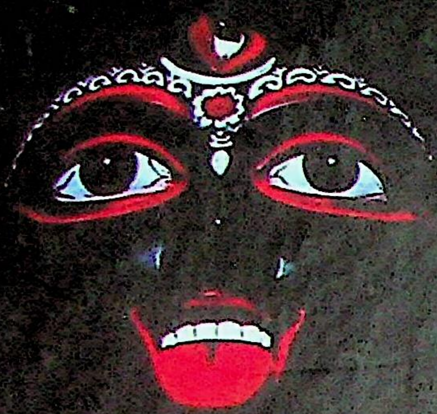

কালী সাধনা

প্রথম খণ্ড

শ্রী পৃথ্বীশ ঘোষ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালী সাধনা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালী সাধনা

শ্রী পৃথ্বীশ ঘোষ

সনাতনী প্রকাশন
পি-২০৫, ব্লক বি, লেকটাউন, কলকাতা ৭০০০ ৮৯

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

KALI SADHANA
by Prithwish Ghosh

প্রথম প্রকাশ ২০২৪

প্রকাশক সত্ত্বাধিকারী
পায়েল গুহ

প্রকাশক এবং স্বত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৮৩০১৮৮৭২৪
email : jayasreepress@gmail.com

প্রচ্ছদ- সাধু অনীশ

প্রাপ্তিস্থান
মহেশ, সায়ন, দে'জ পাবলিশিং (কলেজ স্ট্রিট), দে বুকস্টোর

মূল্য ৫০০ টাকা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উৎসর্গ

শক্তির বিচিত্র প্রভাবে বটগাছের বীজের মধ্যে বিশাল মহীরূহ, ষট্‌বিকারসম্পন্ন দেহের মধ্যে চৈতন্যময়ী বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াতীত মনে বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ শক্তির প্রভাবেই যখন এমন অবস্থা তখন কালীর প্রভাব ও মাহাত্ম্য যে অপার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তহীন আকাশের নীলিমায় সমুদ্রের দিগন্তব্যাপী জলের উত্তাল তরঙ্গে, পর্ব্বতরাশির চূড়ার বরফে, পুরুষের পৌরুষে, নারীর সৌন্দর্য্যে, দরিদ্রের অর্থ কষ্টে, ধনীর বিলাসিতায়, ভোগীর বাসনায়, ত্যাগীর তপস্যায়, স্বাস্থ্যবানের বলশালী দেহে, রোগীর কষ্টে, নবজাতকের প্রাণের সান্দনে, শ্মশানের মৃতদেহের পরিজনের কান্নায় যে পরমা আদি শক্তি কালীর লীলাময় উপস্থিতি অনুভব করা যায় তাঁর চরণযুগলে এই বইটি অর্পণ করলাম।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	৯
কালী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	১৩
কালী সাধনার প্রাথমিক ধারণা	২৩
সাধনার জন্য শ্রী গুরুদেবের প্রয়োজনীয়তা	৩১
শিষ্যের গুণ ও লক্ষণ	৩৭
সাধনা, শ্রীগুরুদেব ও গুরুপূজা	৪৫
কালী সাধনা কি	৫০
সাধক ও সাধনা	৫৪
সাধক, সাধনা ও বর্তমান সমাজ	৬১
তন্ত্র শাস্ত্রের ধারণা	৬৮
নবরাত্রি সাধনা	৮৪
বাংলা ও তন্ত্র	৯১
দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে দু'চার কথা	১০১
কালী অঘোর মন্ত্র সাধনা	১১১
মন্ত্র জপ, পুরশ্চরণ ও গুপ্ত জ্ঞান	১২০
মন্ত্রের পুরশ্চরণ কি ও পুরশ্চরণের লক্ষ্য কি	১৩০
সাধনার পদ্ধতি	১৩৪
অনাবৃতা সাধিকা মিনতি	১৩৬
সাধনায় কিভাবে সফলতা পাওয়া যাবে	১৬৮
শত্রু ধ্বংস	১৬৯
নিয়োগকর্তাকে আকৃষ্ট করতে কালী বশীকরণ মন্ত্র	১৭৫
ভৈরবী কালী সাধনা	১৭৬
কামাখ্যা ভ্রমণ ও ত্রিপুরাসুন্দরী	১৭৯
অম্বুবাচী এক লোকাচার	১৮৯
দেবী কামাখ্যা	১৯২
কামাখ্যাদেবীর মাহাত্ম্য	১৯৭

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হাজো ও মদন কামদেব	২০০
কামসূত্র	২০৬
সমকামিতা	২১২
কে ঐ মেয়েটি	২১৬
কামদেব সাধনা	২২৭
ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির জন্য কামদেব সাধনা	২২৯
কামদেব স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্র	২৩০
বশীকরণের জন্য রতি মন্ত্র	২৩১
কামদেব শাবর মন্ত্র	২৩২
কামদেব শাবর মন্ত্র সিদ্ধি	২৩৩
কামদেবকে বিশেষ নিবেদন	২৩৪
কামদেব, ভস্ম ও বিভূতি	২৩৫
ভস্ম ও সুসলার	২৩৭
মাতঙ্গী সাধিকা মাতু	২৪০

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মুখবন্ধ

তন্ত্র সাধনার দেশ ভারতবর্ষ হলেও এই বঙ্গদেশ বা বাংলা তার পথিকৃত। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে ভক্ত তার সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা করে আসছেন। যে সব দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে তন্ত্র সাধনা হয়ে থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী হলেন কালী। কালীর উদ্ভব ও বিকাশ এই বঙ্গদেশেই। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধক-সাধিকারা মা কালীর নানা রূপের সাধনা করেন এবং একমাত্র সিদ্ধ গুরুই তার শিষ্যকে সাধনার সঠিক পথ দেখিয়ে সাধনার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন। সাধক শিষ্যকে খুব নিষ্ঠাভরে ও গুরুনির্দেশিত পথে তন্ত্র সাধনা করতে হয়। কোনওরকম দোষ-ত্রুটি হলে অনর্থ হতে পারে। তাই সঠিক পথে নিষ্ঠাভরে তন্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম মেনে সাধনা করতে পারলে মা কালী তাঁর ভক্তকে অমিত শক্তি দান করেন।

মা কালী বিশ্ব প্রসবিনী। মা কালী ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম সাধনের জন্যে জগতের কল্যাণে ও অসুর বিনাশে লিপ্ত হয়েছেন। সাধারণত, কাপালিক, অঘোরী, তান্ত্রিক প্রভৃতিরা কালী সাধনা করে থাকেন। ডান পা শব-শিবের ওপর রাখা কালী কখনও কৃষ্ণবর্ণা, কখনও নীলবর্ণা, আবার পীতবর্ণা, রক্তবর্ণা, শুভ্রবর্ণা আবার কখনও তিনি চামুণ্ডা, কখনও বা শত্রু দমনকারী বগলা, তিনিই আবার তন্ত্রমতে মা কমলা, মহালক্ষ্মী আবার তন্ত্রের দেবী মাতঙ্গী বা বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী।

'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানম্ অনেন ইতি তন্ত্রম্', অর্থাৎ যে শাস্ত্রের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তাকে তন্ত্র বলে। আবার 'তনু' থেকে 'তন্ত্র' কথাটি এসেছে একথাও বলা যায়। তবে দেবী কালীর পুজো ও তান্ত্রিক কালীসাধনা সম্পূর্ণ আলাদা। তন্ত্র-সাধনা দাঁড়িয়ে আছে কিছু বিশেষ পুজাপদ্ধতি ও গুপ্ত কিছু কর্মকাণ্ডের উপর। সাধারণভাবে আমরা কারও গৃহমন্দিরে বা তীর্থে কিম্বা পর্বসময়ে কালীর যে পুজো দেখে থাকি, কালীসাধকের পুজো তার থেকে অন্যরকম কিছু কিম্বা বিশেষ ক্রিয়াকৌশলের যা সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে করণীয় নয় আর পুরোহিত ব্রাহ্মণের পুজোর মন্ত্র, মুদ্রা ও আচার সম্পূর্ণ আলাদা। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মা কালীর পুজোয় পশু বলি দেওয়া হয়, পশুর মাংসের ও মাছের ভোগ নিবেদন করা হয়, মা কে মদ নিবেদন করা হয়, বোয়াল মাছ ও অন্যান্য মাছ ভোগ দেওয়া হয়। বলি দেওয়া পশুর ঘাড় বা গলার কাছ থেকে কয়েক টুকরো মাংস ও রক্ত। এই রক্ত মা কে ছোট মাটির মুছি বা ছোট সরার মতো বাটিতে করে মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে নিবেদন করা হয়।

বাইরে থেকে তন্ত্রসাধনা বেশ কষ্টকর মনে হলেও আসলে বিষয়টি তেমন নয়। অধিকাংশ ব্যক্তি এই বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশায় থাকেন। কালীকে কেন্দ্র করে তন্ত্র সাধনা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিয়ে একটু বিশদে আলোচনা করা যাক। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় কালীসাধনা খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকে উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু তন্ত্রধর্ম প্রাকবৈদিক ও হরপ্পা সভ্যতায়ও তন্ত্রধর্মের প্রচলন ছিলো বলে প্রমাণিত। তন্ত্র হল গভীর দর্শনের বিষয়। তাই জ্ঞানান্ধ শিষ্য এসে বিনীতভাবে সিদ্ধ গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে সাধনা করেন। তন্ত্র হল সৃষ্টি পরিচালনার নিয়ম। কিন্তু তন্ত্র বিষয়টির তাৎপর্য বিশাল। তন্ত্র সাধকরা মনে করেন এই মহাবিশ্ব শিব-শক্তির অপার লীলা। এই লীলা ও সৃষ্টিতত্ত্বকে পরবর্তী কালে দশ মহাবিদ্যার ধারণা দিয়ে প্রকাশ করা হয় -- যেখানে প্রথম বিদ্যা হলেন মা কালী। পরমা প্রকৃতি বিশ্বপ্রসবিনী মা মহামায়ারই বিভিন্ন রূপে দশ মহাবিদ্যা। তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে মন্ত্র ও যন্ত্র। যন্ত্র হল দর্শন-এর রৈখিক রূপ আর মন্ত্র হল শক্তির ধ্বনিরূপ। মনকে নিয়ন্ত্রিত করে শরীরকে কালের করাল গ্রাস থেকে ত্রাণই হল 'তন্ত্র'। শরীরের সাথে সম্পর্কিত হল 'মন' আর মনের বাস শরীরকেন্দ্রিক, সেই জন্য মনের ত্রাণকে 'মন্ত্র' বলে এবং শরীরটা হল শ্রীযন্ত্র বা ওঁ-কার স্বরূপ। এই তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্রকে সাধকের দেহের মধ্যে ক্রিয়াশীল করতে হলে দেহে উপস্থিত শক্তির উদ্বোধন দরকার। দেহে উপস্থিত শক্তির মূল কেন্দ্র হল দেহের নীচের দিকে আর তার উপরে ক্রমান্বয়ে দেহের ভিতরের ছয়টি বিশেষ কেন্দ্র বা চক্রকে উজ্জীবিত করে এই শক্তিকে নিজের বশবর্তী করে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হয়। প্রধান ছয়টি চক্র বা ষটচক্রকে বিভিন্ন ভাবে সক্রিয় করে দেহের ভিতরে জন্মাবধি স্থিত নিষ্ক্রিয় শক্তিকে জাগ্রত করাই সাধনা। গুরুজনেরা বলেন, এই চক্রগুলিতে দেবতার অধিষ্ঠান বলে সমস্ত ধারার সাধনায় 'ষটচক্র ভেদ' মূল প্রতিপাদ্য।

তন্ত্রসাধনায় তিনটি ভাবের কথা বলা হয়েছে—পশুভাব, বীরভাব ও দৈবভাব। জন্মাবধি চক্রগুলিতে আসুরিক সত্তা ক্রিয়া করে, যার ফলে ষড়রিপুর প্রভাব প্রকাশ পায়। এই আসুরিক ভাবকেই 'পশুভাব' বলে। জন্ম থেকে মানুষের মধ্যে পশুভাব বা ষড়রিপুর প্রাধান্য বেশি। এই পশুভাবকে সাধনার মাধ্যমে প্রথমে বীরভাবে উত্তীর্ণ করে পরে দৈবভাবের প্রতিষ্ঠা হল তন্ত্র সাধনার মূল উদ্দেশ্য। এইভাবগুলি ক্রিয়া করে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান অনুযায়ী। এক্ষেত্রে ইচ্ছা হল 'আমি', ক্রিয়া হল 'কালী' আর জ্ঞান হল 'শিব'। বাস্তবিকভাবে প্রথমে সাধকের এই ধারণা থাকে না। গুরুদেবের অধীনে তন্ত্রশিক্ষার মাধ্যমে স্ব-ভাবের অন্তর থেকে ক্রমে বহিপ্রকাশের ক্রমধারা শুরু হয়। যার যেমন স্বভাব তার তেমনই ভাব ক্রিয়া শুরু হয়। তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে একজন সাধক গুরু নির্দেশিত পথে সাধারণ মানুষ থেকে ক্রমে আত্মদর্শক সাধকে পরিণত হন। তাই তন্ত্র এক প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান যা মানুষকে অসুর থেকে দেবতায় পরিণত করার এক বিশেষ ক্রিয়াযোগ। এককথায় বলতে গেলে—'তন' বা শরীরের মধ্যেই 'তৎ' বা ঈশ্বরের বাস। তাই তন এর মধ্যে তৎ-এর বাস বলে নিজেকে জানা হলো তন্ত্র। তন বা শরীর আত্মার বাসস্থান বলে দেহ হল আত্মার মন্দির। আত্মা বলতে সেই বৃহৎ আমি বা ঈশ্বরকেই বোঝায়। সেইজন্যে গীতায় ভগবান বলেছেন—'আমাকে যে দেহ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বা শরীর ভাবে সে অজ্ঞানী।'

জীবনের উদ্দেশ্য চতুর্বর্গ লাভ, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র 'ধর্ম'-কে প্রথম স্থান দিয়েছেন। 'ধর্ম' মানে 'অর্থ' ও 'কাম'-এর সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু মনকে স্থির ভাবে ধরে না থাকলে 'ধর্ম' রক্ষা হয় না। ধর্ম পথে থেকে অর্থ-কামের ব্যবহার করে মোক্ষের পথে এগিয়ে যাওয়া হল 'সাধনা'। জীবনে অর্থের প্রয়োজন থাকলেও কতটুকু প্রয়োজন তার কোন নির্দিষ্টতা নেই। তাই অর্থ ও কাম বা কাম-কাঞ্চন মানুষের জীবনের দুটি বড় বন্ধন। অন্যান্য ভোগগুলি কিছুদিন পরে মিটে যায়, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনের তৃষ্ণা সারাজীবন বেঁচে থাকে। মানুষ মাত্রই ভোগ করে, ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত না হলে ত্যাগ করা যায় না। ভোগ ও ত্যাগ হল দিন-রাত্রির মত দুটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং ত্যাগ ও ভোগ হল জীবনের সমন্বয় পাঠ। তাকে জ্ঞান অনুযায়ী গ্রহণ করাই সাধনা। তন্ত্র সাধনায় এই প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বীকার করে ভোগের মাধ্যমে ত্যাগ করে প্রকৃতিকে জয় করতে হয়।

দেহ, মন, প্রাণ ও আত্মাকে জানাই প্রকৃত তন্ত্রসাধনা। আধ্যাত্মিক সাধনায় মানবিক ভাব মূলত তিনটি—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। জন্মের সাথে প্রাপ্ত পশুরূপ দেহ ও মনকে গুরুদেবের নির্দেশে 'মানুষ' করে তুলে তাকে দেবতায় পরিণত করাই তন্ত্রের দিব্যভাব। পশু, মানুষ ও দেবতা—মনের এই তিনটি স্তরই হল পশু, বীর ও দৈবভাব। মানুষ তার কর্ম বা ক্রিয়া অনুযায়ী অধঃপতনে পশু স্বভাবে পরিণত হয় ও উত্থানে দেব স্বভাবে পরিণত হয়। তাই মানুষ পারে দেবতা বা পশু হতে। সক্রিয় ভাবে তন্ত্রসাধনা হল মানুষের দেবতা হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত উপাসনা।

অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার শেষ তিনটি অঙ্গ—ধারনা, ধ্যান, সমাধি একত্রে সংযম। এই সংযমই হল জীবনের আদিশিক্ষা। আমাদের অন্তরীয় শক্তি—আসক্তি, বাসনা ভোগ ইত্যাদির মাধ্যমে বেরিয়ে যায়, তাই আমরা অসংযমী হয়ে পড়ি। বীর্যই হল আমাদের শরীর ও মনের মূল শক্তি। নারী-পুরুষের অসংযমে সেই শক্তির অপচয় হয়ে শরীর ও মন দূর্বল হয়ে পড়ে। বীর্যপাতের পরে যে দুর্বলতা অন্তরে অনুভব হয় তা অজ্ঞানীও বোঝে। কিন্তু আসক্তি ও অসংযমের ফলে সেই অন্তর-শক্তিকে আমরা অপ্রয়োজনীয় ভাবে অপচয় করি। আমাদের মূলাধারের কাছেই এই বীর্য সঞ্চিত থাকে। সংযমে বীর্য গাঢ় হয় ও সাধকের অন্তর্শক্তি কুণ্ডলিনী শক্তিশালী হয়। সংযমে বা ব্রহ্মচর্য সাধনায় বীর্য সঞ্চিত হয়। এইজন্য 'ব্রহ্মচর্য সাধনা' সমস্ত সাধন পথের মুল ভিত্তি। তন্ত্রসাধনা হল শক্তি বা ব্রহ্মচর্যের সাধনা।

এই বীর্যশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তিই আমাদের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় হয়ে ষটকোশে বিরাজমান। তাই কোশে কোশে শক্তিকে জাগরিত করা এবং নানাভাবে সেই শক্তিকে উপভোগ করাই তন্ত্র বা শক্তি সাধনা। পঞ্চকোশে অর্থাৎ শরীরে বা তন্-এর সর্বত্রই তিনি বিরাজমানা। সর্বব্যাপী চৈতন্যশক্তি হয়ে তিনি সজীব হয়ে দেহী হয়ে অন্তরে বসে আছেন। তাই যাদের চেতনা চৈতন্যাভিমুখী তারা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দৈবভাবের সাধক ও যাদের চেতনা বিষয়াভিমুখী তারা পশুভাবের সাধক আর মাঝখানে পশুভাব থেকে দৈবভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার ভাবই হল বীরভাব। দৈবভাবের সাধকের কাছে দেহ হল সতীপীঠ। সততাই হল সতী, যার মধ্যে সততা প্রতিষ্ঠিত তার শরীরই দেবীপীঠ। বোধের অখন্ডতাই হল দেবীশক্তির উদ্বোধন আর বোধের বিক্ষিপ্ততায় তা টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে সতীহারা অবস্থা।

বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে সমস্ত শিক্ষাই হচ্ছে, কেবল সংযম শিক্ষা নেই। তাই পড়াশুনায় শিক্ষিত মানুষেরা নিজ রিপুর বন্ধনে বিজ্ঞ-মূর্খ হয়ে থাকছেন। অর্জুনের মত বীরও যুদ্ধ সাধনায় মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ভগবান তাকে পালাতে না দিয়ে বীরভাবের উপাসনা করিয়েছিলেন—এই ভাবে আমরা শ্রীমৎভগবৎ গীতাতে তন্ত্র সাধনার ইংগিত পাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শুরুতে ভগবান অর্জুনকে যে দুর্গাস্তব করিয়েছিলেন তা শক্তি সাধনার অঙ্গ। এছাড়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরু ছিলেন ঋষি উপমুন্য, যিনি শৈবাগম তন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাই তন্ত্রের বীরভাবের সাধনা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন। জগতে ধর্ম বা দৈবভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের সুখের জীবনকে সহজে পরহিতার্থে উৎসর্গ করা হল তন্ত্রসাধনার একটি দিক। চৈতন্যদেবের সংসার ত্যাগের সাথে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ ও রামকৃষ্ণদেবের সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগও হল বীরভাবের সাধনার অঙ্গ। বলা হয়ে থাকে, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি বিচার-শাস্ত্র লৌকিক বুদ্ধির গম্য, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র সেরকম নয়। গুরুর উপদেশ না পেলে এ বিদ্যায় একেবারেই প্রবেশ করা যায় না বা উচিতও নয়। যদিও বা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তন্ত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, তবুও তন্ত্র সাধনাতে তার অধিকার আছে কি নেই—এর বিচারক সিদ্ধ পুরুষ বা গুরুদেব। তন্ত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ আর তন্ত্রসাধনা এক বিষয় না। এখনকার দিনে প্রচুর মানুষ তন্ত্রশিক্ষা নিতে চান। কিন্তু এইভাবে কখনওই তন্ত্রশিক্ষা লাভ হয় না। সাধারণ দীক্ষায় এই শিক্ষা দুরস্ত। তন্ত্রোক্ত উপাসনায় আত্মোনিয়োগ করলে অনন্যভাবে সাধনায় মনোনিবেশ করতে হবে। তন্ত্রসাধনা এক বিশিষ্ট দর্শন ও ক্রিয়াকর্ম। তন্ত্রসাধনায় কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে যেমন—মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীকস্বরূপ বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, রহস্যপুজা, 'পঞ্চ ম'-কারের ব্যবহার, ভৈরবী সাধনা, প্রয়োগ কর্মে সিদ্ধিলাভের জন্য ষটকর্মের শিক্ষা ইত্যাদি, এসব শিক্ষা সাধক তার গুরুদেবের কাছ থেকে, নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী এক এক করে লাভ করেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

হিন্দু ধর্মের সকল দেব দেবীর মধ্যে মা কালী হলেন দেবীদের মধ্যে ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক তথা শক্তিরূপের অন্যতম সেরা প্রতীক। এই রূপ দিয়ে মা সমস্ত বিশ্বকে একদিকে যেমন বুঝিয়েছেন অসুরদের বিনাশ এর জন্য তিনি এই রূপ ধারণ করেছেন, তেমনই নারীরা তাদের মমতাময়ী রূপের খোলস ত্যাগ করে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে সকল অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার শেষ করার ক্ষমতাও রাখেন। তাঁর যে রুদ্রমূর্তি আমরা দেখতে পাই তাতে দেখি তার দুই চোখ ভয়ংকর রক্তবর্ণের হয়ে থাকে। কালীর যে সকল মূর্তি, চিত্র আমরা দেখতে পাই তাতে সবগুলিতেই আমরা দেখি মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন ভগবান শিবের উপরে এবং তার জিভ সম্মুখে অগ্রস্থ অবস্থায় আছে। অনেকের মনেই এই প্রশ্ন দেখা যায় কেন মা কালী তার স্বামীর উপর এইরূপ জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছেন?

লোককথায় বলা হয়, মা মহামায়া অবতীর্ণ হলে তিনি দেবতাদের বরাভয় প্রদান করেন এবং অসুর নিধনে তার রুদ্র রূপ ধারণ করেন। দেবতারা তখন এক প্রকার খুশি হন। কিন্তু অসুরেরা সম্মিলিত ভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। আর অসুরদের এরকম সম্মিলিত লড়াইয়ে মহামায়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তার তৃতীয় নেত্র থেকে জন্ম নেয় অত্যন্ত রুদ্রমূর্তি দেবী কালী। যখন তিনি মা কালী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন সকল অসুরদের বিনাশ করতে শুরু করেন এবং এক প্রকার হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যান। অসুর হত্যা করে মা তাদের নরমুণ্ড হাতে ধরেন এবং নরমুণ্ডের মালা করে গলায় পরিধান করেন। এছাড়া খড়্গ দিয়ে কাটা অসুরদের হাত দিয়ে তিনি তার পোশাক বানিয়ে পরিধান করে নেন। এইরকম অবস্থায় অসুরেরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না কিভাবে এই দেবীর মোকাবিলা করবে!

তখন শুম্ভ-নিশুম্ভ তাদের সেনাপতি রক্তবীজকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করেন। এই ভয়ঙ্কর দেবীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসুরদের মধ্যে এক ভয়ংকর অসুর ছিল রক্তবীজ। এই অসুর প্রজাপতি ব্রহ্মার আশীর্বাদে পেয়েছিলেন এক অভিনব বর। বরটি ছিল এইরূপ, অসুর রক্তবীজকে যদি কেউ হত্যা করতে উদ্যত হন কোন অস্ত্রের আঘাতে তার শরীর থেকে যদি বিন্দুমাত্রও রক্তপাত হয় তাহলে সেই রক্তের বিন্দুকণা যেখানে যেখানে পড়বে প্রতিটি বিন্দু কণা থেকেই এক একটি করে রক্তবীজের পুনরায় জন্ম হবে অর্থাৎ একপ্রকার নিজেকে অমর করার বর চেয়ে নিয়েছিলেন প্রজাপতির কাছে, অত্যন্ত চালাক অসুর এই রক্তবীজ। এমন বলশালী রক্তবীজকে দেখামাত্রই মা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। খড়্গের আঘাতে রক্তবীজের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করলে তার সারা শরীর থেকে রক্ত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তখনই প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে সৃষ্টি হয় লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ। এইভাবে মা প্রতিবার রক্তবীজকে মারতে উদ্যত হলে আরো লক্ষ লক্ষ নতুন রক্তবীজ জন্ম নেয়। তখন মা বুঝতে পারেন রক্তবীজের বরের কথা। কালী এইবার রক্তবীজের রক্তকে তার মুখ দিয়ে পুরোটাই গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি রক্তবীজকে হত্যা করতে সফলতা লাভ করেন।

এরপরই শুরু হয় মায়ের তাণ্ডবনৃত্য। সেই তান্ডব নৃত্যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপতে থাকে। দেবতারা যখন এই তান্ডব নৃত্য দেখেন তখন তারা বুঝতে পারেন সারা পৃথিবী জুড়ে এক প্রলয়ের সৃষ্টি হতে চলেছে, যা তাদের পক্ষে রোধ করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। আর এই প্রলয় যে সকল কিছুকে ধ্বংস করে দেবে তা তারা উপলব্ধি করতে পারেন। তখন তারা ছুটে যান দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে। মহাদেব সকলের অনুরোধ শুনে মা কালীর রুদ্রমূর্তি তাণ্ডবনৃত্য বন্ধ করার জন্য মায়ের সামনে আপন দেহ শায়িত করেন। তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে মা কালী যখন ভগবান শিবের বুকে পা দেন তখন এক প্রকার সম্বিৎ ফিরে পান। তখন দেখেন তিনি তার স্বামীর বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর তাই তখন হঠাৎ করে লজ্জায় তার জিভ সম্মুখে বেরিয়ে আসে। আর এই সন্মুখে বেরিয়ে আসা জিভ সমেত মা কালীর রুদ্র মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি বিভিন্ন চিত্রকলায় ও বিভিন্ন মূর্তিতে। এই ভাবেই মায়ের চিরাচরিত সম্মুখে জিভ বের করা মূর্তি প্রসিদ্ধিলাভ করে এই পৃথিবীলোকে।

সনাতন সনাতন ধর্মমতে কালী বা কালিকা হচ্ছেন শক্তির দেবী। 'কাল' শব্দটির অর্থ 'সময়', শব্দটি মৃত্যুবোধকও বটে। যেমন আমরা বলি—'কাল'এসে গেছে, মৃত্যুর সময় সমাসন্ন, মহাকাল এসে গেছে। দেবীর নাম মহাকালীও বটে। কালীর নাম কাল না হয়ে কালী হলো এ কারণে যে শিবের অপর নাম কাল, যা অনন্ত সময়কাল বোধক। কালী হচ্ছে কাল এর স্ত্রীলিঙ্গ বোধক। মা কালী হলেন সংহারী রূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত অভিধান শব্দকল্পদ্রুম এ বলা হচ্ছে—'কাল শিবঃ। তস্য পত্নী কালী।' অর্থাৎ শিবই কাল বা কালবোধক, তাঁর পত্নী কালী। তিনি সময়ের, পরিবর্তনের, শক্তির ও সংহারের দেবী। তিনি কৃষ্ণবর্ণা বা মেঘবর্ণা এবং ভয়ংকরী। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভয়ংকরেরও পূজা করেন। তিনি অশুভ শক্তি'র বিনাশ করেন। কালীর পূজক ও কালীসাধক দেবীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করেন তাই ভয়ংকরীকে তিনি ভয় পান না। এই শক্তি পূজা প্রবলভাবে সনাতন সমাজকে প্রভাবিত করেছে, বিশুদ্ধ শক্তি সঞ্চারিত করেছে, অন্তরে শুদ্ধি দিয়েছে, দুর্দিনে দুর্বলকে সাহস দিয়েছে। শাক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব মতে এবং শাক্ত-তান্ত্রিক বিশ্বাস মতে তিনি 'পরমব্রহ্মময়ী'। কালীর এই সংহার রূপের পরেও সাধক তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানে 'মাতা' সম্বোধন করে। এই 'মা' সম্বোধনে তিনি সন্তানের কল্যাণ করেন ও সাধকসন্তানের আত্মসমর্পনে তাঁকে মঙ্গলময়ী রূপে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দর্শন দিয়ে আত্মারাম করে গড়ে তোলেন। তাই তিনি কল্যাণী ও করুণা করে দর্শন দিয়ে তিনি করুণাময়ী—এটাই তাঁর প্রতি সনাতন ধর্মীয়দের বিশ্বাসের মূল আস্থা। মা কালী যেহেতু কল্যাণী ও করুণাময়ী তাই তাঁর কাছে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। যিনি আকুল হয়ে ডাকবেন, তাকে রক্ষা করতে মা বার বার আবির্ভূত হবেন, তিনি দেবতা, রাক্ষস, দৈত্য বা মানুষ যিনিই হন। মা কালীকে অনেকেই অনেক কারণে ডেকে থাকেন, আর মা তার ভক্তদের দশ হাতে দশদিক থেকে রক্ষা করেন। মাকে কেউ ডাকে আর্থিক উন্নতির জন্য, আবার কেউ ডাকেন সন্তানের জন্য, রোগ, শত্রু ও এই রকম নানা কারণে ভক্তরা মাকে ডেকে থাকেন।

কালী হলেন আদ্যাশক্তি। সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু তথা বাঙালিদের কাছে এই দেবী বিশেষভাবে শক্তির দেবী রূপে পূজিতা হন। তন্ত্র অনুসারে, কালী দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত দশজন প্রধান তান্ত্রিক দেবীর মধ্যে প্রথমা। দশমহাবিদ্যার মধ্যে ইনি প্রথমা মহাবিদ্যা। শাক্ত মতে, কালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ। দেবী কালীর অসংখ্য নামের মধ্যে দক্ষিণা, সিদ্ধ, গুহ্য, ভদ্র, শ্মশান, রক্ষা, মহা, চামুণ্ডা ইত্যাদি রূপ প্রসিদ্ধ। কালীর আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দেবাসুরের যুদ্ধে পরাজিত দেবতাদের প্রার্থনায় আদ্যাশক্তি ভগবতী পার্বতীর দেহ কোষ থেকে দেবী কৌষিকী আবির্ভূত হন। তখন ভগবতী আদ্যাশক্তি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন বলে তাঁর নাম কালী বা কালিকা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কাল নিয়ে মহাকাল। আর সেই মহাকালের শক্তি কালী। অনন্তকালে সৃষ্টি রূপিণী পরমা প্রকৃতির রূপ এই মহাকালী। যারা সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করতে চান, যারা তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন, যারা মানুষরূপী হয়েও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চান তারা কালীর পূজা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে করে থাকেন।

আমাদের বৃহত্তর বাংলায় ঘরে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালীপ্রতিমার নিত্যপূজা ও প্রতিটি অমাবস্যায় বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত সাংবাৎসরিক দীপান্বিতা কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়। এই দিন আলোকসজ্জা ও আতসবাজির উৎসবের মধ্য দিয়ে সারারাত্রিব্যাপী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, দীপান্বিতা কালীপূজার দিনটিতে ভারতের অন্যান্য জায়গায় দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই দিন লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হলেও বাঙালি, অসমীয়া ও ওড়িয়ারা এই দিন কালীপূজা করে থাকেন। এছাড়া মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রটন্তী এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজাও যথেষ্ট জনপ্রিয়। ব্রহ্মযামল নামক তন্ত্রগ্রন্থের মতে 'কালিকা বঙ্গদেশে চ...' কালী বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেক জায়গায় প্রতি পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার ছাড়াও দুই পক্ষের চতুর্থী, অষ্টমী, চতুর্দশী তিথিতে কালীপূজা হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি 'কালী' শব্দটি 'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। কালী-নাম মাহাত্ম্যে কাল-কে যদি আলাদা করে নেওয়া হয় তাহলে কাল-এর একাধিক অর্থ বের হয়। কাল মানে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সময়, আবার কাল তথা কৃষ্ণবর্ণ। 'কাল'-এর অর্থ-এ লুকিয়ে আছে সংহার বা মৃত্যু ভাবনাতেও। কালীকে কাল অর্থাৎ সময়ের জন্মদাত্রী বলা যেতে পারে, আবার পালনকর্ত্রী এবং প্রলয়কারিণী নিয়ন্ত্রক বলা হয় এবং সেই কারণেই দেবীর নাম কাল যুক্ত 'ঈ' অর্থাৎ - কালী। সনাতন ধর্মে ঈ-কারের সৃষ্টি ও শব্দোচ্চারণ-কে উল্লেখ করা হয়েছে ঈশ্বরী বা সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মাকে উপলব্ধি করার জন্য। আবার 'কালী' শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ' (কালো) বা 'ঘোর বর্ণ'(পাণিনি ৪।১।৪২)। হিন্দু মহাকাব্য মহাভারত-এ যে ভদ্রকালীর উল্লেখ আছে, তা দেবী দুর্গারই একটি রূপ (মহাভারত ৪।১৯৫)। মহাভারত-এ 'কালরাত্রি' বা 'কালী' নামে আরও এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি যুদ্ধে নিহত যোদ্ধৃবর্গ ও পশুদের আত্মা বহন করেন। আবার হরিবংশ গ্রন্থে কালী নামে এক দানবীর উল্লেখ পাওয়া যায় (হরিবংশ, ১১৫৫২)। 'কাল' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে—'নির্ধারিত সময়' ও 'মৃত্যু'। কিন্তু কালী প্রসঙ্গে এই শব্দের মানে 'সময়ের থেকে উচ্চতর। সমোচ্চারিত শব্দ 'কালো'-র সাথে এর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষকদের মতে, 'কালী' শব্দটি 'কৃষ্ণবর্ণ' বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। প্রকৃত অর্থে কাল বা সময়কে কলন বা রচনা করেন যিনি তিনিই (কালঈ) কালী। 'কালী' নাম কেন কাল-এর স্ত্রীলিঙ্গ হল আর শিব-কেও কাল নামে ডাকা হয়—সে প্রসঙ্গে এবার বলব। 'কাল' মানে হল অনন্ত সময়। এই সময়েরই স্ত্রীলিঙ্গ বোধক হচ্ছে কালী। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে যে কাল সর্বজীবকে গ্রাস করে, সেই কালকে, আবার যিনি গ্রাস করেন-তাঁকে কালী বলা হয়। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, মহাপ্রলয়-এর পিছনে রয়েছে কালশক্তি। সবচেয়ে মজার কথা এই সবের জন্য মহাকাল পরিস্থিতির উদ্ভূত হয় তাই আবার সব সৃষ্টিকে গ্রাস করে। সনাতন ধর্মে উল্লেখ যে মহাকালেরও পরিণাম আছে। মহাপ্রলয়ের কালশক্তি মহাকালীর ভিতরেই নিঃশেষ লীন হয়ে যায়।

কালিকা পুরাণ থেকে জানা যায় পুরাকালে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামক দুই অসুর ছিল এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের ভয়ঙ্কর ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীতে চরম অত্যাচার শুরু করেছিলেন দুই অসুর। তাদের আক্রমণে পৃথিবীর সকল মানুষ একপ্রকার চরম অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা তাদের আক্রমণের পরিধি শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি তাঁরা দেবলোকেও আক্রমণ করেছিল। দেবতারাও এই দুই দৈত্যের কাছে যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে এবং দেবতাদের দেবলোক ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এমন সময় দেবতারা ভগবান বিষ্ণু, মহাদেব শিব এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন তাদের সম্মিলিত উপদেশে সকল দেবতারা মিলে আদ্যশক্তি মহামায়ার উপাসনা করবেন বলে স্থির করেন। দেব লোক তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র দেব লোক ফিরে পাওয়ার জন্য আদ্যশক্তি মহামায়ার তপস্যা করতে থাকেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কাছে আবির্ভূত হন। মা মহামায়া অবতীর্ণ হলে তিনি দেবতাদের বরাভয় প্রদান করেন এবং অসুর নিধনে তাঁর রুদ্র রূপ ধারণ করেন। দেবীর শরীর কোষ থেকে অন্য

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এক দেবী সৃষ্টি হয় যা কৌশিকী নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত দেবী কৌশিকী মা মহামায়া দেহ থেকে নিঃসৃত হলে মা মহামায়া কালো বর্ণ ধারণ করেন, যা দেবী কালীর আদিরূপ বলে ধরা হয়।

তন্ত্রে ও পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তোড়লতন্ত্র অনুসারে, কালী আট প্রকার—দক্ষিণকালিকা, সিদ্ধকালিকা, গুহ্যকালিকা, শ্রীকালিকা, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালিকা, শ্মশানকালিকা ও মহাকালী। মহাকাল সংহিতার অনুস্মৃতিপ্রকরণে নয় প্রকার কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়—দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, ধনকালিকা, সিদ্ধিকালী, সিদ্ধকালী, চামুণ্ডাকালী। অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক ও তন্ত্রসার গ্রন্থ দুটিতে কালীর ১৩টি রূপের উল্লেখ আছে—সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী, রক্তকালী, যমকালী, মৃত্যুকালী, রুদ্রকালী, পরমার্ককালী, মার্তণ্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী, মহাভৈরবঘোর ও চণ্ডকালী। 'জয়দ্রথ যামল' গ্রন্থে কালীর যে রূপগুলির নাম পাওয়া যায়, সেগুলি হল—ডামরকালী, রক্ষাকালী, ইন্দীবরকালী, ধনদাকালী, রমণীকালী, ঈশানকালী, জীবকালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী ও সপ্তার্নকালী। মুণ্ডকোপনিষদে মহাকালী স্বয়ং কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সধূম্রবর্ণা, বিশ্বরুচি, স্ফুলিঙ্গিনী, চঞ্চলজিহ্বা ইত্যাদি নামে ভূষিতা হন। মূলতঃ সাধকের দর্শন অনুযায়ী কালী রূপ পরিগ্রহ করেন।

মা কালী মহাশক্তি। যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে সব মা কালীর মধ্যেই আছে। অনন্ত, আদি, বর্তমান সব কালী মায়ের মধ্যেই আছে। দেবী কালিকার প্রচলিত যে রূপটি পূজিত হয়, সেইরূপটির নাম দক্ষিণাকালী। বলা হয়, এই রূপকল্পনা তান্ত্রিক সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের, এটি তাঁরই মানসচক্ষে পাওয়া মূর্তি। এ বার তাঁর কল্পিত মূর্তির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কী আছে বা তার তাৎপর্য কী, সেটা দেখে নেওয়া যাক।

আগেই বলেছি, কালী শব্দটির ব্যাখ্যা হল—'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'কালী'। এই শব্দের অর্থ 'কালো' বা 'ঘোর বর্ণ'। ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে। যেমন ঘন কালো রাত্রির পর দিন আসে। তেমনি ধ্বংসের পর সৃষ্টি হয়। ঘন কালো মেঘ বিদায় হলেই আকাশে ঝলমলে সূর্য ওঠে, তাই ধ্বংস ছাড়া সৃষ্টির বিকাশ সম্ভব নয়।

মা কালী হলেন আদ্যাশক্তি। জগতের মূল শক্তি ইনি। ইনি মহা সরস্বতী, ইনিই মহা লক্ষ্মী, ইনি রুদ্রানী শিবানী, ইনি ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, নারায়নের শক্তি নারায়নী, শিবের শক্তি শিবা। ইনি নারসিংহী, ইনি বারাহী, ইনি কৌমারী, গন্ধেশ্বরী। ইনি শ্রী রামচন্দ্রের শক্তি সীতা দেবী (রামস্য জানকী ত্বং হি রাবনধ্বংসকারিনী), ইনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, ইনি মহিষমর্দিনী চণ্ডী, ইনি চামুন্ডা, কৌষিকী, দুর্গা ভগবতী। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে। তাই মায়ের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না।

সংহার শব্দের অর্থ ঠিক ধ্বংস নয়—সংহরন, আর এই সংহরণ হল, নিজের ভিতরে প্রত্যাকর্ষণ। যেমন সমুদ্রের ঊর্মিমালা বা ঢেউ সমুদ্রের বুক থেকে উদ্ভুত হয়ে আবার সমুদ্রেই মিলিয়ে যায়, কিম্বা যেমন মাকড়সা নিজের গর্ভ থেকে জাল রচনা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করে আবার নিজের পেটেই তা গুটিয়ে নেয়, তেমনই। মৃত্যুর অর্থ পৃথিবী থেকে, নিকট জনের থেকে চির বিদায় নেওয়া—কিন্তু সেই জগত জননীর কোলে আশ্রয় পাওয়া। এই ব্রহ্মাণ্ড সেই মহামায়ার ইচ্ছাতেই রচিত, সংহার কালে তিনি আবার সব গুটিয়ে নেন।

এবার কালীর রূপকল্পনা বিষয়ে আসি। কালিকাপুরাণে আমরা দেখি আদি শক্তি রূপে তিনি যোগীদের মন্ত্র ও তন্ত্র উদঘাটনে তৎপর। তিনি চতুর্ভূজা, খড়্গধারিণী, বরাভয়দায়িনী, নরমুণ্ডধারিণী। তিনি লোলজিহ্বা ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তিনি মুক্তকেশী, কৃষ্ণবর্ণা, শিববক্ষে দণ্ডায়মানা মাতৃমূর্তি। তিনি মূলত শাক্তদের দ্বারা পূজিতা হন এবং একাধারে দশমহাবিদ্যার প্রথমা দেবী ও বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। দেবী কালীর রূপকল্পনায় মা কালী শবরূপী শিবের উপর দণ্ডায়মানা। শিব হচ্ছেন স্থির বা নীরব। আর কালী হচ্ছেন 'গতির প্রতীক'। এখানে শিব দেখতে সাদা আর মায়ের রূপ কালো বা ঘন নীল। সাধারণত যাঁরা যোগী বা সাধক, তাঁরা সাধন কালের 'কূটস্থ' দর্শনকালে শুভ্র রং বেষ্টিত কালো দেখে থাকেন। আবার বলা হয়ে থাকে মহাদেব এখানে শব রূপ, মৃত্যুরুপ শিবের বুকে স্বয়ং জগত মাতা, এর মানে হল মৃত্যু কে জয়।

দেবী কালী দিগম্বরী। এর অর্থ তিনি কোন কিছুর বন্ধনে আবদ্ধ নন। তিনি দেশ ও কালের উপরে। তিনি সকল জীবের মাতা। এক দিকে দেবী বিশ্বমধ্যে, আবার অন্য দিকে তিনি বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত। যাঁর স্বরূপ এমন, তাঁকে কি কোনও বস্ত্র দিয়ে আবরিত করা সম্ভব! কার কী এমন সাধ্য আছে তাঁর ওই রকম বস্ত্র তৈরী করার! তাই তিনি ঋষি কল্পনায় দিগম্বরী বা নগ্নিকা। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন কিছু পণ্ডিত বসনকে কামনা বাসনার প্রতীক বলেছেন। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ গোপীনিদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন। যারা মূর্খ, নাস্তিক তারা এর মধ্যে অশ্লীলতার প্রসঙ্গ খোঁজেন। এর মানে কিন্তু এই না আমাদের বসনহীন হয়ে থাকতে হবে। খালি কামনা বাসনা আদি ষড়রিপু বর্জন করতে হবে। তবেই দেবকৃপা পাওয়া যাবে। তাই সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে অহং ও অবিদ্যা কে ত্যাগ করেই মায়ের কাছে যেতে হবে।

কালী হলেন শক্তি, তাই মুক্ত স্বভাবা, তাই তিনি মুক্তকেশী। তাঁর মাথার ঘন কালো চুল বাঁধা অবস্থায় থাকে না। যোগশাস্ত্রে মুক্তকেশ বৈরাগ্যের প্রতীক। কালী তাই চিরবৈরাগ্যের প্রতীক। কালী জ্ঞান দান করে লৌকিক বা জাগতিক সকল বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। তাঁর জ্ঞানখড়্গের দ্বারা অষ্টপাশ ছিন্ন হলেই নিস্কাম সাধক দেবীর কৃপা পান, তবেই মুক্তি ঘটে। রামপ্রসাদ তাই গাইলেন —

'মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রনা পাই দিবানিশি।'

দেবী কালীর কেশ মৃত্যুর প্রতীক। চণ্ডীতে আছে মহিষাসুরের হাতে পরাজিত দেবতারা যখন ত্রিদেবের কাছে গেলেন তখন ত্রিদেব ও সমস্ত দেবতাদের তেজ রাশি একত্রিত হয়ে ভগবতী মহামায়ার আবির্ভাব ঘটে। যমের তেজে দেবীর কেশরাশি গঠিত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হয়।

দেবী মায়ের কণ্ঠে মুণ্ডমালা। দেবীর গলায় ৫০টি অসুরের কাটা মুণ্ডের মালা বা হার। প্রকৃত অর্থে ৫০টি কাটা মুণ্ড ৫০টি সংস্কৃত বর্ণেরমালার প্রতীক। ১৪টি স্বরবর্ণ আর ৩৬টি ব্যঞ্জন বর্ণ। এখানে প্রতিটি বর্ণ মানে প্রতিটি বীজমন্ত্র। শব্দ ব্রহ্ম। তাই এখানে অক্ষর রূপ বীজমন্ত্রগুলি শক্তির উৎস। দেবী এখানে স্বয়ং শব্দব্রহ্মরূপিণী। কামধেনু তন্ত্রে দেবী স্বয়ং বলেছেন—'মম' কণ্ঠে স্থিতং বীজং পঞ্চাশদ্ বর্ণমদ্ভুতম্। রামপ্রসাদ তাই গেয়েছেন—

'যত শোন কর্ণপুটে সকল মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী
বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

মুন্ডমালা হল জ্ঞান শক্তির প্রতীক। দেবী ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। তিনি চেতনা দান করেন। অন্ধকারে আবদ্ধ জীবকে আলোর পথ দেখান।

দেবী কালীর কটিদেশে নর হস্তের মেখলা কর্মশক্তির প্রতীক। এখানে কাটা হাত কর্ম বা কর্মফলকে বোঝানো হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পরে জীবাত্মা দেবীর অঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, তিনি আবার সমস্ত কর্মের ফলদাত্রী। পরবর্তী জন্মে তাদের কর্মফল অনুসারে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন গর্ভে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

দেবী কালীর ত্রিনয়নের একটি চন্দ্র স্বরূপ, একটি সূর্য স্বরূপ আর তৃতীয়টি অগ্নি স্বরূপ। দেবী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোতে বা জ্যোতিতে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আবার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিপতি। অর্থাৎ তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতেও অবস্থান করবেন। তাঁর ত্রিনয়নের ইঙ্গিতেই ত্রিকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে আমরা যে কাজ করি না কেন তিনি তা দেখছেন। আমরা যদি গোপনে পাপ কাজ করে প্রভাব খাটিয়ে এই পৃথিবীর বিচারসভার হাত থেকে নিস্কৃতি পাইও, তবুও দেবী সব দেখেন—তাঁর বিচার থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না।

দেবীর চার হাত। তাঁর উপরের দুহাতে অভয় ও খড়্গ। নীচে বর মুদ্রা ও ছিন্ন নরমুণ্ড। অভয় ও বর মুদ্রা সৃষ্টির প্রতীক। খড়্গ ও ছিন্ন নরমুণ্ড ধ্বংসের প্রতীক। দুটি বিপরীত কাজ হলেও আমরা মা কালীর মধ্যে দুটিকেই দেখতে পাই। এর অর্থ দেবী কালীর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়, তার ইচ্ছাতেই ধ্বংস হয়। দেবী তার খড়্গ দ্বারা অবিদ্যারূপী অসুরকে ধ্বংস করেন।

কালী কৃষ্ণবর্ণা। এখানে কালো মানে বর্ণাতীত। কালোর মধ্যে সব বর্ণ মিলে যায়। কালো জগতের আলো। সাধকেরা দেবীকে অনেক সময় গাঢ় নীল বর্ণের দেখে থাকেন, কারণ তিনি গাঢ় নীল আকাশের মতোই অনন্ত অসীম। আদিতে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না তখনও তিনি ছিলেন। তিনি অনন্ত, তিনি আদিতেও ছিলেন, তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা আবার কখনো তিনি নীলবর্ণা—যা সুদীর্ঘ, সুনীল, নীল আকাশের সাথে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তুলনীয়। অনন্ত তার লীলা প্রকাশ—যা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অগোচর।

দেবী কালী উলঙ্গিনী। তাই কিছু নাস্তিক, মূর্খ ও বুদ্ধিজীবি শ্রেনীর মানুষ অনেক সময় খারাপ কিছুর সঙ্গে উলঙ্গিনী মায়ের তুলনা করে বসেন। মা উলঙ্গিনী বটে—কিন্তু তিনি যে তাঁর বাৎসল্যের স্নেহধারা তাঁর সকল সন্তানদের জন্যই রেখেছেন। তিনিই তো অন্নপূর্ণারূপে ধান, শস্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। তিনি শাকম্ভরী, পরম করুণাময়ী। সন্তানের দুঃখে তিনি কাঁদেন, সন্তানের উল্লাসেই তিনি আনন্দিত হন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, অনেক পণ্ডিতরা বলেন মা শীতলা নাকি সকলকে বসন্ত রোগের জীবানু দেন। এমন কোন মা আছে যে তার সন্তানদের তিনি রোগ দিয়ে কষ্ট দেবেন! তাঁর সন্তানরা রোগে কষ্ট পাবে আর তিনি দেখবেন, এমন ধারনা 'মা' শব্দের অপমান।

দেবীর রক্তমাখা জিহ্বা রজঃ গুনের প্রতীক। তিনি তার শ্বেত দন্তপাটি দিয়ে জিহ্বা কেটেছেন। শ্বেত বর্ণ হল স্বত্বঃ গুনের প্রতীক। এর মানে মা আমাদের স্বত্বঃ গুন দ্বারা রজঃ গুনকে সংহত করার শিক্ষা দিচ্ছেন, অর্থাৎ দাঁতের দ্বারা জিহ্বা স্থির রেখে বলতে চাওয়া হয়েছে ত্যাগের দ্বারা ভোগকে জয় করা।

দেবী মহাশ্মশ্মান-এ বিচরণ করেন। কর্মফল ভোগান্তে জীবের শেষ আশ্রয় স্থল হল শ্মশ্মান। যেখানে তারা জননীর কোলে সুখে নিদ্রা যায়। মায়ের আঁচল এর তুলনা কোটি কোটি স্বর্গের সাথেও হয় না। যেখানে বাৎসল্যের ছোঁয়া লেগেই থাকে—'মায়ের কোলে ঘুমায় ছেলে, এ শান্তি মা কোথায় বল!'

আদ্যাশক্তি শ্রী শ্রী কালী বিশ্ব প্রসবিনী। পরম পুরুষ মহাকাল শিবের সাথে মিথুন ক্রিয়ার মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন। এই রতি ক্রিয়া পরমার্থ বিশেষ। শ্রী শ্রী কালী মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী। তিনি আমাদের অবিদ্যা রুপিনী অন্ধকারকে নাশ করে আমাদের জ্ঞান দেন, চেতনা দেন। তাঁর লোমকূপ সকলে কোটি কোটি প্রদীপ্ত তারকা। তার আবির্ভাবে অন্ধকারময় অবিদ্যা, আসুরিক শক্তি নাশ হয়ে যায়, তাই কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় আমরা শত শত প্রদীপের আলোকমালায় সেই জগত মাতাকে বরণ করে নিয়ে আমরা প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের অন্ধকার অবিদ্যার জাল থেকে মুক্ত করে দেন।

শ্রীশ্রী কালী চতুর্ভুজা। সকাম ও নিষ্কাম—সাধক সাধারণত এই দুই প্রকার। সকাম সাধক সংসারে সাফল্য চান আর নিষ্কাম সাধক চান মুক্তি। মায়ের ডান হাতে সকাম সাধককে অভয় ও বর দিচ্ছেন আর বাম হাতে খড়্গ দিয়ে নিষ্কাম সাধককে মোহপাশ ছিন্ন করতে বলছেন। কালো কেশ আকর্ষণ করে মা তমোগুণকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলছেন। যেহেতু রক্ত রাজসিক গুণের প্রতীক তাই মা মস্তিষ্ক থেকে অসারিত রুধির ধারা শোষিত করে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

প্রাক আর্য যুগ থেকেই ভারতে শক্তি উপাসনা প্রচলিত। সেই যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়াল রূপকে ঠিক মতো ব্যাখ্যা করতে পারত না। প্রাকৃতিক নানান দুর্যোগের কাছে তারা তখন নিতান্ত অসহায়। সেই কারণে তারা সেই সমস্ত অলৌকিক ও দুর্জয়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন। প্রকৃতিকে স্বয়ং শস্যশ্যামলা মাতৃরূপে তথা মাতৃশক্তিরূপিনী জগদম্বা রূপে কল্পনা করা হত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও মহামায়াকে পরাশক্তির আধাররূপিনী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কালিকা পুরাণে আমরা দেখি, আদি শক্তিরূপে তিনি যোগীদের মন্ত্র ও মন্ত্রের মর্ম উদঘাটনে তৎপর। পরমানন্দা সত্ত্ববিদ্যাধারিণী জগন্ময়ী রূপ তাঁর। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুরের নির্গমন হয় এবং জীবের ক্রমবিকাশ হয় তেমনই সেই সব সৃজনই তাঁর সৃষ্টিশক্তি। এই জগতে অন্ধকারবিনাশিণী তিনিই, দেবতা তথা শুভাশুভ শক্তির সম্মিলিত রূপও তিনিই।

আমরা বেশিরভাগ মন্দিরেই যে কালীমূর্তি আমরা দেখি তা কিন্তু দক্ষিণাকালীর। কথিত আছে, রামপ্রসাদ সেনের গুরুদেব শ্রী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বপ্নে আদেশ পান কালীর প্রসন্ন ভাবমূর্তি রচনা করার। স্বপ্নে দেবী তাঁকে জানান পরবর্তী ভোরে যে নারীকে তিনি সর্বপ্রথম দেখবেন তার রূপ অনুযায়ী কালীর এক ঘরোয়া প্রতিমূর্তি তৈরী করতে। পরপর দিন ভোরবেলায় যে নারীকে প্রথম তিনি দেখেন তার গায়ের রঙ কালো, তার ডান পা সামনে এগোনো, খোলা কালো চুল এবং বা হাত উঁচু করে দেওয়ালে গোবর দিয়ে ঘুঁটে দিচ্ছেন। হঠাৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে সামনে দেখে সেই মহিলা লজ্জা পেয়ে তার জিভ বের করে দাঁত দিয়ে চাপলেন। সেই নারীর রূপ স্মৃতিতে নিয়ে আগমবাগীশ মশায় দক্ষিণা কালীর মূর্তি রচনা করেছিলেন। এর আগে কালী যন্ত্রে কালীপূজা হতো।

দক্ষিণা কালীর ডান পা শিবের বুকে থাকে। তিনি কালীর অন্যান্য রূপ থেকে ভিন্ন এবং তাকে গৃহস্থ ঘরে ও মন্দিরে পূজা করা হয়। দক্ষিণাকালী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভূজা এবং মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তার বাম হাতদুটিতে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ; ডান হাতদুটিতে বর ও অভয় মুদ্রা। তার গায়ের রঙ গভীর নীল, আকাশ এবং নীল সমুদ্রের মতো; তিনি দিগম্বরী বা উলঙ্গিনী। তাঁর গলায় মুণ্ডমালার হার; দুই কানে দুই শবরূপী দুটি শিশুশব বা কর্ণাবতংস; কোমরে নরহস্তের কটিবাস। তার দাঁত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ; তাঁর দুই স্তন উন্নত; তিনি ত্রিনয়নী এবং তিনি মহাদেব শিবের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মহাভীমা, হাস্যযুক্তা ও মুহুর্মুহু রক্তপানকারিনী। তাঁর দীর্ঘ এবং কালো চুল সভ্যতা থেকে প্রকৃতির স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করে। দক্ষিণা কালীর তৃতীয় চোখের নিচে সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নির প্রতীক দেখা যায় এবং এটি প্রকৃতির চালিকা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। আবার বলা হয় দক্ষিণদিকের অধিপতি যম কালীর ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়, সেই জন্য তাঁর নাম দক্ষিণাকালী। অধিকাংশ মন্দির বা শক্তিপীঠে যে কালীর পুজো হয় মূলত তাঁরাও দক্ষিণা কালী হিসেবেই পুজো পান।

বর্তমানে কালীপূজাতে সাধারণত মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করা হয়। মন্দিরে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী বা ধাতুপ্রতিমাতেও কালীপূজা করা হয়। মধ্যরাত্রে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দেবীকে ছিন্নমস্তক সহ বলির পশুর রক্ত, মিষ্টান্ন, অন্ন বা লুচি, মাছ ও মাংস উৎসর্গ করা হয়। গৃহস্থবাড়িতে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাধারণত অ-তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যমতে আদ্যাশক্তি কালীর পূজা হয়। দেবীর পূজায় ছাগ মেষ বা মহিষ বলির প্রথা রয়েছে। সুদুর অতীতে নরবলি দিয়েও কালীপূজা হত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, কালী শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই কারণে কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিটি শ্মশানে কালীর মন্দির আছে ও সেখানে প্রতিদিন কালীর পূজা হয়। কোথাও কোথাও কালীর সঙ্গে সঙ্গে দশমহাবিদ্যাও পূজিতা হন।

কোন্ কোন্ জন্তুর মাংস প্রশস্ত তন্ত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। এই সব প্রাণীদের মধ্যে ছাগ, মেষ, সজারু, হরিণ, সারস, হাঁস, বনমোরগ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। 'নির্বাণতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটি 'ম'-কার সহকারে পূজা করার কথা। সাধকরা এই পঞ্চ 'ম'-কার দিয়ে শক্তির আরাধনা করে থাকেন। অদ্বৈতভাবপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চমহাভূতকে দেখানো হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে ষড়রিপু—এরা হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া এবং মাৎসর্য। আর এই ষড়রিপু আমাদের খারাপ পথে নিয়ে যায়। তাই আদ্যশক্তি কালী সাধনার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভিতরে থাকা এই ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। শক্তির পূজা করে শক্তিমান হয়ে মনের দুর্বলতাকে অতিক্রম করে মানসিক অজ্ঞতারূপী সকল অন্ধকার দুর করতে সচেষ্ট হতে পারি। তাই শক্তির আরাধনা অবশ্যই প্রত্যেককে করতে হবে। একমাত্র শক্তিমান মানুষই পারে সকল বিপদ থেকে নিজেকে, পরিবারকে ও সমাজকে উদ্ধার করতে। তাই সমাজের সকল খারাপ বা অসৎ এবং অসামাজিক কাজকর্ম দুর করার জন্য শক্তির আরাধনা স্বরূপ আমরা দেবী কালীর পূজা ভক্তি সহকারে এবং শ্রদ্ধা সহ করব।

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মধ্যরাত্রে অর্থাৎ অমাবস্যার রাত্রে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে কালী পূজা করা হয়। সাধারণত যে কোন পূজায় ভক্তি সহকারে করলে আরাধ্য দেবতা বা দেবী আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। যেহেতু মা কালী আদ্যা শক্তির দেবী অর্থাৎ শক্তি এবং সাহস অর্জন করার জন্য এই দেবীর পূজা করা হয় তাই কালী পূজার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিশেষ নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় কালির দোয়াত কালী পুজার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পুজোর শুরু হওয়ার আগে অনামিকা আঙুল দিয়ে কালির দোয়াত বা লেখনী দোয়াত দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কন করা হয়। স্বস্তিক আঁকা হয়ে গেলে দেবীর পূজা শুরু হয়। বহুল আয়োজন বা ঘনঘটা করে অনুষ্ঠান করলে দেবী যে প্রসন্ন লাভ করেন তা কিন্তু নয়। কালীপুজোর অন্যতম প্রধান উপাদান হলো জবা ফুল, তাই কালীপুজোর ক্ষেত্রে মা জবা ফুল খুবই পছন্দ করেন অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসেবে অবশ্যই রাখতে হয় জবা ফুল। এছাড়াও আস্থা, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে পুজা করা হলে মায়ের আশীর্বাদ অবশ্যই লাভ করা যায়। সাধারণত মধ্য রাতে এই পূজা শুরু হয় এবং ভোররাতে এ পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত এই পূজার ক্ষেত্রে আবাহন, পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি, যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালীর পূজা পদ্ধতি সম্পন্ন হয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। জবা ফুল, রক্তচন্দন, বেলপাতা, জবাফুল, ধূপ, দীপ ইত্যাদি কালী পূজার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কালীর এক এক রূপের এক এক রকমের বর্ণসমষ্টি নিয়ে আলাদা আলাদা মন্ত্র তৈরী হয়। এমন প্রচুর মন্ত্র আছে, তবে মূলতঃ একাক্ষরী ও বাইশ-অক্ষরী মন্ত্রেই বেশী পুজো হয়।

— —

কালী সাধনার প্রাথমিক ধারণা

সারা বিশ্ব আজ অস্থির। ব্যক্তির অহংকার ও তার ধর্মীয় গোঁড়া বিশ্বাসের কারণে এক একজন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তির শত্রুই নয়, আতঙ্কবাদী হয়ে মানবতার চরম শত্রু হয়ে উঠেছে। পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির ধ্বংস, নিজের গোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য হত্যা-ষড়যন্ত্র-শত্রুতা ও ধর্মীয় অনুভূতির বিস্তৃতির কারণে সারা বিশ্বে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য বেড়েছে এবং ধীরে ধীরে এই মহাবিশ্বের প্রতিরক্ষামূলক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

মানুষের অত্যাধিক লোভের কারণে প্রকৃতি আজ ধ্বংসের মুখে। বন্যা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, ভুমিকম্প, ঘুর্ণিঝড়, খরার মতো সমস্যা বেড়েছে। প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে এবং এই ভারসাম্যহীনতার কারণে অনেক পরিবেশগত প্রাকৃতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই সব সমস্যার কোনো সহজ সমাধান সাধারণ বিজ্ঞান করতে পারবে না, অন্যদিকে অলৌকিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে রয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি সমস্যার সরল সমাধান। আধ্যাত্মিকতা কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে অসহায় বিশ্ব এবং বিজ্ঞানকে সুরক্ষা দিয়েছে, দিচ্ছে ও দেবে এবং সমাধানের শতকরা একশ' ভাগ সাফল্য নিশ্চিত করেছে, এটাই সত্যের পক্ষে প্রমাণ।

আমাদের দেশে ও সমগ্র বিশ্বের এই অবস্থা, যা এখন ঘটে চলেছে, তা প্রতিটি যুগে, বিশেষ করে যুগ-সন্ধিকালে বেশি ছিল। তাই সর্বদা সাধু, ঋষি, যোগীরা সকলের অলক্ষ্যে (জ্ঞানগঞ্জ) থেকে এই পৃথিবীকে সামগ্রিকভাবে রক্ষা করেছেন, সংরক্ষণ করেছেন 'সনাতনী' মানব সভ্যতা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন—যা প্রতিটি যুগের ক্ষেত্রে সত্য। প্রতিটি যুগে তাই আমাদের সাফল্যের জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রয়োজন। এই সময়টিও খুব কঠিন সময়, যেখানে দেবশক্তি এসে অসুরশক্তিকে পরাভুত করবে, তবেই সমাজ তার ভূমিকা নির্ধারণ করবে এবং নিশ্চিত সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে।

আজ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। হিমালয়ে যুগ যুগ ধরে ক্রিয়াশীল ঋষিরা আশীর্বাদ দিতে আগ্রহী, কিন্তু তার জন্য পরিবেশ তৈরি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করা দরকার, সামান্য যোগ্যতাই সাফল্যের নির্ণায়ক। এই পরীক্ষার জন্য, আমি এই 'কালী সাধনা' বইটি ধার্মিক ব্যক্তিদের সামনে ও মানুষের কল্যাণের জন্য সত্য অন্বেষণকারীদের কাছে উপস্থাপন করছি, যেখানে তারা সত্যের পথ ধরে দেবী কালীর সাধনার মূলাশক্তির কাছে পৌঁছাতে পারেন।

আমি আমার ছোট্ট জীবনে তন্ত্রের অনুশীলন থেকে এতটুকু উপলব্ধি করেছি যে পৃথিবীর সবকিছুই তন্ত্র-মন্ত্রের অধীনে। মন্ত্র ছাড়া জীবন গতিশীল হতে পারে না, তন্ত্র ছাড়া জীবন অগ্রসর হতে পারে না, শ্রবণ-মনন-নিধিধ্যাসন, তন্ত্রক্রিয়ার অনুশীলন ও ধ্যান ছাড়া সাফল্য পাওয়া যায় না। যখন সামাজিক, মানসিক বা দৈহিক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে বা যখন পরিবর্তনের সময় আসে, যখন রূপান্তর ঘটে পরিবেশ-পরিস্থিতির, তখন মানুষ সমাজের কাঠামো বদলায়, আচরণবিধি পাল্টে যায় জনমনে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়, জীবন মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয় কিন্তু তারপরও একজন সাধকের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, যুগ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কিভাবে চলছে। এই নতুন শতাব্দীতে সাধকের কর্ত্তব্য ও ধর্ম কী হবে এবং প্রত্যেক সাধকের মনে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে যে—আমাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির জন্য এখন আমাদের কী করা উচিত ও বস্তুগত উন্নতির জন্য তার এখন কীভাবে এবং কোন অর্থপূর্ণ প্রচেষ্টা করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, এগুলিই একমাত্র প্রশ্ন যা যে কোনও তন্ত্রসাধকের মনে জেগে উঠতে পারে। এগুলো ছাড়া আর কোনো প্রশ্ন তার নেই বা থাকতেও পারে না। সকল কিছুই আছে যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, জীবনের মূল্যবোধও তাই অবশ্যম্ভাবী ভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু এই পরিবর্তিত বিশ্বে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং সেই ব্যবস্থা ও উল্লেখিত অলৌকিক অনুশীলনগুলি কি!

দীক্ষিত, অদীক্ষিত অথচ আধ্যাত্মিক অনুসারীদের কাছে ধর্ম ও উদ্দেশ্য আছে কিন্তু অন্যান্য মানুষের মূলতঃ কোন ধর্ম নেই, এদের কোন লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্যও নেই। 'ধর্ম' জগতকে ধারণ করেছে তাই জীবনে এত আনন্দ, এত সুখ, এত শান্তি। সুখের প্রধান কারণ ধর্ম, যা না অনুসরণ করলে সুখ প্রাপ্তি হয় না। অধর্ম করলে ব্যক্তির পাপ ও লোক সমাজে অশান্তি ও দুঃখ বৃদ্ধি পায়, দুঃখ ও পাপ বৃদ্ধিতে ব্যক্তি সমাজে ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হয়। তাই সকল সময় আমাদের ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করা উচিত ও সকল 'কর্ম' ধর্মসাক্ষী করে সম্পাদন করা উচিত। ধার্মিকের হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করেন। আসলে সাধারণ মানুষের নিজের বলতে কিছুই নেই। সামগ্রিক চিন্তা করা, আশা করা, চেষ্টা করা ও খাওয়া-ঘুম-বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি জাগতিক কাজেই সাধারণ মানুষ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু একবার দীক্ষা গ্রহণ করলে বা তন্ত্রধর্মী হয়ে গেলে, নিজেকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিলে বা আত্মসমর্পণ করলে সমস্যার আর কিছুই থাকে না। জলে ভাসমান পাতার যেমন নিজের করার কিছু থাকে না, তেমনই দীক্ষিত মানুষ। জলে ভাসমান ঝরা পাতা যেমন সম্পূর্ণভাবে জলের স্রোতের উপর নির্ভর করে,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যেমন মনে করে না যে আমি ঝড় থেকে বাঁচি বা শান্ত জলে সুখে-সচ্ছন্দে সাঁতার কাটব, তেমনই তন্ত্র সাধকের জীবনে একইভাবে কোন ইচ্ছা আর অবশিষ্ট থাকে না—তা আধ্যাত্মিক উন্নতি হোক বা শারীরিক উন্নতি, সবই আপনাআপনি ও সময় অনুযায়ী কালীর কৃপায় ঘটে চলে। সুখও আসে, দুঃখও আসে, অসুবিধাও আসে, অনুকুলতাও আসে, পথে কাঁটাও আসে, গোলাপও আসে—কাজ দুটোই সমানভাবে হয় আর সেই সাধক শুধু দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে দেবী কালীর চরণে নিজেকে সঁপে দিয়ে চুপটি করে বসে থাকে—একটি জলের স্রোতে ভাসমান ঝরা পাতার মত, কর্মের সাগরে প্রবাহিত হয়ে চলে যার নিজস্ব কোন লক্ষ্য থাকে না।

তন্ত্র-মার্গের অনুসারীদেরকে কেবল তান্ত্রিক বলা হবে। হ্যাঁ, গুরুকে যেমন ভালো শিক্ষা দিতে হবে আবার শিষ্যকেও তৈরী হতে হবে ভবিষ্যতের গুরু হওয়ার জন্য—এক মুহূর্তও নষ্ট না করাই গুরু-শিষ্যের ধর্ম। এই জন্যই তাদের সকলের কথা চিন্তা করে অতি যত্নের সাথে এই লেখা আমি কালীর কৃপায় প্রস্তুত করছি। মনে রাখবেন—জ্ঞানাণ্বেষী হতে গেলে কঠোর সাধনা, আত্মত্যাগ, নিরহঙ্কারী, কোমল মন, নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টির বড় প্রয়োজন। অন্বেষী হওয়ার মধ্যে বড় আনন্দ আছে ঠিকই তবে দিনের শেষে কষ্ট পেতে হবে ভেবেই সাধনার পথে আসা উচিত। একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ চিন্তাবিদ হতে পারেন, দার্শনিক হতে পারেন, কিন্তু তন্ত্রসাধক হতে পারেন না।

আধ্যাত্মিক সাধনা বা তন্ত্রসাধনা হল আগুনের নদী এবং এতে ডুবে যেতে যেতে সাঁতরাতে হয় নিজের জন্য, আর সমাজের জন্য বাঁচতে হয়। একজন সত্যকারের সন্ধানী সাধক বা তন্ত্রপ্রেমী, তন্ত্র অনুশীলনে আগ্রহীকে জীবন এবং মৃত্যু উভয়কেই সমান ভাবে নিতে হবে—এই কথা ভেবে তবেই তন্ত্রপথে আসুন। সকালে সূর্যের প্রথম রশ্মি পৃথিবীতে পড়ার দুর্লভ দৃশ্য কোটি কোটি মানুষ নিশ্চয়ই দেখেন, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, এই শতাব্দীর বিস্ময়কর দৃশ্য যতটা সম্ভব কাছাকাছি থেকে, আমি যে পরিবেশে দেখেছি তা খুব কম মানুষই দেখেছেন। আপনিও কঠোর অনুশীলন করলে তা দেখতে পাবেন।

অনন্ত সময়কে বলা হয় 'কাল'। জীবের 'কাল' শেষ হলেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর 'কালদূত' যমরাজ জীবের মৃত্যুর শেষে ফলদান করেন। আর 'কাল'-কে যিনি শাসন করেন—তিনিই হলেন কালী। তান্ত্রিক পরম্পরায়, কালী হলেন আদিশক্তির দৃশ্যমান রূপ। আদিশক্তি হওয়ার ফলে তিনি তার ভক্তদের শক্তি ও ভুক্তি, ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করে চলেছেন সৃষ্টির আদি থেকে। তাঁর সাধনার কথা ও কালীতন্ত্রের কথা বা একইভাবে যখন তন্ত্রের বাম সাধনাগুলি উপস্থাপন করা হয়, তখন তাকে 'কালী সাধনা' বলা হয়।

অনেক অনুশীলন ও প্রয়োগ করে, বিভিন্ন সাধকের আশীর্বাদক্রমে বিশেষ এমন কিছু সাধনা এখানে উপস্থাপিত করলাম যা তান্ত্রিক সাধকের উপকারে আসবে বলে মনে করি। রুদ্রযামলে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে—'সুর-অসুর যুদ্ধের সময় রক্তবীজ অসুর

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যখন ক্ষমতাবান হতে শুরু করে, তখন আদ্যাশক্তি তাঁর নিজ প্রতাপে এক অতি উজ্জ্বল কালো ও উগ্রা দেবীকে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি রক্তবীজ ও অন্যান্য অশুভ শক্তিকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করেন।' আমাদের অন্তরেও এমন অনেক অসুর বাস করে। আশাকরি তন্ত্রাভ্যাসের মাধ্যমে সেই সকল অসুরশক্তি পরাভূত হবে, জেগে উঠবে শুভ শক্তি। সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগেই সাধককে অন্তরের আসুরিক শক্তিকে পরাভুত ও অবদমিত করে শুভ শক্তিকে জাগ্রত করে সাধনপথে অগ্রসর হতে হবে।

সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার আগেই মনকে স্থির করা দরকার। 'মন' হল সেই যোগাযোগমাধ্যম যার সাহায্যে সাধকের বহির্জগতের সাথে অন্তর্জগতের মেলবন্ধন হয়। মনস্থির করার জন্য প্রতিদিন নিত্যকর্মের পরে নীচের লেখা মন্ত্রটি নিয়মমত জপ করতে হবে। এতে ধীরে ধীরে মন স্থির হয়।

মন্ত্র—'হ্রীং শান্তে প্রশান্তে মম সর্ব ক্রোধোপশমনী স্বাহা।'

এখন প্রশ্ন হল, কি ভাবে একজন সাধক সাধনপথে অগ্রসর হবেন। কে দেবেন সেই পথের ঠিকানা? আর পথে যদি কোনও বিপদ আসে তো কি ভাবে সেই বিপদসঙ্কুল পথ সাধক পার হবেন? এই তিনটি প্রশ্নই গুরুতর।

প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে, একজন সাধক কিভাবে সাধনপথে অগ্রসর হবেন, সেই বিষয়ে বলা যায় যে একজন সাধককে তার লক্ষ্য ঠিক করে কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ও ধৈর্যের সাথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল সাধনা।

দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয়ে, বলা যায় নির্দিষ্ট সাধনায় সিদ্ধ একজন ব্যক্তি বা শ্রী গুরুদেবই শিষ্যকে বা সাধককে সঠিক পথের দিশা দেখান। ঐ সাধকের দোষত্রুটি সংশোধন করে তাকে মূল লক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন গুরুদেব। তাঁর আশ্রমে বাস করে, তাঁর আশ্রয়ে থেকে, তাঁরই নির্দেশনায় সাধক একদিন সিদ্ধিলাভ করে থাকেন।

তৃতীয় প্রশ্নের বিষয়ে, বলা যায় যে গুরুকৃপা লাভ হলেই সাধনজীবনের সকল বিপদ কেটে যায়। সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করলে অসম্ভব ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। কিন্তু গোটা সাধনায় মাত্র দুটি শক্তির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, প্রথমটি হল—একটি ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্থাপিত ও উৎসারিত চেতনা বোধ বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়টি হল যন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে ঐশ্বরিক শক্তিগুলির দ্রুত প্রতিক্রিয়া। তবে কখনও কখনও দ্বিতীয় শক্তিটি ব্যর্থ হতে পারে যদি সাধকের ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক বল দুর্বল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে একজন শক্তিশালী গুরুদেবের প্রয়োজন হয় যেখানে গুরুশক্তি আশ্চর্যজনক ভাবে শিষ্য-সাধককে উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে তুলে ধরেন ও সাধক পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান শক্তি সর্বোচ্চ এবং সত্য বা জ্ঞান-এর কোন সীমা নেই। জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি অজ্ঞতা ও ভয়ের অন্ধকারকে সরিয়ে দেয়।

সাধনা সঠিক পথে অগ্রসর হলে প্রত্যেক সাধক প্রতিদিনের উপাসনা সম্পাদন করেন এবং বিশেষ মন্ত্রের আচার ব্যবহার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তবে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রত্যেক সাধনের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে এবং গুরুদেব একটি নির্দিষ্ট উপায়ে উপাসনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উপস্থাপন করেন। প্রত্যেক সাধনায় উপচার ও উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। উপচার ও উপাসনার স্থির বিধি দ্রুত সাফল্যের আশ্বাস দেয়। প্রতিটি যুগে উপাসনার ধরণগুলি আলাদা কিন্তু বর্তমান যুগে সাধন করা একটি বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং উপাসনা পদ্ধতিটি নির্ভুল ভাবে যত ছোট হয় ততই ভালো।

কোনও সাধকের বাধার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে, সামান্য দীক্ষার পরে সাধনজীবনে প্রাথমিক হতাশা আসে তবে এতে ভয় পাওয়া বা আশা হারানো উচিত হবে না। এটি নবীন সাধকের জন্য একটি সতর্কতা বিশেষ। সমস্ত সাধনা এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট ক্রম এবং প্রক্রিয়া রয়েছে। যতক্ষণ না সমস্ত নিয়ম মেনে চলা হয় সাধনায় সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। কখনও কখনও কঠোর পরিশ্রমের পরেও একজন সাধকের কাছে সাফল্য অধরা থাকে। এটি কারও অতীত জীবনের খারাপ কর্মের কারণে হতে পারে।

আরও একটি বিষয় হল স্বাস্থ্য—এটা যে কোনও ক্ষেত্রে সাফল্যের সবচেয়ে বড় বাধা। একজন ব্যক্তি কেবল তখনই সাধনা সফলভাবে সম্পাদন করতে পারেন যখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ এবং রোগমুক্ত থাকবেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা বা দুর্বল শারীরিক অবস্থাতে সাধনায় সাফল্য অর্জন প্রায় অসম্ভব। তাই ঘুমানো, ঘুম থেকে উঠা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর নিয়ম মেনে চলা উচিত যাতে শরীর সর্বদা চনমনে থাকে। প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত অনুশীলন এবং যোগাসন করে শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে।

সাধনপথে এর পরের বাধা হল সন্দেহ। গুরু যখন সাধনার নির্দেশ দেন তখন প্রথম দিকে কিছু কিছু সফলতা পাওয়া যায় কিন্তু কখনও কখনও সাধনার সময়কাল বেড়ে যেতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবেই কিছু সাধক মন্ত্র এবং সাধনার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ শুরু করতে পারে। এছাড়া দেবতা আসলে আছেন কি না, তারা সাধকের সামনে উপস্থিত হতে পারেন কি না, তা নিয়ে তারা সন্দেহ করতে পারে। অনেক সময় সাধনা সঠিক কি না বা যে যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তা আসল যন্ত্র কি না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করে, অবশেষে সন্দেহের বশে 'গুরুদেব আমাদের ভুল নির্দেশনা দিয়েছেন' ভেবে মূল সাধনা শুরু করার আগেই ত্যাগ করেন। একজন সাধকের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল ভক্তি ও বিশ্বাস। শ্রীগুরু, মন্ত্র, যন্ত্র, দেব-দেবী ও ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। একজন সত্যকারের সাধকের দৃঢ় প্রত্যয়, কঠিন সংকল্প থাকা উচিত যাতে তিনি তাঁর সাধনায় সত্যিকারের অগ্রগতি অর্জন করতে পারেন। যিনি যত বেশি বিশ্বাসী তিনি ততটাই অগ্রগতি করেন ও বুঝতে পারেন যে সাধনা কল্পিত নয়, বাস্তব।

এর পরের বাধা হলেন গুরুদেব। 'গুরু' বলতে কিন্তু ব্যক্তি মানুষকে বোঝায় না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীগুরু হ'লেন এমন একটি সত্তা যা সত্য, জ্ঞান, ও ভক্তি দান করতে পারেন, যিনি জীবনে এক নির্মলতা বয়ে আনতে পারেন, যাতে সাধক শান্তি লাভ করেন। নিজেকে 'গুরু' বলে দাবী করার লোকের অভাব নেই। প্রতিটি রাস্তায় মোড়েই আপনি এমন একজন গুরুদেব পাবেন, কিন্তু তারা বেশিরভাগই কেবল অহঙ্কারী, শিষ্যের সম্পদ হরণকারী ও সর্বোপরি অজ্ঞান। কোনও সাধন না করেই তারা নিজেদের গুরুপদবাচ্য বলে দাবি করেন এবং কেউ কেউ নিজেকে ভগবান ভেবে থাকেন। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাই একজন সত্যিকারের গুরুদেব খুঁজে পাওয়া এবং চয়ন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, তবে একজন সাধকও যদি সত্যিকারের গুরুদেব খুঁজে পান তো তা শিষ্যের পক্ষে সর্বাধিক সৌভাগ্য। আবার ঘন ঘন গুরু পরিবর্তন করাও সাধনার জন্য সমস্যার বিষয়।

আধ্যাত্মিকতার পথে সাধকের পক্ষে আরও একটি বড় বাধা হ'ল খ্যাতি। আশেপাশে বসবাসকারী সাধারণ লোকেরা যখন বুঝতে পারে যে কোনও সাধক সাফল্যের সাথে একটি নির্দিষ্ট সাধনা সম্পাদন করতে চলেছেন বা সিদ্ধিলাভ করেছেন তখন তারা তাঁর অনুগত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষেরা তাঁকে সম্মান করা শুরু করে। সাধকও একজন মানুষ এবং তিনিও শ্রদ্ধা ও সম্মানিত হতে পছন্দ করেন। তিনি যখন এগুলি সমাজ থেকে পান তখন সে আরও বেশি করে সম্মান পেতে চেষ্টা করেন। ফলস্বরূপ তিনি সাধনার ও উপাসনার লক্ষ্যটি ভুলে যান এবং আরও খ্যাতি এবং নাম অর্জনের দৌড়ে যোগ দেন। এর ফলে সাধনা শক্তি নষ্ট হয়। তিনি নির্মলতা, নম্রতা, বিনয় হারিয়ে অভিমানী হয়ে ওঠেন। সাধকের মন ও অন্তরের বিশুদ্ধতা হারিয়ে যায় এবং তিনি রাগ, ক্ষোভ এবং মিথ্যা অহংকারে ভরে যান। সুতরাং কোনও সাধকের নিজের ক্ষমতা সমাজে প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ সাধককে অবশ্যই আধ্যাত্মিক ভাবে উচ্চতর ক্ষেত্রে উন্নীত হতে হবে কিন্তু সংসারী বা বস্তুগত জগতে নয়।

আধ্যাত্মিকতার পথে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যৌনতা। সাধকের শরীরে পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি সাধনায় সফল হতে পারেন না। একজন সাধকের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মার শক্তি প্রয়োজন এবং এই শক্তি ব্রহ্মচর্য বা বীর্যধারণের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বর্ধিত হয়। সুতরাং সাধনকালে যৌনমিলনে কখনওই লিপ্ত হওয়া উচিত নয় এবং নেতিবাচক বিষয়গুলি ত্যাগ করা উচিত এবং এমন খাবার খাওয়া উচিত নয় যা ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং বীর্যধারণের ক্ষতি করতে পারে। প্রয়োজনীয় শক্তি সংরক্ষণের জন্য বিবাহিত সাধকদেরও যতটা সম্ভব ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। মনে করুন, ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি এমন শক্তি আহরণ করেছিলেন ও দেবতার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন যে তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু তাঁর কাছে আসবে না। ভগবান পরশুরাম যিনি অজেয় ছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর সকলকে পরাজিত করেও ভীষ্মর সাথে ২৩ দিনের লড়াইয়ের পরে পরাজয়ের মুখোমুখি হন। বীর্যক্ষরণের ফলে সাধকের পথে পথে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বাধার মুখোমুখি হতে হয়। ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, মোহ এবং লোভের দিকে পরিচালিত হয়ে ফলস্বরূপ সাধক তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাই সবসময় মনকে বাসনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

ব্রহ্মচর্য বা বীর্যধারণের জন্য সাধককে কয়েকটি যোগাসনের সাহায্য নিতে হবে। প্রতিদিন অন্যান্য যোগাসনের সাথে সাথে পদ্মাসন, মৎস্যাসন, হলাসন, গোমুখাসন করতে হবে। এ ছাড়া কাকচঞ্চু মুদ্রা ও অশ্বিনীমুদ্রা অভ্যাস করতে হবে।

অন্যের মধ্যে অন্যায় ত্রুটি খোঁজা সাধকের পক্ষে আরও একটি বড় বাধা। একজন সাধকের এমন কর্মে নিজের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এবং অন্যেরা কী করছে তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়, এতে সাধকের প্রচুর চিন্তা-শক্তি ও সময় নষ্ট হয়। সাধককে সর্বদা তাঁর নিজের সাধনায় মনোনিবেশ করা উচিত যাতে অন্য বিষয়ে ভাবনার আর সময় যেন না থাকে। জগতের অনিত্য চিন্তা করলে এমনিতেই অন্যের প্রতি হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষা ইত্যাদি দুর হয়।

প্রতিটি সাধনার নিজস্ব নির্দিষ্ট কিছু বিধি রয়েছে। গুরুজনদের মুখে শুনেছি, শুধু তন্ত্র নয়, যে কোনও পথেরই সাধনা হোক্ না কেন, সাফল্য.অর্জনের জন্য কয়েকটি বুনিয়াদি ও প্রাথমিক নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হয়। সেগুলি হল —

১। পরিষ্কার, পবিত্র ও ধোয়া-কাচা পোশাক পরে একটি পরিষ্কার ও পবিত্র জায়গায় সাধনা করতে হবে।

২। সাধক নিজের প্রতি ও মন্ত্র, যন্ত্র, গুরুদেব, ইষ্টদেবতা এবং ভগবান শিবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা এবং অনুরাগ রেখে সাধনজীবন কাটাতে হবে।

৩। সাধন বিষয়ে উৎসাহী হলেও সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যে বাহ্যিক বা সামাজিক কর্মে যেন কোনও ত্রুটি না হয়, যাতে ধৈর্য হারানো বা ইচ্ছা শক্তি নষ্ট না হয়।

৪। সাধককে গুরুদেবের নির্দেশ সঠিক ভাবে মেনে চলতে হবে।

৫। সাধকের স্ব-সম্মোহন ও স্ব-সংশোধন করা উচিত।

৬। সাধনার রীতিনীতি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিনীতভাবে গুরুদেবের কাছে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শিখে নিতে হবে।

৭। গুরুদেবের কাছে প্রাসঙ্গিক দীক্ষা গ্রহণের পরেই সাধনা করা উচিত।

৮। সাধককে দীক্ষাদানকারী গুরুদেবের সংস্পর্শে থেকে সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

৯। সাধককে তাজা খাবার খাওয়া উচিত। বাসী খাবার, খুব ঝাল খাবার, ও ধুমপান বা মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

১০। সাধনার সময়ে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। বিধিমত একাসনে বসে পুরো দৈনিক মন্ত্র জপ সম্পন্ন করা উচিত।

১১। মন্ত্র জপ করার সময় সাধককে সোজা হয়ে বসে দেহটি স্থির রাখা উচিত।

১২। সাধককে প্রতিদিন একই সময়ে, একই দিকে, একই সংখ্যায় মন্ত্র জপ শুরু

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করা উচিত।

১৩। সাধনার সময়ে মেঝেতে মাদুর বা সতরঞ্জের উপর ঘুমানো উচিত।

১৪। সাধনকালে যথাসম্ভব কম কথা বলা উচিত ও বৃথা আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

১৫। কখনও দিনের বেলা ঘুমানো উচিত নয়।

১৬। নিজের সাধনা সম্পর্কে অন্যের সাথে আলোচনা না করে কেবল শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত।

সাধকজীবনে নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে গেলে অন্তরের ও বাইরের সকল বাধা অতিক্রম করতে হবে, প্রাথমিক ভাবে যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এতদিনের সাংসারিক জীবনের অভ্যাস, স্মৃতি, কর্তব্যকর্ম যাতে তার সাধনায় বিঘ্ন না ঘটায় তার জন্য সাধকের কালরাত্রি কালীর পুজো ও সাথে কালী-বশীকরণ মন্ত্র জপ করে নেওয়া উচিত।

কালী ধ্যান

ওঁম্ শূলাব্জপাশাং কুশপদ্মহস্তাং,
চতুর্ভুজাং ধূম্রনিভাং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহাসনস্থাং ধৃতপীতবস্ত্রাং,
ধ্যায়েন্মহেশীম্ হৃদি কালরাত্রিম্

কালী মন্ত্র—ঐং হ্রীং ক্লীং শ্রীং।

কালী গায়ত্রী—ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি-তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।

কালী প্রণাম মন্ত্র—সর্বমঙ্গল

বশীকরণ মন্ত্র

ওঁম্ ঐং হ্রীং ক্লীং শ্রীং কালীশ্বরী
সর্ব্বজন মনোহারিণী
সর্ব্বসুখ স্তম্ভিনী সর্ব্বরাজবশঙ্করি
সর্ব্বদুষ্টনির্দ্দলনী সর্ব্বস্ত্রীপুরুষাকর্ষিণি
বধি শৃঙ্খলস্ত্রোটয় ত্রোটয়
সর্ব্বশত্রুন্ ভঞ্জয় ভঞ্জয়
দ্বেপীন্ নির্দ্দলয় নির্দ্দলয়
সর্ব্বান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহনাস্ত্রেণ
দ্বেপিণমুচ্চাটয় উচ্চাটয়
সর্ব্বং বশং কুরু কুরু স্বাহা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দেহি দেহি সর্ব্বং কালরাত্রিকামিনী গণেশ্বর্য্যে নমঃ।

উপরের মন্ত্রটি রাত্রি ১২টার সময় জপ করতে হবে। জপ শুরু হবে শুক্লা প্রতিপদ থেকে পরের মাসের অমাবস্যা অবধি। সেই অমাবস্যায় কালীর পূর্ণ পুজো করতে হবে। জপ শেষে তিন হাজার আহুতি দিতে হবে। জপের প্রথম দিনে কালীর সংক্ষিপ্ত পুজো করে একমাস জপের সংকল্প করতে হবে। প্রতিদিন শুদ্ধচিত্তে, শুদ্ধাসনে বসে, ভক্তির সাথে, একাগ্র মনে ১০০০ (এক হাজার) বার জপ করলে ভিতরের ও বাইরের সকল শত্রু বশ হয় ও শত্রুতা ত্যাগ করে মিত্র হয়, ক্রিয়াকর্মের বিঘ্ন দূর হয়, সর্বকর্মে সাফল্য লাভ হয়।

সাধনার জন্য শ্রী গুরুদেবের প্রয়োজনীয়তা

আমরা সরাসরি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি না, তবে গুরু গ্রহণ করলে একমাত্র তাঁর কৃপার মাধ্যমেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব। আবার, বৈদিক শাস্ত্রে যেসকল জ্ঞান রয়েছে তা-ও আমাদের সীমিত মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্গুরুর শরণাগত হতে হবে যিনি আমাদের শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে সাধনপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন—ঠিক যেমন শাস্ত্রে অনেক বিদ্যা থাকলেও অভিজ্ঞ শিক্ষকের আনুগত্যে এ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কেবল পারমার্থিক জ্ঞান বা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান নয়; এ জগতের যেকোন জ্ঞান অর্জন করতে গেলেই আমাদের গুরু গ্রহণ করতে হয়। এমনকি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনিও সন্দীপনি মুনিকে গুরুরূপে বরণ করার মাধ্যমে গুরু গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য বশিষ্ঠ মুনিকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। আবার, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও গুরু গ্রহণের গুরুত্ব স্থাপন করার জন্য ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ, সকল জ্ঞানের পরম উৎস পরমপুরুষ ভগবানও গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য স্বয়ং গুরু গ্রহণ করে থাকেন।

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে (৭ম অধ্যায়) গুরুতত্ত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবের অন্ধকার নাশ করে আলোকরূপ জ্ঞান প্রদান করেন, তিনিই গুরু। গুরুদেব ভগবানের কৃপাশক্তির মূর্ত বিগ্রহ। জীবের প্রতি বিশেষ করুণার ফলে ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। গুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধ জ্ঞান দান করেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।

অর্থাৎ "হে অর্জুন, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ সম্পূর্ণরূপে জানে না।"

কেবল ভগবান সর্বজ্ঞ, তিনি ত্রিকালের সমস্ত কিছুই অবগত, কিন্তু কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে অন্য কেউই জানেন না। শুধু তাই নয়, তাঁকে লাভ করার জন্য সাধ্য ও সাধন বিষয়েও তিনি ছাড়া পূর্ণরূপে অন্য কেউই জানেন না। সুতরাং, সমস্ত জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করার জন্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি প্রদানের জন্য স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তগণকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হন।

কখনো স্বয়ং ভগবান, কখনো তাঁর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরা আবার কখনো কোনো জীবের মধ্যে তাঁর শক্তির আবেশ ঘটিয়ে তিনি গুরুরূপে বদ্ধজীবদের শিক্ষা প্রদান করেন। আবার তিনি চৈত্যগুরুরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে তাঁর শক্তির আবেশ ঘটিয়ে গুরুরূপে বদ্ধজীবদের শিক্ষা প্রদান করেন। আবার তিনি চৈত্যগুরুরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে থেকে জীবকে পরম তত্ত্ব প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৯/৬) বলা হয়েছে —

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।।

অর্থাৎ 'হে ঈশ্বর, তুমি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে দেহধারী জীবের অশুভ অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়-বাসনা নাশ করে তার গতি প্রদান করো। অতএব তোমাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কবিগণ কল্পান্তকাল তোমার সেবায় নিযুক্ত থেকেও তোমার উপকারের কথা স্মরণ করে কিছুতেই ঋণমুক্ত হতে পারেন না।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য, ২২/৪৭) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনো ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে।।

"চৈত্যগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি যখন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে কৃপা করেন, যেন তিনি স্বয়ং তাকে বাইরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যমীরূপে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেন।"

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।।

—চৈ.চ. আদি ১/৫৮

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সুতরাং বোঝা গেল যে, অন্তর্যামী গুরুর সাথে বাহ্যত সাক্ষাৎ হয় না; তিনি অন্তরে থেকে কেবল প্রেরণা দিয়েই জীবকে শিক্ষা দেন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'মহান্তস্বরূপে' অর্থাৎ সাধু-সজ্জন বা ভক্তগণের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে থাকেন- প্রকারান্তরে তিনি ভগবান।

মনে করতে হবে যে, গাড়িতে যন্ত্রপাতি ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও গাড়ি নিজে যেমন চলতে পারে না; চালকের প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনই জীবদেহের মধ্যে পরিচালক শক্তি হ'লেন গুরুমূর্তি। তিনি বাইরে থেকে প্রেরণা দেন, প্রয়োজনীয় উপাদান যোগান, আবার ভিতরে বসে তিনিই কৃপা প্রকাশ করেন। একেরই দুই রকমের প্রকাশ ও ব্যবহার 'নরাকার দেহে তিনি নিরাকার স্বয়ং'। এই গুরুমূর্তি হল নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু এই গুরুই আবার স্থূলরূপ নিয়ে এসে মানুষকে তার ভিতরের ঈশ্বরীয় গুণগুলি বাড়াতে সাহায্য করেন। তিনি শিষ্যের মধ্যে শুধু ভাবের দ্বারা শুদ্ধ ভাবের সমন্বয় সাধন করেন। তারপর শুদ্ধ ও দিব্যবোধের বিকাশ সাধন করে অখণ্ড বোধসত্তার সাথে মিলিয়ে নেন। গুরু ঈশ্বর, ঈশ্বর গুরু, সুতরাং তিনি সর্বাধিষ্ঠান বিশ্বাধার, সমগ্র জীবজগতের আব্রহ্মাস্তম্ব সর্বচরাচর, বিশ্বে প্রভু, বিভু, অন্তর্যামী, নিয়ন্তা, গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃদ, তিনি নির্গুণ-গুণী, তিনি আত্মজ্ঞান পূর্ণতা, মুক্তি এবং পরমানন্দদাতা। তিনি সমগ্র দ্বৈত প্রপঞ্চ ও বৈচিত্র্যের অতীত, রূপাতীত হয়েও দিব্য প্রেমের আতিশয্যে স্ব-ভক্তের উদ্ধারের জন্য শরীর বা রূপ ধারণ করেন, তিনি অদ্বয়, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজীবে সর্বধী সাক্ষী, তিনি গুণাতীত, ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, নিত্য, পূর্ণ, 'পরমে পরম, আপনে আপন আবার স্বয়ং-এ স্বয়ং'।

গুরুদেবের গুরুত্ব বুঝাতে তাই লুই পা বলেছেন—
'কাআ তরু বর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিএ পৈঠ কাল।
দৃঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।'

—চর্যাপদ, ১ম পদ, লুই-পা।

বঙ্গার্থ—মানবদেহে বৃক্ষশাখার মতো পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে, আর তাদের চঞ্চলতার জন্য মৃত্যু ধেয়ে আসে। কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মহাসুখের দেখা মেলে। লুই বলেন—গুরুর কাছ থেকেই কেবল সেই দেহ-সাধনায় মহাসুখ পাবার কৌশল জানা যায়।

ধন্য কলি যুগ আমি বলিহারি যাই,
কামের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া আছে সবাই।
না জানিয়া তত্ত্ব সে মত্ত প্রেমের ঘরে,
পাওনাগণ্ডা না বুঝিয়া শুন্য হবে পরে।
তার প্রেম-ভক্তি ক্রমে সকলি নাশ পায়,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রেমে আর ভালোবাসায় কমে পরমাই।
রূপাশ্রয় ধর্ম্ম হয় যার বড়ই বিষম,
বায়ু ধরার পরে কর্ম্ম কে বুঝে মরম!
প্রেম করিয়া কাম-গুরু হয় সতীর পতি,
বায়ু প্রেমে প্রেমিক হইয়া সে রতি-পতি।
জরা ভাবে দেহ আর হবে না বহিতে,
সর্ব্ব ব্যাধি হইবে নাশ বিনা ঔষধিতে।
বায়ুর অধীন হইয়া বাস করো দ্বিদলে,
জীবন্মুক্ত হইয়া যাবে গুরুর কৃপাবলে।

কামের প্রবাহে মুগ্ধ জীবের মোহ কেটে গেলে কালের নিয়মে ঐ ভক্তিপ্রাণ মানুষ বিভিন্ন মঠ, মিশন, আশ্রম, সঙ্ঘ থেকে দীক্ষা নেন। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বংশপরম্পরায় যিনি কুলগুরু ছিলেন তিনি দেহ রেখেছেন, তার সন্তানেরা কেউ দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক নন। এমতাবস্থায় বেশী খোঁজাখুঁজি না করে সহজসাধ্যভাবে বিভিন্ন আশ্রম থেকে ইচ্ছুকরা দীক্ষা নিয়ে নেন। আবার এমনও দেখা যায়, গুরুবংশ দীক্ষা দিলেও অনেকে বংশপরম্পরার বাইরে গিয়ে কোনও বহুলপ্রচারিত ও বিখ্যাত কোনও মঠের শরণাপন্ন হন।

আমি বিভিন্ন সময়ে দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক কিছু মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হই। অনেকেই দীক্ষা, বীজমন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চান। যারা দীক্ষা নেন নি, তাদেরকে বোঝাতে কোনও সমস্যা হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে কোনও রাখঢাকের দরকার হয় না। সোজা কথা সোজা ভাবেই বলা যায়। কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই দীক্ষিত, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু সতর্ক থাকতে হয়। কারণ সোজাসাপ্টাভাবে বললে, কিছু বিষয়ে তারা মানসিকভাবে আহত হতে পারেন, যা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

প্রথমত, বীজমন্ত্র নিয়ে বলি। আপনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন তার চারটি অতি আবশ্যক অঙ্গ থাকবেই, যেমন —

১. ঋষি, ২. ছন্দ, ৩. দেবতা, ৪. বিনিয়োগ। সমস্ত মন্ত্রের এই চারটি সূত্র থাকবেই থাকবে। যদি আপনি আপনার দীক্ষামন্ত্রের এই বিষয়গুলি না জেনে থাকেন তবে আপনার গুরুদেব অথবা সেই আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করুন। যদি সরাসরি সদুত্তর না পান অথবা কল্পিত তাত্ত্বিক ব্যখ্যা পান, তবে নিশ্চিত বুঝবেন সেগুলো আদৌ মন্ত্রই নয়। সেগুলো সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও ইচ্ছেমতো বানানো বর্ণের সমষ্টিমাত্র।

দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রে উল্লিখিত দেবতা ছাড়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নিয়ে কোনও মন্ত্র হতে পারে না, তা তিনি যত বড় মহাপুরুষ, অবতারপুরুষই হোন না কেন। তিনি সেই পরম্পরার প্রণম্য গুরু অবশ্যই হতে পারেন, কিন্তু কোনওভাবেই তাঁর নামে মন্ত্র থাকতে পারে না। থাকলে বুঝতে হবে, সেগুলো পুরোটাই মনগড়া ও নিরর্থক

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শব্দসমষ্টি মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, দেখা গেল প্রণব ও মায়াবীজের সাথে কোনও মহাপুরুষের নাম জুড়ে দিয়ে সেই মন্ত্রেই দীক্ষা চলছে। জানবেন, বিষয়টা আমড়া দিয়ে আমসত্ত্ব বানানোর মতোই।

তৃতীয়ত, সমস্ত পূজায় যেমন সংকল্প অতি আবশ্যক, যজমানের নামে সংকল্প ছাড়া যেমন পূজার ফললাভ হয় না, তেমনি দীক্ষার আগে গুরুকরণেরও সংকল্পবিধি রয়েছে। সেটা করা না পর্যন্ত কেউ কারোর গুরু নয়, কেউ কারোর শিষ্যও নয়। যদিও সিদ্ধগুরুর এ'সবের দরকার পড়ে না, কানের কাছে মুখ নিয়ে মন্ত্রদানেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে আজকের যুগে চূড়ান্ত ব্যতিক্রম। বর্ত্তমান যুগে সিদ্ধগুরু সুদুর্লভ। 'কোনও মঠ বা আশ্রমের সমস্ত দীক্ষাদাতারাই সিদ্ধ তাই সংকল্পাদি লাগে না', এ নিতান্তই হাস্যকর যুক্তিমাত্র। যেহেতু বিধিমত গুরুকরণ হলে শিষ্যের কৃতাকৃত সমস্ত পাপ শ্রীগুরুর গ্রহণ করতে হয়, তাই কৌশলে তা থেকে পার পেতে আশ্রমের গুরুরা এই সংকল্পহীন দীক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেছেন। তাছাড়া মাইকে গণদীক্ষাপদ্ধতিতে বীজমন্ত্র দানও ভুল এবং অশাস্ত্রীয়।

চতুর্থত, দীক্ষার আগে দীক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত ইষ্টমন্ত্র নির্ধারণ করার জন্য চক্রবিচার করা জরুরী। যদিও সিদ্ধগুরু দীক্ষার্থীকে দর্শনমাত্র তার ইষ্ট কে, তা বলে দিতে পারেন। কিন্তু আগে যেমন বলেছি বর্ত্তমান যুগে সিদ্ধগুরু সুদুর্লভ। সেটা ব্যতিক্রমী। রাম, শ্যাম, যদু, মধু সবাই যদি শিষ্যকে দেখেই বলে দেন, বুঝবেন তাতে ভাঁওতা আছে। অনেকে বলতে পারেন, দেবতার মন্ত্র, তা তো সবই ভালো, তার আবার বিচার কি?

তাহলে বলবো, ওষুধ তো সবই ভালো, এই যেমন হাইপ্রেশারের ওষুধ, যার দরকার তার জন্য জীবনদায়ী। কিন্তু যার দরকার নেই, সে খেলে? ফলটা খুব একটা ভালো হবে কি? তাই ব্লাড টেস্ট করে ওষুধ দেওয়ার মতোই ভবরোগবৈদ্য শ্রীগুরুদেব চক্রবিচার করে শিষ্যের জন্য উপযুক্ত বীজমন্ত্র নির্ণয় করে থাকেন। অনুপযুক্ত মন্ত্রে দীক্ষা হলে, তা দীক্ষাপ্রাপ্তের অরিমন্ত্র অর্থাৎ শত্রুমন্ত্র হয়ে যায়, শত্রুর মতো কাজ করতে শুরু করে—দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি পদক্ষেপে সমস্যার সৃষ্টি করে তার সর্বনাশও করতে পারে।

অনেকে আবার দীক্ষা হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে বহু বছর আগে, শিশুকালেই তার দীক্ষা হয়ে গেছে। বলাই বাহুল্য তখনো দীক্ষা কি জিনিস, খায় না মাথায় দেয়, এ সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না! মা, বাবা ও অন্যান্য পরিজনদের সাথে গিয়েছিলেন কোন মোহন্ত বা মহারাজকে দর্শন করতে। তিনি জানতেন না যে মা-বাবার আসলে দীক্ষা নিতে যাওয়া। যাই হোক, ঘর ভর্তি দর্শনার্থী, মহারাজ উচ্চাসনে বসে আছেন, যথাসময়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। মোহন্ত মহারাজ মাইকে একটি মন্ত্র উচ্চারন করলেন। ব্যাস, ঘরে উপস্থিত সবার দীক্ষা হয়ে গেল, কোলে থাকা প্রতিটি শিশুর পর্যন্ত। উনি সেই থেকে দীক্ষিত, ওই নামই জপ করে চলেছেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আসলে গুরু ও শিষ্য উভয়ের সম্মতি না থাকলে দীক্ষা হতে পারে না। তাই যারা এই ভেবে বসে আছেন যে অপরিণত বয়সে মাইকে মন্ত্র শুনে তার দীক্ষা হয়ে গেল, তারা ভুল ভাবছেন। এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন। আর অন্য একটি বিষয়ও আছে—এমন ক্ষেত্রে গুরুকরণের জন্য বিধিবৎ সংকল্পাদিও তো কিছুই হয় নি। সেইক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নই আসছে না। তাই মাইকে প্রদত্ত মন্ত্রের ক্ষেত্রেও যেহেতু এ'সব হয় নি, মন্ত্রগুপ্তি পালিত হয়নি, 'মহারাজ' প্রদত্ত মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ কিছুই নেই, কোনও শাস্ত্রীয় প্রামাণিকতা নেই, তাই খুব স্বাভাবিকভাবে তার দীক্ষাও হয় নি। শুনতে খারাপ লাগলেও শাস্ত্রীয় পরিভাষায় আপনি দীক্ষিতই নন।

এবার আসি অন্য বক্তব্যে। আপনি কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দীক্ষা নেবেন বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু ইচ্ছা হলেই তো আর হলো না—তার হাজার হাঙ্গামা, কঠিন প্রশ্নোত্তর, তাতে উত্তীর্ণ হলে তবেই না দীক্ষার ছাড়পত্র মিলবে! এই না হলে দীক্ষা! সঠিক নিয়মানুবর্তিতা! কঠিন অনুশাসন! আহা, কতো সুন্দর জীবনযাপন! এমন প্রতিষ্ঠান থেকে দীক্ষা নিলে বেশ দশজনকে বলে বেড়ানো যাবে! কিন্তু, ইন্টারভিউ হয় শুধু দীক্ষার্থীর, কেন তা হবে? কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন। শুধু শিষ্যের পরীক্ষা। আর গুরুর পরীক্ষা? তার কী হল? শাস্ত্র যে বলছেন, গুরু ও শিষ্য উভয়েই উভয়কে পরীক্ষা করে বাজিয়ে নেবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবনে যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। পরীক্ষা হবে শুধু শিষ্যের? যাই হোক্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দীক্ষার দিন ধার্য হলো। এখানেও সেই মাইকে দীক্ষা। বিধিবৎ গুরুকরণের কোনও সুযোগ নাই। শুধু বাড়ী থেকে বয়ে আনা ফল, ফুল, ধুতি, চাদর, খামে ভরা দক্ষিণার টাকা গুরুর চরণে দিয়ে দিলেন, ব্যাস হয়ে গেলো। আর যে মন্ত্র দেওয়া হলো সেটিও মনগড়া। প্রণব ও একটি বীজমন্ত্র আছে বটে, কিন্তু তার সাথে অবতারপুরুষের নাম জুড়ে দিয়ে অশাস্ত্রীয় দীক্ষার কোনও মানে হয় না। তাই শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এমনভাবে নিজেকে দীক্ষিত দাবী করতে পারেন না।

বিভিন্ন মহাপুরুষের নামসম্বলিত মঠ, মিশন, সঙ্ঘ, আশ্রমগুলিতে দীক্ষার সময় দীক্ষার্থী ও ভক্তশিষ্যদেরকে সেই মঠ বা আশ্রম থেকে উপদেশ দেওয়া হয় যে সেই মহাপুরুষই গুরু ও তিনিই ইষ্ট। কিন্তু বিষয়টি মোটেই তা নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী, দীক্ষার সময় গুরুদেব শিষ্যের কানে কোনও এক দেব বা দেবীর মন্ত্র দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা বীজমন্ত্র শাস্ত্রে নির্দিষ্ট করে বলা আছে। যেমন, দেবী ভুবনেশ্বরীর হলো মায়াবীজ। এখন যিনি ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্রে দীক্ষা নিতে চান তাকে এই 'মায়াবীজ' মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে তিনি হলেন ইষ্ট আর যে ব্যক্তি মন্ত্রটি দিচ্ছেন তিনি হলেন গুরু। কিন্তু, বর্তমানকালে মানুষের শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন মঠ, মিশন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে দীক্ষা, বীজমন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনগড়া গালগল্প বলে সাধারণ ধর্মপ্রাণ ভক্তদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে, তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হলো সচেতনতা বৃদ্ধি।

সুতরাং ইষ্ট ও গুরু দু'জন ভিন্ন, আলাদা দুই সত্ত্বা। শাস্ত্রে দুজনেরই আলাদা বীজমন্ত্র রয়েছে। গুরুর বীজকে গুরুবীজ ও ইষ্টের বীজকে ইষ্টবীজ বলা হয়। সাধারণত দীক্ষার সময় এই দুটি মন্ত্রই দীক্ষার্থীকে দেওয়া হয়ে থাকে। আপনার গুরুদেবকে আপনি ইষ্টজ্ঞানে, ইষ্টের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করে পূজা করতেই পারেন। এটাই করা উচিৎ। কিন্তু মনে রাখবেন তিনি আপনার ইষ্ট নন। আপনাকে যিনি দীক্ষা দিয়েছেন, তাকে আপনি ইষ্টের মত শ্রদ্ধাভক্তি করতেই পারেন এবং তা-ই করা উচিৎ কিন্তু তাই বলে তিনি আপনার ইষ্ট হয়ে যাবেন না। ইষ্টের মত ভাবা আর ইষ্ট হওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আপনাকে যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে তিনিই আপনার ইষ্ট। আর যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি গুরু। তাই বিভিন্ন মঠ মিশনগুলি থেকে যেভাবে প্রচার করা হয় যে জনৈক মহাপুরুষই আপনার গুরু আর তিনিই আপনার ইষ্ট, এই কথাটা শুনতে যতই ভালো লাগুক না কেন, কথাটি অশাস্ত্রীয়। কোন দেবতার কী বীজমন্ত্র হবে তা শাস্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোন কোন দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা হতে পারে আর কী কী মন্ত্রে দীক্ষা হতে পারে, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত আছে, এর বাইরে যদি কেউ কোনও মহাপুরুষ, অবতার, সিদ্ধপুরুষ বা সিদ্ধসাধিকার নামে দীক্ষা দেওয়া হয় তা পুরোপুরি জালিয়াতি। কারণ সেই অবতার বা মহাপুরুষের কোনও বীজমন্ত্রের উল্লেখ কোনও শাস্ত্রে নেই। আর শাস্ত্রে যা নেই, সেই দীক্ষাপদ্ধতি ও দীক্ষামন্ত্র মনগড়া ও তার শাস্ত্রীয় বৈধতা নেই।

শিষ্যের গুণ ও লক্ষণ

দীক্ষা নেওয়ার আগে আমাদের করতে হবে আত্মবিচার। নিজের বিচার করতে হবে নিজের বিবেক দিয়ে। গুরু আমাকে দীক্ষা দেওয়ার যোগ্য কি না সেটা বিচার করার আগে একবার বিচার করে দেখা প্রয়োজন যে 'আমি' দীক্ষা নেওয়ার যোগ্য তো? অর্থাৎ আপনি শিষ্য হওয়ার যোগ্য তো? আসলে 'শিষ্য' হতেও যোগ্যতার প্রয়োজন।

এই বিষয়ে প্রথমেই একটি ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করি। 'দীক্ষা' নেওয়ার কথা বললে অনেকেই এখন 'সদ্গুরু' খোঁজেন। আসলে তারা নিজেরা সৎ শিষ্য কি না তা জানেন না অথচ গুরু চাই 'সদ্গুরু'। মনে রাখতে হবে যে দীক্ষা নেওয়ার আগেই সাধু-গুরু সঙ্গ করা ভীষণ প্রয়োজন। গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন ও জেনে নিন, সাধুগুরুসঙ্গ কেন প্রয়োজনীয় কেন।

'এক জঙ্গলে এক সাধু নিজ সাধনকুটীরে একাহারী হয়ে ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নামজপ করেই বাস করতেন। তার নামমাত্র কয়েকজন শিষ্যদের মধ্যে এক জন শিকারী ছিল।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আশ্রমের কাছেই বাড়ী বলে প্রতিদিন শিকারে যাওয়ার আগে সে ঐ সাধুকে গুরুদেব ভেবে প্রণাম করে তবেই শিকারে যেত। একদিন শিকারী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করল—আমি সেই ছোটবেলা থেকেই আপনাকে দেখি। রোজ আপনি মালা জপ করেন আর কাঁদেন। আমি তো শিকারের জন্য রোজ জঙ্গলে যাই, কিন্তু আপনি কি শিকারের জন্য এই জঙ্গলে বসে আছেন!

মৃদুস্বরে গুরুদেব উত্তর দিলেন—আমি যাকে শিকার করতে বসেছি তিনি একখানা আজব জগতের মানুষ! বাবা, তিনি নিজে এক চোর। চুরি করাই তার আবাল্য অভ্যাস। আমার সব কিছুই তিনি চুরি করেছেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ শিকারের জন্যই আমি বসে থাকি।

এই কথা বলেই গুরুদেব অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

শিকারী শিষ্য একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে বলল—আরে বাবা, আবার কাঁদছ কেন! তোমায় কাঁদতে দেখলে আমি বড় কষ্ট পাই। আমাকে একবার বলো সেই চোর ব্যটাকে কেমন দেখতে। আমি ঠিক তাকে ধরে এনে দেব তোমার শ্রীচরণে। তোমার আশীর্বাদে এমন ভাবে জাল ফেলব যে সে ব্যটা পালানোর পথ পাবে না।

গুরুদেব তখন ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা তাকে শোনালেন। বললেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণের, মাথায় ময়ুরের পালক, আর অতি সুন্দর বাঁশরী বাজায়। ভীষণ সুন্দর তাঁর দুটি মায়াবী চোখ।

শিকারী এবার তার গুরুদেবের কাছে শপথ করে বলল—বাবা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার এই শিকার আপনার কাছে না এনে দিতে পারব, প্রতিজ্ঞা করলাম - জল পর্যন্ত আমি গ্রহণ করব না। গুরুদেব শিকারীর সরল মনের পরিচয় পেয়ে যেমন খুশি হলেন তেমনই মনে মনে 'শ্রীকৃষ্ণ শিকার'-এর কথা শুনে হাসলেন।

শিকারী কিন্তু বনের শুরুর কাছাকাছি পায়ে চলা পথের ধারে এক জায়গায় বড় জাল নিবিড়ভাবে বিছিয়ে বসে গেল।

প্রতিজ্ঞাবাক্য অনুযায়ী জল-অন্ন ছাড়াই সে শিকারের অপেক্ষায় বসে রইল। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে সে আবারও শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকলো। এই ভাবে দুই দিন হয়ে গেল। তৃতীয় দিনে তার শরীর খাদ্য-জলের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও সে কিছুই খেলো না, কিন্তু প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে শরীরের মায়া ত্যাগ করে বসেই রইল।

একটু পরে সে একটু ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। শিকারীর একনিষ্ঠতা ও গুরুভক্তি দেখে এবার করুণাময় ভগবানের খুব দয়া হল। শিকারীর অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। সন্ধ্যার আগে আগে ভগবান বাঁশরী হাতে মন্দগতিতে নিজেই এসে নিঃশব্দে জালে বদ্ধ হয়ে গেলেন।

শিকারী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জালে বন্দী ভগবান অপেক্ষা করছেন শিকারীর জেগে ওঠার। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। ভগবান এবার শিকারীর ঘুম ভাঙানোর জন্য মধুর স্বরে বাঁশরী বাজাতে লাগলেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অকস্মাৎ বাঁশীর স্বরে শিকারীর ঘুম ভেঙে গেল। দুর্বল, অবশ শরীরে সে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে চিৎকার করে উঠল—শিকার পেয়ে গেছি, আমার শিকার আমি পেয়ে গেছি। আমি আমার গুরুদেবের কাছে করা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছি। তিনদিন ধরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণকে ধরেই ছাড়ালাম তো! আমি ভাগ্যবান, গুরুদেবের চাহিদা আমি পূরণ করতে পেরেছি। জয় গুরু।

শিকারী শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক শিকারের মতই জালে মুড়িয়ে, পশুর মতই কাঁধে ঝোলাল, আর শ্রীকৃষ্ণও বিনা শব্দে ঝুলে রইলেন।

'জয়গুরু' বলতেই তার শরীরে যেন শক্তি ফিরে এসেছে! ছুটতে ছুটতে শিকারী তাঁকে গুরুদেবের কাছে এনে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল—নাও বাবা, তোমার শিকার আজ আমি নিয়ে এসেছি। তোমার চরণে এই আমার প্রনামী রইল।

গুরুদেব দেখলেন শিকারীর কাঁধে ভগবান জালে শান্ত মুর্তিতে বন্দী হয়ে আছেন, মুখে তাঁর রহস্যময় মৃদু হাসি। এখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেও সাধনকুটিরের চতুর্দিকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে, গাছে পাখীরা ডাকছে, দুরে গ্রামে গৃহস্থ ঘরে সন্ধ্যাকালীন উপাসনার শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, বুনোফুলের সৌরভে চারিদিক ম ম করছে।

গুরুদেব তার সাধনকৃত ক্ষীণ তাপসদেহে দৌড়ে গিয়ে ভগবানের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ভগবান, আমি সেই কৈশোরে ঘর-বাড়ি সব ছেড়েছি তোমাকে পাওয়ার জন্য। বন-জঙ্গল-তীর্থ-মন্দিরে মন্দিরে তোমায় খুঁজেছি দর্শনের আশায়। কত বিচিত্র সাধনা করেছি বিভিন্ন মন্ত্রে। আমার সারাজীবন কাটিয়ে দিলাম তোমার আসার আশায়। কিন্তু তুমি আসনি। কেন আসনি! আমি কি তোমার অযোগ্য ভক্ত? আর আমার শিষ্য, এই শিকারী, মাত্র তিনদিনেই তোমাকে পেয়ে গেল! তোমার এমন বিচার কেন?

ভগবান বললেন —- ভক্ত, সাধকশ্রেষ্ঠ, ওঠ তুমি। তুমি ধন্য। তুমি একজন যোগ্য গুরু। তোমার যোগ্যতা আছে বলেই তো আজ তুমি একজন সফল গুরুদেব। সাধারণ শিকারীকে 'ভগবান-শিকার'-এ তুমিই পাঠাতে পেরেছ। তোমার সাধনা সফল হয়েছে বলেই তো তুমি সশরীরে আমার চরণ স্পর্শ করতে পেরেছ। আর তোমার শিষ্য, আমাকে না জেনেও, মাত্র তিনদিনেই আমাকে স্পর্শ করতে পেরেছে কারন সে নিঃসংশয় চিত্তে এক গুরুদেবের আশ্রয় নিয়েছে আর গুরুদেবের কর্মের বিচার না করে গুরুবাক্যে আস্থা রেখেছে। সে তিনদিনেই আমার দর্শন পেয়ে গেল তার আরও কারণ সে প্রতিদিনই তোমাকে স্মরন করে, তোমার সুখদুঃখের খবর রেখে তোমার সাধনার শর্ত পুরানোর চেষ্টা করেছে।

এতক্ষণ ধরে শিকারী-শিষ্য একদৃষ্টে তার গুরুদেব ও ভগবানের কথোপকথন শুনছিল। এবার মোটামুটিভাবে সে ঘটনাক্রম সাজিয়ে নিজের মত করে বুঝে নিলো। ধীর পদক্ষেপে তার গুরুদেবের কাছে পৌঁছে সজল চোখে প্রণাম করতে গুরুদেবের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চরণ উদ্দেশ্য করে হাত বাড়াল।

গুরুদেব ত্রস্ত পায়ে এক কদম পিছিয়ে এসে বললেন—ভক্ত শিকারী, উনি এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা। উনি আমার ইষ্টদেব, আমার ইহকাল-পরকাল, মন-প্রাণের অধিকারী তিনি। এস, ভগবানকে প্রথমে প্রণাম কর।

শিকারী বলল—শোন বাবা, আমি ভগবান কে বা কি তা কখনও জানিনি বা জানার চেষ্টাও করিনি। আমি চিনি তোমাকে। তোমাকে দেখলে ও তোমার কথা শুনলে আমার প্রানে আনন্দ হয় আর তোমার সাথে কথা বলে শিকারে গিয়ে আমি ভাল ভাল শিকার পাই।

গুরুদেব বললেন—ভক্ত শিকারী, ভগবান ছাড়া আমরা একপাও চলতে পারি না। তিনিই সব।

শিকারী বলল —- শোন বাবা, তুমিই আমার ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ কে - তা আমি আজ জানলাম তোমার কথায় শিকার ধরে নিয়ে এসে, কিন্তু আমি কি ভগবানকে ধরতে গিয়েছিলাম? মোটেই না। আরও শোন, কেউ জানে না, 'জয় গুরু' বলে তোমাকে প্রনাম করে একদিন শিকারে গিয়ে গভীর বনের মধ্যে এক পরিত্যক্ত কুয়োতে আমি গুপ্তধনও পেয়েছি! আর তুমি এই ভগবান ছাড়া আর কি পেয়েছ জীবনে? আমি তোমাকে প্রথমে প্রনাম করে তারপরেই ভগবানকে প্রনাম করব।

অপ্রস্তুত গুরুদেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ভগবান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন —- ভক্ত সাধক, তোমার শিষ্য তো ঠিকই বলেছে।

শিকারীকে উদ্দেশ্য করে ভগবান বললেন—বাবা, তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। যাও, তোমার গুরুদেবকে প্রণাম কর।

শিকারী-শিষ্য এতদিনে বুঝল যে তার গুরুদেব যে সে মানুষ নন। তিনি হলেন রাজার রাজা 'মহারাজা', তিনি সাধনভজনে রত—শিষ্য ধরতে ঘুরে বেড়ান না। তার গুরুদেবের ভক্তিসাধনায় স্বয়ং বিশ্বনাথ সাধনকুটিরে উপস্থিত হয়েছেন দর্শন দিতে। শিকারী-শিষ্য দু'হাত বাড়িয়ে, তার অভ্যাসমত, পঞ্চাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করল।

শিষ্যের প্রণাম গ্রহন করে গুরুদেব তার মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করে বললেন—বাবা, এবার ভগবানকে প্রণাম কর আর তুমি আমার সাধনকুটিরের দায়িত্ব নিয়ে সাধন জগতে প্রবেশ কর। আমি ভগবানের দর্শন পেয়ে আবাল্য লালিত স্বপ্নপূরন করেছি। আমি অন্যত্র গমন করব।

গুরুদেব ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করলে তিনি আশীর্বাদ করলেন—তোমার সকল ইচ্ছা পূরণ হোক্।

ভগবানের কথা শুনে গুরুদেবের দুই চোখে জলের স্রোত বয়ে গেল। আনন্দে তিনি এতটাই শিহরিত হলেন যে আনন্দ-কম্পনে তার হৃৎকম্প শুরু হল। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ভগবানের সামনে কয়েক মুহুর্তের মধ্যে দেহ ত্যাগ করলেন।'

তাই 'শিষ্য' হতে গেলে এমন ভক্তিরই দরকার। আজকাল অনেক ব্যক্তিকে দেখি,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিজের চোখে নিজেকে এত বড় করে দেখেন যে তিনি যেন সাঙ্ঘাতিক বিরাট মাপের এক মহাসাধক। অনাকাঙ্খিতভাবে মাঝেমধ্যে এমন কথাও কানে আসে, যেখানে জনৈক ব্যক্তি অহঙ্কারে টগবগ করছেন আর বলছেন—'আমি যদি কারোর কাছে কখনো দীক্ষা নিই তো একমাত্র শিবের থেকে নেবো। এছাড়া কোনও মনুষ্যদেহধারী আমার গুরু হওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি না।'

এছাড়া আমারই এক পরিচিত ব্যক্তির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বিয়ে-থা করেননি, অকৃতদার, কোনও পিছুটান নেই। ব্যবসায়ী মানুষ। বেশ ভালোই আয়। ভারতবর্ষের এ হেন কোনও তীর্থক্ষেত্র নেই যেখানে তার চরণধুলা পড়েনি। অমরনাথে দুই বার, কেদারে চারবার, মণিমহেশ, তুঙ্গনাথ, গুপ্তকাশী, লুপ্তকাশী, সুপ্তকাশী কিছুই বাকী রাখেননি, কেবল জ্ঞানগঞ্জটা চোখে দেখতে পাননি, তাই বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয়েছে। তাকেই একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—দীক্ষা নেননি কেন?

উত্তরে তিনি জানালেন— তেমন গুরুই পাই নি।

অর্থাৎ নিজের চোখেই নিজের উচ্চতাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছেন যে কোনও যোগ্য গুরুই তার আর চোখে পড়ছে না। অথচ দিনে হাজারটা করে মিথ্যে বলা, কর্মে ফাঁকি সবেতেই তিনি আছেন। নিজের দোষগুলি দেখছেন না কিন্তু তার গুরুকে সর্বগুণের আধার হতে হবে! মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের গুরু ছিলেন বশিষ্ঠদেব। আমরাও বশিষ্ঠদেবের মতো জাদরেল গুরু চাই, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মতো শিষ্য হতে চাই না।

এই গেল যারা দীক্ষা নেননি তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোকের কথা। আর যারা দীক্ষা নিয়েছেন, তারা? 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ' যারা মুখস্থ আউড়ে যান, তারা ক'জন সত্যিসত্যিই গুরুকে দেবতাজ্ঞান করেন? দেবতা দূরস্ত, গুরুকে স্রেফ গুরুরূপে সম্মান ক'জন করেন? গুরুকে মানুষ আর মন্ত্রকে অক্ষরজ্ঞান করা শিষ্যই তো জগতজোড়া! আসলে শিষ্য চেনা যায় গুরুর সাথে মতানৈক্য হলে অথবা গুরুর দুর্দিনে। গুরুর সাথে যতদিন মনের মিল, যতদিন গুরুর কাছ থেকে এটা-ওটা মিলছে ততদিন তিনি পরব্রহ্ম, আর অমত হতেই সব ফট্, হাওয়া, অমান্যতা!

মতে মিললে গুরুবাদ,
অমত হলে গুরু বাদ।

তাই হয়তো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে শুরু করে ভোলাগিরি মহারাজ সবাই একবাক্যে বলে গেছেন —গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য মিলে না এক। শাস্ত্র বলেছেন—

"সর্ব্বপাপ প্রশমনং সর্ব্বদারিদ্রনাশনম্।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বসঙ্কটনাশনম্।।"
—গুরুগীতা

'নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।'

—গুরু এবং পরমপদ বস্তুতঃ অভিন্ন তথাপি যখন ঐ গুরু বা পরমপদ শ্রীসংযুক্ত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হন তখনই তাঁহার উৎকর্ষ কারণ শ্রীগুরু ভিন্ন পরমপদ জানিয়া জানাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, থাকিতে পারে না।১

'শিষ্যাস্ গুরুত্ব প্রাপ্ত হোয়ে।
সুবর্ণে সুবর্ণ করি তাঁ।
নৌনি উপমা না সাহে।
সদ্ গুরুসী পরিসাচী আ।।'

— সদগুরুর সেবায় শিষ্য গুরু পদে উন্নীত হন। গুরুর যোগবল, তপোবল সবই গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের মধ্যে বর্তে যায়। স্পর্শমনির দ্বারা কৃত সোনা অন্য বস্তুকে সোনায় পরিণত করতে পারে না। কিন্তু গুরু পারেন তাঁর সেবককে গুরুর গুরুত্ব দিতে। গুরু এবং তাঁর সেবকের মহিমা অনেক বেশী।

এই প্রসঙ্গে গুরুনানকের জীবনের একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিক। একবার গুরুনানক তাঁর কয়েকজন শিষ্যসহ ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত লাহিনাও সেই দলে ছিলেন। হঠাৎ বনের মধ্যে একটা মৃতদেহ তাঁর নজরে পড়ল; পচা মৃতদেহ একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। গুরুনানক সেই দুর্গন্ধময় শব দেখিয়ে শিষ্যদেরকে বললেন—তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে আমার কথায় পচা গলিত শবদেহ ভক্ষণ করতে পারে? গুরুর এই কথা শুনে সবাই অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন, গুরুজী কি আজ অপ্রকৃতিস্থ নতুবা এমন ন্যাক্কারজনক প্রস্তাব কি করে করতে পারলেন?

গুরুনানক অধিকাংশ শিষ্যদের এইরকম মনোভাব বুঝে পুনরায় ঘোষণা করলেন—'নির্দ্বিধায় যে বিনা বিচারে গুরু বাক্য পালন করতে পারে, সেই প্রকৃত শিখ। প্রকৃত গুরুগতপ্রাণ শিখ পরমপদ অর্থাৎ 'অলখ্ নিরঞ্জনতত্ত্ব' উপলব্ধির যোগ্য আধার। যারা তা পারে না, তারা গুরুর চারধারে থেকে কেবলই ভীড় বাড়ায়'। নতমস্তকে সব শিষ্য নীরবে গুরুর এই ধিক্কার শুনলেন, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করতে এগিয়ে এলেন না। অবশেষে লহিনাকে দেখা গেল, তিনি ধীরে মৃতদেহের কাছে বসে করজোড়ে বললেন—গুরুজী আপনি দয়া করে বলে দিন, এই মৃতদেহের কোন অংশ থেকে আমি সর্বপ্রথম খেতে আরম্ভ করব?

লাহিনার কথা শুনে তার গুরুভ্রাতারা স্তম্ভিত। কিন্তু নানক শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'কোমরের দিক থেকেই আরম্ভ কর'। গুরুর বাক্য শেষ হতে না হতেই নির্বিকার চিত্তে লাহিনা শবদেহ কামড় দিবার জন্য হাঁ করে ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু শবদেহ হতে কাপড়ের আচ্ছাদন তুলতেই দেখা গেল, সেখানে থরে থরে সুমিষ্ট ফল ও মিষ্টান্ন দ্রব্য সাজানো রয়েছে।

গুরুনানক চেলাদের ভাব-ভাবনার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে লাহিনার মাথায় হাত দিয়ে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'এ আমার কোন বিভূতি নয়, তোমার গুরুভক্তির গুণেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

মনে রাখবে, অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ,শব্দযোগ, সিদ্ধ যোগ, বিহঙ্গীযোগ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রভৃতির নিরন্তর অভ্যাসের যে পরমপদ লাভ করা যায় না, প্রকৃত একজন শিখ গুরুভক্তির গুণে তা অবলীলাক্রমে লাভ করতে পারে। লাহিনা! তোমার অসাধারণ গুরুভক্তির গুণে তোমার তন্ মন্ ধন্ এক কথায় তোমার সমস্ত সত্ত্বাকে গুরুর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ, সর্বতোভাবে তুমি আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তাই তোমার নাম দিলাম অঙ্গদ। আমার পরে তুমিই হবে সমস্ত শিখপন্থের গুরু।'

এই গল্প থেকেই বোঝা যায়, ভালো গুরু পাওয়া যত না কঠিন, একজন ভালো শিষ্য পাওয়া তার চেয়ে ঢের ঢের কঠিন। দীক্ষার্থীরা তাই গুরু, মন্ত্র এ'সব যাচাই করার আগে নিজেকে যাচাই করবেন। নিজে কতদূর তৈরী হয়েছেন শিষ্য হওয়ার জন্য। নিরপেক্ষভাবে নিজেকে এই শাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে আপনার জমি কতদূর তৈরী হয়েছে।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। একজন শিষ্যকে তাই মানসিকভাবে বলবান হতে হবে। গুরুগৃহে শিষ্য গুরুকে সেবা করার সুযোগ পায়। সেই সেবার মধ্য দিয়েও গুরু শিষ্যকে লক্ষ করেন, শিষ্য অমনোযোগী, অলস বা অসতর্ক কি না! গুরু যদি শিষ্যকে তাঁর অন্তরঙ্গ বলে গ্রহণ করেন, তবে তিনি তাঁর নিজের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দেন। উত্তম আচার্য গুরুদেব সবসময় উত্তম শিষ্যধন খুঁজে বেড়ান। বিনয়ী, মনোযোগী, প্রকৃত জিজ্ঞাসু এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আছে এমন একজন শিষ্যকে গুরু যখন খুঁজে পান তখন তাঁর আর আনন্দের সীমা থাকে না। শ্রীগুরু হলেন শিষ্যের আপন থেকেও আপন। গুরুর থেকে শিষ্যের কাছে আর কেউই প্রেমাস্পদ হতে পারে না। একজন আদর্শ দীক্ষার্থী বা শিষ্যের লক্ষণগুলি হল —

১. দীক্ষার্থীকে শান্ত হতে হবে। শান্ত মানে শুধু আচার-ব্যবহারে বাহ্যিক শান্তভাব নয়, মনের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্বগুলির নিরসন করে স্থির অচঞ্চল অবস্থায় স্থিত হওয়া। সেটা কী করে হবে? শাস্ত্র বলছেন যে দীক্ষার্থী ও গুরু এক বছর সময়কাল একে অপরকে যাচাই করবেন। সেই সময়টা খুব মনোযোগের সাথে গুরুর ভালো-মন্দ সমস্ত বিষয় বিচার করে নিতে হবে। অধিকাংশই দীক্ষার আগে এ কাজটি ভালোভাবে করেন না। কিন্তু দীক্ষার পর 'শ্রীগুরুর মধ্যে ছিদ্র অনুসন্ধান' করতে শুরু করেন। এ সম্পূর্ণ অনুচিত। দীক্ষার আগে গুরুকে পরীক্ষা করা দোষের তো নয়ই বরং শাস্ত্রসম্মত কারণ মন্ত্রদানের আগে তিনি তখনও আপনার গুরুপদে উন্নীত হন নি। তাই তখনই সমস্ত প্রকারের ঝাড়াই বাছাই করে তারপর মন্ত্রগ্রহণ করা উচিৎ যেন পরে কোনওরকম প্রশ্ন মনে না জন্মায়। তাহলেই মন সম্পূর্ণ শান্ত হবে। কিন্তু দীক্ষার পরে গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে তাঁর মধ্যে দোষ খোঁজাটা ঘোরতর পাপ।

২. দীক্ষার্থীকে অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে। শ্রীগুরুর কাছে কোনও প্রশ্ন করার সময় বা সাধারণ কথাবার্তার সময় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করা দরকার। মনে রাখতে হবে, শ্রীগুরুকে কখনোই 'তুমি' বলে সম্বোধন করা উচিৎ নয়।

৩. দীক্ষার্থীর মন কলুষতামুক্ত হতে হবে। শুদ্ধ মনের অধিকারী হলে তবেই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বীজমন্ত্র পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হতে পারে।

৪. শ্রীগুরু, তাঁর পরিবারবর্গ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সতীর্থদের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে দীক্ষার্থীকে।

৫. শ্রীগুরুর তত্ত্ব উপদেশ ধারণে সমর্থ হতে হবে দীক্ষার্থীকে। যদিও এই বিষয়টা শ্রীগুরুর শিষ্যচয়নের উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। অধিকারীভেদে মন্ত্র ও সাধন উপদেশ শ্রীগুরুর নিয়ন্ত্রাধীন। যেমন এক লিটারের জলের বোতলে দু লিটার জল ঢাললে অতিরিক্ত জল গড়িয়ে নষ্ট হয়ে যায়, অনেকটা সে'রকমভাবেই দীক্ষার্থীর যোগ্যতা বিচার জরুরী। কিন্তু পাশাপাশি শিষ্যের নিরন্তর নিজের মান উন্নয়ন ও ধারণক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যত্নবান হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধ্যায় অর্থাৎ পড়াশোনা আর গুরুর আদিষ্ট অনুশাসন পালনে মনোযোগী হতে হবে।

৬. দীক্ষার্থীকে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ও বংশের প্রচলিত প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

৭. দীক্ষার্থীকে অবশ্যই সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, ইন্দ্রিয় সংযমী হতে হবে। নিজের দৈহিক তথা জাগতিক কামনা বাসনা যেন বৈধতার গন্ডী অতিক্রম না করে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এও খেয়াল রাখতে হবে যে নিজের দৈহিক চাহিদা যেন সামাজিক মাধ্যমে দেখানো বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়। আপাত দৃষ্টিতে অশ্লীল বিষয় দেখলে মন চঞ্চল হতে পারে।

৮. মন, বাক্য, দেহ ও ধন দিয়ে গুরুদেবের সেবা করতে প্রস্তুত থাকাটা আদর্শ দীক্ষার্থীর অন্যতম লক্ষণ।

এ ছাড়াও দীক্ষার্থীর অনেক রকমের লক্ষণ বিভিন্ন শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এখানে খুব সহজভাবে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি লক্ষণ আলোচনা করা হলো। আশা করি আমরা গুরু ও মন্ত্র বিচার করার আগে আয়নায় একবার নিজেকে দেখবো, সবার আগে নিজেকে যাচাই করে নেবো যে আমি শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত কি না।

একজন প্রকৃত শিষ্য এই জগতের সাধারণ বস্তুকে সাধারণ মানুষ যে ভাবে দেখেন সেই ভাবে দেখেন না। তিনি যা করেন এবং যা দেখেন তার মধ্যে তার 'গুরু-দর্শন' রয়েছে। যার গুরু-দর্শন নেই সে জাগতিক বাস্তবতা দেখে এবং উপভোগের মেজাজে জীবনযাপন করে। সবার উপরে গুরু-দর্শনের অর্থ হল সবকিছুকে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে দেখা এবং সবকিছুই গুরুদেবের বিভুতি বলে ভাবা।

একজন প্রকৃত শিষ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে সর্বদাই গুরু-দর্শন থাকে। যদিও তিনি নিজেকে ছোট এবং তুচ্ছ বা লঘু মনে করুন না কেন, তার দৃষ্টিশক্তি উচ্চস্তরীয় এবং গভীর, কারণ তিনি তার নিজের ভোগের সাথে সম্পর্কিত কিছু দেখেন না।

একজন আন্তরিক শিষ্যের সর্বদা নিখুঁত সচেতনতা থাকে যে তার আধ্যাত্মিক গুরু ব্যতীত, এই পৃথিবীতে কিছুই তার নিজস্ব নয়। একজন প্রকৃত শিষ্য সর্বদা তার আধ্যাত্মিক গুরুর সেবক বা (গুরুদাস) হিসাবে তার পরিচয়ে অবস্থিত, যাঁকে তিনি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পরমেশ্বর ভগবান থেকে আলাদা বলে মনে করেন। সে আজীবন তার আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং তার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা বজায় রাখে।

একজন সত্যিকারের শিষ্য আধ্যাত্মিক গুরুকে তার আত্মার আত্মীয় হিসাবে, ভগবানের খুব প্রিয় বলে, তার প্রেম এবং স্নেহের বস্তু হিসাবে, তার শাশ্বত গুরু হিসাবে, চির উপাসক হিসাবে এবং তার জীবন ও আত্মা হিসাবে দেখে থাকেন। একজন প্রকৃত শিষ্য জানে যে শ্রী গুরুদেব একই সাথে ভক্তির প্রতীক এবং ভগবানের মূর্ত রূপ—শ্রী গুরুদেবের পাদপদ্মের সেবক না হয়ে ভগবানের সেবা লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র যারা শ্রী গুরুর সেবা করেন তারাই প্রকৃত সাধু বা প্রকৃত শিষ্য। তারা ছাড়া, বাকি সবাই অহঙ্কার-আত্মা অর্থাৎ 'মিথ্যা অহংকার দ্বারা বিভ্রান্ত' —[ভগবদ্-গীতা, ৩.২৭]। সোজা কথায়, তারা জীবনকে ঐহিক বস্তুর উপভোগী করে তুলতে চায়।

সাধনা, শ্রীগুরুদেব ও গুরুপূজা

সাধনার মূলেই হচ্ছে বিশ্বাস। গুরু পদবাচ্য তিনিই, যিনি স্বতঃ-সহজ প্রেমে সাধনার পারে গিয়েছেন, যিনি সহজ ভাব-ও-কর্ম্মসিদ্ধ মহাপ্রেমিক। এই গুরু লাভ না হ'লে আধ্যাত্মিক সাধনা হতে পারে না। আর, গুরু স্বীকার করলে, বিশ্বাস করলে, স্বতঃই আসে তাঁর সঙ্গ করা, তাঁর ইচ্ছাপূরণ করা। তাঁর স্বার্থ, তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর পুষ্টি, তাঁর প্রীতির জন্য আসে স্বতঃ-উৎসারিত সহজ দায়িত্ববোধ, স্বতঃ-উদ্ভাবনী কর্ম্মপ্রেরণা, আর তাতেই থাকে সহজ সন্তোষ, সহজ খুশী।

মানুষের যখন গুরুর প্রতি আসে ঐ বিশ্বাস, তখনই তার জীবনে চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব যায় নিরস্ত হয়ে, সকল সংশয় অপসারিত হয় তার মন থেকে। একনিষ্ঠ ভাবস্থৈর্য্য আসে জীবনে। সে হয় নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য, সত্যস্থ। 'এ এক পরম প্রাপ্তি'—ব'লে তার অন্তরাত্মা দিয়ে সে অনুভব করে পরমসুখ। তার মনটা আর ফাঁকা-ফাঁকা বা ফাঁপা বোধ হয় না, শূন্য ব'লে মনে হয় না। তখন জীবনটা তার কাছে আর বাস্তবতাহীন নয়। সবটা যেন তার পূর্ণ হয়ে ওঠে, ভরাট হয়ে ওঠে। জীবনে আলোর তীব্রতা আর স্রোত দুই-ই যায় বেড়ে। সে ওঠে জ্বলন্ত হয়ে, জীবন্ত হয়ে, গতিশীল হয়ে, আত্মবান হয়ে; পছন্দসই পতিগৃহে নববধূর মতো চিরানন্দে বাস করে।

এই বিশ্বাস আসে সহজ আকর্ষণে, সহজ ভাললাগায়, সহজ স্বার্থে বা গুরুসঙ্গ কামনা নিয়ে। আমাদের ইচ্ছাশক্তির মোড় ঘুরিয়ে নতুন কর্ম্মপ্রবণতাকে খুলে দিয়ে—রামধনুর মতো মনটাকে রাঙ্গিয়ে, একটা বাস্তবতার বোধে সত্তাকে বিভোর করে দিয়ে গুরুসান্নিধ্য লাভ হয়। তাই বিশ্বাসকে আমরা সহজ কর্ম্মপ্রবণতা, ইচ্ছাশক্তি বা এষণারই প্রকারভেদ বা রকমফের বলতে পারি। কোনও যুক্তি দিয়ে একে ঠিক-ঠাক

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মিলানো যায় না, যদিও সব যুক্তির মূলেই ঐ গুরুশক্তিই। গুরুদেবের প্রতি এই বিশ্বাসই সাধনার প্রথম সোপান। এতে হয় ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ, আনে জীবনের বাস্তবতার বোধ। মনের বিরোধী ভাবগুলিকে এই বিশ্বাস স্বতঃ প্রচেষ্টায় খণ্ড খণ্ড করে দুরে ছুঁড়ে ফেলে। সাধনার আরম্ভেই আমাদের গভীরভাবে স্বীকার করতে হবে—এই বিশ্বাসে আমরা সত্যি-সত্যি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, নইলে বহুমুখী কাম-বাসনায় প্রলুব্ধ-আবিল, প্রত্যাশী, হতচ্ছাড়া মন নাবালকের মতো, বুভুক্ষু কুকুরের মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে ক্ষুদ্র স্বার্থপূরণে, লোলজিহ্ব হয়ে তাঁরই আনাচে-কানাচে।

সমগ্র সত্তা দিয়ে এই স্বাধীন গ্রহণ, এই সহজ স্বীকার, এই বিশ্বাসই 'গুরুভাব'-এ আমাদের রাঙিয়ে তুলে সহজ, জীবন্ত, সেবানুলিপ্ত সাধনায় একাগ্র ক'রে। মানুষ তখনই গুরু-মন্ত্র, গুরুনাম, ইষ্টের ধ্যান, ভজনে অধিকার লাভ করে আবার অন্যের ভিতরেও এই বিশ্বাসকে সঞ্চারিত করার সামর্থ্য লাভ করে, সার্থক হয় সে জীবন-সাধনায়। গীতায় তাই শ্রীভগবান বলেছেন—

'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।'

অর্থাৎ, যিনি কর্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের কারণ শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিহিতের আচরণ করেন না, অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করেন, তিনি চিত্তশুদ্ধিরূপ পুরুষার্থলাভের যোগ্য হন না। তিনি ইহলোকে সুখ, পরলোকে স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না।

আমাদের গুরুভক্তি ও গুরুসেবার মাধ্যমে আমরা খুবই সহজে এই সমাজে বিশ্বাস, আস্তিক্যবুদ্ধি আর নিষ্ঠাময় শ্রদ্ধাকে ফুটিয়ে তুলতে পারি প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে, প্রতিটি পরিবারে। পিতার প্রতি, মাতার প্রতি, পতির প্রতি, ভ্রাতার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে শিক্ষা, দীক্ষা, সুপ্রজনন ও সুসংস্কৃত বিবাহপ্রথার মাধ্যমে। এই ভাবেই গুরুদেবের প্রতি সহজ বিশ্বাসে, ভক্তিতে, ধর্ম্মে সমাজ ও রাষ্ট্র পাবে নবীন চেতনা, আসবে অভিনব অভ্যুদয়।

মাতা-পিতা আমাদের জন্ম দান করেন আর গুরুদেব দান করেন পরাবিদ্যা। আমরা দীক্ষা গ্রহণ করে যোগ্যতা অনুযায়ী সাধনজগতে প্রবেশ করি ও জীবনপথে এগিয়ে চলি। তো, গুরুদেবই আধ্যাত্মিক জগতের সাথে আমাদের পরিচয় করান বলেই তিনি পরম পূজনীয়। সাধনার দিনগুলিতে তাঁকে স্মরণ করে আমাদের ক্রিয়াকর্ম শুরু হবে। তাই প্রথমেই শিখতে হবে শ্রীগুরুপূজা।

শ্রী গুরুদেবের পুজো করতে প্রাথমিক অনুষ্ঠান করে নিয়ে ধ্যান করতে হবে। কুর্মমুদ্রায় হাতে সচন্দন পুষ্প নিয়ে ধ্যান করতে হবে—

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বর পরিধানং, শ্বেতমাল্যানুলেপনম্।
বরাভয়করং শান্তং, করুণাময়বিগ্রহম্।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বামেনোৎপলধারিণ্যা, শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং, সাধকাভীষ্টদায়কম্।।

এই ভাবে ধ্যান করে হাতের ফুল সামনের তামার পাত্রের জলে বা শিবলিঙ্গের উপর স্থাপন করে শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি চিন্তা করে পূজা করতে হবে —

পূজা —

ঐং এষ গন্ধঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং এষ ধূপঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং এষ দীপঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং ইদং নৈবেদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রী গুরু প্রণাম

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
সংসার বৃক্ষম্ আরূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দু-নাদ-কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্মঃ নমাম্যহম্।।
ধ্যানমূলং গুরোঃ মূর্ত্তি পূজামূলংগুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোঃ বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎসচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
চিন্ময়ং ব্যাপি যৎসর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সর্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিতপদাম্বুজঃ।
বেদান্তাম্বুজসূর্যো যঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
চৈতন্যশাশ্বতশান্তঃ ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ঃ তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অনেক-জন্ম-সম্প্রাপ্ত-কর্মবন্ধ-বিদাহিনে।
আত্ম-জ্ঞান-প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ৷৷
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ৷৷
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ৷৷
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।

শ্রী গুরু কবচম্

অস্য শ্রী গুরু কবচস্য ঋষিঃ বিষ্ণুঃ ছন্দঃ বিরাড়্
দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ।
চতুর্বর্গজ্ঞানমার্গে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ।।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলো গুরুঃ।
বামোরুস্থিতশক্তিঃ সর্বত্র পরিরক্ষতু।
পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বল্লভে।।
পরাপরাখ্যো নাসাং যে পরমেষ্ঠী মুখং সদা।
কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদনন্দনাথকঃ।।
বাহু দ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দ এব চ।
বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা।।
ক্রোধানন্দঃ কটিং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ধ্যাননন্দশ্চ সর্ববাঙ্গং বোধনন্দশ্চ কাননে।।
সর্বত্র গুরুবঃ পাতু সর্বের ঈশ্বররূপিণঃ।
ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে।।

শ্রী কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে গুরু-কবচম্ সম্পূর্ণম।

গুরুস্তোত্রম্

ওঁ নমোস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশায় সংসার দুঃখ তারিণে।।
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায় জ্ঞান হারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে।।
শিবতত্ত্ব প্রকাশায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয় দায়িনে।।
অনাচারাচার ভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্মুক্ত মুক্তিদাত্রে নমোনমঃ।।
নমস্তে সম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাব প্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দ স্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ।।
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলি কলাত্মনে।।
কুল পূজোপদেশায় কুলাচার স্বরূপিণে ।
আরক্ত নিজতচ্ছক্তি বামভাগ বিভূতয়ে ।।
নমস্তেহস্ত মহেশায় নমস্তেহস্ত নমোনমঃ।।

ইদংস্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি।
কুলসম্ভব পূজায়া মন্দৌ যো ন পঠেদিদম্।
বিফলা তস্য পূজাস্যাদভিচারায় কল্পতে।।

কুব্জিকাতন্ত্রে গুরুস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালী সাধনা কি

অনেকেরই প্রশ্ন—কালী সাধনা কি? আমি বলি, কালী সাধনা হল 'চৈতন্য শক্তি' লাভ করা। এই চৈতন্য শক্তি অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তি ও আদি শক্তি। এই পবিত্র চৈতন্য শক্তি আছে বলে মানুষের আধ্যাত্মিক বোধ আছে। কিছুকিছু মনুষ্যেতর প্রাণীও দৈবাৎ এই চৈতন্যশক্তি ঈশ্বরের কৃপায় খুব অল্প পরিমানে হলেও লাভ করে থাকে।

'চেতনা' হল খুবই বহুব্যবহৃত একটি শব্দ। প্রথমত বলা যাক, চেতনা বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি। আমরা যে আদতে বহু কিছুর যোগফল—এই বোধ করার বৃত্তি বা শক্তি হল 'চেতনা'। অর্থাৎ জীবনের সৃষ্টিকারক এই বুদ্ধিমত্তাকেই আমরা চেতনা বলি। শুধুমাত্র আমরা সচেতন বলেই জীবনের অস্তিত্বকে বা বেঁচে থাকাটুকুকে অনুভব করতে পারি। জীবনের একটি টুকরো হিসেবে বা একটি শরীর হিসেবে আমরা হলাম নির্দিষ্ট কিছুটা মাটি, জল, বাতাস, আগুন আর আকাশ, এ ছাড়া রয়েছে এক মৌলিক বুদ্ধিমত্তা, যা ঐ সবকটি বস্তুকে একত্রিত করে তা থেকে জীবন সৃষ্টি করতে পারে—যে জিনিসগুলো স্রেফ কাদামাটির মতো নিষ্প্রাণ পড়ে থাকে, তাই কি না দিব্যি জীবন্ত হয়ে আমরা এখানে বসে আছি—কী অসামান্য রূপান্তর, তাই না! বুদ্ধিমত্তার এক অকল্পনীয়, অত্যন্ত নিগূঢ় স্তর রয়েছে, যা কিনা বাতাসের মতো সাদামাটা বস্তুকেও জীবন্ত করে তুলতে পারে। বাতাস বন্ধ হলেই তো জীবন শেষ! শুধুমাত্র আমরা সচেতন বলেই আমাদের জীবনের অস্তিত্বকে বা বেঁচে থাকাটুকুকে অনুভব করতে পারি। কিন্তু যদি অচেতন হতাম, আমরা তো জানতেই পারতাম না যে, আমরা জীবিত না মৃত!

এই চেতনাকে আমরা বাড়াতে পারি না, কমাতেও পারি না। আমরা 'চেতনাকে বৃদ্ধি করা' গোছের কথাবার্তা ব্যবহার করি শুধু নির্দিষ্ট কিছু প্রেক্ষাপটে। এর কারণ হল, জীবনসংগ্রামটাই আমাদের কাছে মুখ্য, যা কিনা অন্যান্য প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখনই নিজেকে আমরা এক শরীর হিসেবে চিহ্নিত করি, সেই মুহূর্তেই আমার পরিচয়ের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই শরীরী জগতেও কোন কিছু যত সূক্ষ্ম হতে থাকে, তার সীমারেখাও ততই নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। আমরা যে বাতাসটুকু শ্বাস নিচ্ছি, তার মধ্যেও কিছু আর্দ্রতা থাকে। শ্বাস নেওয়ার সময় ক্রমাগতই আমরা বাতাস ও জলকে বদলে নিই। শরীরের ভিতরে এই পরিবর্তনের জন্য আমাদের কোনও সমস্যাই হয় না, কেন না আমরা তো ওই বাতাস বা জলের সাথে চিহ্নিত নই। আমরা শুধু আমাদের শরীরের সাথেই চিহ্নিত, যাকে আমরা সকলেই 'আমি' বলে গণ্য করি। তাই আমরা কখনও চাই না যে, কোনও কিছুই আমাদের শরীরের সীমারেখাকে লঙ্ঘন করুক।

এই চেতনা আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু মাত্রায় রয়েছে। প্রশ্ন হল, কতটা। না, আমার চেতনাকে বাড়াতে হবে না—আপনাকে শুধু নিজেকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যেতে হবে যাতে তাঁর খোঁজ পেতে পারি আর তাঁকে অনুভব করতে পারি।

ফলে যাকে আমরা চেতনা বলি, তা আমাদের পরিচয়েরই এক অতি সূক্ষ্ম দিক, আর এটা আমাদের সকলের মধ্যেই অভিন্ন। আর এই হল সেই একই বুদ্ধিমত্তা—যা আমার, আপনার ও সকলের মধ্যেই প্রতিদিনের খাদ্যকে শরীরের রক্তে-মাংসে পরিণত করছে। এখন আমরা যদি মানুষকে তার শারীরিক সীমারেখার সাথে তার পরিচয় থেকে সরিয়ে তার ভিতরেরই এক গভীরতর মাত্রায় নিয়ে যেতে পারি, তবে তার মধ্যে এই 'আমি' আর 'আপনি' গোছের ধারণাগুলো কমতে থাকে - 'আপনি' আর 'আমি' তখন একই মনে হতে থাকে। এর অর্থ হল চেতনা ঊর্ধ্বমুখি হয়েছে সামাজিক স্তরে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা চেতনাকে বাড়াই না। আমরা শুধু আমাদের অনুভূতিকেই বাড়িয়ে তুলি, যাতে আমরা নিজেরাই সচেতন হতে পারি। এই চেতনা আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু মাত্রায় রয়েছে। এই চেতনাকে বাড়িয়ে শুধু নিজেকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে যাতে তাঁর খোঁজ পাই আর তাঁকে অনুভব করতে পারি। একবার যদি আমরা এই চেতনার সাথে একাত্ম হতে পারি, তখন এই মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর সাথে একাত্মবোধ অনুভব করতে পারব—এটাই হল সাধনার প্রকৃত অর্থ বা 'যোগ'।

'যোগ' শব্দটির অর্থই হল এক হওয়া'। সাধক মানুষ এই এক হওয়ার বোধটুকুকে অনুভব করার চেষ্টা করে চলেছে নানাভাবে। এই বোধ যখন খুব স্থূল ভাবে প্রকাশ পায়, আমরা তাকে বলি 'যৌনতা' আর যখন আবেগের পথে প্রকাশিত হয়, তাকেই বলি 'প্রেম'। যদি স্রেফ মানসিক প্রকাশ ঘটে, তখন লোভ, উচ্চাশা, বিজয়ের নেশা, কিংবা স্রেফ কেনাকাটার বাসনা—এমনই বলি। কিন্তু এই সংযোগের বোধই যখন চেতনার পথে প্রকাশিত হয়, আমরা তাকে বলি 'যোগ'। অর্থাৎ এমন কিছুকে আমি নিজের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছি, যা আমার নিজস্ব অংশ নয়। এর অর্থই হল, আমার এবং অন্যের মধ্যকার দূরত্ব বা সীমারেখাকে আমি মুছে ফেলতে চাইছি।

'যোগ'-এর অর্থ হল সবাইকে নিয়ে এক হওয়া কিংবা অন্যভাবে বললে, আমার আত্মপরিচয়ের সীমানাগুলোকে মুছে ফেলা। যৌনতাই হোক বা প্রেমের সম্পর্ক, উচ্চাশাই হোক্ কিংবা বিজয়ের নেশা হোক্—আসলে যা আমি করতে চাইছি, তা হল যা আমার নয়, তাকে নিজের অংশ করার চেষ্টা, এজন্যই যোগের প্রয়োজন। কিন্তু এসব নিয়ে কথা বলার বদলে কিংবা পাণ্ডিত্য ফলানোর বদলে, আমাদের উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যাতে আমরা আমাদের আত্মপরিচয়ের এই গণ্ডি থেকে বের হয়ে এসে কোন ভাবে বা কি করে সেই মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায়, যেটা কিনা শরীরী সত্তার ঊর্ধ্বে।

'কালী সাধনা' ঠিক এই কাজটা করে—আমাদের এক অজানা দেশে নিয়ে যায়, যে অবস্থায় যেতে পারলে আমরা শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ থেকেও, এর বাইরের নানা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মাত্রাকেই স্পর্শ করতে শুরু করব। যাতে আমরা জীবন নিয়ে আমাদের অনুভূতিগুলো শুধু শরীরের কাঠামোতেই আটকে না থাকে, বরং জীবনকে বৃহত্তর, অসামান্য ব্যাপার বলে অনুভব করতে পারব। এটাই হল চেতনাকে বৃদ্ধি করা—যার অর্থ হল আমার চারপাশের সমস্ত মানুষজনকে, সকল বস্তুকে আমি নিজের অংশ বলে অনুভব করতে পারব। এই ভাবে অনুভূতির সীমানাকে এতটাই বাড়াতে পারব যে, আমি ঘরে বসেই টের পাব যে গোটা ব্রহ্মাণ্ড আমার একটি অংশমাত্র। এটাই হল যোগ, এই হল চেতনার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি, এটাই হল দর্শন, এটাই হল আত্মজ্ঞান লাভ। এ কোনও দার্শনিক উপায়ে কিংবা কোনও তাত্ত্বিক উপায়ে অনুভব করার বিষয় নয়—বরং প্রাত্যহিক সাধনা কর্মের অভিজ্ঞতা দিয়ে করা এবং এমন এক প্রযুক্তির সাহায্যে, যা সকলের পক্ষেই করা সম্ভব। আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু পুজো করতে হবে না, এমনকী একে মাথায় তুলে বয়ে বেড়াতেও হবে না, শুধুমাত্র প্রাত্যহিক 'কালী সাধনা' কর্মের নিয়ম বজায় রাখলেই কার্যসিদ্ধি হতে বাধ্য।

সাধারণ ভাবে 'কালী সাধনা' বলতে আমরা নিত্যদিন কালীর পূজা, জপ, অভিষেক, পুরশ্চরণ, যজ্ঞ ও কুমারী পূজা বুঝি। একমাত্র হিন্দুই নারীকে মাতৃজ্ঞানে সম্মান করে ও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বহুরূপে ও শতনামে শক্তির আরাধনা হয়। ফলে, সম্মানের বিচারে নারীকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসানো হয়েছে। প্রধানতঃ প্রকাশ্যে অনুর্ধ ষোল বছরের কম বয়সী অপুষ্পা কুমারী কন্যাদের পূজা আমরা দেখে থাকি। শাস্ত্রকাররা নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতেই এই কুমারীপূজার কথা বলেছেন। অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে সন্মান ও শ্রদ্ধার আসনে বসাতে এবং দেবীর কুমারী রূপের আরাধনা করতেই এই পুজোর বিধান দেওয়া হয়েছে। মনের অন্তরের পশুত্বকে সংযত রেখে নারীকে সন্মান জানানোই কুমারী পুজোর প্রধান ও মূল লক্ষ্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য 'শ্রীশ্রী চণ্ডীর' নারায়ণীস্ততিতে পঞ্চদশ শ্লোকে রয়েছে—'কৌমারী রূপ সংস্থানে নারায়ণী নমোহস্তু তে।।' এখানে কুমারী হলেন অপাপবিদ্ধা, নিত্যশুদ্ধা, সৃজনকারিণী ব্রহ্মশক্তি। কুমারী ব্রহ্মরূপিণী স্ত্রীশক্তি, যা হল নিষ্কল, পবিত্র ও অসঙ্গা।

কারও কারও মতে আবার প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা কুমারীপুজোর মাধ্যমে প্রকৃতিকে পুজো করতেন। প্রকৃতি মানে নারী—সেই প্রকৃতিরই আর এক রূপ কুমারীদের মধ্যে দেখতে পেতেন তাঁরা। সমস্ত স্ত্রীলোকই ভগবতীর এক একটি রূপ। আর শুদ্ধাত্মা কুমারীতে সেই ভগবতীর প্রকাশ বেশি।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখি যে ভগবান রামের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা শরৎকালে, দক্ষিণায়ণে দেবতাদের নিদ্রার সময়। দেবতারা মর্ত্যে এসে দেখলেন, এক দুর্গম স্থানে একটি বেলগাছের শাখায় সবুজ পাতার রাশির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে একটি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বালিকা। ব্রহ্মা বুঝলেন—এই বালিকাই জগজ্জননী দুর্গা। তিনি বোধন-স্তবে তাঁকে জাগরিত করলেন। ব্রহ্মার স্তবে জাগরিতা দেবী বালিকামূর্তি ত্যাগ করে কুমারীর বেশে ব্রহ্মাকে বললেন, বিল্ববৃক্ষমূলে দুর্গার বোধন করতে। তার পরে তিনি চণ্ডিকামূর্তি ধারন করলেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তন্ত্রে যে কোন বর্ণ ও জাতির কুমারীকে দেবী জ্ঞানে পূজার কথা বলা হয়েছে। জগৎজননীর অনন্য প্রকাশ এই কুমারীর মধ্যে। মাতৃশক্তি ছাড়া এই জগতে কোন প্রাণের সৃষ্টি কী সম্ভব! তাই প্রণাম করি সেই মহাভয় বিনাশিনীকে, যিনি নিদারুণ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করেন। তিনি পরম করুণাময়ী, যাঁর স্বরূপ ব্রহ্মাদি দেবতারাও জানেন না, যাঁর কোন অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তিনি জন্মরহিতা হলেও জগতের কল্যাণে আত্মপ্রকাশ করেন। সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে তিনিই আছেন। তাই তিনি একম্ ও অদ্বিতীয়ম্। এই ভাবেই আমরা কালীসাধনায় যুক্ত হয়ে পড়ি।

ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় প্রচলিত মাতৃকা দেবীদের পুজোর মধ্যে প্রধান যে কয়টি ধারা রয়েছে তার ভিতর কালীই প্রধানা। 'দেবী-ভাগবতে' বলা হয়েছে —

কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।
পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে।।

অর্থাৎ—ভারতবর্ষের যত নগরে এবং গ্রামে যত দেবী রয়েছেন তাঁরাও বিধিপূর্বক মহাদেবীরূপেই পূজিতা হয়ে থাকেন—কারণ, মূলে তাঁরা আদ্যাদেবী থেকে কিছু পৃথক নন, তাঁরাও সবাই একই মহাদেবীর বিশেষ বিশেষ কলামাত্র।

তাই বাংলা অঞ্চলে মাতৃপূজার যে ইতিহাস তাতে দেখা যায় যে, দুর্গাপুজো পুরানো হলেও কালীপুজো সারা বছরের পুজো ও সমাজের সকল শ্রেনীর পুজো হলেও কালীপুজো সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের পুজো বলে পরিচিত। কারণ শাক্ত দর্শনের মূল ভিত্তি প্রাচীনযুগের সৃষ্ট 'প্রকৃতি-পুরুষ' তত্ত্বকে আশ্রয় করে। তন্ত্রের ভিত্তি ছিল সমাজের নীচের তলার মানুষ নিয়ে কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা তন্ত্রধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে শাক্তধর্ম ও তন্ত্র ব্রাহ্মণ্যবাদের স্পর্শে তার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ফলে সাংখ্য একেবারে বাদ না গিয়ে বেদান্ত-দর্শনকে চাপানোর ফলে সাংখ্যের 'পুরুষ'-এর ধারণাটা বদলে 'ব্রহ্ম' হলো আর 'প্রকৃতি' স্বধর্ম বিচ্যুত হয়ে ব্রহ্মের বিমর্শ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। এখন শিবই সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং কালীকেই প্রকৃতি হিসেবে বলা হয়। এই শিব নিস্ক্রিয়, আদি শক্তি কালীর সাথে যুক্ত হয়ে এই ভূত-জগতে বিরাজমানা। আমাদের দেহে এই শক্তি 'কুণ্ডলিনী' রূপে মূলাধার চক্রে ঘুমিয়ে থাকেন। যোগের অভ্যাসের মাধ্যমে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে মূলাধার থেকে সহস্রারে উন্নীত করাই তান্ত্রিক সাধকের প্রধান সাধনা। শাক্ত সাধকের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় এই শক্তি জাগরিত হলেও আবার নিম্নগামী হয়ে মূলাধারে ফিরে আসে। বারবার অভ্যাসের মাধ্যমে সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে স্থায়ী ভাবে জাগরিত করে সহস্রারে স্থিতি লাভ করাতে পারলেই সাধক সাক্ষাৎ কালীর দর্শন লাভ হয়। এটাই সাধকের সিদ্ধি, দিব্যজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ ও মোক্ষ। এই অবস্থায় সাধকের জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান হয়, তান্ত্রিক সাধক অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাধক ও সাধনা

এবার আমরা সনাতনী শাস্ত্রে সাধকের কয়েকটি পর্যায়ের বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেব। শাস্ত্রে সাধকের কয়েকটি পর্যায়ের সাধনা বর্ণনা করা হয়েছে যাতে করে যে কোনো জীবের ঊর্ধ্বগতি অর্জন করা হয়। প্রথমে সাধনায় আকৃষ্ট জীব, যার আধ্যাত্মিক জীবনে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, তাকে 'মুমুক্ষু' বলা হয়। এই পর্যায়ে একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে নিজের প্রকৃতি এবং তার চারপাশের জগতের প্রকৃতি, এর উৎস, এর লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়ে অনুসন্ধান করে এবং বিভিন্ন ধারণা এবং দর্শন অন্বেষণ করে।

মুমুক্ষু ব্যক্তি আকুল ভাবে একজন ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শকের খোঁজ করেন। ঐ মুমুক্ষু ব্যক্তি তার পূর্বজীবনের অর্জিত কর্মফল অনুযায়ী এক পথপ্রদর্শক খুঁজে পান। এই আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শককে শাস্ত্রে 'গুরু' বলা হয়ে থাকে। গুরুদেব তাকে নিজ সিদ্ধ মন্ত্রে অভিসিঞ্চন করে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আর ঐ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে 'শিষ্য' বলে গণ্য করা হয়। একাধিক অতীত জীবনে অর্জিত পুণ্যের প্রমাণাদির সাথে ঐ ব্যক্তি বা শিষ্য গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র, আত্মবিশ্বাস, ইষ্টভক্তি, পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, লক্ষ্য ইত্যাদি সহযোগে সাধনায় অভিনিবিষ্ট হন।

সকল মুমুক্ষু শিষ্যই প্রাথমিক ভাবে সাধন-ভজন করলেও দীর্ঘদিন কর্ম করতে পারেন না। খুব কম সংখ্যক শিষ্যই সাধনভজনে নিজেকে উজাড় করে ইষ্ট ও গুরুর কাছে তথা নিত্যকর্মে আত্মসমর্পণ করেন। এই শিষ্যই 'সাধক' পদবাচ্য। সাধারণভাবে তান্ত্রিক জগতে একবার গুরুদীক্ষা হয়ে গেলে বা গুরু প্রদত্ত একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দীক্ষিত হলে, শিষ্য গুরুর সজাগ দৃষ্টিতে সমস্ত বিধি-বিধান এবং নির্দেশিকাগুলি নিবিড়ভাবে অনুশীলন করে থাকেন। সাধনায় যে সমস্ত বাধা ও প্রতিবন্ধকতার শিষ্য মুখোমুখি হন তা উপস্থাপন করে তিনি ধীরে ধীরে এবং অবিচলিত ভাবে নিজ লক্ষ্য অনুযায়ী অগ্রসর হন।

সাধক ব্যক্তি যখন গুরু ও ইষ্টশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে তখন সে এই প্রকৃতির সাথে যে নিজের যোগ আছে তা তার অনুভুত হয়। ক্রমাগত নিত্য অভ্যাসের মাধ্যমে সাধক ব্যক্তির মানসিক অবস্থা উন্নত হয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার জাগতিক চেতনা উচ্চতর শক্তির সাথে একীভূত হয়ে পড়ে। তখন সাধক তার অন্তর্জগতে আলোড়ন অনুভব করে। এই অবস্থায় সাধকের কঠোর অনুশীলন ও অভ্যাস তাকে পরমাত্মার বা পরমব্রহ্মের সাথে যোগ ঘটাতে প্রস্তুত হয়। এখন সে 'যোগী'। সে তার কুণ্ডলিনী বা ক্ষুদ্র আকারের পরাশক্তিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করে ও অনুশীলনের মাধ্যমে অবশেষে গুরুকৃপার মাধ্যমে ষটচক্র ভেদ করে সহস্রারে উপনীত হয়। আজ্ঞা চক্রে অবস্থানরত গুরু-তত্ত্বের কৃপায় এটি ঘটে থাকে।

আজ্ঞা চক্রে অবস্থানরত গুরু-তত্ত্বের কৃপায় এই পর্যায়ে সাধক পরম চেতন মনের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দিকে আরোহণ করেন এবং সর্বজনীন মনঃ তত্ত্বে বাস করেন। সাধক এখন মনস্বী। মানসিক শক্তির সাহায্যে এই পর্যায়ে তিনি বাইরের কোনও ক্রিয়া বা প্রয়োগের সাহায্য ছাড়াই তিনি একা তাঁর সংকল্প শক্তি দিয়ে যে কোনও ক্ষেত্রে যে কোনও কিছু অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এই পর্যায়ে সাধক মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই পার্থিব সমস্ত সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হন। তখন তিনি ঋষি পর্যায়ে পৌঁছে যান। এই পর্যায়ে তিনি মহাবিশ্বে উদ্ভাসিত সমস্ত কিছুর আদিম সর্বজনীন উৎসের কাছে পৌঁছে যান এবং জ্ঞানের বিশুদ্ধতম রূপ লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি লোকোপকারের অভিপ্রায়ে এই ধরনের অর্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানকে অন্যদের কাছে প্রয়োজন মত দান ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। এই ধরনের ঋষি দুই প্রকার—মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি এবং মন্ত্র শ্রেষ্ঠ ঋষি। ঋষি তাঁরাই, যাঁরা মূল উৎস থেকে শাশ্বত মন্ত্রগুলি গ্রহণ করেন এবং ঋষি তাঁরাই যাঁরা বিদ্যমান নীতির উপর ভিত্তি করে নতুন মন্ত্র তৈরি করতে পারেন। এখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত ঋষি বা ব্রহ্মর্ষি হওয়ার যোগ্য।

যে সাধক পরমাত্মার স্তরে প্রবেশ করেছেন তিনিই ব্রহ্মর্ষি পদের যোগ্য। এখন তিনি পার্থিব মায়ার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছেন এবং দেবতাদের মর্যাদা অতিক্রম করেছেন কিন্তু তবুও তাঁর মধ্যে স্বতন্ত্র চেতনার সামান্য উপস্থিতি রয়েছে। এখন শ্বাসগতির উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, কুম্ভকে পারদর্শী।

পরবর্তী পর্যায় হল 'হংস'। হংস শব্দটি নিজেই শুদ্ধ শব্দকে বোঝায়। এখানে সাধক তার মধ্যে পূর্ণ পরম চেতনার প্রকাশ করেছেন। সকল মায়া এমন ব্যক্তির থেকে দূরে থাকে। তিনি শুধুমাত্র পরমাত্মা দ্বারা পরিচালিত শুদ্ধ কর্মে বাস করেন, তা ও কোনো স্বার্থ ছাড়াই। এই পর্যায়ে তিনি সর্বদা একাকী পবিত্রতায় বাস করবেন। এই স্তরে কর্মের কোন বন্ধন থাকবে না। সাধক এখন 'হংস' পদ বাচ্য।

এখন পরমাত্মার অসীম পরম চেতনার দৃশ্যমান প্রকাশ হলেন সাধক। এই পর্যায়ে সাধক ব্যক্তি একটি নিষ্পাপ শিশুর মতো বাহ্যিক গুণাবলী প্রদর্শন করেন। তাঁরা ত্রি-করণের সাথে যে কাজই করুক না কেন তা তাদের কোনও স্তরের কর্মের সাথে আবদ্ধ করবে না। হংস এবং পরমহংস উভয়ই জীবন্মুক্ত পর্যায়। তাদের দেহ পড়ে যাওয়ার পরে তারা ব্যক্তি হিসাবে অস্তিত্ব বন্ধ করে দেন। তাঁরা পরম চেতনায় মিশে যান এবং কখনও সংসারে ফিরে আসেন না।

এই সমস্ত পর্যায় কেবলমাত্র গুরু এবং পরমাত্মার কৃপাতেই সাধিত হয়। প্রতিটি পর্যায়ের উত্তরণ ও পরবর্তী দীক্ষা কঠোর সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মায়া প্রতিটি পর্যায়ে সাধককে এগিয়ে যেতে বাধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করে কিন্তু প্রকৃত সাধক হলেন তিনিই, যিনি তার নিরলস সাধনা এবং গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র, নিজের ও ভগবান শিবের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সাধন প্রক্রিয়া বজায় রাখেন এবং সমস্ত বাধা নিজের মনঃ শক্তির বলে অতিক্রম করেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এতটুকু আলোচনা করতে গিয়ে বুঝলাম যে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই 'সাধক' হয়ে 'পরমহংস' বা 'অবধূত' হতে পারেন না। সমস্তটুকু নির্ভর করে ঐ মুমুক্ষু ব্যক্তির পূর্বজীবনের কর্মফল বা সংস্কারের উপর—সে গুরু নির্বাচনই হোক্ বা সিদ্ধিলাভই হোক্ কিম্বা অবধূত পদবাচ্যই হন না কেন। তবে এক্ষেত্রে 'ভগবানের কৃপালাভ' একটি বিশিষ্ট বিষয়।

বেদ শাস্ত্রের ষড়ঙ্গের একটি হল জ্যোতিষ। জ্যোতিষশাস্ত্রে 'চন্দ্র' একটি বিশিষ্ট গ্রহ (উপগ্রহ)। তন্ত্র শাস্ত্রে সাধনার সাথে চন্দ্র বা চাঁদের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে কারণ এর উৎপত্তি হয় পরমপুরুষের বা পরমাত্মার মন থেকে। যজ্ঞাদি আচার, দেবী-দেবতার উপাসনা বা যোগসাধনার সাথে চাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কেন না চন্দ্র আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ বা নির্দেশ করে। সাধকের জীবনে পূর্ণ ফল লাভের জন্য মনকে যে কোনো সাধনায় সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত রাখা জরুরী।

পুরুষসূক্তে আছে—

চান্দ্রমা মানসো জাতাঃ।
চক্ষোঃ সূর্য্য অজায়তা।
মুখাদীন্দ্রাস্কাগ্নিস্কা।
প্রানাদ্বয়ুরজায়তা।

তারপর অথর্ববেদে আছে—

যাত্রা ব্রহ্মবিদো যন্তি দিক্ষ্যা তপসা সাহা
চন্দ্রো মা তত্র নয়তু মনস্কন্দ্রো দধাতু মে চন্দ্রায় স্বাহা।
সোমো মা তত্র নয়তু পায়ঃ
সোমো দধাতু মে সোমায়া স্বাহা।।

এই দুটি মন্ত্রে চন্দ্রকে মন ও জলের কারক বলা হয়েছে। এটি একটি বিশেষ সত্য যে চাঁদ এবং জলকে এমনভাবে দেখে মন প্রসন্ন হয়। মনের তৎপরতায় নদীর জলের মত জোয়ার হৃদয়েও উঠতে থাকে। তন্মাত্র বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের অন্তর্ভুক্ত আবার ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল প্রকৃতির। চাঁদও চঞ্চল। মনসহ পাঁচটি তন্মাত্র আছে... 'হৃদয়ে চিত্তসংবিত'। মনসহ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করে, পণ্ডিত ধ্যানের নৌকায় ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা সংসারের বিপজ্জনক স্রোত অতিক্রম করেন। আহ্লাদ (আনন্দ) হলেন ঈশ্বর—'আনন্দম ব্রহ্ম'-এর সমর্থক। তাই শুধুমাত্র জন্মছকে চাঁদের অবস্থান দেখার পরে, একজনকে একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্পন্ন করার চেষ্টা করা উচিত। রাশিচক্রে চন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে সাধনার পথে চলা উচিত বলে গুরুজনেরা বলেন কেন না চন্দ্রের দ্বারা ব্যক্তির মন প্রভাবিত হয়।

অতএব, যে ব্যক্তির চন্দ্র তার রাশিচক্রে স্থির রাশিতে থাকে যেমন—বৃষ, সিংহ,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বৃশ্চিক এবং কুম্ভ রাশির পাশাপাশি এটি একটি স্থির ঘরে যেমন দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম বা একাদশ, এই জাতীয় ব্যক্তি ধ্যানের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত, অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ সফলতা পাবেন। চন্দ্র যদি রাশিচক্রে স্থির রাশিতে বা বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ রাশিতে থাকে কিন্তু দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম বা একাদশ ঘরে না থাকে, তবুও দীর্ঘমেয়াদী নিয়মিত সাধনা করলেও দেরী হলেও সাধক ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সফল হবেন। একইভাবে, যদি চন্দ্র স্থির ভাব অর্থাৎ দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম বা একাদশ ঘরে কিন্তু চন্দ্র রাশি বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ নয়, তাহলেও সাধনা সফল হবে। তবে জাতককে দীর্ঘ সময় ধরে মানসিকভাবে সংগ্রাম করতে হবে নিজেকে নিয়মানুবর্তিতায় পরিণত করতে। যদি চন্দ্র শনি দ্বারা প্রভাবিত হয় বা শনির সাথে মিলিত হয় এবং উচ্চস্থ ও সবল হয় তবে একজন ভাল যৌগিক অনুশীলনকারীও হতে পারেন। চন্দ্র যদি মেষ, কর্কট, তুলা বা মকর রাশির মতো চারটি রাশিতে থাকে তাহলে মানুষের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই ধরনের মন যোগ অনুশীলনের জন্য অনুপযুক্ত। জাতক প্রতি মুহূর্তে চিন্তা পরিবর্তন করে। রাশিচক্রের সাথে সাথে, যদি প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম ঘরে চাঁদ থাকে তবে মনও খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে যা যোগ সাধন বা ধ্যান সাধনার জন্য ভাল নয়। কিন্তু এই ধরনের সাধক তান্ত্রিক সাধনার জন্য ভাল যা দ্রুত ফল দেয়, তীব্র মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয় এবং নিয়মিত কঠোর শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয় না। চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ ঘরে চন্দ্রযুক্ত ব্যক্তিরা, তামসিক রাশিতে বসে বা তামসিক গ্রহ দ্বারা প্রভাবিত তারা তন্ত্রসাধনা, বামাচার, অঘোরাচার এবং কৌলাচারে সাফল্য লাভ করতে পারেন।

যদি চন্দ্র দ্বৈত রাশিতে থাকে (৩, ৬, ৯, ১২) তাহলে এই ধরনের ব্যক্তির মন দ্বান্দ্বিক। এই ধরনের মনোভাবের ব্যক্তি অত্যন্ত বস্তুবাদী বা জাগতিক, তার মন বাণিজ্যিক এবল তারা কৌশলী হন। এই ধরনের ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সমস্যার সাথে লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। চন্দ্র পুরুষ রাশিতে রাখলে (১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১) পুরুষ দেবতা পূজার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যাদের চাঁদ নারী রাশিতে থাকে (২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২) দেবীর উপাসনা করে। আজকাল রাহুর প্রভাবে অনেকেই বাণিজ্যিক গুরুদেবদের বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার ফলে তারা ভুল উপাসনা শুরু করে যা তাদের ভবিষ্যতে সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

কোন গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করার আগে একজন সাধকের খুব সতর্ক হওয়া উচিত, রাশিচক্রে চন্দ্রের বলাবল ও অবস্থান দেখে নেওয়া জরুরী। সাধনায় সিদ্ধিলাভের ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করে চন্দ্রের অবস্থান, চন্দ্রের নাড়ী অংশ, চন্দ্রের নক্ষত্র ইত্যাদির উপরে। এছাড়া জ্যোতিষে সাধনা বিষয়ে আরও অনেক বিচার আছে তবে ৫ম, ৮ম, ৯ম ভাব, কেতু ও শনির অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

চন্দ্রগ্রহণের দিন সাধনার একটি প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ে মন্ত্র-সাধনার ইতিবাচক প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যদি এটি সঠিক পদ্ধতিতে করা হয়। গ্রহনকালে একটি মন্ত্র

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জপ যে কোনো সাধারণ দিনের তুলনায় লক্ষ জপের সমান। পবিত্র অগ্নিতে একটি একক আহুতি অন্য যে কোনো দিনে করা একই আহুতির হাজারগুনের সমতুল্য। এই কারণেই মন্ত্র এবং তন্ত্র সাধনার বিভিন্ন গ্রন্থে এই দিনের বিশেষ গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক তান্ত্রিক এই দিনের গুরুত্ব বোঝেন এবং তাদের সাধনায় সাফল্য পেতে এই দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।

মূর্খ ব্যক্তিরাই গ্রহনকে অশুভ বলে মনে করেন। আমাদের সমাজ আমাদের বিবেচনা করেছে যে গ্রহন অকেজো এবং এই সময়কাল এড়ানো উচিত এবং এই সময়ে কিছু করা উচিত নয়। শুধুমাত্র এই কারণে, মানুষ এই সময়ে কোন কাজ করতে ভয় পায়। যাইহোক, এটি শুধুমাত্র একটি পৌরাণিক কাহিনী এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জীবনের উন্নতির জন্য গ্রহণের সময়কালের সম্পূর্ণ সুবিধা নিতে হবে।

চাঁদ তার সৌন্দর্য এবং প্রশান্ত প্রকৃতির জন্য বিখ্যাত। চাঁদকে সমস্ত জড়বাদী এবং সাংসারিক ও জাগতিক আনন্দ প্রদানকারী বলে মনে করা হয়। এইভাবে, এই সময়কালে সাধনা করা একজনকে সমস্ত বস্তুবাদী আনন্দ লাভের পাশাপাশি জীবনে সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য লাভ করতে সাহায্য করে। চন্দ্রগ্রহণের সময় সাধনা করলে সকল বিপদ, অসুবিধা, দৈন্যতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ইতিবাচক রশ্মিতে পূর্ণ গ্রহণকালে যে কোনো সাধক ধনাত্মক রশ্মিগুলির প্রভাবে সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। এই সময়ে পবিত্র যজ্ঞ করা যেতে পারে। অন্যদিকে, একজন সাধারণ মানুষ কিছুই না করে এই সময় নষ্ট করে। এটিই স্বাভাবিক মানুষের জীবনে অসুখী ও উত্তেজনার কারণ কারণ প্রথমত তারা এই ধরনের শুভ সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং যারা এটি সম্পর্কে জানে, তারা এটিকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করে না।

যেহেতু চন্দ্র মন, অনুভূতি, কল্পনাশক্তি, খ্যাতি, সঙ্গীত, অর্থ, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য, মাধুর্য, তীক্ষ্ণ মন, চরিত্র আনন্দ, সৌন্দর্যের সাথে সম্পর্কিত তাই গৃহস্থালীর সুখশান্তি সম্পর্কিত সাধনা, অনঙ্গ সাধনা, বিবাহ সম্পর্কিত সাধনা, সৌন্দর্য সম্পর্কিত সাধনা, উর্বশী সাধনা, মানসিক শান্তির জন্য সাধনা, প্রজনন অঙ্গ সম্পর্কিত সাধনা ইত্যাদি করতে পারেন এবং কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও, কেউ এই সময়টিকে চাকরি, পৈতৃক সম্পত্তি, ভ্রমণে সাফল্য, পদোন্নতি পেতেও করতে পারেন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে ইচ্ছাটি বাস্তবসম্মত হতে হবে। কেউ যদি মঙ্গলে নিজের বাড়ি করতে চায়, তবে এই ইচ্ছাটি একটি অবান্তর ইচ্ছা। ইচ্ছাটি এমন হওয়া উচিত যা অন্যের ক্ষতি না করে আপনার উপকার করবে। এই ইচ্ছাটি এমন হওয়া উচিত যার জন্য আপনি মরিয়া।

আমার তন্ত্রজীবনে এক গুরুদেব থেকে পাওয়া দুটি ছোট অথচ অত্যন্ত কার্যকরী সাধনা দেওয়া হল যা চন্দ্রগ্রহণের সময় করা হলে একজন সাধকের জীবনে একটি বড় বিপ্লব আনতে পারে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যদিও এই সাধনা যেকোন দিনে করা যেতে পারে, তবে চন্দ্রগ্রহণের সময় সাধনা করলে এর সেরা ফল দেখা যায়। নিম্নলিখিত ইচ্ছা পূরণের জন্য কেউ এই সাধনা করতে পারেন—সুখী ও শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের জন্য, নিজস্ব বাড়ি ও যানবাহনের জন্য, সব শত্রুকে দূর করতে, জীবনে নাম ও খ্যাতি অর্জন করতে, সব ধরনের রোগ থেকে মুক্তি পেতে, সম্পদের প্রাচুর্য, ব্যবসায় বা কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য, পুরুষ সন্তান প্রাপ্তির আশায়, চৌম্বক ব্যক্তিত্বের জন্য ইত্যাদি জাগতিক সুবিধার জন্য।

সম্ভবত এমন কোনও ব্যক্তি থাকবে না যে জীবনে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে পছন্দ করবেন না। এমনকি সবচেয়ে ধনী, সুখী ও সফল ব্যক্তিদের জীবনেও ঘাটতি থাকে এবং এটিই তখন কামনায় পরিণত হয়। তাই এই সাধনা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একটি আশীর্বাদস্বরূপ। এই সাধনার সাহায্যে একাধিক ইচ্ছা পূরণ করা যায়।

এখানে উল্লিখিত সাধনাটি একটি তন্ত্রোক্ত সাধনা এবং অত্যন্ত কার্যকরী। এই সাধনা করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করতে হবে—এই সাধনার জন্য নির্ধারিত মন্ত্র জপের কোন ন্যূনতম গণনা নেই। গ্রহনের সময় যত বেশি জপ করা যায়, ততই ভালো, গ্রহনকালে কিছু খাবেন না বা পান করবেন না, এই সাধনা করার সময় পশ্চিম দিকে মুখ করে বসতে হবে, এই সাধনার জন্য সবার প্রয়োজন সর্ব মনোস্কামনা পূর্তি যন্ত্র।

সাধনা পদ্ধতি বলতে, গ্রহনকালের ঠিক আগে স্নান করুন এবং পরিস্কার সাদা কাপড় পরে নিন। পশ্চিম দিকে মুখ করে একটি সাদা আসনের উপর বসুন, একটি আম কাঠের তক্তা নিন এবং এটি একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। এর উপর গুরুদেবের ছবি রাখুন এবং সিঁদুর, ধানের শীষ, ফুল ইত্যাদি দিয়ে তাঁর পূজা করুন। একটি ধূপকাঠি এবং একটি ঘি প্রদীপ জ্বালান। গুরু মন্ত্রের এক মালা জপ করুন এবং সাধনায় সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন।

এখন গুরুদেবের ছবির সামনে যন্ত্রটি রাখুন এবং জল, ধানের শীষ, সিঁদুর, ফুল ইত্যাদি দিয়ে যন্ত্রটিকেও পুজো করুন। যন্ত্রের সামনে আপনার ইচ্ছাপুরণের বক্তব্য একে একে নিবেদন করুন এবং লাল বা হলুদ ফুল দিয়ে আপনার প্রতিটি ইচ্ছার কথা বলুন ও একেকটি পৃথক ফুল প্রয়োজন। এখন সাধনায় সাফল্য লাভের জন্য এবং আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য যন্ত্রের কাছে প্রার্থনা করুন। এরপর নিচের মন্ত্রটি জপ করুন এবং গ্রহণের সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত জপ চালিয়ে যান।

মন্ত্র—ওঁম্ ঐং শ্রীং হ্রীং শ্রীং ঐং ওঁম্।

একই দিনে বা পরের দিন সাধনায় ব্যবহৃত বস্তুগুলি নদী বা পুকুরে ফেলে দিন। যদিও এই সাধনা সর্বদাই শুভ ও নিশ্চিত ফল দেয়, তবে গ্রহনকালে যখন করা হয়, এই সাধনা সাধকের জীবনে এক অলৌকিক ফল নিয়ে আসে।

দ্বিতীয় সাধনাটি আরও আকর্ষক। সম্মোহন ও বশীকরণ সাধনা প্রয়োগে চন্দ্রগ্রহণের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সময় কাজে লাগানো যেতে পারে। এই সাধনা অন্যকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে নিজের সম্মোহনী শক্তিকে উজ্জীবিত করা হয়। এই সাধনা করার পর একজন ব্যক্তি একটি চৌম্বক ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ হন। একটি সম্মোহনী শক্তি সাধকের চারপাশে তৈরী হয়ে যায় যা সকলকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। কোনও ব্যক্তি এই মন্ত্রের সাধক ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিলে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে শত্রুরাও তখন সাধকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সকলেই এমন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল থাকেন। শুধু তাই নয়, এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে যে কেউ সাধকের বাক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হন নিশ্চিতভাবে। মানুষ এমন ব্যক্তির আদেশ পালন করতে ভালোবাসে। এমন ব্যক্তির পারিবারিক জীবন সত্যিই জীবনসঙ্গী হিসাবে একটি আশীর্বাদ এবং সেই সাথে সন্তান এমন ব্যক্তির সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে এবং এমন একজন সাধকের সংসারে মতবিরোধ থাকতে পারে না। এমন সাধক ব্যক্তির জীবনে বন্ধুর প্রাচুর্য আসে। প্রত্যেকেই এই ধরনের ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আগ্রহী থাকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য সুযোগ চায়। এই সাধনা পদ্ধতিটি সাধক ব্যক্তির চন্দ্রগ্রহণের সময়ই করা আবশ্যক।

সাধনা পদ্ধতিটি খুবই সহজ। সাধনার জন্য প্রয়োজন হবে সম্মোহন যন্ত্র, বশীকরণ যন্ত্র এবং সম্মোহন জপমালা। গ্রহনকালের ঠিক আগে স্নান করুন এবং পরিস্কার সাদা কাপড় ও উত্তরীয় পরে নিন। পশ্চিম দিকে মুখ করে একটি সাদা আসনের উপর বসুন, একটি আম কাঠের তক্তা নিন এবং এটি একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। এখানে গুরুদেবের ছবি রাখুন এবং সাদা চন্দন, ধানের শীষ, সাদা ফুল ইত্যাদি দিয়ে তাঁর পূজা করুন। ধূপকাঠি এবং একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। গুরু মন্ত্রের এক মালা জপ করুন এবং সাধনায় সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন।

এখন একটি তামার থালা নিন এবং গুরুদেবের ছবির সামনে রাখুন। এই থালায় উভয় যন্ত্র রাখুন এবং জল, ধানের শীষ, সাদা চন্দন, ফুল ইত্যাদি দিয়ে যন্ত্রদুটির পূজা করুন। এখন সাধনায় সাফল্য লাভের জন্য এবং আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য যন্ত্রের কাছে প্রার্থনা করুন। এরপর স্ফটিকের জপমালা নিয়ে নিচের মন্ত্রটির ১১ মালা জপ করুন।

মন্ত্র—ওঁম্ সুদর্শনায় বিদ্মহে মহাজ্বালয় ধীমাহি তন্নশ্চক্রঃ প্রচোদয়াৎ।

সাধনায় ব্যবহৃত সমস্ত বস্তু রাতে নদী বা পুকুরে ফেলে দিন। ঘরে ফিরে স্নান করে নিন। এই সাধনা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পরের দিন থেকেই নিজের মধ্যে একটি বিশেষ রূপান্তর লক্ষ্য করতে শুরু করবেন। আপনি জীবনে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে শুরু করবেন। আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি জীবনে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন এবং আপনার জীবন সকলের কাছে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। আপনি একজন কালীসাধক হিসাবে নিজেকে আরও বেশি মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে দেখবেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাধক, সাধনা ও বর্তমান সমাজ

হিন্দু শাস্ত্র গুরুপরম্পরাগতভাবে 'কালী সাধনা' বিজ্ঞানকে গভীরভাবে সুবিন্যস্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে ছয়টি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথমেই দীক্ষা ও নাম মন্ত্র সাধনা, দ্বিতীয়তঃ প্রারম্ভিক যোগশিক্ষা ও পূজা-পাঠ, তৃতীয়তঃ পূজা, জপ, পুরশ্চরণ ও যজ্ঞ, চতুর্থতঃ পূজা, জপ-যজ্ঞ, প্রয়োগ ও সাধারণ ভ্রমণ, পঞ্চমতঃ তীর্থ ভ্রমণ, জপ, যজ্ঞ ও প্রয়োগ, পঞ্চমতঃ নির্দিষ্ট তীর্থে জপ-যজ্ঞ সাধনা ও প্রয়োগ, ষষ্ঠতঃ শ্মশান বাস ও জপ-যজ্ঞ ও সাধনা, সপ্তমতঃ মনে হলে দীক্ষা দানের মধ্যমে পরম্পরা রক্ষা করা। নিরক্ষর মানুষ থেকে উচ্চ শিক্ষিত প্রতিটি ব্যক্তির তন্ত্রানুসন্ধানের প্রয়োজন মিটাতে সাধনার এই স্তর বিন্যাস মনে হয় বেশ উপযোগী। সাধনা জগতে চরিতার্থতা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ নিত্য কর্ম, জ্ঞান আহরন ও যোগ অভ্যাসের সাথে সাথে এই পরম্পরার দীক্ষিত ব্যক্তিরা তন্ত্র-বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বাস, সেবা ও ভক্তি ভাব জাগিয়ে তুলবার প্রয়াসকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এর ফলে সাধকের কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তির মণিকাঞ্চনযোগ ঘটে ও আত্মিক মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হয়। জ্ঞান, কর্ম, অভ্যাস যোগের দ্বারা বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হবে আর হৃদয়ে জেগে উঠবে পরাভক্তি।

একজন তন্ত্র সাধকের জীবনদর্শন ও সাধনার মূল কথা হ'ল—এই বিশ্বচরাচরে সবকিছুই গতিময়। জড়, দেহ, মন সব কিছুই অনন্ত চৈতন্য সত্তার আপেক্ষিক প্রকাশ মাত্র। সব কিছুই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত এই বিশ্বচরাচরে 'আত্মবিকাশই সাধনার মূল কথা'। সাধনা হল—কর্ম, জ্ঞান, অভ্যাস যোগ ও ভক্তির সমন্বয়। সাধককে তাই শাস্ত্রীয় নীতিবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানবিক আচরণ বিধি মেনে চলতে হবে। সাধককে ধর্মভীরু নয়, ধর্মবীর হতে হবে। বহির্মুখী আচার-অনুষ্ঠানের সাথে অব্যই অন্তর্মুখী মানস-আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হবে। মূর্তিপূজা, শিখা, সূত্র, বাহ্যিক যাগ-যজ্ঞ, প্রার্থনার সাথে সাথে জাতপাত ভেদ, স্বর্গ-নরকের ভয়, গুরুদেবদের ধর্মের নামে ব্যবসা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি যে শোষণের হাতিয়ার ও স্বভাবতঃই মানবধর্মের বিরোধী সেকথা মনে রেখে চলতে হবে। প্রেয় নয়, শ্রেয়-র সাধনা করতে হবে। জীবনের সর্বস্তরে মুক্তির আকাঙ্খাই মানুষের চলার পথে মূল প্রেরণা এবং একমাত্র আত্মোপলব্ধি করাই সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সমাজ অস্তিত্বের মূল ভিত্তি'—এই কথা মনে রেখে বিশ্লেষণের পথে নয়, সংশ্লেষণের পথে চলতে হবে। 'প্রতিটি জীবের মধ্যেই আত্মারূপে পরমাত্মা বিরাজ করেন, আমরা সবাই এবং এই বিশ্বের সবকিছু একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র'—একথা মনে রেখে সাধনায় অগ্রসর হতে হবে।

কিন্তু বর্তমান কালে লক্ষ্য করছি যে, 'তন্ত্র-মন্ত্রের একটি অন্ধকার জগৎ' তৈরী হয়েছে। এটা ঠিক যে যখনই কোনো বিদ্যা ও জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে মানুষ তাকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পেশা হিসাবে নিয়েছে ও খোলা মনে স্বাগত জানিয়েছে। এটি তন্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। একদিকে যখন অধিকাংশ মানুষ বিদ্যাকে সেবার মানসিকতায় নিয়েছে তেমনই অন্যদিকে কিছু মানুষ এটিকে শোষণের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার করেছে ও করছে।

আমাদের ভারতবর্ষের মতো ঐশ্বরিক পরিবেশের ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ দেশে—ঋষি-মুনি, সাধু, তান্ত্রিক, অঘোরী এবং গুরুকুলের পরিবেশে দীর্ঘ ও গৌরবময় ঐতিহ্যই রয়েছে, যারা তন্ত্র-মন্ত্রের শক্তির মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছেন, যদিও কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী ও দাম্ভিক সাধকের অপ্রীতিকর লজ্জাজনক ঘটনা ব্যতীত বাকি সকলের লক্ষ্যই কেবল জনকল্যাণ। এই শতাব্দীতে এমন অলৌকিক সাধকদেরও খুঁজে পাওয়া গেছে, যারা তাঁদের অনন্য অলৌকিকতা এবং জনকল্যাণমূলক ঐতিহ্যের কারণে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। বারাণসীর অবধূত বাবা কীনারাম, বাবা অবধূতরাম, দেওরাহা বাবা, মা আনন্দময়ী, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, কালীকম্বলী বাবা, তৈলঙ্গস্বামী, বাবা বামদেব, খাঁকিবাবা ইত্যাদি ও অগণিত অজানা গুরুজন এইসব ঐশ্বরিক কৃতিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। বরঞ্চ আজকের বেশকিছু তান্ত্রিক ও জ্যোতিষীগণ জ্যোতিষশাস্ত্র এবং তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা অর্জিত শক্তিকে বস্তুবাদী আনন্দের জন্য ধ্বংস করে বেড়াচ্ছে। এমন মানুষের কর্ম ও আচারে ভারতের পবিত্র ঐতিহ্য তন্ত্র-মন্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের নিন্দায় বর্তমান সমাজ ক্রমাগত অপবিত্র হয়ে চলেছে এবং সাধারণ পীড়িত জনগণ এই শাস্ত্র বিষয়ে ভুল ধারণা পোষন করছেন। মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজে এমন তন্ত্র-মন্ত্র সাধনা ও তান্ত্রিকদের দ্বারা প্রচুর সুপরিকল্পিত প্রতারণামূলক ঘটনা চোখে পড়ে।

এ' তো গেল তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপার, জ্যোতিষশাস্ত্রেরও একটা অদ্ভুত অবস্থা। বিজ্ঞান যেখানে উন্নতির নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে কিছু ভুল জিনিসের জন্ম দিয়েছে আধুনিক জ্যোতিষীরা। জ্যোতিষীর নির্দেশনা অনুসারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ভাগ্যবান সন্তান লাভ করা বর্তমানকালে একটি লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। শুভ সময় বিচার করে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রচলন দিনে দিনে বাড়ছে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে জন্মের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোতিষীরা জন্মের সময় গণনার মাধ্যমে সন্তানের সমগ্র জীবনের জন্য একটি ভবিষ্যত রাশিফল তৈরি করেন। আমার প্রশ্ন হল, একই সময়ে জন্ম নেওয়া শত শত শিশুর কি একই পরিণতি হবে? জ্যোতিষশাস্ত্র প্রদত্ত শুভ সময়েও সব জ্যোতিষী একই মত পোষণ করেন না। তাই মা ও শিশুর জন্য এমন চিন্তা বিপজ্জনক—এতে মা, সন্তান বা উভয়ের জীবন বিপন্ন হতে পারে। এই সমস্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, একটি শুভ সময়ে ডেলিভারি সম্পন্ন করার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। আবার ডাক্তারও আগে থেকে সন্তানের জন্মের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারে না, কারণ সার্জারি করার সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সময় কম বা বেশি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে শুভ সময়ের কোনো গুরুত্ব নেই।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকায় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তারা নিজেদের বিশ্ববিখ্যাত বলে বর্ণনা করে তিনি বিলাসবহুল হোটেলে থেকে বিজ্ঞাপন করেন—আপনার ভবিষ্যত প্রেমের ভাগ্য, চাকরী পাওয়া, ভাড়াটিয়া নিয়ে বিবাদ, পারিবারিক অশান্তি, জমি-বাড়ি বিক্রি না হওয়া, মামলায় বিজয়, সন্তান লাভ, বিবাহের সমস্ত বাধা ও দুরারোগ্য ব্যধি দুর করে দেবেন। এখন আপনিই বলুন—ঐ জ্যোতিষী কি তান্ত্রিক, ডাক্তার না কি উকিল? অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ 'মোবাইল ও হোটেল জ্যোতিষী'-দের কাছে সাধারণ মানুষ এসে প্রতারিত হন।

কিন্তু এর পিছনের কারণ কী? আমার মনে হয়, আসলে এর পিছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। 'সব কিছু সহজে পাওয়া যায়'—এমন চিন্তা করা মানুষের স্বভাব ছিল, আছে এবং থাকবে। আজকের মানুষ পরিশ্রম না করে ধনী হতে চায়, সুখী হতে চায়। রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে কিছু পাওয়ার পরিবর্তে ঘরে বসে সে এই কামনা করে। তাই কিছু দুস্কৃতি 'জ্যোতিষী সেজে' এই মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে দিনরাত চতুর্গুণ ব্যবসা করছে। শৈশবে ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদার মুখে সত্যিকারের অলৌকিক কাহিনী শুনে এবং সময়ে সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা পড়ে ও শুনে সাধারণ মানুষের মনে এই অটুট বিশ্বাস গেঁথে গেছে যে, তন্ত্রের মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব। প্রচার এবং লোভের জগত থেকে দূরে, কিছু সিদ্ধ তান্ত্রিকের অনন্য কাণ্ডও তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। ফলে তন্ত্রকে অলৌকিক শক্তি এবং তান্ত্রিককে অলৌকিক ব্যক্তি মনে করে তাদের সেবায় অনেক সাধারণ মানুষ তার সঙ্গ করেন ও উপস্থিত থাকেন। অল্প কিছু তান্ত্রিক পূজা-পাঠ, চতুরালি তান্ত্রিক পরিভাষা, মানুষের মাথার খুলি এবং কিছু অদ্ভুত আকৃতির হাড় নিয়ে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভিড় জমিয়ে ফেলেন 'জাল তান্ত্রিক', আর তাদের মায়ায় পড়ে প্রতারিত হন নিরীহ ভক্তরা।

অনেকেই বলেন যে, কিছু তান্ত্রিক, বাবা, দাম্ভিক জ্যোতিষীরা না কি মাত্র ক্লাস ফোর পাস। তন্ত্র যেখানে এক বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সেখানে সাধক ও তান্ত্রিক কোনো সাধনা, পূজা বা সিদ্ধি ছাড়াই তার কাজ শুরু করে। তার একটু পড়াশুনাই যথেষ্ট তারপর সে তার বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দেয় গণমাধ্যমে। আঙ্গুলে অদ্ভুত বড় আংটি, গলায় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, পুঁতির মালা, কপালে ত্রিপুন্ড, অদ্ভুত চুল-দাড়ি-জটা আর অনন্য পোশাক, অদ্ভুত কিছু হাড়—বানর বা মানুষের মাথার খুলি, ত্রিশূল-চিমটা নিয়ে এক রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর জগৎ গড়ে নিয়ে তাদের প্রতারণার ব্যবসা চালাতে থাকেন। এই কারণেই তিনি কোনও সহকারী রাখেন তার লেখার কাজের জন্য। কিছু জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক টাকা দিয়ে তাদের মিথ্যা গল্প পত্র-পত্রিকায় ছাপায়, কেউ কেউ তাদের নিজস্ব বই ছাপান এবং তাদের শিষ্যদের তা কিনতে বাধ্য করেন। একটু ভাবুন, কার কল্যাণে তিনি এসব করছেন—সাধারণ মানুষের, ভক্তের, শিষ্যের, সমাজের না কি নিজের?

ভুয়ো তান্ত্রিকদের প্রতারণার এমন ঘটনা এখনও অবিরাম প্রক্রিয়ায় হয়ে চলেছে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এসব লোকের কারণে জ্যোতিষবিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা ও প্রকৃত জ্যোতিষ-তান্ত্রিকের মানহানি হচ্ছে। প্রকৃত জ্যোতিষীর প্রচার এমনিতেই হয় আর সত্যিকারের তান্ত্রিকরা ঘরের এক কোণে, বনে বা শ্মশানে বসে নিজের সাধনায় ব্যস্ত থাকেন। কারণ, তান্ত্রিক বিশ্বাস করেন যে ভগবান শিব বলেছেন—'কলিযুগে আগম মার্গ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি স্মৃতি, শ্রুতি ও পুরানাদিতেও এই কথা বলেছি। কলিযুগে, তন্ত্রসাধনায় যারা পীড়িত তারা দেবতাদের পূজা করবে এবং তন্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত প্রাণী মোক্ষ লাভ করবে।' এদিকে প্রতারকরা ব্যবসা করছে আর অন্য দিকে নিভৃতে থাকার কারণে জ্যোতিষ ও তন্ত্র বিদ্যা হাহাকার করছে। তন্ত্র একটি শিক্ষা, একটি কঠোর অনুশীলন, একটি উপাসনা। আর এই ভেকধারীরা এসবের ধারকাছ দিয়েই যায় না। আজ প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে আপনি তান্ত্রিক, ওঝা, গুণীন ও জ্যোতিষী পাবেন। আনন্দে তিনি তার ব্যবসা পরিচালনা করছেন। আপনি একজন সত্যকার, নিঃস্বার্থ এবং পরোপকারী এবং জনসেবী জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক খুব কমই পাবেন।

আগে জ্যোতিষী বা তান্ত্রিকরা সাধারণ মানুষের কাছে যেতেন যাতে তারা তাদের কিছু দুঃখ বা কষ্ট দূর হতে পারে, কিন্তু এখনকার জ্যোতিষী বা তান্ত্রিকরা সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ করে যাতে তার নিজের কিছু কল্যাণ ঘটবে। সেই তথাকথিত জ্যোতিষী, তান্ত্রিক বাবা বড় আড়ম্বরে গাড়িতে চেপে চেম্বারে আসে, বস্তুগতভাবে উপার্জন করে এবং তারপর ভক্তকে ছোট-বড় কিছু আশ্বাস দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়, তারপর আর আসে না।

জ্যোতিষীদের সম্মেলন এবং সেমিনার একটি খুব অদ্ভুত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। এই সকল সম্মেলনে যোগদানকারী পণ্ডিতদের তাদের ভূমিকা এবং অলৌকিক ঘটনাগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে দেখা যায়। আর এই সকল সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সার্টিফিকেট বিক্রি করা। কিছু জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক আছেন নিজের বই বিক্রি করতে এই সকল সেমিনারে আসেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিষ ও তন্ত্র চর্চা এতই রহস্যময় এবং কঠিন যে এর সাধন পথে অগ্রসর হওয়া সকলের বিষয় নয়। শুধুমাত্র কিছু 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষ' এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন এবং তারপর কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সাথে এটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করেন। বর্তমানে কিছু মানুষ এটাকে স্ফুর্তি ও জীবিকার মাধ্যম বানিয়েছে মাত্র। একজন জ্যোতিষী, একজন তান্ত্রিক যখন অন্যের জন্য সব ধরনের মঙ্গল করতে পারেন, তখন তিনি কি নিজের জন্য ভালো করতে পারেন না? তাহলে তিনি নিজে কেন একগাদা আংটি, কবচ ইত্যাদি পরে থাকেন? কেন এসব প্রতিকার ছাড়াই তিনি সুস্থ জীবন ধারণ করেন না? অনেক জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক তাদের নিজের গবেষণা কেন্দ্র, বড় আশ্রম এবং বিলাসবহুল বাসস্থান তৈরি করেছেন, যেখানে প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। রাজনীতিবিদ এবং অভিনেতারা জ্যোতিষী এবং তান্ত্রিকদের আরও প্রচার করেছেন ও করছেন। কিন্তু চিরকালীন সত্য হল যে একজন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রকৃত তান্ত্রিক কখনও লোভী বা দুষ্ট হতে পারেন না। তিনি নীরবে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে, প্রচার ছাড়াই তন্ত্র-বিজ্ঞান এবং মানবতার সেবা করে থাকেন—আমি দুঃখিত যে এই বাণিজ্যিক যুগে এই রকম তান্ত্রিকের সংখ্যা আঙুলে গুনে রাখার মতো।

কঠোর পরিশ্রম, নিরন্তর সাধনা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমেই জীবনে সব কিছুই পাওয়া যায়, তন্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র পথপ্রদর্শক হিসাবে সাহায্য করে মাত্র। তন্ত্রকর্মে কখনও অর্থবৃষ্টির প্রয়োজন হয় না, তন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ইচ্ছা পূরণ করে না, শুধুমাত্র আপনার সঠিক জীবনপথ নির্ধারণ করে মাত্র। এই তিক্ত সত্যকে স্বীকার না করে আপনি কখনই তন্ত্র বা জ্যোতিষ থেকে উপকৃত হতে পারবেন না, এই সূত্রটি আপনি সর্বদা মনে রাখবেন।

আজ আধ্যাত্মিক সাধনার অবস্থাও অদ্ভুত। আজ এই পৃথিবীর প্রতিটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন মাত্র কিছু টাকায় না কি করা যায়! অভিষেক করতে না কি হাজার হাজার টাকা প্রয়োজন! এটা অন্য কথা যে প্রতিটি সাধনায়, সকল গুরুজীর বলা পদ্ধতি অবশ্যই একই হবে। আমি জানতে চাই, আমাদের মুনি-ঋষিরা যারা চরম প্রান্তরে থাকতেন, তারা এত দামি উপকরণ কোথা থেকে পেতেন? যদিও এটি সত্য, তিনি অনেক পরাশক্তি এবং অলৌকিকতার অধিকারী হতেন!

পরিতাপের বিষয় যে, প্রতি বছর ক্যালেন্ডার বদলানোর মত, ব্যবসায়ী জ্যোতিষ-তান্ত্রিকরা তাদের বিজ্ঞাপন ও ব্যবসায়িক পদ্ধতি পরিবর্তন করে চলেছেন। কখনও তিনি হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষী, কখনোও তিনি হয়ে ওঠেন একজন অভিজ্ঞ হস্তরেখাবিদ, কখনও আচার্য আবার কখনও বা সিদ্ধ তান্ত্রিক, কখনোও গোল্ড মেডালিস্ট বা কখনও গোল্ডেন ক্রাউনধারী। প্রাচীনকালে আমাদের মুনি-ঋষিরা হাজার বছর বেঁচে থেকে দীর্ঘ সময় ধ্যানে কাটাতেন এবং 'সিদ্ধ' হয়ে উঠতেন। নারদ একজন হস্তরেখাবিদ ছিলেন তান্ত্রিক ছিলেন না, আচার্য বরাহমিহির, পরাশর, মহর্ষি ভৃগু ছিলেন জ্যোতিষী ছিলেন কিন্তু তান্ত্রিক বা হস্তরেখাবিদ নন, অঘোরী বাবা কিনারাম একজন অবধূত ছিলেন, বাবা বামদেব তান্ত্রিক ছিলেন অথচ জ্যোতিষী বা হস্তরেখাবিদ নন, কিন্তু আজকাল একজন ব্যক্তিই একাধারে জ্যোতিষী, সিদ্ধ তান্ত্রিক হয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে চেম্বার করে সেবা করে চলেছেন—যা করা কখওই তার উচিত নয়। এগুলো যারা করেন, তার কারণ হল—নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, শাস্ত্রীয় ও মানবিক আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও লোভ।

তন্ত্রাচার্যদের দেখানো পথে চলে আপনি একজন সত্যিকারের সাধক হয়ে উঠুন, তবেই প্রকৃত তান্ত্রিক হতে পারবেন, অন্যথায় নয়। তন্ত্র সাধনা কিভাবে করবেন? কিভাবে মন্ত্র ধ্যান করবেন? যন্ত্র সাধনা কিভাবে করবেন? এসব জানার পরে, আপনাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিখতে হবে, তারপর তন্ত্র বিদ্যার নিয়মগুলি খুব ভালভাবে বুঝতে হবে এবং সেগুলি আপনার আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

তন্ত্র বিজ্ঞান হল আধ্যাত্মিক সাধনার আকারে অমৃতের একটি হ্রদ, একমাত্র শর্ত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হল এটি বুঝতে হবে যে সময় আসতে চলেছে, যেখানে কেবল সত্যিকারের সাধকরাই সুখ উপভোগ করতে সক্ষম হবেন। একজন সত্যিকারের সাধককে সফলতা পেতে হলে জেদ থাকতে হবে, না জানি জীবনে সফলতার জন্য কত মানুষ কত ব্রত নেয়, কিন্তু কে পূরণ করে! সবাই আপনাকে সাধনার পথ ধরে উৎসাহিত করবে কিন্তু হাতে ধরে সাধনা শিখিয়ে বা করিয়ে দেবে না!

একজন তান্ত্রিক সাধকের কি কি করা উচিত নয়? আমি যদি এই বিষয় নিয়ে লম্বা তালিকা বানাতে বসি, তবে তা দীর্ঘ হতেই থাকবে, কিন্তু কোন বিশেষ চিন্তা না করে যদি একটি বাক্যে ভাল উপদেশ দিতে চাই, তবে তা এভাবেই দেওয়া যেতে পারে—'অসুখী কেউ সমস্যার সমাধানের জন্য এসে থাকলে তাকে কখনোই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ বসতে বাধ্য করবেন না অথবা জ্ঞানতঃ সেই ব্যক্তির অযথা অর্থক্ষতি করে কষ্ট দেবেন না কারণ তিনি অলস সময় কাটিয়ে নিজের অর্থব্যয় করতে আপনার কাছে আসেননি।

অযথা অন্যের কষ্ট বাড়াবেন না। ব্যবসায়ী, লোভী তান্ত্রিক জ্যোতিষীদের একটা অভ্যাস আছে, তারা অর্থহীন বিষয়ে যে কোনো মানুষকে চার-চারটা, পাঁচ-পাঁচটা প্রশ্ন করে। বেচারা মনে মনে ভয় পায়। তারপর আপনি যা বলবেন সে তাই করবে। আপনি শুধুমাত্র তার ব্যথা এবং কষ্ট অনুভব করুন। একজন ব্যক্তির অর্থ কিম্বা একজন নারীর সৌন্দর্য দেখা এবং তা উপভোগ করা কেবল একটি সোনার হরিণ তাড়ানোর মতো। আপনার আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার কাছে ততটুকুই চেয়ে নিন, কিছু সঞ্চয় থাকলে তা সমাজকল্যাণের কাজে ব্যয় করা উচিত। কিছু তান্ত্রিক বিজ্ঞাপনের জগতে বাস করতে পছন্দ করেন। আসলে তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। এটা করার মানে কি? আরে, যতটুকু কাজ পেয়েছেন ততটুকুই করুন, বাকি সময় ধ্যানে কাটান। কেন আপনি দশজনের সাথে দেখা করেন, মাত্র পাঁচজনের সাথে দেখা করেন তবে তাদের কাজ অবশ্যই করবেন। আপনি একজন সত্যিকারের জ্যোতিষী এবং একজন ভদ্র তান্ত্রিক হলে নিজের বড়াই করবেন না। যদি অন্যরা আপনার আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং কৃতিত্বের কথা বলে, তবে ঠিক আছে, তবে নিজের কৃতিত্ব ও প্রচার আপনি নিজে কখনই করবেন না। বারবার একই কথা বলে মানুষকে বিরক্ত করবেন না। যখনই সুযোগ পাবেন তখন পূর্ণ সচেতন হয়ে জপে বসে যান। জপে যদি মন না বসে তবে আপনার জীবনের সুখ এবং দুঃখের মুহূর্তের স্মৃতি স্মরণ করুন, এবং তখনকার মত জপ থেকে বেরিয়ে আসুন সাথে সাথে। পরবর্তী সময়ে মন স্থির হলে আবার জপকর্মে বসে যান।

সাধনা কালের ব্যর্থতা কেবল একটি সুন্দর রসিকতা ভেবে দুঃখিত হওয়ার প্রতিটি সুযোগ এড়িয়ে চলুন। যখনই দুঃখ আসে এবং আপনার সাথে বসতে শুরু করে, তখনই তা গুটিয়ে ফেলুন। সকালে ঘুম থেকে উঠলে আশ্রমের অন্য ঘুমন্ত শিষ্যরা যাতে বিরক্ত না হয়, এভাবে চুপচাপ বসে থাকুন, এমনকি শুয়েও পড়তে পারেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই কয়েকটি বিষয় মেনে চললে শুধু তন্ত্রবিজ্ঞানই নয়, ভক্তরাও যথেষ্ট উপকার পেতে সক্ষম হবেন। নিজেকে একজন 'মানুষ' বলে পরিচয় দিতে পারবেন এবং অন্যদের কাছে উদাহরণ বা আদর্শ হয়ে থাকতে পারবেন।'

এই বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের আদেশ এবং তাঁর শিষ্যদের আনুগত্য নিয়ে একটি বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে। এক সময় দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু তীর্থযাত্রায় যাচ্ছিলেন, একজন বয়স্ক ও একজন যুবক ভিক্ষু। পথে একটি খরস্রোতা নদী পড়ল। ঐ দুইজন ভিক্ষু যখন খরস্রোতা নদী পার হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করছিল তখন তারা একটি যুবতী মেয়েকে সেখানে দেখতে পায়। মেয়েটিকে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে দ্রুত জলের স্রোত অতিক্রম করতে গিয়ে সে ভয় পাচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছে। বয়স্ক সন্ন্যাসী পার হতে সাহায্য না করলেও যুবক সন্ন্যাসী তাকে কাঁধে বসিয়ে নদীর ওপারে নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনা দেখে বয়স্ক সন্ন্যাসী যুবক সন্ন্যাসীকে অভিশাপ দিতে শুরু করেলেন। এবং এই ভাবেই তারা আবারও পথ চলা শুরু করলেন। বয়স্ক সন্ন্যাসী একই কথা বারবার বলে চললেন, যে কেন ঐ মেয়েটিকে কাঁধে বসিয়ে যুবক সন্ন্যাসী পার করে দিয়েছিল। যুবক স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দেয়—'নদী পার হওয়ার সময় আমি তাকে কেবল আমার কাঁধে বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আপনি এখনও তাকে আপনার মনে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

এই আপাততঃ সাধারণ প্রেক্ষাপটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় বিষয় হল জীবনের সত্য। একজনকে জীবনের অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়, আর কেউ তা চায় বা না চায়, কোনও বিশেষ সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তবে যে ব্যক্তি কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র এক মুহুর্তের মধ্যে নিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তান্ত্রিক। কোন ব্যক্তি জীবনে কি করেছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং কোন চাপে সে তা করেছে সেটাই বিচার্য। এমন ব্যক্তিদের জীবন প্রকৃত অর্থে অনুকরণীয়। এই পৃথিবীর ক্লেদযুক্ত কাদায় পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে বেঁচে থাকার রহস্য তিনি একাই জানেন এবং প্রকৃত অর্থে 'তাঁর জীবন তন্ত্রের পথে নিবেদিত হওয়ায় তিনি বিবেকী ও বৈরাগী শ্রেণিতে আসার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন, রঙীন পোশাক পরে মন্দিরে, তীর্থে ঘুরে বেড়ানো সাধক তান্ত্রিকের শ্রেণীতে আসার যোগ্য হতে পারেন না।'

সব শেষে কালীর কাছে প্রার্থনা করি যে আপনার ধৈর্য ধরে এই অবধি পড়া ও আমার এই প্রচেষ্টা যেন সার্থক হয়। আমি সকল পাঠকের আশীর্বাদপ্রাপ্তি। আপনার কোনও মতামত থাকলে তা খোলাখুলিভাবে ও স্বচ্ছন্দে জানাতে পারেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তন্ত্র শাস্ত্রের ধারণা

অনেক সময় সাধারণ মানুষ আমাকে প্রশ্ন করেন, কেন আমরা তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস করব? এই জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা কি? অনেক সময় কোনও ব্যক্তি বলেন বা সংগঠন থেকে ঘোষণা করা হয়—তন্ত্র বাজে কথা ও বুজরুকি, মন্ত্র মিথ্যা ও কল্পনা, যন্ত্র বিজ্ঞান নয় কিছু জ্যামিতিক ছবি মাত্র। অতি-পণ্ডিতরা এই জিনিসটা মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, আপনার ঘরে যখন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ আছে, আপনি যখন পূজাপাঠ করেন তো তখন কেন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখান? তারা ভুলে যান যে একজন চোখের ডাক্তার কিডনীর রোগে অসুস্থ হলে কোন ইউরোলজিস্টকে দেখান। আপনার বাড়িতে হাতুড়ি, ছেনি, তার, সুইচ, বাল্ব ইত্যাদি সবকিছু থাকলেও আপনি কেন একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকেন? একইভাবে, আপনি বিদ্বান ও শিক্ষিত হলেও আপনি একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কেন ডাকেন! আসলে আমরা সকলেই বিশেষ কাজে বিশেষ ব্যক্তিকে ডেকে থাকি। বাজারে তন্ত্রের অনেক বই পাওয়া যায়, কিন্তু আমি তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্র বিশ্বাস করি বলে শুধু তান্ত্রিক বই পড়তে পছন্দ করি, এর প্রধান কারণ আমি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

শাস্ত্র বলেছেন, 'তন্ত্র' হল প্রকৃতি ও পুরুষের খেলা—আর তন্ত্রশাস্ত্র হল শক্তি ও জ্ঞানের সমাহার। তন্ত্র হল উপাসক, সাধনা, উপাসনা ও সিদ্ধির সমাহার। তন্ত্র কোন বিষয় থেকে পলায়ন করতে শিখায় না, নির্ভীক ভাবে সমস্যার সাথে সামনাসামনি লড়াই করার অনুপ্রেরণা দেয়। অনেকেই তন্ত্র বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেন কারণ তারা এটিকে কখনই কাছ থেকে দেখেননি, বিষয়টির ভিতরে প্রবেশ করেননি, বোঝেননি বা বোঝার চেষ্টাও করেননি। তন্ত্র-বিজ্ঞান বিকৃত বিদ্যা নয়। এটাকে বিকৃত করা যাবে না কারণ এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরে তৈরী একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়। আপনি যদি কখনও সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, দেখবেন প্রকৃতি কিভাবে নিজেকে অপরূপ ছটায় নিজেকে সাজায়। সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখবেন অরুণোদয়ের সাথেসাথে পূর্ব দিকের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, দিগন্তে লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে। ঈশ্বর এই ভাবেই রং ছড়িয়ে দেন আমাদের অন্তরে আবার বাইরেও, কিন্তু আপনি দেখেননি, দেখার চেষ্টা করেননি, কারণ আপনি তখন বিছানায় গভীর ঘুমে মগ্ন। তাই তন্ত্র-শক্তিকে বুঝতে গেলে, মন্ত্র-সাধনাকে জানতে গেলে, যন্ত্র-বিজ্ঞানকে বুঝতে গেলে অবশ্যই অজ্ঞানতা থেকে জেগে উঠে শাস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে হবে।

এখন আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন—ঈশ্বর কি? এ বিষয়ে বলতে গেলে আমি বলব—এই পৃথিবীর সকল ধর্মেই এক সর্বশক্তিমানের (ঈশ্বর-এর) ধারণা রয়ে গেছে। কিন্তু যারা তাঁকে জেনেছেন, অনুভব করেছেন, বুঝেছেন, তাঁরা ঈশ্বরকে 'সত্য' বলে অভিহিত করেছে। একমাত্র চেতনার সর্বোচ্চ শিখরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঈশ্বরের কাজ কি? এমন প্রশ্ন করলে বলব—ঈশ্বর কোনও একজন ব্যক্তি নন যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, যিনি বিশ্ব পরিচালনা করছেন, বা যিনি এই সব করছেন। আমার ব্যাখ্যায় ঈশ্বর হলেন আপনার নিজের চেতনার সমাধি-রূপ। যখন আপনার নিজের 'চেতন মন' সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যখন চিন্তা শূন্য হয়ে গিয়ে মন স্থির হয়, যখন প্রাণ বায়ুর চলাচল বন্ধ হয়, যখন আপনার ভিতরের সমস্ত ঝড় থেমে যায়, যখন আপনার মনের অন্তঃস্থল হয়ে যায় শান্ত—তখন আপনার মন একটি স্বচ্ছ দর্পণ হয়ে ওঠে, তখন আপনার মধ্যে যা কিছু অনুভব হয়, সেই অনুভুতি বা অভিজ্ঞতাই হলেন ঈশ্বর। সেই জন্য আমি বলি যে ঈশ্বর একজন ব্যক্তি নন বরং উপস্থিতি, তিনি এক অখণ্ড সত্তা। আপনি যখন 'সাধনা' নামক কর্মকাণ্ডে ডুবে যাবেন, তখন আপনি জানতে পারবেন যে তন্ত্র সাধনা আমাদের চৈতন্যবোধের জাগরণ করে, আমাদের পথ দেখায়।

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ মন্ত্রের মহিমায় পূর্ণ, কিন্তু সেই সময়ে শুধুমাত্র একজন দেবতাকে সর্বোচ্চ হিসেবে গ্রহণ করার প্রথা ছিল না। বিভিন্ন দেবতার কাছে ঋষিরা বিভিন্ন জাগতিক সমস্যার বিষয়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে সমাধান প্রার্থনা করতেন। কোন ঋষি যখন কোনও দেবতার ভক্ত হয়ে উপাসনায় মগ্ন হন, তখন তিনি তাঁকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করতে শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা তৈরী হয় এবং ধীরে ধীরে 'ব্রহ্ম'-এর ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং প্রথমে উপনিষদে ও পরে পুরাণ হয়ে শ্রীমৎ ভগবৎগীতায় তা সুস্পষ্ট হয়েছে। এই 'ব্রহ্মন্' শব্দের মূল 'বৃঃ', যার অর্থ স্ফীত হওয়া বা বিস্তারলাভ করা। হিন্দু দর্শনে ব্রহ্মকে চূড়ান্ত সত্তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই ব্রহ্মের অর্থ বা স্বরূপ হল—জগতের মাঝে ও জগৎ ছাড়িয়ে বিস্তৃত সত্যের অব্যয় রূপ।

ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে শুরু করে বৈদিক সাহিত্যের নানা শাখায় ব্রহ্মের ধারণার বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বেদের প্রাচীনতম শ্লোকগুলিতে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, এর মূল নির্যাস হল—'বেদের ধ্বনি, শব্দ, শ্লোক ও সূত্রসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি' হিসেবে এবং পৌরাণিক কালে এই অর্থের সম্প্রসার ও সমৃদ্ধিকরণ ঘটেছে। বৈদিক যুগে পরে ক্রমশঃ 'ব্রহ্ম' শব্দের বিমূর্ত থেকে বিমূর্ততর ব্যাখ্যা হতে থাকে এবং এভাবেই প্রাথমিক শব্দ ও শ্লোকগত অর্থ বিস্তৃত হয়ে পরবর্তীকালে সর্বব্যাপী, অখণ্ড, অব্যয় সত্তার আধার বা আত্মা ইত্যাদি অর্থগুলির প্রচলন হয়েছে।

উপনিষদের মূল আলোচ্য হল ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা (আত্মন্ বা স্ব-সত্তাকে জানার বিদ্যা); এই দুই ধারণার সংজ্ঞা ও সেই বিষয়ে চর্চার প্রকৃতি। উপনিষদগুলি এই বিষয়ে কোনও একক ও সুসংহত তত্ত্বের অবতারণা করে না বরং বিভিন্ন ভাবে ধারণার যোগ্য অনেকগুলি সম্ভাব্য দিকনির্দেশ দেয়, যেগুলি থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় শাখার উদ্ভব হয়েছে।

বেদের পরবর্তীকালে পরাবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ও মুক্তিতত্ত্বের বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উপনিষদে প্রাপ্ত 'ব্রহ্ম'-এর ধারণার ব্যাখ্যা করা যায়। এক কথায় বলতে গেলে উপনিষদে আলোচনা করা ব্রহ্মের ধারণার সারসংক্ষেপ হল—'অনন্ত বিশ্ব ও মহাজগতের ক্ষুদ্রতম কণা তথা অন্তঃসার যা বোধগম্য কিন্তু অদৃশ্য, সর্বজীবের আত্মা এবং সত্য ও পরমানন্দ স্বরূপ'।

হিন্দু দর্শনে ব্রহ্ম হল মূল আধিভৌতিক ধারণা। ব্রহ্মের ধারণা ছাড়াও, হিন্দু অধিবিদ্যায় আত্মার ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা চূড়ান্তভাবে বাস্তব বলেও বিবেচিত হয়। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দর্শন, বিশেষ করে দ্বৈত ও অদ্বৈত দর্শন, আত্মার প্রকৃতির উপর ভিন্ন, তা ব্রহ্ম থেকে আলাদা, বা ব্রহ্মের মতই। যারা ব্রহ্ম ও আত্মকে স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন তারা হলেন ঈশ্বরবাদী এবং পরবর্তীকালে ন্যায় দর্শন এই ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করে। যারা ব্রহ্ম ও আত্মকে একই বলে মনে করে তারা অদ্বৈত বা ধর্মবাদী এবং পরবর্তীতে সাংখ্য ও যোগ দর্শন এই আধিভৌতিক ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করে। উপনিষদের প্রধান শিক্ষা হল প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিজের আত্মিক পরিচয় রয়েছে অন্য প্রতিটি মানুষ ও জীবিত সত্তার সাথে, সেইসাথে পরম, চূড়ান্ত বাস্তবভাবে ব্রহ্মের সাথেও।

উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা উচিত আর তার কারণ হল এটি ব্যক্তির জীবন থেকে দুঃখ দূর করে। কারণ ব্যক্তিটির অপরিবর্তনীয় এবং চির-পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা ও জ্ঞান রয়েছে এবং তাই ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত থাকে না। অতঃপর, ব্যক্তি শুধুমাত্র 'স্ব' নিয়েই সন্তুষ্ট এবং তার শরীর বা নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নয়। পরবর্তী কালে 'দেবতা' ধারণার সৃষ্টি হয়। এই দেবতা নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে —

একবার শাকল্য মুনি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে প্রশ্ন করলেন—'এই বিশ্ব চরাচরে কতজন দেবতা রয়েছেন?'

উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—'স হো বাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্বেব দেবা ইতি

কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিতাষ্টৌ বসব
একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব—
প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।'

—(বৃহদারণ্যক উপনিষদ, অধ্যায় ৩/৯/২)।

অর্থাৎ এক পরমেশ্বর বা পরমব্রহ্ম হলেও, তিনি নানা শক্তিরূপে প্রকাশিত। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বললেন, 'ত্রয়স্ত্রিংশদিতাষ্টৌ বসব', অর্থাৎ ৩৩ জনের মধ্যে আটজন বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, এবং এই ৩১ জন সহ ইন্দ্র এবং প্রজাপতি-কে নিয়ে সর্বসাকুল্যে ৩৩ জন দেবতা।

এই একই তথ্য আমরা পাই, অথর্ব বেদের ১০/৭/১৩, ঋগ্বেদের ৮/২৮/১ এবং শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪ নং স্কন্দে। অর্থাৎ অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র (একজন প্রধান রুদ্র

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এবং তাঁর ১০টি বর্দ্ধিত শক্তি। এই ১০টি বর্দ্ধিত শক্তি আসলে আমাদের শরীরেরই ১০টি জীবনী শক্তি), দ্বাদশ আদিত্য, এক বিদ্যুৎ এবং এক কর্মকাণ্ডের যজ্ঞকুণ্ড, উপনিষদে বর্ণিত এক বিদ্যুৎই (বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি) হল বাস্তুর কেন্দ্র বা 'ব্রহ্মা', এবং কর্মকাণ্ডের যজ্ঞকুণ্ড হল বাস্তুর 'অদিতি'।

ঠিক এই ভাবে আমাদের বাস্তুতে নিহিত পিতৃ, ভূধর, অপহ, ভল্লাট ইত্যাদি দৈবশক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছেন অষ্টবসু। আবার বিবস্বান, ইন্দ্র, বরুণ, অর্যমা ইত্যাদি দৈবশক্তিতে দ্বাদশ আদিত্যের প্রকাশ, অন্য দিকে একাদশ রুদ্রের মধ্যে রয়েছেন রুদ্র, অপবৎস, শিখি, জয়ন্ত, সত্য, গন্ধর্ব ইত্যাদি। আমাদের বাস্তুতেই অসুর, শোষ, পাপযক্ষ্মা, রোগ, নাগ ইত্যাদির মতো ১২টি আসুরিক শক্তি রয়েছে।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী-র ১২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে—'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি', অর্থাৎ, একক নিয়ন্তা পরমব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র রূপে জগতের সমস্ত কিছুতেই প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত। উপনিষদের এই শ্লোকটিকেই যেন ব্রহ্মাণ্ডের জ্যামিতি, বাস্তুর জ্যামিতি এবং মনুষ্যদেহের জ্যমিতি একইভাবে স্পন্দিত হলে কল্যাণময়, আনন্দময় অনুভুতি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বাস্তুর ব্রহ্মাণ্ডীয় আকাশে সেই এক ও আদি দৈবীয় সত্ত্বার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ হয়। কিন্তু সেই প্রকাশ কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেই আসুরিক শক্তি বা বিনাশ শক্তির উদ্ভব হয়।

এর পরবর্তী কালে ব্রহ্মের চালিকাশক্তি ব্রহ্মময়ীর ধারণা তৈরী হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্রহ্মময়ী সাধক সমাজে অগ্রগণ্য। তান্ত্রিক মার্গে সেই ব্রহ্মময়ী কালক্রমে হলেন আদ্যাশক্তি কালী, তিনিই হলেন সাধকের অভীষ্ট ব্রহ্মের সগুন রূপ। সৎ, চিৎ এবং আনন্দের সমষ্টিই হলেন পরমব্রহ্ম। সেই পরমানন্দের সন্ধানই দেবীর রূপ রহস্য। নিবিষ্ট চিত্তে এই সন্ধান চালিয়ে গেলে, ক্রমে সাধক তার কাঙ্খিত পরমব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হয়, উন্মোচিত হয় ব্রহ্মবিদ্যা। দেবী তাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। স্বভাবত নিরাকার রূপিনী এই দেবী সাধকের কাছে পরমা প্রকৃতিরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, অতঃপর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মাধ্যমে অখিল জগৎরূপে বিরাজ-করছেন। জীব, নির্জীব তথা তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যকুল তাঁরই চূড়ান্ত বিবর্তিত প্রতিমা। মনুষ্য দেহে চৈতন্য রূপে নিরাকারা হয়ে বিরাজ করেন ও দেহরূপে সাকারা হয়ে। ওই নিরাকারা বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্য জীবদেহে কুণ্ডলিনীরূপা মহাশক্তি। তিনিই ত্রিগুনাতীত সাধকের সন্ধানী চেতনায় ধরা দিচ্ছেন মূর্ত ব্রহ্মরূপে।

কালী তত্ত্ব নিয়ে আরও আলোচনার আগে কামিনী তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধনা হল বাস্তবিক এক সন্ধান। স্বয়ং এবং ব্রহ্মের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের রহস্য উদঘাটন করাই সাধনা। সন্ধান করতে হবে সেই আনন্দের, যা জীবের মধ্যেই বিরাজ করছে। যার উপস্থিতি টের পাওয়া সহজ, কিন্তু অবস্থান অতীব দুর্গম এক অগম্য ধামে। নিষ্কাম হওয়াও এক প্রকার কামনা, তাই 'কামিনী তত্ত্ব' হল

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাধকের সন্ধানের প্রথম সোপান। প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করাও এক কঠিন কামনা। যতক্ষণ সাধক তাঁর শক্তিকে বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী করতে অপারগ, ততক্ষণই তিনি 'আত্ম স্বরূপ' জ্ঞাত নন। এই বিপুল সাধনশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে, প্রবৃত্তিকে জয় করে, নিবৃত্তির মার্গে তাকে চালিত করে পরমব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সহায়তা করেন কুলকুন্ডলিনি কামিনী। সাধকের নিষ্কাম হওয়ার কামনা তিনি পরিপূর্ণ করেন। তাই কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে সব জ্ঞাত হয়ে কুণ্ডলিনী সাধনা সর্বপ্রথমে করা দরকার।

আত্মার রূপ, তার অবস্থা এবং অস্তিত্ব এবং অমরত্বের প্রশ্নটি আমাদের সকলের জন্য কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুগে যুগে শাস্ত্র এ বিষয়ে তাদের মতামত পেশ করেছেন। বৈদিক ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে। বেদের ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে এই জগতের বাইরেও আর একটি জগৎ আছে, যেখানে মৃত্যুর পর ভালো কাজ করা মানুষ বা পূণ্যাত্মা অবস্থান করে। বৈদিক যুগের ঋষিরা পুনর্জন্মের সাথে পরিচিত ছিলেন। এই মনুষ্যদেহকে ব্রহ্মের স্বরূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এই দেহ কেবল পাঁচটি উপাদান দিয়ে তৈরী বিবেচনা করা হয়, এই পাঁচটি উপাদান হল—আকাশ, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী এবং জল উপাদান। দেহ কেবল প্রতিটি উপাদানের পারস্পরিক সহযোগিতায় চলে, তাই এই পাঁচটি উপাদান দিয়ে তৈরি দেহ দিয়েই ব্রহ্মসাধনা সম্পন্ন হয়। সনাতনী মতে অনেক দেবতা আছেন এবং কোন সাধনা, উপাসনা আপনি করবেন এবং কোন সাধনা ত্যাগ করবেন তা নিয়ে সাধকের কোন প্রকার বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। এই দেবতা বা লক্ষ্যপথই হল তন্ত্র সাধনা—যার মুল দুটি পক্ষ হল 'পুরুষ ও প্রকৃতি'। নারী হলো প্রকৃতি বা শক্তি রূপ আর পুরুষ হলো জ্ঞান রূপ, তন্ত্র মার্গে তারা ভৈরব-ভৈরবী নামে পরিচিত।

সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী, শক্তি সাধনা মানে প্রকৃতির উপাসনা, তাই যিনি প্রকৃতির বিশাল ভাণ্ডারের একটি অংশও নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, তিনিই ক্ষমতাবান। যেখানে শক্তি আছে সেখানে দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য, অন্যায়, অলসতা থাকতে পারে না, যেখানে প্রজ্ঞা, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, অগ্নি, অজেয়তা আছে, সেখানে শক্তি অগ্নি উপাদানের কর্তা, যাকে শান্ত করা যায় না, তাই শিব আছেন শক্তির অপর রূপ—জ্ঞান হিসাবে। আমরা জানি, শক্তি ব্যতীত কোন প্রকার কাজই সম্পন্ন হয় না, শক্তি সগুণ ও নির্গুণ উভয় রূপেই, মহাশক্তির রূপ। শক্তি যখন খণ্ড রূপে থাকে তখন স্বভাব বা গুণ অনুযায়ী তাকে লক্ষ্মী বলা হয়, তারপর সরস্বতী, তারা, গৌরী, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। আগুন যেমন বাতাস ছাড়া বাস করতে পারে না, তেমনি শক্তিও শক্তিমান ছাড়া বাঁচতে পারে না, এটি তার সাথে সংযুক্ত রূপ। শক্তিমানকে পুরুষ বা আদি দেব বা শিব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আদি দেব হলেন এই রহস্যময় প্রকৃতির সমাধান, যিনি সীমাহীন বা অসীম—যাকে সময়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। তাঁর রূপকে কোনো এক রূপেও স্থির করা যায় না এবং যাঁর দীপ্তি থেকে দেব-দেবীদের পূজা করা হয়। সাধক

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চায় এই এক জীবনেই সেই অসীমতা অর্জন করতে। কিন্তু তা কি সম্ভব? আজ আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্য পেতে এত বিলম্ব কেন? ব্যর্থতা কেন অন্বেষণের সাথে যুক্ত? কেন উদ্ঘাটন অসম্ভব? কেন প্রাচীনকালে সাফল্য সম্ভব ও সহজ ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে ছান্দোগ্য উপনিষদ-এ বর্ণিত একটা গল্প মনে পড়ে গেল—

সুর ও অসুর ছিলেন দুই সৎ ভাই। দেবতাদের মা ছিলেন অদিতি এবং অসুরদের মাতার নাম দিতি। পদ-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার জন্য তাদের মধ্যে বারবার মারামারি হতো। দেবতারা ছিলেন সাত্ত্বিক, তাই তারা যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অসুররা ছিলেন তামসিক। তারা তাদের খারাপ গুণ নিয়ে দেবতাদের অত্যাচার করত। একবার দেবতারা খুব দুঃখ পেয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অসুরদের দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞেস করলেন। ব্রহ্মা বললেন—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সুর ও অসুর উভয় প্রবণতাই বিকশিত হচ্ছে। এটি প্রকৃতির গুণ, একে এড়ানো খুবই কঠিন, একে মোকাবেলা করতে হবে। অসুরদের বা তাদের দৈত্য প্রবৃত্তিকে দূর করা কঠিন। এখন আপনারা সকলেই আপনাদের সাত্ত্বিক শক্তি দিয়ে তাদের মোকাবেলা করুন। একসময় সফলতা পাওয়া সম্ভব।

দেবতারা ব্রহ্মার আনুগত্য স্বীকার করে তাদের আবাসে ফিরে আসেন। অসুররা আবার তাদের আক্রমণ করল। এবার অস্ত্রের মুখোমুখি না হয়ে দেবতারা প্রাণশক্তি নিয়ে আক্রমণ করলেন। সেই শক্তি অসুরদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা দূষিত হয়েছিল। যেটা আগে সুগন্ধি গন্ধের গুণ ছিল, এখন তাও দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। এরপর দেবতারা বাকশক্তি দিয়ে আক্রমণ করলেন। অসুররাও তাদের গুণাবলী দ্বারা তাকে মুগ্ধ করেছিল। আগে শুধু সত্য বলার ক্ষমতা ছিল, এখন সে অসত্যও বলতে শুরু করেছে। তখন দেবতারা শ্রবণশক্তি ব্যবহার করলেন। অসুরদের সাথে সংঘর্ষের পর এই শক্তিটিও দূষিত হয়েছিল এবং এখন সে অশ্রুত খারাপ কথা শুনতে শুরু করেছে। তারপর তারা দৃষ্টি শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন। ফল হলো, যে চোখ আগে শুধু ভালোই দেখত, এখন মন্দও দেখতে শুরু করেছে। সবকিছু কলুষিত হওয়ার পর, তিনি মনের ইচ্ছা শক্তি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু অসুরদের শক্তি তাকে পরাজিত করেছিল এবং তার মধ্যে তার প্রবৃত্তি মিশিয়েছিল। যে হৃদয়ে সবসময় ভালো চিন্তা থাকত, সেই হৃদয়টাও খারাপ চিন্তার মন্থন শুরু করল। তারা প্রতারণামূলক জিনিস ভাবতে শুরু করে। এভাবে মনও পৈশাচিক প্রবণতায় আক্রান্ত হয়।

দেবতারা ভাবলেন, সবই বৃথা। তাদের মধ্যে যত গুণ ছিল, সবই অসুরদের সংস্পর্শে তমোগুণ হয়ে গেল। তখন তারা আবার ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন যে—আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত এই পরীক্ষাটি ভাল উপাদানগুলিকেও মন্দ করে দিয়েছে।

দেবতাদের উদ্বেগের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন—আমি বলিনি যে এই দুটি গুণের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দ্বারা কিছুই অস্পৃশ্য থাকবে না। এই দেহে যে কেন্দ্রীয় প্রাণশক্তি রয়েছে তা 'ব্রহ্ম'। তিনি সকল গুণ-অপকর্মের উর্ধ্বে। সকলে তাঁর উপাসনা করুন। দেহে তাঁর নিবাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তিশালী থাকে, ভালো-মন্দের জ্ঞান থাকে। জীবনের প্রতিটি গতিবিধি তাঁর দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁকে অনুভব করুন। তিনিই সকলকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবেন। কোনও আসুরিক শক্তি আর আপনাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

এই গল্পের সারাংশ হল—নিজেকে শুদ্ধ, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক রেখে আত্মজ্ঞ হতে হবে তবেই ভুক্তিমুক্তি লাভ সম্ভব, সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে। কিন্তু সিদ্ধি এত সহজ বিষয় নয়, (হিন্দু দর্শন অনুযায়ী) তার কারণ হল 'কর্ম'। এতকিছু জেনেও মানুষ তার জীবনে ক্রমাগত অন্যদের সাথে নিজেকে তুলনা করতে থাকে, লক্ষ্য করে তার জীবনে কি কি জিনিসের অভাব রয়েছে। তারপর নিজের যোগ্যতার বিচার না করেই সেই সকল পার্থিব বস্তু লাভ করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। সৎ বা অসৎ যে কোনও উপায়েই তার ঐ সকল বস্তু তার চাই। এই ভাবে একজন মানুষ তার অজ্ঞাতসারে কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার বিধানে কোন কমতি নেই। সৃষ্টিকর্তা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে মানুষকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে সকল উপাদানই অন্তর্ভুক্ত করে দেন। একজন মানুষ তার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে উপাদানটি নিয়ে জন্মায় সেটি হলো—ভাগ্য! তাই বলা হয় পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষের ভাগ্য আলাদা, ভাগ্যের গতি খুবই অনন্য। কোন সময়ে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে পরিণত হয় এবং কোন সময়ে তা আবার সৌভাগ্যে পরিণত হয় তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু ভগবানের দ্বারা এই ভাগ্য বা নিয়তি লেখা এক মুহূর্তে হয় না বা অন্যভাবে বললে ঈশ্বর তার ইচ্ছানুযায়ী সৌভাগ্য বন্টন করেন না। মানুষ তার ভাগ্য বা নিয়তি নিজেই তৈরী করে জন্মায়। মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যা সৃষ্টি করে তিনি তাকে মুক্ত করেন, পাশাপাশি তাকে হৃদয়, বুদ্ধি, চিন্তার শক্তি দেন, যাতে সে নিজেই তার জীবন নির্ধারণ করতে পারে। এই নির্ধারক শক্তির পিছনে লুকিয়ে আছে তিনটি কর্ম। যার মতে সে তার জীবনে চলাফেরা করে। এই তিনটি কর্ম হল সঞ্চিত কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম, ক্রিয়ামান।

এখন আমি প্রত্যেকে কর্ম বিষয়ে সামান্য পরিচিতি দিই। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে, পূর্বজন্মে যেভাবে জীবন যাপন করা হয়েছে এবং যে কর্মের ফল এখনও পাওয়া যায়নি, তা বর্তমান জীবনে কর্মসংস্কার হিসেবে আমাদের কাছে থাকে। সংস্কৃতি ও জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা দুর্বলতা জীবনেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শুরু থেকেই গুণ, খারাপ গুণ, সুস্থতা, অসুস্থতা, চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন ধরনের রুচি-অপছন্দের বিকাশ ঘটে। এসবের পিছনে আছে শুধু সঞ্চিত কর্ম।

দ্বিতীয়টির নাম প্রারব্ধ কর্ম। প্রারব্ধ অর্থ পূর্বজন্মে কৃত কর্ম, যা ভগবান এই জন্মে ভোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাকে প্রারব্ধ বলে। এটি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য দুইই হতে পারে। সৌভাগ্যের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয় এবং দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে কেবল ব্যর্থতাই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হাতে আসে। তাই বলা হয়েছে ভাগ্যের গতি অনন্য। কাকে সিংহাসনে বসাতে হবে, কখন কাকে সিংহাসন থেকে ফেলে দিতে হবে, এ সবই নিয়তির খেলা। কেউ কেউ এটাকে ভগবানের লীলা বলে, অথচ এটা তার নিজের কর্ম যা তার সাথে পূর্বজন্ম থেকে এসেছে। ভগবান মানুষ বানিয়ে তার লীলার অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন।

সর্বশেষে একজন ব্যক্তি বর্তমান জীবনে তার প্রভাবের ফলে যে কর্ম করে তাকে ক্রিয়ামান কর্ম বলে। এই তিন ধরনের কর্মের মধ্যে ক্রিয়মান কর্মই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষ নিজেই নিজের ইচ্ছা, চিন্তা, বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে সেগুলি সম্পন্ন করে। ক্রিয়ামান কর্মের মাধ্যমে, সে কেবল তার ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি তৈরি করে না, তবে পূর্বজন্মে করা সঞ্চিতা কর্ম এবং প্রারব্ধ কর্মের ত্রুটিগুলিও দূর করতে পারে, কারণ সে পূর্বজন্ম দেখেনি এবং ভবিষ্যতও অজানা। ক্রিয়মান কর্ম ব্যক্তির নিজের হাতে। তাকে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ক্রিয়ামান আসলে নিয়তির ত্রুটি ও সঞ্চিত কর্মের ত্রুটি দূর করার কাজ। তন্ত্রসাধনায় এই তিনটি কর্মকে ক্ষয় করা যায় বলে তান্ত্রিক সাধকেরা বলেছেন ও নিজের জীবনাচরণ দিয়ে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। অতীত জীবন জানতে, বর্তমানকে সঠিকভাবে উপভোগ করতে এবং পরবর্তী জীবনকে উন্নত করার জন্য তন্ত্র বিজ্ঞান তাই একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এতে বহু সাধনা, পূজা-অর্চনার বিবরণ ছাড়াও অতি সহজে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রে জপ-সাধনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জপ সাধনা জীবনের উন্নতির একটি সফল উপায়। যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও উপকারের চিন্তায় মন্ত্র জপের আশ্রয় নেন। প্রথমত তিনি অবশ্যই একটি নতুন পরিবর্তন অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন যে আত্মার দোষগুলি বেরিয়ে আসছে এবং বিশুদ্ধ উপাদানগুলি ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। ফলে অনেক খারাপ গুণ, খারাপ চিন্তা, তামসিক প্রকৃতি এবং হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদির অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকে এবং তার জায়গায় সংযম, পবিত্রতা, উদ্যম, সহনশীলতা, সততা, উদারতা প্রভৃতি গুণাবলী গড়ে উঠতে থাকে। এই পরিবর্তনের স্বাভাবিক ফল হল যে অন্যান্য লোকেরাও এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে শুরু করে। জপ সাধনা করলে শুধু গুণের জন্ম হয়, এই গুণাবলীর সাথে সাথে একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে পরিবর্তন আসে এবং তার মধ্যে তৃপ্তির অনুভূতি জাগ্রত হতে থাকে। তার সকল বেদনাদায়ক চিন্তার পরিবর্তন হয়। এই ভাবে একজন মানুষ শান্তি পায় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

শাস্ত্রে আছে 'জপাৎ সিদ্ধি'—অর্থাৎ জপ দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। ভগবানের কোনো নাম-মন্ত্র বা গুরু-মন্ত্র অনবরত বিভিন্ন ভাবে বা বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্ব-জ্ঞানে উচ্চারণ করার নাম জপ।

শাস্ত্রানুসারে জপ ১১ প্রকারের পদ্ধতি দ্বারা করা যা, যেমন—কায়িক জপ, বাচিক জপ, উপাংশু জপ, প্রাণিক জপ, হার্দিক জপ, মানসিক জপ, ক্রিয়া জপ, সুষুম্না জপ, চক্র জপ, অজপা জপ, পশ্যন্তি জপ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রতিটি জপ পদ্ধতি পরস্পরের থেকে উন্নত। যেমন-কায়িক থেকে বাচিক আবার বাচিক থেকে উপাংশু উন্নত-এই ভাবে প্রতিটি জপ পদ্ধতি পরস্পরের থেকে উন্নত। পশ্যন্তি জপ পদ্ধতি পর্যন্ত একবার করতে পারলে জপ সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয় এবং শাস্ত্রের 'জপাৎ সিদ্ধি' কথাটির অর্থ হল পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া।

কায়িক জপ—কায়িক জপ শব্দের অর্থ হলো - শারীরিক পরিশ্রম এর দ্বারা যে জপ করা হয় তাকে কায়িক জপ বল। যেমন—খোল-করতাল নিয়ে নাচতে নাচতে বা হেলে দুলে যে ভগবানের অনবরত নাম করা রূপী জপ করাকে কায়িক জপ বলে।

বাচিক জপ—বাচিক জপ শব্দের অর্থ হল—এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে বসে অনবরত উচ্চারণ করে যে জপ করা হয় তাকে বাচিক জপ বলে।

উপাংশু জপ—উপাংশু জপ শব্দের অর্থ হলো- এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে শুধু নিজে শুনতে পাবে কিন্তু পাশে বসে থাকলেও কেউ শুনতে পাবে না, এই রকম ভাবে অনবরত উচ্চারণ করে যে জপ করা হয় তাকে উপাংশু জপ বলে।

প্রাণিক জপ—প্রাণীক জপ শব্দের অর্থ হলো - শাস্ত্রে কোনো কোনো জায়গায় শ্বাস কে প্রাণ বলা হয়েছে। এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে জিভকে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস এর দ্বারা জপ করাকে প্রাণিক জপ বলে।

হার্দিক জপ—হার্দিক জপ শব্দের অর্থ হলো - এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে জিভকে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে শুধু নিজের হৃদ-স্পন্দন শুনে (কোন প্রকারের যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে), সেই নিজের হৃদ-স্পন্দন এর গতিতে যে জপ করা হয় তাকে হার্দিক জপ বলে।

মানসিক জপ—মানসিক জপ শব্দের অর্থ হলো- এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে শরীর ও জিভকে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে শুধু নিজের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে যে গতিমান মন (কোনো প্রকারের যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে) -সেই মনের গতির সাথে জপ করাকে মানসিক জপ বলে।

ক্রিয়া জপ—ক্রিয়া জপ শব্দের অর্থ হলো - এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে জিভকে কপালকুহরে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে গুরুমুখি বিদ্যারূপী ক্রিয়া এর দ্বারা জপ করাকে ক্রিয়া জপ বলে।

সুষুন্না জপ—সুষুন্না জপ শব্দের অর্থ হলো - এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে জিভকে কপালকুহরে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে গুরুমুখি বিদ্যারূপী ক্রিয়া। এর দ্বারা জপ করতে করতে সুষুন্নাতে প্রবেশ করে জপ করাকে সুষুন্না জপ বলে।

চক্র জপ—চক্র জপ শব্দের অর্থ হলো - এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে জিভকে রাজিকাতে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে গুরুমুখি বিদ্যারূপী ক্রিয়া, এর দ্বারা জপ করতে করতে সুষুন্নাতে প্রবেশ করে তারপর সুষুন্নাতে প্রবেশ অবস্থায় থেকে প্রতিটি চক্রে জপ করার নাম চক্র জপ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অজপা জপ—অজপা জপ শব্দের অর্থ হলো - এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে জিভকে রাজিকাতে বা আলজিহ্বাতে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে গুরুমুখি বিদ্যারূপী ক্রিয়া এর দ্বারা জপ করতে করতে সুষুন্নাতে প্রবেশ করে তারপর সুষুন্নাতে প্রবেশ অবস্থায় থেকে প্রতিটি চক্রে জপ করতে করতে কেবলি-কুম্ভক এর দ্বারা অনাহতে দিব্য ধ্বনির প্রকাশ হয় এবং গুরুমন্ত্র আপনা আপনি সেই অনাহতের দিব্য ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জপ হতে থাকে—একেই অজপা জপ বলে।

পশ্যন্তি জপ—পশ্যন্তি জপ শব্দের অর্থ হলো - এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে জিভকে রাজিকাতে পূর্ণ রূপে স্থির রেখে গুরুমুখী বিদ্যারূপী ক্রিয়া। এই ভাবে জপ করতে করতে সুষুন্নাতে প্রবেশ করে তারপর সুষুন্নাতে প্রবেশ অবস্থায় প্রতিটি চক্রে জপ করতে করতে কেবলি-কুম্ভক এর দ্বারা অনাহত দিব্য ধ্বনির প্রকাশ হয়, গুরুমন্ত্র আপনাআপনি সেই অনাহত দিব্য ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অজপা জপ এর মন্ত্র ধ্বনি শুনতে শুনতে সাধক সমাধি অবস্থায় উপনীত হয়—আর তখনি পশ্যন্তি দিব্য ধ্বনির মধ্যে ব্রহ্ম জ্যোতির প্রকাশ হয় - আর সেই ব্রহ্ম জ্যোতির মধ্যে মন্ত্রের অর্থ-গায়িত্রীর দর্শন হয় আর সেই সঙ্গে সেই গুরু মন্ত্ররূপী ইষ্টদেবের সাক্ষাৎ দর্শন হয়ে সাধক পূর্ণ মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করেন—একেই শাস্ত্র পশান্তি জপ বলেছে, এই জপে সিদ্ধ হলে বলা হয় যে—জপের দ্বারা পূর্ণ সিদ্ধিলাভ বা 'জপাৎ সিদ্ধি' অবস্থা।

আগেই বলেছি, জপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধনা। জপের আগে সংকল্প করুন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক জপ শেষ না করা পর্যন্ত আসন থেকে উঠবেন না। এটি আপনার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করবে এবং আপনাকে সহজেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে যতক্ষণ না আপনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক জপ শেষ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাধনায় কোনো বিরতি থাকা উচিত নয়। এই ধরনের সাধনার ফল হল অমরত্ব বা অনন্ত সুখময় জীবন। আপনি যদি এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করতে চান তবে আপনাকে এটি গভীর ভাবে অনুশীলন করতে হবে।

জপ সাধনায় যে মুহূর্তে আপনি আসনে বসবেন, অনুভব করবেন যে আপনি একজন মানসিক সন্ন্যাসী, পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, এই সময় সবকিছু ভুলে যান, যদি কেউ আপনার দরজায় টোকা দেয়, বিরক্ত হবেন না বা দরজা খুলবেন না। আপনার পরিবারের সদস্যদের আগেই বলে দিন যে আপনি আপনার সাধনা শেষ না করা পর্যন্ত যেন আপনাকে কোনও ভাবে বিরক্ত না করে।

আপনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন তখন একই সাত্ত্বিক ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সর্বদা ইষ্ট মন্ত্র বা নাম মন্ত্র পাঠ করুন। কোনো বিরতি থাকলে আবার স্মরণ রাখুন। ধীরে ধীরে ধ্যান ও জপ পাঠ অভ্যাস বা সহজ হয়ে যাবে। অবচেতন বা বিষয়গত মন সর্বদা নামটি পুনরাবৃত্তি করবে, যদিও সচেতন বা উদ্দেশ্যমূলক মন মাঝে মাঝে এটি ভুলে যেতে পারে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যদি আপনি সময়মতো সতর্ক না হন তবে একাগ্র জপের ফলে আপনার সাধনার সময়কালে আপনার তৈরি করা সংস্কারগুলি মুছে যাবে। আপনার সাংসারিক সঙ্গ, পার্থিব কথাবার্তা, আপনি যে খাবার গ্রহণ করেন, আপনি যে পোশাক পরেন, আপনি যে বস্তুর দিকে তাকান, আপনি যে শব্দগুলি শুনতে পান ইত্যাদি সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আপনি অশ্লীল বা কঠোর শব্দ বলতে পারবেন না, সাত্ত্বিক খাবার গ্রহণ করেন, পরিস্কার ও সাধারণ পোশাক পরবেন, মনকে সর্বদা ভগবানের রূপের উপর নিবদ্ধ করবেন। আপনি যে কোনও রূপ দেখবেন তার উপর গুরুদেবকে আরোপ করুন, কারণ উপন্যাস, সংবাদপত্র পড়া বা সিনেমা দেখা দুষ্ট সঙ্গ তৈরী করে, এসব জাগতিক চিন্তার জন্ম দেয় এবং মনের শান্তি নষ্ট করে। ফলে জপ সাধনায় আপনার কিছুই লাভ হবে না।

পৃথিবীতে অনেক বাধা এবং অসুবিধা আছে। এইসব বাধা এড়িয়ে আপনি যদি জপের মাধ্যমে সিদ্ধি পেতে চান তবে আপনাকে যোগের নিয়ম পালন করতে হবে। নির্জন শান্ত আপদহীন জায়গায় আপনি জপ সাধনায় কাটান এবং তীব্র সাধনা করুন।

আপনার হয়তো জপ যোগ এবং নাম মহিমা সম্পর্কে সামান্যতম হলেও জ্ঞান আছে। তাই এখন আপনি এই মুহূর্ত থেকে প্রকৃত সাধনা শুরু করতে পারেন। আমি নীচে আপনার দৈনন্দিন জপ-সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ব্যবহারিক ইঙ্গিত দিচ্ছি। দয়া করে লক্ষ্য করুন এবং সাবধানে অনুসরণ করুন, আশাকরি ভালো হবে।

১) জপের জন্য সবচেয়ে কার্যকর সময় হল ভোরের ব্রাহ্মমুহূর্ত এবং সন্ধ্যা, যখন সত্ত্ব প্রাধান্য পায়। জপ সাধনায় নিয়মানুবর্তিতা খুবই প্রয়োজনীয়।

২) প্রতিদিন একই জায়গায় বসে জপ করতে হবে। রোজ রোজ স্থান পরিত্যাগ করবেন না। প্রথম দিনের জপে বসার জায়গাটিকে পরিবর্তন করবেন না। পরবর্তী সময়ে সেখানে বসলে আপনা থেকেই জপ করার ভাব এসে যাবে। আপনার স্বাভাবিক আসনটিতে বসবেন তখন আপনি জপ করার আনন্দ পাবেন।

৩) একটি আরামদায়ক অবস্থানগত আসনও মনকে স্থির করতে সাহায্য করে এবং একাগ্রতাকে সহায়তা করে। মেরুদন্ড সবসময় সোজা রাখুন ও মাথা একটু উঁচু করে জপ করবেন। মন্ত্র জাপের সময় স্থির ভঙ্গিতে থাকুন।

৪) উত্তর বা পুর্ব দিকে মুখ করে জপ করতে বসুন। এটি একটি সূক্ষ্ম প্রভাব এবং জপের কার্যকারিতা বাড়ায়।

৫) একটি বসবার আসন খুবই গুরুত্বপুর্ণ। জপের জন্য কুশের, কম্বলের, সূতীর বা একসাথে এই তিনটি আসন জপের সময় ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে কুশের, তার উপরে সূতীর ও তার উপরে কম্বলের আসন রেখে তার উপরে বসে জপ করা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যে দেহের কোনও অংশ যেন মাটি স্পর্শ না করে, শক্তি সংরক্ষিত হয়, অন্যথায় জপ-শক্তি হারাতে হবে।

৬) জপের আগে গুরু ও ইষ্টের সংক্ষিপ্ত পুজো করে উচ্চতর প্রার্থনা করা উচিত।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যথাযথ প্রার্থনা সঠিক সাত্ত্বিক ভাবকে প্রভাবিত করে। সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনায় ঐশ্বরিক সাহায্য পূর্বশর্ত। তা ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় না এবং চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৭) জপের মন্ত্রটি স্পষ্টভাবে এবং ভুল উচ্চারণ ছাড়া জপ করুন। জপ-মন্ত্রের অর্থ গুরুদেবের থেকে জেনে নিন। এতে মন্ত্র-শক্তি দ্রুত জাগ্রত হয়, মন সহজে উন্নত হয় এবং উচ্চারণ স্পষ্ট হলে দ্রুত মন্ত্র-শক্তি লাভ হয়।

৮) জপের জন্য একটি নিখুঁত মালার প্রয়োজন। একটি শোধিত জপ-মালার ব্যবহার জপ-শক্তি লাভে সাহায্য করে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে জপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যও এটি প্রয়োজনীয়। আসন ছাড়ার আগে নির্দিষ্ট সংখ্যক মালা শেষ করার সংকল্প করুন। মালা ছাড়া জপ করলে মন অস্থির হবে, মনে হবে যে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে জপ করেছেন এবং আপনি প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে বেশি বা কম করেছেন।

৯) মন্ত্র জপে বৈচিত্র্য আনুন। জপের প্রতি আগ্রহ বজায় রাখতে, ক্লান্তি এড়াতে এবং একঘেয়েমি প্রতিরোধ করার জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয়। এর জন্য জপ শুরুর প্রথমেই কিছু সময়ের জন্য বাচিক, তারপরে কিছু সময়ের জন্য উপাংশু ও সব শেষে জপ-মন্ত্রটি মানসিকভাবে পুনরাবৃত্তি করুন। এর ফলে জপ প্রকৃত সুখ লাভ হবে ফলে জপ অভ্যাসগত এবং আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে, একঘেয়েমি থাকবে না একেবারেই। মন্ত্র জপের এই বৈচিত্র্য শুধুমাত্র প্রবর্ত সাধক বা নতুনদের জন্য। মানসিক জপ সবচেয়ে শক্তিশালী, এটি সরাসরি মনের অশুভ বৃত্তিকে প্রতিহত করে এবং মনকে শুদ্ধ করে।

১০) জপ শুরুর আগে প্রাণায়ম করে নিয়ে গুরুদেবের ধ্যান করুন। গুরুদেবকে আপনার সামনে উপস্থিত মনে করে তাঁর সুন্দর রূপের কল্পনা করুন। এই অভ্যাসটি আপনার সাধনার কার্যকারিতা এবং শক্তিকে অসাধারণভাবে বৃদ্ধি করবে। এই অনুশীলনের ফলে আপনার মন সম্পূর্ণভাবে জপে নিমগ্ন হবে এবং গুরুদেবের মানসিক উপস্থিতিতে জপে বাধা পড়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

১১) জপের সমাপ্তি ও প্রার্থনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জপ শেষ হওয়ার পরে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করবেন না, সবার সাথে মিশে যাবেন না কিম্বা পার্থিব কর্মকাণ্ডে ডুবে যাবেন না। জপ শেষ হলে কমপক্ষে ১০ মিনিটের জন্য খুব শান্তভাবে ঐ আসনে বসেই গুরুশক্তির কাছে কিছু প্রার্থনা করুন, ঈশ্বরকে স্মরণ করুন বা তাঁর অসীম প্রেমের প্রতি চিন্তা করে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করুন। এখন আপনি জপের স্থান ত্যাগ করে পার্থিব কাজ শুরু করতে পারেন। জপের ফলে অর্জিত আধ্যাত্মিক শক্তি সুষ্ঠু ভাবে থাকবে। পরবর্তী সময়ে কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই গুরু, ইষ্ট ও ভগবান শিবকে স্মরণ করুন।

তন্ত্র-মন্ত্র সাধনার প্রত্যক্ষ অর্থ হল সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হওয়া। সবকিছুর অর্থ বস্তুগত সম্পদ নয়, মন। তন্ত্র সাধনা উপার্জনের বিষয় নয়, অনুরোধ করার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিষয়। ভগবানের চরণে নিজেকে খালি করার সাথে সাথেই অপার শক্তির জন্ম হয়। আমরা যখন ক্ষমতার কর্তা হতে চাই, তখন মাত্র কয়েকটি সিদ্ধি আমাদের হাত স্পর্শ করে, যেখানে আত্মসমর্পণ করলে তন্ত্রের সমস্ত শক্তি আমাদের হয়ে যায়।

তন্ত্র নিজেই একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভর করে, আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, যদি একটি অনুশীলন সফল না হয় তবে অন্যটি করুন, তৃতীয় অনুশীলন করুন, আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন, এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোনও একটিতে সাফল্য পাওয়ার দরকার নেই। নতুন পরীক্ষা, তার জন্যও দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পরীক্ষা করতে হবে, বিজ্ঞান সাধনের জন্য যেমন নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা প্রয়োজন, তেমনি ভক্তি, তন্ত্র সাধনা সিদ্ধিতে বিশ্বাস, অবিরাম প্রয়োজন। ধ্যান এবং একাগ্রতা, শুধুমাত্র যখন এটি ঘটে তখনই তন্ত্র সাধনায় সাফল্য অর্জিত হয়।

প্রাচীনকালে তন্ত্র বিজ্ঞানের গুরুত্ব ছিল, কিন্তু আজকের যুগে তন্ত্রের গুরুত্ব আগের চেয়ে বেড়েছে, জীবন আগের চেয়ে জটিল উঠেছে, তাই এটাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে আসুন আমরা তন্ত্রকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করি। সমস্ত মিথ্যা জিনিস ত্যাগ করে, যাতে জীবনকে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমৃদ্ধ করা যায়।

তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, আপনি একজন ছাত্র, একজন ব্যবসায়ী বা একজন চাকরিপ্রার্থী—আপনি যে ক্ষেত্রেই থাকুন না কেন, তন্ত্র আপনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। মৃত্যুর সময়ও তন্ত্র আপনার সাথে থাকে। বর্তমান যুগে প্রতিটি মানুষই তার শত্রুদের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে বিপর্যস্ত এবং জীবনে তাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, যার কারণে তার কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সে যে গতিতে চায় সেভাবে তার অগ্রগতি হয় না। প্রতিটি কাজেই কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কলিযুগে তন্ত্র-যন্ত্র সাধনা যদি অবিলম্বে কার্যকর করা যায় তো সাধনা শেষ হওয়ার আগেই সাধক অনুকূল সংবাদ পেতে শুরু করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে এ ও বলা হয়েছে, যে সাধক তন্ত্র-যন্ত্র ও মন্ত্রের মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পন্ন করেন, তার জীবনে কখনো কোনো বাধা আসে না, তার সামনে তার শত্রুদের শক্তি কমতে থাকে এবং তাকে জাগতিক বাধার সম্মুখীন হতে হয় না এমন কি সাধক যে কাজগুলো নিয়ে চিন্তা করেন, সেই সব কাজ কোনো বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হয়। তাই তন্ত্র সাধনা সম্পূর্ণ একাগ্রতার সাথে করতে হবে এবং অনুশীলন শুরু করার পর নিয়মিত ধ্যান, জপ ও অনুধ্যান করতে হবে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, সাধকের যদি কোনো ধরনের বাধা থাকে, কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে তন্ত্র সাধনা চমৎকার এবং তাৎক্ষণিকভাবে সফল হয়। আসলে আমার জীবনে যখনই কোনো কঠিন সময় এসেছে, আমি তন্ত্রের আশ্রয়ে থাকার জন্যই হয় তো খুব সহজেই সেই কাজ এমনিতেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আমি আমার পুরো জীবন তন্ত্রে উৎসর্গ করেছি এবং একজন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তান্ত্রিক হয়ে উঠেছি। সময় সময়ে মনে হয় যে আমি হয় তো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, একটি বিশেষ লক্ষ্য, একটি বিশেষ কাজের জন্য জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার জন্ম একটি সাধারণ ঘটনা নয়, এর একটি অর্থবহ কারণ রয়েছে, সময়ের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমার সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং ক্রমাগত এটি সম্পূর্ণ করছি ও আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে জাগরণের প্রক্রিয়া চলছে। এই জাগরণ প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হল ধারণা, নতুন ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী ধারণার সংগঠন। দ্বিতীয় পর্যায় হলো চিন্তার ধারার পরিবর্তন করা আর তৃতীয় ধাপ হল নৈতিকতা। একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা এবং আচার-আচরণের কোন ধারা নেই। আসক্তি ও ঘৃণাতে লিপ্ত, কামনা ও লজ্জায় সিক্ত। একজন সাধারণ এবং অদীক্ষিত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও আচরণ দুই দিকে থাকে এবং তাদের দূরত্ব কখনো দূর করা যায় না। নদীর এই পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য এবং দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য যেমন একটি সেতু থাকে তেমনই আমাদের সাংসারিক জীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের সেতু বা পদ্ধতি আছে, আর সেটি হল সংস্কার—যা 'দীক্ষা' বলে পরিচিত। এই দীক্ষা-সংস্কারে একজন ব্যক্তি সাধকে পরিণত হন ও তার নিত্যকর্ম একটি আচারে পরিণত হয়। সংস্কার তৈরি হলে চিন্তা ও আচারের মধ্যে দূরত্ব দূর হয়ে যায়, ব্যক্তির ভাবনায় স্বপ্ন রূপ নেয়। পরে অনুক্ষণ শ্রীগুরুদেব, মন্ত্র, ইষ্ট ও ভগবতী কালীর কৃপায়, আমি নিশ্চিত যে, ব্যক্তি তন্ত্রের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হন ও কালক্রমে 'সাধক' বলে পরিচিতি লাভ করেন।

মন্ত্র উচ্চারণ করলে হৃদ্ রোগ, দুর্বলতা, ক্ষয়, ক্ষুধা, পেটের সমস্ত রোগ, কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এটা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়, এর পিছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ওষুধের পরমাণু যেমন রোগের পরমাণু ধ্বংস করে রোগীকে সুস্থ করে তোলে, তেমনি জপ মানসিক পরমাণুকে আকর্ষণ করে এবং শরীরের ভেতর থেকে অস্বাস্থ্যকর পরমাণু দূর করে মন ও শরীর উভয়কেই সুস্থ করে তোলে।

মন ও শরীরকে স্থির করতে প্রথমেই ইষ্ট দেবী কালীশক্তির সাহায্যে সাধককে 'মন ও শরীর' বশ করতে হবে। এর জন্য উত্তরমুখী হয়ে আসনে বসে গুরুপূজা ও গুরুকে প্রনাম করে কালীর একাক্ষরী মন্ত্রের ধ্যান করতে হবে। এবার পঞ্চোপচারে পুজো করে যথাসম্ভব জপ করে নীচের মন্ত্র (প্রয়োজনমত) ১০০০ বার জপ করতে হবে। এর ফলে মন স্থির হবে। এবার রোগ সুস্থ্যতার প্রতিটি মন্ত্র সিদ্ধ করার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে এক আসনে বসে ১০০০০ সংখ্যায় জপ করে ১০০০ আহুতি দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। এরপর অন্ততঃ ১০০ বার লঘুমৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করতে হয়।

শরীর ও মন বশকারী মন্ত্র—ক্রীং ভগবতে ঘোরদ্রংষ্ট্রে করালবদনে ক্রীং ক্রীং কালীকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিশ্বমেতৎ বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।

বিভিন্ন রোগ নিরাময় (করতে সিদ্ধি করার) মন্ত্র —

০১) নাকের রোগে—ওঁ উমাদেবীভ্যাং নমঃ।
০২) চোখের রোগে—ওঁ শাং শাকিনীভ্যাং নমঃ।
০৩) কানের রোগে—ওঁ দুং দ্রাং দ্বারবাসিনীভ্যাং নমঃ।
০৪) গলার রোগে—ওঁ চিং চিত্রঘন্টাভ্যাং নমঃ।
০৫) জিহ্বার রোগে—ওঁ সাং সর্বমঙ্গলাভ্যাং নমঃ।
০৬) স্তনের রোগে—ওঁ মাং মহাদেবীভ্যাং নমঃ।
০৭) হৃদয়ের রোগে—ওঁ লাং ললিতাদেবীভ্যাং নমঃ।
০৮) পেট/উদরের রোগে —- ওঁ শুং শূলধারিনীভ্যাং নমঃ।
০৯) ক্ষত রোগে—ওঁ কাং কালরাত্রীভ্যাং নমঃ।
১০) বায়ুরোগে—ওঁ বং বজ্রহস্তাভ্যাং নমঃ।
১১) রক্তচাপের রোগে—ওঁ বং বজ্রস্থস্তাভ্যাং নমঃ।
১২) দাঁত—ওঁ কৌং কৌমারীভ্যাং নমঃ।
১৩) নারীর গোপন রোগে—ওঁ গুং গুহ্যেশ্বরীভ্যাং নমঃ।
১৪) রক্তবিকার রোগ—ওঁ পাং পাবর্তীভ্যাং নমঃ।
১৫) জ্বর রোগে—ওঁ মুং মুকুটেশ্বরীভ্যাং নমঃ।
১৬) সার্দি-কাশি-কফ রোগে—ওঁ পং পদ্মাবতীভ্যাং নমঃ।

লঘু মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র—ওঁ হৌং জুং সঃ মাম্ পালয় পালয়।

এই ভাবে প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্য মন্ত্রের ব্যবহার ছিলো। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলা হয় ও আয়ুর্বেদাচার্যের কাছে মন্ত্রের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন ছিল যাতে মানুষের সুখ ও স্বস্তি নিশ্চিত করা যায়।

এছাড়াও আর একটি পদ্ধতি বলছি, কামাখ্যায় এক সাধুমহারাজের থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। প্রতিদিন নিত্যকর্মের পরে সংক্ষেপে ভগবান শিবের সংক্ষিপ্ত পূজা করুন ও তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি অন্ততঃ দশবার পাঠ করুন। সম্ভব হলে অসংখ্যবার পাঠ করুন। যে কোনও অসুস্থ্যতা থেকে দ্রুত আরোগ্যলাভ করবেন।

মন্ত্র

'ওঁ ত্র্যম্বকম্ যজামহে সুগন্ধিম্ পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।

নমস্তে অস্তু ভগবন্
বিশ্বেশ্বরায় মহাদেবায়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ত্র্যম্বকায় ত্রিপুরান্তকায়
ত্রিকালাগ্নিকালায়
কালাগ্নিরুদ্রায় নীলকণ্ঠায়
মৃত্যুঞ্জয়ায় সর্বেশ্বরায়
সদাশিবায়
মাম্ রক্ষ রক্ষ
মম আয়ুর্দেহি বলম্ দেহি
বীর্যম্ বৃদ্ধি কুরু করু স্বাহা।'

মন্ত্রটি পাঠের সময় মনে ধারনা করবেন যে—ভগবান শিব নিজ হাতে আপনার মাথায় ব্রহ্মতালুতে রোগনিবৃতকারী ওষধি কলসীতে করে ঢেলে দিচ্ছেন। এই ওষধি আপনার সারা শরীরের ভিতর ও বাইরে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত রোগ-জীবানু, মল-ময়লা, ব্যথা-বেদনা সারিয়ে আপনাকে সুস্থ্য করে দিচ্ছে এবং আপনি ধীরে ধীরে আপনার সুস্থ্যতাও ফিরে পাচ্ছেন। জপ শুরুর সাত দিন পর থেকে আপনি এই চমৎকার লক্ষ্য করবেন। ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে জপ করুন, নিশ্চয়ই আপনার এই উপলব্ধি হবে বলে, আমি মনে করি।

যদি বিজ্ঞানকে প্রামাণিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে মন্ত্র জপের বৈজ্ঞানিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আমরা জানি, জপ করলে তরঙ্গ সৃষ্টির কারণে কম্পন তৈরী হয়। সাধারণত মন্ত্র জপের সময় কম্পন স্থূল থেকে উৎপন্ন হয় ও উচ্চারিত শব্দ থেকে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম কম্পনে পরিণত হয়। সূক্ষ্ম কম্পন কিন্তু স্থূল কম্পনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও প্রভাবকারী। দেহে ও মনে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। মন্ত্র জপের মাঝখানে একটি ছন্দ তৈরি করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই ছন্দের সাথে একটি কম্পন গতিশীল হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে, শরীরে অবস্থিত চেতনা কেন্দ্রগুলি এর দ্বারা সক্রিয় হতে শুরু করে। এইভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিনটি স্তরেই পরিবর্তন ঘটে এবং শরীর, মন শক্তিশালী, প্রাঞ্জল ও গতিময় হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে শব্দ তরঙ্গ মানুষের উপর বেশি প্রভাব ফেলে। সভ্যতার প্রথমে ঋষি, মহর্ষিরা ছিলেন মন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। সাধনাক্রমে তার এই মন্ত্রশক্তিকে শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য ব্যবহার করতেন। এই ঋষি মহর্ষিরা উচ্চ গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তির জন্য পাহাড় ও গুহায় বসবাস করতেন। মন্ত্রই ছিল তাঁদের জীবন ও শক্তির ভিত্তি। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা তাদের আবিষ্কারকে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় পরীক্ষা না করা পর্যন্ত স্বীকৃতি দেননি। যজ্ঞ, মন্ত্র, জপ, যন্ত্র, এই সবই তাঁরা অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় নির্দিষ্ট করেছেন—একবার নয় বারবার, তারপর কোথাও গিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জড় বিজ্ঞান সাক্ষী, যে কোনো বস্তু পুড়ে গেলেও ধ্বংস হয় না। এটি বায়ুবাহিত হয়ে মহাশূণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। লংকা বা মরিচ পুড়িয়ে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দিলে তা বাতাসে মিশে দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ হাঁচি দেয়, আর একইভাবে যজ্ঞে দেওয়া উপকরণ এবং ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর জিনিস বায়ুবাহিত হয়ে বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য মানুষ দৈহিক উপকার লাভ করে, রোগের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়, রোগ না ছড়িয়ে দূরে চলে যায়। আর যজ্ঞের ধোঁয়া আকাশে গিয়ে মেঘের সঙ্গে মিশে যায়। বছরের পর বছর জল নিয়ে পৃথিবীতে এলে পুষ্টিকর খাদ্য ও গাছপালা উৎপন্ন হয়, যা খেলে মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে। মন্ত্র জপের ধ্বনি-কম্পন ও যজ্ঞের ধোঁয়া শক্তিশালী হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। অনেক উদ্দেশ্যে, অনেক ইচ্ছা পূরণের জন্য, অনেক নিয়ম-নীতি সহ অনেক বিশেষ যজ্ঞও করা যেতে পারে ফলে সুরক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই আধ্যাত্মিক উপায়ে নিরাময়ের জন্য যজ্ঞের চেয়ে উত্তম কর্ম আর কিছু হতে পারে না।

নবরাত্রি সাধনা

এবার আসি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক মানুষের জন্য একটি আবশ্যিক পূজা প্রসঙ্গে। এই পূজাকে ব্রতও বলা যেতে পারে। এই ব্রতটি হল 'নবরাত্রি'। শক্তি-সাধক যেমন বছরে চারটি নবরাত্রি নবরাত্রি বিভিন্ন উপায়ে পালন করেন তেমনই সাধারণ ও অদীক্ষিত ভক্ত মানুষ ঘরোয়া ভাবে নবরাত্রি ব্রত উদযাপন করতে পারেন।

নবরাত্রি হল নয় রাত্রি ব্যাপী হিন্দুদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। যদিও বৎসরে চারটি নবরাত্রি উৎসব পালন করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে শারদ নবরাত্রি ও বসন্ত নবরাত্রি গৃহীদের জন্য বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়া আষাঢ় ও মাঘ মাসে যে দুটি নবরাত্র পালন করা হয় তা গুপ্ত নবরাত্র নামে পরিচিত, সেগুলি সাধক কূলের জন্য প্রশস্ত। শারদ নবরাত্রি শুরু হয় আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে এবং নবমী পর্যন্ত চলে। হিন্দুরা ছাড়াও শিখ ও জৈন ধর্মের মানুষেরাও নবরাত্রি পালন করে থাকেন। নবরাত্রি ব্রতের সময় মা দুর্গার নয়টি রূপের পূজা করা হয়। শ্রী শ্রী চণ্ডী বা দুর্গা সপ্তশতীর দেবীকবচ মতে নব দুর্গারা হলেন—

প্রথমং শৈলপুত্রী চ দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কূষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।।৩।।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নীতি চ।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।।৪।।
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা।।৫।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দেবী শৈলপুত্রী (পর্বতের কন্যা), ব্রহ্মচারিণী (যিনি ব্রহ্মাকে স্বয়ং জ্ঞান দান করেন, ভক্তকেও ইনি ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান), চন্দ্রঘন্টা (দেবীদুর্গার মহিষাসুর বধের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত ঘন্টা যার মধ্যে গজরাজ ঐরাবতের মহাশক্তি নিহিত ছিল, চন্দ্রের চেয়েও লাবণ্যবতী ইনি), কুষ্মান্ডা (উষ্মার অর্থ তাপ। দুর্বিষহ ত্রিতাপ হল কুষ্মা, আর যিনি এই ত্রিতাপ নিজের উদরে বা অন্ডে ধারণ করেন অর্থাৎ সমগ্র সংসার ভক্ষণ করেন ইনি), স্কন্দমাতা (দেব সেনাপতি কার্তিকেয় বা স্কন্দের মা), কাত্যায়নী (কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে দেবকার্যের জন্য আবির্ভূতা—ইনি বৃন্দাবনে দেবী গোপবালা রূপে পূজিতা। ব্রজের গোপবালারা এই কাত্যায়নীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তাই ব্রজের দুর্গার নাম কাত্যায়নী), কালরাত্রি (ঋগ্বেদের রাত্রিসুক্তে পরমাত্মাই রাত্রিদেবী। মহাপ্রলয়কালে এই রাত্রিরূপিণী মাতার কোলেই রিলয় হয় বিশ্বের। অনন্ত মহাকাশে নৃত্যরত কালভৈরবের দেহ থেকেই আবির্ভূতা ইনি দেবী যোগনিদ্রা মহাকালিকা বা কালরাত্রি নামে আখ্যাত), মহাগৌরী (তিনি সন্তানবৎসলা, শিবসোহাগিনী, বিদ্যুদ্বর্ণা মা দুর্গার প্রসন্ন মূর্তি) এবং সিদ্ধিদাত্রী (অপরূপ লাবণ্যময়ী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, প্রাতঃসূর্যের মত রঞ্জিতা যোগমায়া মাহেশ্বরী ইনি সকল কাজে সিদ্ধি প্রদান করেন)।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই প্রথম মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গার এই নয়টি রূপের বর্ণনা ও মহিমা প্রকাশিত। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা শেষ হওয়ার সাথেসাথে কৃষ্ণপক্ষের বা পিতৃপক্ষের অবসান হয় ও দেবীপক্ষের সূচনা হয়। পরদিন অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত ন'টি রাত্রি অবধি দুর্গার নয়টি রূপের পুজো চলে। মূলত এটি শক্তির আরাধনা।

নবদুর্গা ও নবগ্রহের সম্পর্ক —

১. শৈলপুত্রী সূর্যগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
২. ব্রহ্মচারিণী রাহুগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
৩. চন্দ্রঘন্টা কেতুগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
৪. কুষ্মান্ডা চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
৫. স্কন্দমাতা মঙ্গলগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
৬. কাত্যায়নী বুধগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
৭. কালরাত্রি শনিগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
৮. মহাগৌরী বৃহস্পতিগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
৯. সিদ্ধিদাত্রী শুক্রগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

নবরাত্রি পূজার প্রয়োজনীয় সামগ্রী —

০১) দেবী দুর্গা অথবা নবদুর্গার একটি ফটো।
০২) একটি শাড়ী/ দোপাট্টা মায়ের চরণে নিবেদনের জন্য।
০৩) একটি কাঠের চৌকি। এক টুকরো লাল কাপড় বা শালু।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

০৪) দুর্গাসপ্তশতী বই।।
০৫) একটি ঘট, একটি ঢাকনা।
০৬) একটি গামলা জাতীয় মাটির পাত্র, বালি ও মাটি।
০৭) কিছু যবের দানা।
০৮) আমপল্লব/অশোকগাছের পল্লব।
০৯) রোলি, মৌলী, আতপচাল, সুপারী, পান, এলাচ, লবঙ্গ।
১০) নারকেল।
১১) আবীর, কুমকুম, ধূপ/আগরবাতি।
১২) চন্দনকাঠ ও পিড়ি।
১৩) জবাফুল ছাড়াও বিভিন্ন ফুল, প্রতিকৃতির জন্য মালা।
১৪) বেদানা, কলা ছাড়াও বিভিন্ন ফল।
১৫) প্রসাদের জন্য লাড্ডু।
১৬) অখন্ড প্রদীপ।
১৭) পূজার থালা, ঘন্টা।

নবরাত্রির প্রথমদিন একটু বেশি সময় দিতে হবে। তাই সকাল সকাল স্নান করে তৈরী হতে হবে। তা না হলে, সঠিক মূহুর্তে ঘটস্থাপন হবে না। আর তা যদি না হয়, তবে পুরো পরিশ্রম বিফল। অখন্ড প্রদীপ জ্বালানো হলে ঘর খালি রাখা যাবে না। বাড়িতে সর্বদাই কোন একজনকে অবশ্যই থাকতে হবে।

প্রথমদিন যে তিনটি কাজ করতে হবে—

০১) একটি কাঠের চৌকি নিতে হবে। তার উপর লাল কাপড় বা শালু পেতে সেটি মৌলি দিয়ে চৌকির সাথে বেধে নিতে হবে। তার উপর মায়ের প্রতিকৃতিটি রাখতে হবে। সেটিকে ফুল দিয়ে ভালো করে সাজাতে হবে। যদি কারো বাড়িতে দুটি দুর্গাসপ্তশতী বই থাকে, তাহলে একটি চৌকির উপর রেখে তারও মায়ের সাথে নিত্য পূজা হবে। আর যদি একটি বই থাকে তাহলে পূজার পর সেটিকে নিয়ে পাঠ করে আবার সেখানেই রেখে দিতে হবে।

০২) একটি মাটি বা পিতল বা তামার ঘট নিতে হবে। সেটি গঙ্গা বা বিশুদ্ধ জল দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। সেই ঘটের ভিতর একটি সুপারি, একটি কয়েন, আতর বা সেন্ট, ফুল ইত্যাদি দিতে হবে। তারপর একটি আম বা অশোক গাছের পাঁচপাতা যুক্ত পল্লব দিতে হবে। এর উপরে একটি সরা বা তামার পাত্র ঢাকনা হিসাবে দিতে হবে। সেই পাত্রটি চাল দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। সেই চালের উপর একটি নারকেল রাখতে হবে। কিন্তু এই নারকেলটি আগেই লাল শালুতে মুড়ে মৌলী দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। কিছুটা মাটি নিয়ে তার উপর ঘটটিকে স্থাপন করতে হবে। কিছুটা রোলি মাটির চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

০৩) একটি মাটির পাত্র (গামলা জাতীয়) নিতে হবে। সেটি মাটি এবং বালি দিয়ে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পূর্ণ করতে হবে। তার উপর যবের দানা ভালো করে ছড়িয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। ওপর থেকে হালকা জল ছড়িয়ে দিতে হবে। পরে এই পাত্রটিকে মায়ের প্রতিকৃতির সামনে রেখে দিতে হবে। সমস্ত কাজই পঞ্চাঙ্গের শুভ মুহূর্ত দেখে করতে হবে। তাহলে মায়ের কৃপালাভ সম্ভব হবে।

এই বার অতি সাধারণভাবে ঘরে পূজা করার নিয়ম বলছি—

০১) আসন পাতা হলে তার উপর বসে প্রথমেই প্রদীপ জ্বালতে হবে এবং ধূপ দিতে হবে। এরপর সমস্ত দেবদেবী এবং পবিত্র নদীদের আবাহন করে প্রার্থনা জানাতে হবে যে, ঘটমধ্যস্থিত জল যেন পবিত্র জলে পরিণত হয় এবং সমস্ত দেবদেবীগন যেন আগামী নয়দিন যাবৎ ঘটে অধিষ্ঠান করেন। সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করেন এবং জ্ঞান দান করেন। এরপর ঘটে সমস্ত দেবদেবীর পঞ্চোপচারে পূজা করতে হবে।

০২) এরপর মায়ের প্রতিকৃতিতে পূজা করে প্রার্থনা জানাতে হবে, মা দুর্গা যেন নবরাত্রির নয়দিন গৃহে অধিষ্ঠান করেন এবং তার চরণে ভক্তকে ঠাঁই দেন। মায়েরও পঞ্চোপচারে পূজা হবে।

০৩) এরপর ঘন্টা বাজিয়ে মায়ের আরতি করতে হবে। সন্ধ্যাবেলায় আবার মায়ের আরতি হবে।

০৪) নবরাত্রি চলাকালীন সবকিছু আহার করা যায় না। আবার কেউ একবার আহার করেন।

০৫) নবমদিনে ৫-১২ বছর বয়সী ও নিজ সাধ্যমত ১-৯ জন কন্যাকে ভোজন করাতে হবে। সাথে কিছু দক্ষিণা ও উপহার দিতে হবে।

০৬) দশমদিনে হাতে কিছু ফুল এবং চাল নিয়ে ঘটস্থিত সমস্ত দেব-দেবীগনকে এই নয়দিন উপস্থিত থেকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে এবং স্বস্থানে প্রস্থান করার জন্য অনুরোধ করতে হবে সাথে পরবর্তী সময় আবার আবাহন করলে যেন তারা আসেন এবং কৃপা করেন এই অনুরোধ জানিয়ে ফুল ও চাল উৎসর্গ করতে হবে। এরপর 'ক্ষমস্ব' বলে ঘটটিকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে।

০৭) মায়ের প্রতিকৃতির সামনেও একই অনুরোধ জানিয়ে ছবিটিকে তার নিজ স্থানে রেখে দিতে হবে।

০৮) ঘটের নারকেলটি প্রসাদ হিসাবে খাওয়া হবে। ঢাকনার উপর যে চাল দেওয়া ছিল তা পাখিকে খাওয়াতে হবে। ঘটের জল বাড়ির সর্বত্র ছিটাতে হবে। ঘটের ভেতরের কয়েনটি টাকার সাথে রেখে দিতে হবে।

০৯) যবের চারগুলি থেকে কিছু মা দুর্গাকে নিবেদন করে সেগুলি ঘরে রেখে দিতে হবে। বাকি চারাগুলি কোন অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় পুঁতে দিতে হবে। ঘটটি বাড়িতে রেখে দেবেন, অন্যকাজে ব্যবহার করা যাবে।

১০) প্রতিদিন দুর্গাসপ্তশতী নিজে পাঠ করতে হবে বা অন্যকে দিয়ে পাঠ করাতে হবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নবরাত্রির প্রতিদিনের আরাধ্য দেবী ও তাঁর মন্ত্র।

১ম দিন - মা শৈলপুত্রী	ওঁম্ শ্রী শৈলপুত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।
২য় দিন - মা ব্রহ্মচারিণী	ওঁম্ শ্রী ব্রহ্মচারিণী দুর্গায়ৈ নমঃ।
৩য় দিন - মা চন্দ্রঘন্টা	ওঁম্ শ্রী চন্দ্রঘন্টা দুর্গায়ৈ নমঃ।
৪র্থ দিন - মা কুষ্মাণ্ডা	ওঁম্ শ্রী কুষ্মাণ্ডা দুর্গায়ৈ নমঃ।
৫ম দিন - মা স্কন্দমাতা	ওঁম্ শ্রী স্কন্দমাতা দুর্গায়ৈ নমঃ।
৬ঠ দিন - মা কাত্যায়নী	ওঁম্ শ্রী কাত্যায়নী দুর্গায়ৈ নমঃ।
৭ম দিন - মা কালরাত্রি	ওঁম্ শ্রী কালরাত্রি দুর্গায়ৈ নমঃ।
৮ম দিন - মা মহাগৌরী	ওঁম্ শ্রী মহাগৌরী দুর্গায়ৈ নমঃ।
৯ম দিন - মা সিদ্ধিদাত্রী	ওঁম্ শ্রী সিদ্ধিদাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।

নয় দিন ধরে মায়ের এই নব রূপের আরাধনা করলে কোন কিছুই তার পথের বাধা হতে পারে না, তার নীরোগ দেহ লাভ হয়, পরিবারে শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখা দেয়।

নবরাত্রি পূজার ভোগ নিয়ে বিশেষ কিছু নিয়ম পালন করা উচিত। নীচে যা দেওয়া হচ্ছে তা বিশেষ ভোগ। তবে এমনটি নয় যে ঐ ভোগ ছাড়া মায়ের পূজা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তবে প্রত্যহ মায়ের প্রিয় ফল বেদানা সাথে কলা (মর্তমান অথবা কাঁঠালিকলা) এবং হলদে লাড্ডু দিয়ে পূজা করতে পারলে ভালো হয়। মায়ের প্রিয় ফুল জবা দিতে পারলে ভালো হয়। তবে সর্বোপরি ভক্তি, এটি না থাকলে সবই বৃথা।

০১) নবরাত্রির প্রথমদিন মাতা শৈলপুত্রীর পূজা করা হয়। সেদিন মা কে (চরণতলে) শুদ্ধ গব্য ঘৃত উৎসর্গ করা হয়। এটি করার কারণ নীরোগ শরীর লাভ।

০২) দ্বিতীয়দিন মাতা ব্রহ্মচারিণীর পূজা করা হয়। ভোগ হিসাবে দেওয়া হয় চিনি। পরিবারের সকলের দীর্ঘায়ু কামনায় এমনটি করা হয়।

০৩) তৃতীয়দিন মাতা চন্দ্রঘন্টার পূজা করা হয়। ভোগ হিসাবে দেওয়া হয় ক্ষীর, দুধ বা দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন। সকল দুঃখের অবসান এবং সুখ ও আনন্দের জন্যই এমনটি করা হয়।

০৪) চতুর্থদিনে মাতা কুষ্মান্ডার পূজা করা হয়। ভোগ হিসাবে দেওয়া হয় মালপোয়া। বুদ্ধির বিকাশ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভের জন্যই এমনটি করা হয়ে থাকে।

০৫) পঞ্চমদিনে মাতা স্কন্দমাতার পূজা করা হয়। ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয় কলা(মর্তমান অথবা কাঁঠালিকলা)। সুস্বাস্থ্য কামনায় এমনতর ভোগ নিবেদন।

০৬) ষষ্ঠদিনে মাতা কাত্যায়ণীর পূজা করা হয়। ভোগ হিসাবে অর্ঘ্য দেওয়া হয় শুদ্ধ মধু। ব্রতীর আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধির জন্যই এমন অর্ঘের ব্যবস্থা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

০৭) সপ্তমদিনে মাতা কালরাত্রীর পূজা করা হয়। ভোগ হিসাবে দেওয়া হয় গুড়(আখের গুড়)। অনাগত দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এমনটি করা হয়।

০৮) অষ্টমদিনে মাতা মহাগৌরীর পূজা করা হয়। ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয় নারকেল। নিঃসন্তানরা সন্তান কামনায় এমনটি করে থাকেন।

০৯) নবম অর্থাৎ শেষদিনে পূজা করা হয় মাতা সিদ্ধিদাত্রীর। ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয় তিল। ইচ্ছাপূর্তি এবং কোন অশুভ ঘটনা থেকে বাঁচতেই এমনটি করা হয়।

এই নবম দিনেই 'কুমারী পূজা' করা হয়। সাথে তাদের ভোজন, দক্ষিণা ইত্যাদি দান করা হয়। সকলেই তার সাধ্যমত মায়ের পূজন, দান-দক্ষিণা ইত্যাদি কর্ম করবেন। ব্রতপালন বিষয়ে অতি সাধারণভাবে বলা হল। তাই মন্ত্রের জটিলতা বা নিত্যহোম প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি।

এবার যোগসাধন বিষয়ে বলি। নবরাত্রিতে দেবী পার্বতীর দুর্গা পুজোয় যোগসাধনার যোগপদ্ধতি অত্যন্ত উচ্চ মার্গের সাধনক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এই নবরাত্রির প্রথম দিনের পুজোয় যোগীগণ তাদের মনকে 'মূলাধার' চক্রে স্থিত করেন, যা মানুষের শরীরের অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠিত 'কুলকুণ্ডলিনী' রূপে বিরাজমানা। স্বয়ং মহাশক্তি, দৈবী ও ঐশী শক্তি, মহামায়া, মহাদুর্গা রূপে তিনি মূলাধারে স্থিতা।

নবদুর্গা রূপের প্রথম দিনের রূপটি হল, 'শৈলপুত্রী', সাধক এই দিন তার আগামী নয় দিনের সাধ্য কর্মের সংকল্প করে ঘট স্থাপনা করেন। নবরাত্রি উৎসবের প্রথম দিনে (প্রতিপদ) মা শৈলপুত্রীর পূজা করা হয়। শৈলপুত্রী আক্ষরিক অর্থে পাহাড়ের কন্যা। তার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের সম্মিলিত শক্তি আছে বলে কথিত। নবরাত্রির প্রথম দিনে দেবী শৈলপুত্রীকে খাঁটি ঘি নিবেদন করে ভক্তরা একটি সুস্থ জীবন অর্জন করতে পারেন।

দ্বিতীয় রূপটি হল 'ব্রহ্মচারিণী'। বেদ গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে। এই দিন সাধক তার মনকে মূলাধার থেকে সাধনবলে 'স্বাধিষ্ঠান' চক্রে স্থিত করেন যোগসাধনার মাধ্যমে।

নবরাত্রি আরাধনার তৃতীয় দিনে মা দুর্গার তৃতীয় শক্তির নাম 'চন্দ্রঘণ্টা', উপাসনায় যোগী তার মনকে 'মণিপুর' চক্রে প্রবিষ্ট করান।

মা দুর্গার চতুর্থ রূপের নাম হল 'কুষ্মাণ্ডা', এই চতুর্থী তিথিতে সাধকের মন 'অনাহত' চক্রে অবস্থান করে।

মহাপঞ্চমীতে দেবী দুর্গা 'স্কন্দমাতা' রূপে পূজিতা হন। এই দিনে সাধক তার মনকে 'বিশুদ্ধ' চক্রে স্থাপন করেন।

দেবী দুর্গাকে প্রথম আরাধনা করেন মহর্ষি কাত্যায়ন—কন্যারূপে। তাই দেবী দুর্গা মহাষষ্ঠীতে 'কাত্যায়নী' রূপে পূজিতা হন। শ্রীকৃষ্ণ-সহ সমস্ত গোপ ও গোপী দেবী

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কাত্যায়নীর পূজা করেন, এর উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। দেবী কাত্যায়নীর আরাধনায় সাধক পরবর্তীকালে 'আজ্ঞা' চক্রে তার মনের উত্তরণ ঘটান।

দুর্গাপুজার সপ্তম দিনে মহাসপ্তমীতে দেবী দুর্গাকে 'কালরাত্রি' রূপে পূজা করার বিধান। সে দিন সাধকের মন 'সহস্রার' চক্রে অবস্থান করে।

মহাষ্টমীতে দেবী দুর্গার রূপ হয় 'মহাগৌরী'—সন্ত তুলসীদাস এই দেবীর উপাসনা করতেন। এই দিন সাধক 'সন্ধিচক্র'-এ অধিষ্ঠিত হন।

নবদুর্গার শেষ রূপটি হল 'সিদ্ধিদাত্রী'। সিংহবাহিনী দেবীর চার হাতে আশীর্বাদী মুদ্রা। তিনি সিদ্ধি দান করেন। অর্থাৎ তার উপাসনায় সংসারে আসে সুখ এবং সমৃদ্ধি। সবাইকে বরাভয় দেন এই মাতৃকামূর্তি। দেবীভাগবত্ পুরাণে আছে, স্বয়ং মহাদেব দেবী পার্বতীকে সিদ্ধিদাত্রী রূপে পুজো করেছিলেন। তার ফলেই মহাদেব সকল সিদ্ধি লাভ করেন। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'-এ 'সিদ্ধিদাত্রী' অষ্টভুজা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে 'সিদ্ধিদাত্রী' অষ্টাদশভুজা রূপে বর্ণিত। 'সিদ্ধিদাত্রী' চতুর্ভুজা রূপেও দেখা যায়। সেখানে তিনি শিবের আরাধ্যা। এই হল নবদুর্গার চর্চিত কাহিনী। মূলতঃ নবরাত্রি ব্রত হল আত্মসাধনার এক গূঢ় সাধন প্রক্রিয়া। আপনি যদি এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন তো শ্রী গুরুদেবের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী নবরাত্রিতে এই ব্রত পালন করুন।

আসলে নবরাত্রিতে মহাদেবীর বা শক্তির বোধন করার এক প্রকৃষ্ট সময়; বোধন অর্থে জাগরণ। জীবের প্রাণশক্তি মহাদেবী দুর্গা (শক্তি) মানবদেহে সুপ্তাবস্থায় রয়েছেন, প্রাণায়ামের সাহায্যে ঐ দেবীর জাগরণ বা বোধন হয়ে থাকে। সাধক নিজের পুজো নিজে করেন, মানে নিজ দেহস্থিত সুপ্ত প্রাণশক্তিকে প্রাণায়ামের সাহায্যে জাগ্রত করেন; প্রাণশক্তি জাগ্রত হলেই সাধক জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে লিখিত রয়েছে—'যা দেবী সর্বভুতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।' অর্থাৎ যে দেবী সর্বপ্রাণীতে প্রাণশক্তি রূপে অবস্থিত; ঐ প্রাণশক্তি নিরাকারা দেবীকে প্রাণায়ামের সাহায্য নমস্কার করছি। মন্ত্রটি তিন বার নমস্তস্যৈ শব্দ উল্লেখ হওয়ায় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, অধম, মধ্যম ও উত্তম প্রাণায়ামের সাহায্যে মহাদেবীকে প্রণাম করতে হবে।

মানুষের দেহমধ্যে নয়টি চক্রে (মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা চক্র, ললনা চক্র, মনশ্চক্র ও সোমচক্র—এই নয়টি চক্র মানবদেহে অবস্থিত) দেবীশক্তি অবস্থিত বলে শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা প্রভৃতি নয়টি প্রাণশক্তি রূপে নয়টি চক্রে পূজিতা হন। প্রত্যেক চক্রে নবদুর্গার উপাসনা করে চক্রাতীত হতে হবে; এই নয়টি চক্রের মাঝে তিনটি জায়গায় বাঁধ দেওয়া আছে—বাঁধ তিনটি মুলাধারে, মনিপুরে ও আজ্ঞা চক্রে অবস্থিত, এদেরকে গ্রন্থি বলে; গ্রন্থি তিনটিকে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণু গ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি বলে। যোগী সাধক গ্রন্থিভেদ করে সহস্রার পদ্ম-রূপ কৈলাসে উপনীত হন। মুলাধারের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মুলাধার পদ্ম থেকে সহস্রার পদ্মে নিয়ে বসিয়ে দেওয়াকে দেবীর নিসর্জন বা নিরঞ্জন বলে। দেবীর বিসর্জনে জীবাত্মার বিসর্জন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হয় বা ঐ সময়ে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হওয়ার পদ্ধতিই হলো নবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য।

তন্ত্রশাস্ত্রে এমন সহজ ব্রত-উপবাস করার কথা হলেও তন্ত্র মূলতঃ ক্রিয়ামূলক সাধনা। তাই তন্ত্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের মতোই এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো শিবশক্তির মিলন। আদি শঙ্করাচার্য রচনা করেছিলেন—

আত্মা ত্বং, গিরিজা মতিঃ, সহচরাঃ প্রাণাঃ, শরীরং গৃহং,
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রাঃ সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চার পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ।
যদ্ তৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।।

অর্থাৎ—হে প্রভু, তুমিই আমার আত্মা, গিরিজা আমার মতি, আমার প্রাণবায়ু তোমার সহচর, এই দেহই তোমার মন্দির। আমার বিষয় উপভোগই তোমার পূজা, নিদ্রাই আমার সমাধির অবস্থা। বিষয়-কার্যে ভ্রমণই তোমাকে প্রদক্ষিণ করা এবং আমার উচ্চারিত সকল বাক্যই তোমার স্তুতি। আমি যে যে কাজ করে থাকি, সব কিছুই তোমার আরাধনা।

কিন্তু তন্ত্র শুধু মাত্র আমাদের দৈনন্দিন কর্মকে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীকে স্মরণ করে চলতে বলে না, বরং নতুন নতুন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, বৈদিক জীবনধর্মের কঠিন কঠিন ক্রিয়াকে আরও সরলীকরণ করে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। তাই 'তন্ত্রের মূল সাধনা হল কুলকুণ্ডলিনীরূপী মহাশক্তিকে জাগ্রত করে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরম শিবের আবাসে পৌঁছে মহাচৈতন্যরসে নিজেকে অভিষিক্ত করা। তন্ত্র সাধকরা মনে করেন এই মহাবিশ্ব শিবশক্তি ও মাতৃশক্তির অপার লীলা। জীবদ্দশাতেই পরমশিবের আবাসে পৌঁছানো।

বাংলা ও তন্ত্র

বাংলার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বঙ্গদেশ শাক্ত-সাধনাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

'ত্রিধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতি স্বয়ং।
মায়া বিদ্যা চ পরমেত্যেবং সা ত্রিবিধাপ্পভবৎপ্প
মায়া বিমোহিনী পুংসাং যা সংসার-প্রবর্তিকা।
পরিস্পন্দানিশক্তির্যা পুংসাং যা পরমা মতা।
তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা চৈব সা সংসার-নিবর্তিকাপ্প'

অর্থাৎ, মূলপ্রকৃতি পরব্রহ্ম ভগবতী স্বয়ং স্বেচ্ছায় নিজ শক্তিকে মায়া, বিদ্যা এবং

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পরমা এই ত্রিবিধরূপে বিভক্ত করেন।

—ভগবতীর অবিদ্যারূপী মায়াশক্তি বিমোহিনী সংসার-প্রবর্তিকা শক্তি, ভগবতীর এই মায়া-শক্তি সংসার বন্ধনের মূল।

—যে শক্তি পরিস্পন্দাদি ব্যাপার-বিধায়িনী চৈতন্যময়ী সঞ্জীবনী শক্তি সে ভগবতীর পরমা শক্তি।

—আর তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা সংসার-নিবর্তিকা শক্তি হলো ভগবতীর বিদ্যা-শক্তি। ভগবতীর এই বিদ্যা-শক্তি হলো সংসার হতে মুক্তির হেতু, শুদ্ধবিদ্যা।

সাধক এই শুদ্ধবিদ্যা লাভ করতে চান। শাস্ত্র বলছেন—'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানম্ অনেন ইতি তন্ত্রম্', অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তাকে তন্ত্র বলে কিম্বা বলা হয়েছে— 'তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বমন্ত্র-সমন্বিতান্', অর্থাৎ যে শাস্ত্রে তত্ত্ব ও মন্ত্রকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে।

এখানে তত্ত্বের অর্থ হলো মহাজাগতিক মূলতত্ত্বের বিজ্ঞান আর মন্ত্রের অর্থ হলো অতীন্দ্রিয় শব্দের বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের মধ্যে প্রয়োগ-সম্বন্ধ আছে যার ফলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করা যায়। প্রকৃত পক্ষে, ব্রহ্ম বা শিবের পরম সত্যের সঙ্গে তাঁর শক্তির প্রকাশস্বরূপ এই বিশ্বের বৈধতাকে সংযুক্ত করে তন্ত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—এই তিন হল তন্ত্রের আধার।

সহজ কথায় বলতে গেলে সকল বিষয়ের নেপথ্যে রয়েছে তিনটি শক্তি, জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া। মহামায়া বা মহাশক্তি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াময়ী হয়ে কুলকুণ্ডলিনী চক্রে ঘুমিয়ে থাকেন। তন্ত্র সাধনায় একজন সাধক সেই মহাশক্তিকে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে প্রকাশ করেন এবং সেই শক্তিতে নিজেকে ভূষিত করেন। কারণ, শক্তি না থাকলে জগতে ন্যায়, ধর্ম কিছুই নিরাপদ থাকে না। আর শক্তিহীনের দ্বারা আত্মজ্ঞানও লাভ হয় না। তাই উপনিষদে আছে—

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সেই শক্তি মায়া, মহামায়া এবং যোগমায়া নামে অভিহিত হয়েছেন। সেখানে কৃষ্ণ পার্থকে বলছেন —

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।'

অর্থাৎ, মায়া যখন অবিদ্যা তখন সেই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে সমর্পণ করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। এই মহামায়ার সংসারে জাগতিক চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেয়ে বিদ্যারূপী পরম ব্রহ্মস্বরূপ বা যোগস্বরূপ মায়াকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সকল জাগতিক চাহিদা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পরিত্যাগ করে আমার স্মরণ নাও। মায়ার সংসারে জীবকুল জাগতিক বিষয়-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাই আমি তাঁদের গোচর হই না। মূঢ় লোকে তাই আমাকে অজ ও অব্যয় বলে জানতে পারেন না।

শাক্ত সাধক জানেন, শ্রী শ্রী চন্ডীতে যিনি আদি পরাশক্তি তিনিই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া এবং মহামায়া হিসাবে অবস্থান করছেন। এই শক্তি শুধু শরীরের নয়—এই শক্তি মানসিক শক্তি, অর্থ শক্তি, বিদ্যা শক্তি, জনশক্তি—পৃথিবীর সকল বস্তু, এমন কি জড়ের অন্তরালে যে মহাশক্তি সুপ্ত হয়ে আছেন, সেই আদিশক্তিই মূলশক্তি। মানব হৃদয়ে মনে যদি দুঃখীর দুঃখ দূর করার ইচ্ছা হয়, অর্থশক্তি না থাকলে তা হতে পারে না। যদি প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে হয় তবে শারীরিক শক্তি না থাকলে সম্ভব হয় না। যদি কঠোর সাধনার শক্তি না থাকে তবে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কাজেই জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্বপ্রকার শক্তি অর্জন অবশ্যই প্রয়োজন। তাই প্রাচীন কাল থেকে বাঙালী নিরন্তর সেই মহাশক্তি, মহামায়া, মহাদেবী, মহাবিদ্যা, আদ্যাশক্তি কালীর আরাধনা করে এসেছে।

তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে মন্ত্র ও যন্ত্র। যন্ত্র এখানে দর্শন বা রূপকল্পের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অবিদ্যাকে গ্রাস করে জ্ঞানশক্তির উন্মোচন করে তন্ত্র। আর প্রাকৃতিক শক্তিকে চৈতন্যময় করাই তন্ত্রের উদ্দেশ্য।

তন্ত্র অসীম শক্তির আধার। তন্ত্র সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের পরিচালনা শক্তি। তাই তো তন্ত্র বিদ্যা অতি গোপন বিদ্যা, এ এক বৃহৎ ও গোপন বিষয়। প্রকৃত গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে গুরু নির্দেশিত পথে তন্ত্র সাধনা করতে হয়। দীক্ষা ছাড়া গুরু কাউকে এই পথের সন্ধান দিতে চান না। তন্ত্র হল মুক্তি পথের দিশারী, দাসত্বে আটকে রাখার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি নয়। অদীক্ষিত ব্যক্তি কখনওই তন্ত্রসাধনায় অংশ নিতে পারেন না, এমনকি তন্ত্রসাধনা দেখার বিধানও নেই। আর এই তন্ত্রের মূল উৎপত্তি হল এই বৃহত্তর বাংলা, যাকে প্রাচীন কালে 'গৌড়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুর্ম্ম এবং লিঙ্গ পুরাণেও গৌড়ের উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদি খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্র এবং গৌড় সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থান করছে। নানা শিলালিপি ও তাম্রশাসনে সেই গৌড়ের উল্লেখ আছে। গৌড়, চেদি, মালব, বেরার সীমান্ত অবধি বিস্তার লাভ করেছিল।

শক্তিসংগম তন্ত্রে বলা হয়েছে—বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।

এহেন সুপ্রাচীন রাঢ় তথা গৌড় বঙ্গের সুপ্রাচীন সনাতন ধর্ম তার সকল মান ও ঐতিহ্য নিয়ে অবস্থান করত। সেখানে নিরাকার রূপে প্রকৃতির উপাসনা হতে সিদ্ধ তন্ত্রপীঠ সকলের অবস্থান ছিল একাধারে। সেখানে অবস্থান ছিল ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের তপোবনের। সেই রাঢ় তথা গৌড়ে জন্ম হয়েছিল সুপ্রাচীন তন্ত্র সাধনার।

'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মরাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।।'

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে যেমন বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবমার্গীয়দের প্রভাবাধিক্য ছিল তেমনই শক্তিসাধক সম্প্রদায়ের প্রভাবও বড় কম ছিল না। তাঁরাও কালীকীর্তনে ধর্মজগৎ কম্পিত করে সিংহের মত বিচরণ করতেন। শাক্ত মহাত্মাগনের নাম এবং সাধন স্থানে বহু নিদর্শন সিদ্ধপীঠ, উপপীঠ নাম ধারণ করে আজও বিরাজ করছে। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান শাখাও তন্ত্রভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ওই সমস্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা বাংলার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে তাদের তন্ত্রসাধনা চালিয়ে যান। গৌড় দেশ একসময় শৈব এবং শাক্তদের লীলাস্থান ছিল। এর ফলে ৫১টি পীঠের মধ্যে রাঢ় বঙ্গেই ৯টি পীঠ রয়েছে। কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণসুবর্ণ বা কর্ণস্বর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীটি, অশ্বপ্রদ বা অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অট্টহাস—এই আটটি সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। আবার তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে বহুলা, উজাণী, ক্ষীরখণ্ড, কিরীট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, অট্টহাস, মন্দিপুর এই ৯টিকে মহাপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিব চরিত সংগ্রহ গ্রন্থে অট্টহাস, নলহাটী ও নন্দিপুর উপপীঠ বলে গণ্য হয় এবং সুগন্ধা, রণখণ্ড ও বক্রনাথ মহাপীঠ বলে গণ্য হয়।

সাধারণ সংসারী মানুষের তন্ত্র নিয়ে একরকমের ভয় মিশানো শ্রদ্ধা আছে। তন্ত্রের উদ্দেশ্য হল তত্ত্বের সিদ্ধান্তকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে রূপদান করা। কাজেই তন্ত্র অনুশীলনমূলক সাধনা। তন্ত্র বিষয়টা গুহ্য ও গুরুমুখী বলে তন্ত্রের কিছু গোপন বিধি রূপে পরিচিত—পঞ্চমুন্ডি আসনে সাধনা, শব সাধনা, প্রেত সাধনা, ডাকিনী সাধনা, বেতাল সাধনা, পিশাচিনী সাধনা, পঞ্চ ম-কার সাধনা ইত্যাদি লোকমুখে বা বই পড়ে জেনে ও শুনে মানুষ প্রথমেই ভয়-ভীত হয়। এছাড়া ষটকর্মে সিদ্ধ হতে গেলে তন্ত্রানুশীলনে অনেক রকমের ভয়ংকর ও কঠিন সাধনা কখনও কখনও করতে হয়। সাধারণ মানুষ এই সকল সাধনায় ভয় পেয়ে থাকেন। ভয়ংকর ও কঠিন সাধনার মধ্যে একটি হল পঞ্চমুণ্ডি আসন সিদ্ধি। আমি বিভিন্ন শ্মশানে, তীর্থ স্থান, সাধু-মহাত্মাদের আশ্রম, জঙ্গলের ভিতরের সাধুর কুঠি, পাহাড়ের নির্বান্ধব জায়গায় কোন গুহাতে, প্রত্যন্ত গ্রামের নির্জন জায়গায় কোনও নদীর ধারে কোনও গর্তে ও কোনও ভদ্রাসনে বা মন্দিরে গিয়ে নানা ধরনের সাধুসঙ্গ করেছি। তাঁদের কাছ থেকেই কিঞ্চিৎ যেটুকু জ্ঞান আহরণ করেছি তাই এখানে বলছি। সাধক বামদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সহ বহু খ্যাত ও অখ্যাত সাধক এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বেরা পঞ্চমুন্ডী আসনে বসে বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। পঞ্চমুন্ডী আসন স্থাপন করতে পাঁচটি মৃত জীবের মাথার খুলি প্রয়োজন হয় যেমন—অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে এমন চন্ডাল মানুষের মাথার খুলি, শিয়ালের খুলি, বেজির মাথার খুলি, বিষধর সাপের মাথার খুলি ও হনুমানের খুলি। অমাবস্যা তিথির মহানিশিতে এই আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক্ষেত্রে স্থান চয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকালয় থেকে দুরে, কেনও নিরালা স্থানে, জঙ্গলে, অথবা কোনো দেবস্থানেই বসানো সবচাইতে উত্তম। পাঁচটি মাথার খুলি মাটিতে স্থাপনের পর তার উপরে বসার আসন মতো করে খুব সুন্দর ভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। আসনের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জায়গাটি ভালোভাবে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা উচিত যাতে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে। আসন স্থাপনের পরে তন্ত্রসাধক অথবা সাধিকা এতে নিত্যদিন বসে সাধনা করবেন এবং পঞ্চমুণ্ডিকে সদা জাগ্রত রাখতে হবে। শাস্ত্রসম্মত ভাবে সমস্ত কাজ করতে পারলে এই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধক/সাধিকা অলৌকিক কিছু শক্তি লাভ করে থাকেন।

তন্ত্র ধর্ম ছাড়াও বাংলায় গুপ্তোত্তর যুগে বৈদিক ধর্মের উদাসীনতায় এবং বর্ণবাদ ও জাতিভেদের কারণে বাঙলায় সৃষ্টি হয়েছে একাধিক লোকধর্ম। যে হেতু জীবনের জন্যই ধর্ম তাই এই লোকায়ত ধর্ম নিয়ে একটু জেনে নিই। কোন একটি ভৌগোলিক এলাকায় দীর্ঘকাল বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘকাল ধরে আচরিত জীবনাচার, অভ্যাস, বিশ্বাস, সংস্কার ও জীবনবোধের ঘনীভূত বা জমাটবদ্ধ রূপই কালে 'ধর্ম' নামে চিহ্নিত হয়। ধর্মের অস্তিত্ব নেই বা ছিল না, এমন কোন মনুষ্যসমাজের কথা জানা যায় না। ধর্ম মানুষের সমাজজীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বস্তুত সকল সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ধর্ম এবং এটা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বতভাবে ভূমিকা পালন করে।

মানুষের মনে ধর্মের জন্ম হলেও পৃথিবীর কোন ধর্মই সর্বজনীন নয়, একে অন্যের পরিপুরক মাত্র। আবার মানবিক প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে একেকটি নতুন ধর্মমত। আর নতুন নতুন ধর্মমতই সমাজে বিভিন্ন জনপদে মানুষের জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের বিধান তৈরিতে যে সব মহাপুরুষ অবদান রেখেছেন—তাঁরাই একেক জনপদে ঐ সম্প্রদায়ের কাছে নমস্য হিসেবে পুজিত হয়ে আসছেন। এই মান্যতা থেকেই বিভিন্ন ধর্ম চিন্তকদের উপলব্ধি বোধই একেকটি নতুন ধর্মমত আবির্ভূত হয়।

আমাদের বাংলায় মানববোধের গুরুত্ব সূচীত হয় পালযুগ বা চর্যাযুগ থেকে। পরবর্তীকালে তা বিকশিত হতে থাকে নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, শাক্তপদ, বাউলগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বৌদ্ধ সহজিয়া ভিক্ষুদের রচিত বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে রয়েছে এর নিদর্শন। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'মানুষ'। মানবকুলের বৈষম্যহীন সমাজে এক অনুপম রূপকল্প এই 'চর্যাপদ'। চর্যাগীতির মানববন্দনার ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। মানববৈরী ধর্মবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিকে উঁচুতে আসন দিয়ে চণ্ডীদাস দৃপ্ত ঘোষণা করলেন—'শুন হে মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। বাংলার এই জনপদে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রচলন থাকলেও এখানে রয়েছে আরও অনেক ধর্ম সম্প্রদায়, আর অনুসৃত হচ্ছে বহু লোকধর্ম। এ যেন সত্যের সাধনায় বহুমুখী স্রোতধারা। এই স্রোতধারায় মিশে আছে ব্রাহ্ম, নাথ, বৈষ্ণব, কর্তাভজা, কিশোরীভজা, মতুয়া ধর্ম সমেত আরও বিভিন্ন সম্প্রদায়। যদিও তন্ত্রের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তবু স্বল্প পরিসরে এই বাংলার লোকধর্মগুলি সম্পর্কে একটু জেনে রাখা ভালো।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বৈদিকধর্মের ভিন্ন মতাবলম্বী ব্রাহ্মসমাজ হলো উপনিষদের অদ্বৈতবাদ নিয়ে হিন্দুধর্মের একটি নতুন মতবাদ। হিন্দুধর্ম সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাঙালি হিন্দু রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত করেন ব্রাহ্মসমাজ। তাঁরা বৈদিক বহু দেবতার পরিবর্তে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আন্দোলন জোরদার হওয়ার আগেই মাত্র ৫৯ বছর বয়সে লন্ডনে মৃত্যুবরণের পরে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে দেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের উদার অংশে পরিণত হয় ও প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ ও সর্বধর্ম সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের অমৃত উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে ক্রমশঃ হিন্দু ধর্মের বৃহত্তর অংশে মিলে যায়।

এরপর বলা যায় সৎসঙ্গের কথা। ভারতীয় সন্ত মতেরই একটি সম্প্রসারিত রূপ সৎসঙ্গ সম্প্রদায়। বাংলাদেশে এই মতের বিকাশ ও সম্প্রসারণ করেন শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী। সৎসঙ্গ বলতে বুঝায় কবীরপন্থা অনুসারে সাধুসঙ্গ ও ভজন গানের অনুষ্ঠান। কল্পতরুবৃক্ষ ও সৎসঙ্গ সমগুণ বিশিষ্ট, কল্পতরু বৃক্ষের কাছে যেমন চাহিদামতো বস্তু মেলে তেমনি সৎসঙ্গের ফলে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সৎসঙ্গের কারণে মানুষের অসম্ভব বিষয় সম্ভবপর হয়, সৎসঙ্গ মানুষকে ঊর্ধ্বগামী করে—এই হল সৎসঙ্গীদের মূল বক্তব্য। বাংলাদেশের পাবনার হিমাইতপুর নিবাসী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রকে কেন্দ্র করে জাতি, ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রত্যয়ে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, পরবর্তীকালে তাঁরা সৎসঙ্গ নামে পরিচিতি লাভ করে। জাগতিক ও পারমার্থিক বিকাশসহ জীব ও প্রাণীর সুসামঞ্জস্য বিধানে সৎসঙ্গের প্রচারক বা ঋত্বিকের থেকে দীক্ষা নিয়ে, ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি রেখে যে কেউ সৎসঙ্গী হতে পারে। সৎ সংযুক্তির সঙ্গে তদ্গতি সম্পন্ন যারা তারাই সৎসঙ্গী আর তাদের মিলন ক্ষেত্র হল সৎসঙ্গ। আর্য কৃষ্টির সংরক্ষণ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির অঙ্গীকারে সৎসঙ্গের ধর্মসম্প্রদায় সারা ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত।

পরবর্তীকালে স্বামী স্বরূপানন্দকে কেন্দ্র করে অখণ্ডমণ্ডলীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়। অযাচক ও বীর্যবানের ধর্মই হল অখণ্ডমণ্ডলী। এই সম্প্রদায়ের বেদ হল 'অখণ্ড সংহিতা'। মানবজীবনে উৎকর্ষ লাভ করতে হলে ত্যাগ, আত্মনির্ভরশীলতা, ও ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীনতা রয়েছে। অখণ্ডমণ্ডলী শুধু মাত্র কৌমার্যের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য্য নয়, দাম্পত্য জীবনেও ব্রহ্মচর্যের ধারা প্রবর্তন করেছেন। অখণ্ডমণ্ডলী মনে করে যে, নারী পুরুষ আধ্যাত্মিক সাধনার চড়াই' এবং যুগল সাধনার পরিপূরক শক্তি। অখণ্ডমণ্ডলী মূলত একেশ্বরবাদী বাংলাদেশে উদ্ভব হলেও পরিবর্তীকালে অনিবার্য কারণবশত বিহারের মানভূম জেলায় এর বিকাশ ঘটে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে অখণ্ডমণ্ডলীর স্থাপনা হয়। ঢাকা অঞ্চলের শুভ্যাঢ্যা নিবাসী বীরেন্দ্র মালো নামক মল্লবর্মণ সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। টাঙ্গাইল অঞ্চলে গোপালপুর উপজেলার ডুবাইল গ্রামের শহীদ ভূপতি মোহন সরকার এক সময় অখণ্ড মণ্ডলীর

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বাণী প্রচার করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এরা নিজেদের আরাধ্য দেবতার নামকে কর্তা বলে অভিহিত করেন। আউল চাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ঘোষপাড়াকে কেন্দ্র করে এর প্রচার ও উদ্ভব, প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ীদের মেলা বসে। কর্তাভজা সম্প্রদায়কে অনেকে বাউল মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। বাউল এবং কর্তাভজা মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও একটি আরেকটি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তা বলা যায় না। ফকির আউল চাঁদ এর প্রতিষ্ঠাতা হলেও রামশ্রবণ পাল এর প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মানুষ যখন রসবিবর্জিত আচারের মরুবালিরাশি কিংবা মূল্যহীন শব্দের ধুম্র ধূলিতে দিকভ্রান্ত হচ্ছিল তখন জীবন সত্যের অঙ্গীকারের প্রেম ও বোধিবৃক্ষের লালনের সফল প্রয়াস ও অভিযানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানব সম্প্রদায়ে এর উদ্ভব। বাংলার নিরক্ষর 'সহজ মানুষ'-এর সমাজে বুদ্ধির মুক্তি ও সংস্কারমুক্ত আত্মিক অনুশীলনের প্রয়োজনে লোকায়ত সমাজে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রসার। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হল, ১. বাণীবদ্ধ শাস্ত্র আচারের মধ্যে সত্যস্রোত আটকে থাকে না, সত্য নিত্যনতুন রূপে চির বহমান। ২. জৈবিক প্রবৃত্তিকে নির্মূল করে সাধনা নয়, প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বমুখী ও সুসঙ্গত বিকাশের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। ৩. জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে তারা বাস্তববাদী, অনুমান নির্ভর নয়। ৪. বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ভেদবুদ্ধি এবং অন্ধ বিশ্বাস ও বিচারহীন আনুগত্য নেই তারা প্রতিবাদী এবং বিবেকের নিকট দায়বদ্ধ। ৫. কায়াসাধনার মাধ্যমে পরমসত্যের উপলব্ধি ঘটে, অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য গুরুশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ৬. ধর্ম বর্তমানের বিষয়; ধর্ম ইতিহাস কিংবা অনুমান নয়।

এরপর আসে কিশোরীভজা। সহজিয়া সাধনার একটি সম্প্রদায় হল কিশোরীভজা সম্প্রদায়ের। কালাচাঁদ বিদ্যালংকার এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কালাচাঁদ গুরুগৃহে থাকাকালীন ধানভাঙার সময়ে গুরুপত্নীর গায়ে আঘাত লাগে। এতে তিনি ব্যথিত হয়ে গুরুগৃহ থেকে পালিয়ে নবদ্বীপে চলে যান। সেখানে তিনি বংশরাম স্পষ্টদায়ক ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক নেতার সংস্পর্শে এসে এক নতুন সম্প্রদায়ের শুরু করেন। সৃষ্টির আদিম শক্তি হল চির কিশোরী, চিরচঞ্চলা কন্যাকুমারী। এই মহাজগৎ ও তার প্রাণী সম্পদ যেন কিশোরীর ক্রীড়ার বস্তু, অর্ন্তনিহিত তাঁর মাতৃত্ব ও দয়ার গুণে পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাব। সৃষ্ট জীবের জন্য তিনি মাতা ও কন্যাস্বরূপ। তাকে উপলব্ধি করেই 'আমার উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী' সংগীতের উদ্ভব। কর্তাভজা ও রাধাবল্লভীদের সাথে তাঁর মতাদর্শে মিল থাকায় পণ্ডিতেরা তাঁর কর্তাভজা ও রাধাবল্লভী সংশ্লিষ্টতা অনুমান করেন। মতে সহজিয়া অথচ আচারে বৈষ্ণবরাই ছিলেন কিশোরীভজা মতের প্রচারক। আদ্বিজ ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবার জন্যই কিশোরীভজাদের দ্বার উন্মুক্ত ছিলো। তবে চক্র সাধনা অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে সীমিত। ঢাকা শহর ও তৎসংলগ্ন নমঃশূদ্র ও জেলে গ্রামগুলিতে এখনও চক্র সাধনার অবশেষ রয়েছে। সাধনার ক্ষেত্রে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এরা নারীকে অতিউচ্চ স্থান দেন। নগ্ন প্রেমলীলা নয়, প্রকৃতি ও পুরুষের আত্মিক উন্নতির জন্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে একত্রে সাধন ভজনাই তারা করে থাকেন। কেরানীগঞ্জ উপজেলার চৌকিদার হাটির সুরেন্দ্র সরকার, তোতারাম সাধু, দুখাই সাধু ও চন্দ্রবাউলের আখড়ার সেবায়েত তারাকুমার মহাশয়ের সক্রিয়তায় কিশোরী ভজন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

রামবল্লভী সম্প্রদায় কর্তাভজা সম্প্রদায়েরই একটি স্রোতধারা, আউলচাঁদ প্রবর্তিত কর্তাভজা সম্প্রদায় অনেকাংশে গোস্বামীতন্ত্রে রূপান্তরিত হলে আউল চাঁদের সত্যস্রোতে আরেকটি ধারার সৃষ্টি হয়; তার নাম রামবল্লভী সম্প্রদায়। রামবল্লভ নামের এক ব্যক্তি বাংলাদেশে এক ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। উদ্যোগী পুরুষ কৃষ্ণকিংকর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি হয়। প্রতি বছর শিবচতুর্দশীতে এই সম্প্রদায়ের মেলা বসে। রামবল্লভী সম্প্রদায় সকল ধর্মের প্রবর্তক ও সকল ধর্ম গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করে। এই সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সভায় যিশু খ্রিষ্ট, হজরত মুহম্মদ (সা.) ও গুরু নানকের ভোগ দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, ১. জাতি ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। ২. সকলের প্রতি বিনয় সম্মত আচরণে বিশ্বাসী হওয়া উচিত। ৩. সকলের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী হওয়া। ৪. পরদ্রব্য, পরস্ত্রীর প্রতি নির্মোহ। ৫. বিভিন্ন ধর্মের উপাস্য পরমসত্তা বহু নয়, ভিন্ন নয়, জাতি ভাষা কৃষ্টিভেদে একেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। বাংলার লোকায়ত মানুষের মধ্যে আউল বাউলের সমপর্যায়ের ভাবাদর্শে এই সম্প্রদায়ের জন্ম হিন্দু বাঙালির অন্তর্নিহিত, সমন্বয়ী ও প্রেমিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্মের সকল উচ্ছেদের পর তৃণমূল মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধধর্মের সাধনা সাধারণের মধ্যে দীর্ঘদিন গোপনে সাধিত হওয়ার পরে অনুকুল পরিবেশে প্রেমের স্পর্শে বৈষ্ণব, আউল, কর্তাভজা নামে এরা পরিচিতি লাভ করে। এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভগবৎ সেবার নিয়মাবলী হলো—১. ভক্তিযুক্ত প্রাণে ও নির্মল চিত্তে সবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করা কর্তব্য; ২. মিথ্যা কথা বলা, এঁটো খাবার খাওয়া, অহঙ্কার, লোভ, হিংসা করা নিষেধ; ৩. সত্য কথা বলা, সদাচার ও সত্যানুষ্ঠান পালন করতে হবে; ৪. আত্ম প্রশংসা করা, গুরুজনের নিন্দা ও বেদ শাস্ত্রের নিন্দা করা অনুচিত; ৫. কখনওই কারও সাথে কর্কশ বা অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা চলবে না; ৬. সভার মধ্যে উচ্চস্বরে কথা নিষেধ; ৭. সেবায় যেন অপরাধ না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে; ৮. শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে তদ্গত চিত্তে ঈশ্বর সেবায় নিরত থাকতে হবে; ৯. সব সময় গুরুজনের সম্মান করতে হবে; ১০. সব সময় সৎপ্রসঙ্গে মন নিবিষ্ট রাখতে হবে; ১১. সব সময়ে সকল বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত; ১২. আত্ম প্রশংসা, বিবাদ, কলহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করতে হবে; ১৩. তর্ক করা চলবে না; ১৪. শ্রদ্ধাহীন ব্যাক্তিকে নাম উপদেশ দেওয়া যাবে না; ১৫. সকলকেই সমভাবে জ্ঞান করতে হবে; ১৬. গুরু ভজনে অবজ্ঞা করা চলবে না; ১৭.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাধু সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা কর্তব্য; ১৮. একান্তে নাম স্মরণ করতে হবে; ১৯. শুক্রবারে নিরামিষ খেতে হবে।

সত্যপীরের পিরালী সম্প্রদায়ের কথা বলি। বৌদ্ধ করব্যুহসূত্র মতে অবলোকিতেশ্বর (পদ্মপানি) এর হৃদয় থেকে নারায়ণের জন্ম, সেই হিসাবে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবজাত ও বৌদ্ধদের সত্যপূজার অবশেষ। জৈন-বৌদ্ধ যুগে তীর্থংকর ও অর্হৎ পূজার আরম্ভ অথবা সে যুগে মানুষ সাধনা বলে নরনারায়ণে পরিণত হয়। সত্যসেবা সাধনার গুণে তীর্থংকর এবং অর্হৎগণ সাধারণ মানুষের পূজা পেতে থাকেন এবং পরে তা সঙ্গত কারণে যোগী, দরবেশ, পীর ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অনেকে পৌরাণিক অর্হৎ, নাথ যোগীকে পীরদের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে সত্যপীরের মাহাত্ম হলো—

'কৃষ্ণকেশী কেশব মোর নাম,
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যার রাম।
ফকির হইয়া আসি তোমার কারণ,
কলিতে সম্প্রতি সত্যপীর নারায়ণ।

পীর নারায়ণ সম্প্রদায় অবৈদিক ধারণার মধ্য দিয়ে মানব মিলনের প্রয়াসী। সত্য নারায়ণ বা সত্যপীর সম্প্রদায় বৌদ্ধ সাধনার ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে। পরম শ্রদ্ধেয় মছলন্ধী পীর মৎসেন্দ্রনাথকে অভিন্ন বলে মনে করা হয় অথবা দিনাজপুর জেলার সতিমন ডাঙ্গির সত্যমন ঠাকুররূপী ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ প্রতিমার মত অন্যান্য প্রতিমাগুলি পরবর্তীকালে সত্যপীরের বা সত্যনারায়াণের রূপ লাভ করেছে কিনা তা গবেষণার বিষয়।

বৌদ্ধদের পঞ্চতথাগত তান্ত্রিক বৌদ্ধযুগের অন্তিমপূর্বে লোকায়ত সামজে পঞ্চপণ্ডিতে রূপান্তরিত হয়, এই লোকায়ত সমাজ সুফি মরমিদের সংস্পর্শে ইসলামে আত্তীকরণের সময় পঞ্চতথাগতকে পঞ্চপীর বা পাঁচপীর পূজা আজও প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের রংপুর দিনাজপুরে ও ভারতের কোচবিহারে অঞ্চলে আজও পঞ্চপীর, সত্যপীর পুজো প্রচলিত রয়েছে। এক সময় মধুপুর গড় অঞ্চলে পঞ্চপীরের অনুসারীদের আখড়া ছিল।

হরি নামে মাতোয়ারা মতুয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইতিহাসের জটিল বিন্যাসে না ঢুকে সহজ কথায় বললে বলতে হয়। এক বিপ্লবী ধর্ম আন্দোলন তথা সমাজ আন্দোলনের প্রবক্তা হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মেছিলেন পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার সাফলিডাঙা গ্রামে। তিনি ও তাঁর সুপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম সাধনার ফল তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মমত, যার নাম 'মতুয়া ধর্ম'। তাঁদের ধর্ম আন্দোলন, সমাজ বিপ্লব, জীবনসাধনা বিষয়ে তাঁদের নিজের লেখা কোনও গ্রন্থ নেই। হরিচাঁদ সামান্য শিক্ষিত ছিলেন আর তাঁর পুত্রকে বর্ণ হিন্দুদের স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল না বলে মক্তবে ভর্তি করেন। এখানে পড়াশুনা করার পরে অন্যত্রও পড়াশুনা করেন। তবে তাঁদের জীবনলীলা বা কর্মসাধনা,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দর্শন, মনন ও নির্দেশ বিধৃত আছে দুটি মহাগ্রন্থে। মতুয়া ধর্মের মানুষের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র সেই দুটি। হরিচাঁদের জীবনী নিয়ে রচিত মহাকবি তারক সরকারের শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত এবং গুরুচাঁদের জীবন ও সংগ্রামের কথা লেখা আছে আচার্য মহানন্দ হালদারের শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত্র গ্রন্থে। দুটি গ্রন্থই ছন্দে বিধৃত। ভক্তদের অভিমতে যেন এ যুগের চৈতন্য চরিতামৃত।

মতুয়া শাস্ত্রে রয়েছে—

নীচ হয়ে করিব নীচের উদ্ধার
অতি নিয়ে না নামিলে কীসে অবতার,
নীচু জনে উচ্চ হবে বুদ্ধ তপস্যায়,
বুদ্ধদেব অবতার যে সময় হয়।

মতুয়াদের দ্বাদশ আজ্ঞা হলো—১. সদা সত্য কথা বলবে; ২. পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে; ৩. নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে; ৪. জগৎকে প্রেম করবে; ৫. সকল ধর্মে উদার থাকবে; ৬. জাতিভেদ করবে না; ৭. হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে; ৮. প্রত্যহ প্রার্থনা করবে; ৯. ঈশ্বরে আত্মদান করবে; ১০. বহিরঙ্গে সাধু সাজবে না; ১১. ষড়রিপু বশে রাখবে ১২. হাতে কাম, মুখে নাম করবে। অধ্যাত্ম অনুশীলনের মূল কথা হল আত্মোপলব্ধির সহিত মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্তার সামগ্রিক কল্যান। উপরিউক্ত ধারণার সঙ্গে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার সমন্বয়ে মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মতুয়ারা বর্তমান ও জীবন্ত ধর্মে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, দণ্ডকারণ্যসহ আন্দামান দ্বীপে মতুয়া ধর্মমত প্রচলিত আছে।

এরপর আসি মহানাম সম্প্রদায়ের কথায়। শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী তীরের ডাহাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তার জীবনাবসান ঘটে। জগবন্ধু সুন্দরের উপাসকরা সুন্দরকে কেন্দ্র করে এক আধ্যাত্ম অভিযাত্রা শুরু করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধ্যানমার্গে অতিবাহিত করেন, তাঁর শিষ্য মহেন্দ্রজীর এই সম্প্রদায় গঠনে অসামান্য অবদান আছে। এই সম্প্রদায় বৈষ্ণব বেদান্তের অনুসারী ও প্রকৃতি বিবর্জিত সাধনায় বিশ্বাসী। শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু মোট ৮ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন—১. শ্রীমতী সংকীর্তন ২. শ্রী নাম কীর্তন ৩. শ্রীবিবিধ সংগীত; ৪. শ্রীসংকীর্ত্তন; ৫. শ্রীশ্রী হরিকথা; ৬. চন্দ্রপাত; ৭. ত্রিকাল; ৮. উদ্বাবন। ডঃ মহানামব্রহ্মচারী এই সাধক সম্প্রদায়ের একজন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রবক্তা। ফরিদপুরে গোয়াল চামটে 'শ্রী অঙ্গণ' অবস্থিত, ঢাকা টিকাটুলীসহ সারাবিশ্বে এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। চন্দ্রপাত গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্র মহানাম রয়েছে।

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারি হস্ত চন্দ্র পুত্র হাকীট পতন।

সর্বধর্ম সমন্বয় ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দচন্দ্র নন্দী বা আনন্দ স্বামী। তিনি ১২৩৯ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ কুমিল্লা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পিতার নাম রামদুলাল নন্দী, তিনি শৈশব থেকেই কঠোর অধ্যয়নের মাধ্যমে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, হিন্দি ও ফারসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। অল্প বয়সেই তৎকালীন কুমিল্লা জেলায় ভাষাবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

এক সময় আনন্দ স্বামী ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাঠ করে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর আনন্দ স্বামী স্বীয় ভ্রাতা কৈলাশ চন্দ্র নন্দীর সঙ্গে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে (পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন) ঢাকায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকে তিনি নিজ গ্রামে ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রচার ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তার সাধনালব্ধ সত্যকে জনতার মধ্যে বিতরণে সচেষ্ট থেকেছেন; ১২৮৮ বঙ্গাব্দ হতে তাঁর ভিতর দয়াময় ভাবনা ক্রমবিকশিত হচ্ছিল এবং ১২৮৯ সনে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

বাংলার নব জাগরণের ভাবনার গুণাত্মক পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী ভাবনা এবং তৎকালীন ভাবনাগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও আদান প্রদানের ফলে নতুন বিভিন্ন ধর্ম মতের সৃষ্টি হয়। আনন্দ স্বামীর সর্বধর্ম সমন্বয় সেই প্রচেষ্টারই এক মহৎ অভিব্যক্তি। সাধক কবি মনোমোহন, লব চন্দ্র পাল, আফতাব উদ্দিন, মনছুর উদ্দিন সহজ ও অসংখ্য সাধক পুরুষ এই ধারার অনুসারী। সাতমোড়া, ভোলাচং, নরসিংদী, ত্রিপুরা, গাজীপুর অঞ্চলে এই ধারার সাধকমণ্ডলী এখনও রয়েছেন। আনন্দ স্বামী ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মৃত্যুবরণ করেন। কালীকচ্ছ গ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়। প্রকৃত তত্ত্ব, সর্বধর্ম্মগীতিকা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

এর পরে আসে নাথ ধর্মের কথা। বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যোগী সম্প্রদায়ের লোকজন বাস করে। নাথ ধর্ম বিষয়ে পরে আলোচনা করা আছে। যাই হোক্, বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেই এই সব ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্মের ভিতরেই।

দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে দু'চার কথা

সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এবং তিনি নিরাকার, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, তিনি করুনাময় জীব-জগতের পালন কর্তা—এ বিশ্বাস সকল মানুষই পোষণ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন অতি চঞ্চল, কল্পনায় ডুব দিয়ে চোখের নিমেষে কেউ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসে, কেউ গাড়ি, বাড়ি, বিত্ত, বৈভব, বৃত্তি গড়ে তোলে, আবার কেউ সেই নিরাকারের নির্দিষ্ট রূপ কল্পনার মধ্য দিয়ে গুনসম্পন্ন দেব-মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। অন্তরের খাঁটি বিশ্বাসে 'ধর্ম জেগে ওঠে কর্ম'-এর মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে নিরাকার সৃষ্টিকর্তার আরাধনার লক্ষ্যে তাঁর একটি রূপ বা মুর্তি স্থাপনের মাধ্যমে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রদ্ধাভরে পুজো অর্চনা, গুনগান করে সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাধারণ ভক্ত প্রতিমায় পুজো করে থাকেন। ঈশ্বর, ভগবান বা পরমপিতার শক্তি সর্বত্রই বিরাজমান। অদৃশ্য সেই মহাশক্তিকে নিরাকার ভাবনা, ধ্যান বা যজ্ঞের মাধ্যমে আয়ত্ব করা সাধারণ ভক্তের জন্য প্রাথমিক ভাবে দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেন না সংসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই তিন গুণের মানুষ আছেন। বর্তমান সময়ে তামসিক ও রাজসিক মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাই দেব-দেবীর মুর্তি বা প্রতিমা স্থাপনের মাধ্যমে সাধন ভজনে দ্রুততার সাথে নিবিষ্ট হওয়া বা মনোনিবেশ করা সম্ভব। তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন—'গাভীর দুগ্ধ তাহার রক্ত হইতে সম্ভুত। রক্ত গাভীর সর্বাঙ্গেই বিরাজিত তাই বলিয়া গাভীর যে কোন অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেই দুগ্ধ পাওয়া যায় না, একমাত্র স্তন হইতেই উহা ক্ষরিত হয়। সেইরকম শ্রী ভগবানের উপস্থিতি সর্বত্র সকল সময়ে থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি প্রতিমাতেই সর্বাঙ্গসুন্দররূপে হইয়া থাকে।'

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতিতে তন্ত্রশাস্ত্র প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তান্ত্রিক মতে পূজায় প্রতীক বা প্রতিমা থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে পূজার সকল কর্ম প্রতিমা বা মুর্তিকে অবলম্বন করে হয়। আর বৈদিক মতে, অগ্নিকে সকল শক্তি বা দেবতার উৎস বিশ্বাস করে অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাহুতি দেওয়া হয় অর্থাৎ, আগুন বা অগ্নিকে পবিত্র বা নির্মল শক্তি হিসেবে মনে করা হয়। অগ্নিতে সকল মোহ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ বিসর্জ্জন দিলে আত্মশুদ্ধি ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আট প্রকার বিগ্রহের কথা বলা হয়েছে —

'শৈলী দারুময়ী লৌহ লেপ্যা লেখ্যা সৈকতী।
মনোময়ী মনিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতাঞ্চ'

—শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতু (সুবর্ণাদিময়ী) লেপ্যা, (মৃৎচন্দনাদিময়ী) লেখ্যা (চিত্রপটময়ী) বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মনিময়ী এই আট প্রকার প্রতিমা হইতে পারে।' তাই মানবজীবনকে স্বার্থক করে তুলতে স্ব স্ব আরাধ্য দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান, পরমপিতা যে যে নামেই সম্বোধন করুন না কেন সেই নিরাকার অসীমকে একটি রূপকল্পের গন্ডিতে এনে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সাধন-ভজন করলে তাঁকে পাওয়ার উচ্ছাসে জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং সেখানেই প্রতিমা পূজার বা সার্থকতা।

শ্রীমৎ ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে—'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত মুর্তিন।'—অর্থাৎ আমি অব্যক্তরূপে জগৎ সংসার ব্যপিয়া আছি। ফলে সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত অথচ 'আমি' কিন্তু আমি কোন বস্তুতেই অবস্থিত নই।' এখানে এই 'আমি' শব্দটির অর্থ বৈষ্ণবরা বা অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু এখানে 'আমি' অর্থে পরমাত্মার কথাই বলছেন, কারন গীতার ৯।৫ শ্লোকে ভগবান আবার বলেছেন—'ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে য়োগমৈশ্বরম্।।' অর্থাৎ তিনি অর্জুনকে যত উপদেশ দিয়েছেন, তা তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় বলেছেন। এই কারণে তিনি গীতার বহু জায়গায় একাধিকবার 'পশ্য মে য়োগমৈশ্বম্' কথাটি অর্জুনের প্রতি ব্যবহার করেছেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ যখন ভূমি থেকে ভূমার ক্ষেত্রে উঠেন, তখন দ্বৈত-ভ্রান্তি দূরে যায়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন, এই ত্রিপুটির লয় হয়; ব্যুত্থানের পরেও যে চিত্তবৃত্তি মানুষকে দেশ-কাল-পাত্র বা দেহাত্মবুদ্ধির মধ্যে পরিচ্ছিন্ন সীমিত করে রাখে, সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধের জন্য স্বরূপ উপলব্ধি হওয়ায়, সর্বত্রই দেখেন, সেই একই আত্মা জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনরূপে অভিব্যক্ত!

তাই যিনি ব্যক্ত সাকার; তিনিই অবতার, আবার অব্যক্ত অবস্থায় নিরাকার। অর্থাৎ প্রতীক বা প্রতিমা অব্যক্ত নিরাকার ব্রহ্ম বা আরাধ্য দেবতার প্রতিনিধি। অতএব শক্তির উপাসক কালীমূর্তি স্থাপন করে ভৌতিক জীবনে মুখ্যকর্ম করেন আর সেই কর্মেই তার সামগ্রিক জীবনের সফলতা আসে।

'কালী বাংলার দেবী'। এই কালীপূজা বাংলায় প্রগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলে আসছে। রাজা থেকে প্রজা, ধনী থেকে দরিদ্র, কেউই বাদ নেই, শক্তিমান হতে সকলেই আশা করেন। তাই দেখি—বার ভুঁইয়াদের অন্যতম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে 'যশোরেশ্বরী' কালিকা মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন। ভারতচন্দ্র রায় গুনকর তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে লিখেছেন —

'যশোর নগর ধাম
প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে বাদশায়
কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে সব ভূপতি দ্বারস্থ।।
বরপুত্র ভবানীর
প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়ষ হলকা হাতি
অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।

বাঙালী প্রতি দিন যাপনে কালীর উপর এতটাই নির্ভরশীল যে, মানসিংহ ছলে-বলে-কৌশলে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি 'যশোরেশ্বরী কালী'-মুর্তি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরেই প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে। বৃহত্তর বাংলায় এমন কোনও গ্রাম নেই যে গ্রামে কালীমন্দির নেই! বাংলায় এমন কোনও ধর্মাবলম্বী নেই যিনি কালীসঙ্গীতে মজেননি! এই কালীই আদিশক্তি।

এই আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি যদিও তত্ত্বত অসঙ্গা নির্বিকারা ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপা তবুও নিজ শক্তিবলে তিনিই জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। সেই আদ্যাশক্তি সূক্ষ্মা, স্থূলা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিণী। নিরাকারা হয়েও সাকারা। তিনি কৃপা না করলে কে তাঁকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জানতে পারে।

একজন তান্ত্রিক প্রাকৃতিক শক্তিকে চৈতন্যময়ী মনে করে এবং সেই চৈতন্যময়ী শক্তিকে বাঙালি হিন্দুর মানবীয় উপলব্ধির সীমানায় নিয়ে এসে সেই চৈতন্যময়ী শক্তির সঙ্গে মাতাপিতার সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই চৈতন্যময়ী শক্তিকে দেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করে। তন্ত্রের প্রধান সিদ্ধান্তই হল এই যে প্রাকৃতিক শক্তিকে চৈতন্যময়ী মনে করা। কিন্তু, বিশ্বজগতে সবই তো শক্তির সমাহার, যে শক্তিকে জড়বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়। আধুনিক সভ্যতা এই মূলতত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সূত্র আবিস্কার করে এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা কতটা যৌক্তিক এই প্রশ্নও তো আজকাল উঠছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হটকারী কি না, পরিবেশ বিপর্যয়ের মুলে এই দর্শন সক্রিয় কি না—এসব প্রশ্নও নিয়েও তো আমরা আজ উদ্বিগ্ন।

তন্ত্র কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না। তার কারণ, তন্ত্র প্রাকৃতিক শক্তিকে চৈতন্যময়ী জেনেছে, 'মা' বলে জেনেছে, মায়ের দেবীপ্রতিমা কল্পনা করেছে; দেবী মা (প্রকৃতি) কে একজন তান্ত্রিক নিষ্ঠাভরে ভজনা করতে চায়, আরাধনা করতে চায়, পূজা করতে চায়। পাশাপাশি একজন তান্ত্রিক মনে করেন, একজন ভক্ত চৈতন্যময়ী শক্তির অনুগত থাকলে চৈতন্যময়ী শক্তির কৃপায় তার অশেষ কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে নারীশক্তির আরাধনা অন্যতম বিষয়। বৈদিক যুগেই নারীরা 'ঋষি' পদবাচ্য হয়েছেন আর বেদোত্তর যুগে তারা পূজনীয়া বলে লক্ষ্য করি। মুণ্ডক উপনিষদে শক্তিকে সাতটি অগ্নিশিখা বা অগ্নিজিহ্বারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সপ্ত অগ্নিজিহ্বার প্রধান হলেন 'কালী'। অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে, যিনি কালকে ধারণ করেন তিনিই কালী। আবার মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে, মহাকাল সর্বজীবকে গ্রাস করেন। সেই মহাকালকেই যিনি নিজ অঙ্গে ধারণ করেন, তিনিই কালী। 'কালী' শব্দটি এসেছে 'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ থেকে। যার অর্থ—কৃষ্ণ (ঘোর কালো) বর্ণ। মহাভারতে কালীকে দুর্গার একটি রূপ হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। আবার ওই মহাভারতেই কালরাত্রি বা কালী নামে এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, বর্ণনামতে, যিনি মৃত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মাকে বহন করেন। শাক্ত বিশ্বাস অনুসারে, শাক্তদেবী কালী বা কালিকা দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ তিনি আবার ইনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া।

শাক্ত ধর্মমতের ইতিহাসে মহাবিদ্যা ধারণার বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ধারণা থেকেই শাক্ত ধর্মে ভক্তিবাদের সূচনা হয় ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। উত্তর-পৌরাণিক যুগে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ হিন্দু দেবমণ্ডলীতে পুরুষ দেবতার একাধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায় এক নতুন ধর্মান্দোলনের সূচনা ঘটেছিল। এই নতুন ধর্মমতে পরম সত্তাকে নারীরূপে কল্পনা করা হলো। এই মতকে ভিত্তি করে একাধিক ধর্মগ্রন্থ রচিতও হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দেবীভাগবত পুরাণ। দেবীভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের শেষ নয়টি অধ্যায় 'দেবী গীতা' নামে পরিচিত। এটিই শাক্ত ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য গ্রন্থের আর একটি হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের উপাখ্যান হচ্ছে দশমহাবিদ্যা। দশমহাবিদ্যা হলো মহাদেবীর দশটি বিশেষ দেহধারণ বা রূপ যার উল্লেখ পাওয়া যায় তন্ত্রে। দশমহাবিদ্যার রূপের একদিকে যেমন রয়েছে ভয়ঙ্করী রূপ, অন্য দিকে তেমনই আছে মোক্ষ ও অভয়দায়িনী রূপ। 'গুহ্যাতিগুহ্য তন্ত্র' গ্রন্থে দশ মহাবিদ্যাকে বিষ্ণুর দশ অবতারের উৎস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টির দশটি প্রধান বিষয়ও দেবীর এই দশ রূপের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

কালীর দশটি বিভিন্ন রূপ 'দশমহাবিদ্যা'-এর পিছনে রয়েছে ভগবান শিব ও তাঁর স্ত্রী তথা পার্বতীর পূর্বাবতার সতীর মধ্যে একটি দাম্পত্য-কলহ। সতীর পিতা দক্ষ শিবকে অবজ্ঞা করবার জন্য একটি বড়ো যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং সেখানে নববিবাহিত শিব-সতীকে আমন্ত্রণ জানালেন না। দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সতী বিনা আমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে যেতে চাইলেন কিন্তু শিব তাঁকে বারণ করলেন। ক্রুদ্ধ সতী স্বামীর অনুমতি আদায়ের জন্য তৃতীয় নয়ন থেকে আগুন বের করতে করতে কালী মূর্তিতে রূপান্তরিত হলেন। সতীর ওই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে শিব পালাতে গেলে সতী দশ 'মহাবিদ্যা'-র রূপ ধারণ করে শিবকে দশ দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেন। এর পর শিব তাঁকে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিলেন। সতীর ওই দশ প্রকার বিভিন্ন রূপ বা 'মহাবিদ্যা' পরিচিত 'দশমহাবিদ্যা' নামে।

দশমহাবিদ্যা হিন্দু ধর্মে দিব্য জননীর দশটি বিশেষ রূপের সমষ্টিগত নাম। দেবীত্বের এই সারণিতে একদিকে যেমন রয়েছে ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তি তেমনই স্নেহময়ী কোমলমূর্তিও রয়েছে। শাক্তরা বিশ্বাস করেন, একই সত্য এখানে দশটি ভিন্নরূপে প্রকাশিতা।

এখানে প্রথম মহাবিদ্যা হলেন কালী। তিনিই আদ্যাশক্তি কালিকা। শাক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ বলে মাতৃরূপে দেবী কালীর পুজো হয়ে থাকে। বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু জায়গাতেই বিভিন্ন নামে দেবী কালিকার পূজা হয়। কিন্তু যে নামেই তাঁর মূর্তি গড়া হোক না কেন, সেগুলো সবই ভয়ঙ্করী ও বিভীষিকাময়ী। দেবী কালিকা সর্বত্রই ধ্বংসের বা প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর মূর্তি গড়া হয় মাটি, পাথর বা কোনো ধাতু দিয়ে। নিত্য পূজার জন্য দেবী স্থাপিত হন মন্দিরে আর দেবীর কুলপূজা ও মানত পূজা করা হয় বৃক্ষতলে, নাটমন্দিরে বা সাময়িক পটাবাসে। যে যে বিভিন্নরূপে ও নামে দেবী কালিকার পূজা হয় সেটার একটা মোটামুটি তালিকা এরকম—(১) 'দক্ষিণাকালী', (২) 'সিদ্ধকালী', (৩) 'গুহ্যকালী', (৪) 'ভদ্রকালী', (৫) 'শ্মশানকালী', (৬) 'রক্ষাকালী', 'মহাকালী', (এই ছয়টির পরে 'উগ্রকালী' ও 'চামুণ্ডাকালী'র উল্লেখসহ 'অষ্টবিধ কালী মূর্তির পূজা' একাধিক তন্ত্রে বিহিত হয়েছে) (৭) 'দেওয়ালী' (৮) 'রটন্তী', (৯) 'ফলাহারিণী কালী'। এঁদের মধ্যে বর ও অভয়দায়িনী বলে 'দক্ষিণাকালী'ই সব থেকে জনপ্রিয়। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি তাঁর ডান পা আগে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বলে তাঁকে 'দক্ষিণা' বলা হয়; কেউ কেউ বলেন যে তিনি কল্যাণময়ী অনুকূল ও দাক্ষিণ্যযুক্ত বলে তাঁর এই নাম হয়েছে। তিনি ভীষণ দর্শনা; তবে তাঁকে দেখে দেখে আমরা নিতান্ত অভ্যস্ত বলে আমাদের কাছে তাঁর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তি ততটা প্রকট হয় না বটে, কিন্তু যাঁরাই সেই মূর্তি প্রথম দেখবেন, তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই ভাববেন, দেবীর একি বিকট রূপ! কিন্তু ভুললে চলবে না যে, কালী বিশ্বপ্রকৃতির সংহার-মূর্তি; তিনি ভূমিকম্প, প্রবল ঝড়, বা মহামারীর মতই প্রলয়ঙ্কর। তাঁর গায়ের রং দুর্যোগের মেঘের মতই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর গলায় নরমুণ্ডমালা, দেহের অন্যত্রও সেই একই অলঙ্কার; শিশুর শব তাঁর কর্ণাভরণ, তাঁর মেখলা বা কোমরের অলঙ্কার মৃতদেহের হাত দিয়ে তৈরী। তাঁর চারটি হাত। দুটি বাঁ হাতের একটিতে সদ্য নিহত মানুষের বা দানবের মাথা, অন্যটিতে রক্তাক্ত খড়্গ। দুটি ডান হাতের একটির ভঙ্গী বরদানের অন্যটির অভয় দানের। তাঁর মুখের দু'দিক থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে; মনে হয় যেন এখনই রক্তপান করে উঠলেন! কালী শ্মশানবাসিনী। তাঁর তিনটি চোখ, আর সেই চোখগুলো এত উজ্জ্বল যে সেগুলোর সঙ্গে কেবলমাত্র নবোদিত সূর্যের তুলনা করা চলে। তিনি 'করাল-বদনা' ও 'দন্তরা', অর্থাৎ প্রকাণ্ড ও বিকট তাঁর দাঁত। স্তনদ্বয় উন্নত ও নিতান্ত স্থূল। তিনি বিবসনা; মহাকাল বা শিবের দেহের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চারদিকে চিৎকারের ভঙ্গীতে মুখ ব্যাদান করে রয়েছে অসংখ্য 'শিবা' বা শৃগালী। এই ভয়ঙ্করী মূর্তিতেই তিনি আমাদের মানসপটে গেঁথে রয়েছেন। অথচ এই ভীমা সংহার-মূর্তিতেই তিনি সারা পূর্বাঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কল্যাণময়ী দেবী বলে পূজিতা। কিন্তু যে রূপে আমরা এখন তাঁর পূজা করি, সেটি তাঁর আদিম রূপ নয়। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণের' 'দেবীমাহাত্ম্যে' তাঁর যে রূপ বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে আধুনিক রূপের গরমিল রয়েছে। কি সেই আদিম রূপ? 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ' বলছে—

'ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন তস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা।
ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতং।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিধারিণী।"

'চণ্ড' ও 'মুণ্ড' - এই দুটি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দেবী চণ্ডীর মুখ রোষে রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি-কুটিল হল। তাঁর ললাট অর্থাৎ কপাল থেকে বেরিয়ে এল এক মহাশক্তি - তিনিই কালী। তাঁর হাতে তাঁর খড়্গ, পাশ ও গদা। তাঁর পরনে বাঘের চামড়া আর গলায় অলঙ্কাররূপে নরমুণ্ডের মালা। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ ও কোটরগত, জিহ্বা লোল, লকলকে অর্থাৎ এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে। তাঁর অট্টহাসি চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরবর্তীকালে রচিত 'কালিকা পুরাণের' মতে দেবী 'দুর্গা' বা 'সতী'ই পরজন্মে কালীরূপে 'শিবশক্তি' হয়েছিলেন।

বর্তমানে এটা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত যে দেবী কালিকার এই আধুনিক রূপ 'কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ'-এর সৃষ্টি। তাঁর কাল, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতকের চতুর্থ পাদ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত; অনেকে বলেন, ১৪৮৫ সাল থেকে ১৫৩৩ সাল পর্যন্ত ছিল। সেই হিসেবে প্রায় সাড়ে চারশো বছর ধরে দেবী কালিকার এই আধুনিক রূপের ধ্যান আমরা করছি। আগমবাগীশের লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'তন্ত্রসার'; তাতে তিনি অতল তন্ত্রসাগর খুঁজে খুঁজে ডুবুরীর মত নানা মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে তন্ত্রসার বইটি তন্ত্র চর্চার জন্য একটি অতি মূল্যবান প্রামাণিক পুঁথি; তান্ত্রিকদের পক্ষে বা তন্ত্র চর্চাকারীদের জন্য সেটি নিত্য প্রয়োজনীয়। সেই পুঁথিতে 'কালীতন্ত্রের' উল্লেখ করে আগমবাগীশ দেবী কালিকার আধুনিক রূপের কথাই উল্লেখ করেছিলেন-'করালবদনাং ঘোরাং চতুর্ভুজাং, মুণ্ডমালা বিভূষিতাং, মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং ... পীনোন্নত পয়োধরাং, শ্মশানালয়বাসিনীং ..... কালী সর্বকাম সমৃদ্ধিদাম্।' এখানে শুধু কালীর 'বীজন্যাসের' বা 'প্রাণায়ামাদি'সহ ধ্যানগম্য রূপের কাঠামোর কথাই বলা হল; আগে যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তা এই ন্যাসেরই হুবহু প্রতিকৃতি। মহামারী থেকে রক্ষা পাবার জন্য সর্বজনীন 'রক্ষাকালী' ও 'শ্মশানকালী'র পূজা করা হয়। 'রটন্তী' পূজা হয় মাঘ মাসে আর 'দেওয়ালী' পূজা হয় দুর্গাপূজার পরবর্তী প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। দেওয়ালীর প্রচলন খুব বেশি দিন আগে ঘটেনি। কিংবদন্তী রয়েছে যে, নদীয়ার মহারাজা 'কৃষ্ণচন্দ্রের' আদেশে সেই পুজো তখনকার বঙ্গদেশে চালু হয়েছিল; এই কথা ঠিক হলে সেটা মাত্র দু'-আড়াইশো বছরের কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে মাতৃকাপুজো প্রাক বৈদিক কালের। 'ফলহারিনী' পুজো হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। বার হিসেবে শনি ও মঙ্গলবার দেবীপূজার পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণতঃ মধ্য রাত্রে পূজায় বসতে হয়। কালীতন্ত্র মতে বাঙলার নিজস্ব পূজার পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। এই দেবীপূজায় পশুবলি প্রায় অপরিহার্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কুলবিধানকে মান্য করে, পশুর বদলে অন্য কিছু বলি দেওয়া হয়। পশুবলিতে প্রশস্ত হল মোষ ও ছাগ; তবে শেষেরটিকেই এখন প্রায় একমাত্র বলির পশু বলা চলে।

দেবী তারা ও কালীমূর্তির মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। তবে তারা-দেবী 'দিগম্বরী' নন; তাঁর পরনে 'বাঘের চামড়া' থাকে। এছাড়াও তাঁদের মধ্যে আরো বেশ কিছু প্রভেদ রয়েছে। দশমহাবিদ্যার 'তারা' বা 'তারিণী' দেবীকে 'নীলসরস্বতী'ও বলা হয়। কারণ তিনি বাকশক্তি দেন। তিনি উগ্র বিপদ থেকে রক্ষা করেন বলে তাঁকে 'উগ্রতারা'ও বলা হয়। তিনিও শ্মশানবাসিনী, শিবরূপী শবের ওপরে দণ্ডায়মানা, ত্রিনয়নী। তাঁর তিনটি চোখই প্রস্ফুটিত ইন্দীবর বা সদ্য ফোটা নীলপদ্মের মত ও প্রভাতসূর্যের মতো গোলাকার। তাঁর বর্ণ শ্যাম, নরের মুণ্ডের মালাই তাঁর ভূষণ, এমনকি কেশের শোভাবর্দ্ধনেও সেগুলোকেই তিনি ব্যবহার করেন। তিনিও চতুর্ভুজা; তাঁর দুটি ডান হাতে রয়েছে খড়্গ, বাঁ হাতের একটিতে খর্পর, অন্যটিতে একটি সদ্য ফোটা পদ্ম। তিনি ভীমা হলেও, করালবদনা নন। কালীর উন্মত্ততা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি পিঙ্গলবর্ণ একজটাধারিণী, ললাটে অক্ষোভ্য, প্রজ্জ্বলিত চিতামধ্যে অবস্থিতা, ভীষণদন্তা, করালবদনা,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিজের আবেশে হাস্যমুখী, বিশ্বব্যাপ্ত জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মের উপর অবস্থিতা। তিনি রাজদ্বারে, সভাতে, বিবাদে ও বাণিজ্যে - সর্বকর্মেই জয়ী করেন। তাঁর পূজা হয় শ্মশানে, শূন্যালয়ে, চতুষ্পথে অর্থাৎ চৌরাস্তায়, শবাসনে, মুণ্ডাসনে, আকণ্ঠ সলিলে, রণভূমিতে, যোনিতে ও বিজন বনে। তবে তাঁর পূজার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান হল 'একলিঙ্গ শিবমন্দির'। 'একলিঙ্গ' কাকে বলে? যেখানে পঞ্চক্রোশের মধ্যে একটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন শিবলিঙ্গ থাকে না, তাঁর-ই নাম একলিঙ্গ।

দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া দেবী 'ষোড়শী'র ধ্যানরূপ হল —

'বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম।
পাশাঙ্কুশ শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ে।'

তাঁর প্রভা নবোদিত সূর্যের মত। তাঁর চারটি হাত; হাতে রয়েছে পাশ অর্থাৎ বন্ধনাস্ত্র, অঙ্কুশ অর্থাৎ ডাঙ্গশ, তীর ও ধনু। তিনিও ত্রিনয়নী - শিবের নাভিকমলের ওপরে তিনি বসে রয়েছেন। ইনি আলুলায়িতা কুন্তলা অর্থাৎ মুক্তকেশী, তরুণী, ও রূপসী। তাঁর গলায় সুশোভন হার ও মাথায় স্বর্ণমুকুট।

দেবী ষোড়শী পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার স্বরূপ। এই রূপ ষোড়শপ্রকার কামনার প্রতীক। ষোড়শীতন্ত্রে ত্রিপুরাসুন্দরীকে 'শিবের নয়নজ্যোতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ত্রিপুরসুন্দরী অর্থাৎ ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

দশমহাবিদ্যার চতুর্থ দেবী রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, বহু রত্নভূষণে ভূষিতা 'ভুবনেশ্বরী' রূপে ও ঐশ্বর্যে সত্যি ভুবনেশ্বরী। তিনি রক্তবর্ণা, মুকুটধারিণী ত্রিভুবনের অধীশ্বরীরূপে রক্তকমলের ওপরে নিজের ডান পা রেখে, বাঁ পা রেখেছেন নিজের ডান ঊরুতে। তাঁরও চারটি হাত, চোখ তিনটি। ডান হাতে বর ও অভয় মুদ্রা, বাঁ হাত দুটিতে পাশ ও অঙ্কুশ। ভুবনেশ্বরী সর্ব ঐশ্বর্য ও পরম শক্তিদায়িনী। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বের সব অশুভকে ধ্বংস করে দেন। যখন ঈশ্বরের জাগতিক ব্যবহার সুপ্ত থাকে, সেই সময় একমাত্র অব্যক্ত প্রকৃতি অবশিষ্ট বা বর্তমান থাকেন, সেই অব্যক্ত প্রকৃতি দেবীর নাম ভুবনেশ্বরী। তিনি ভক্তদের অভয়প্রদায়িনী ও সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী।

মহাবিদ্যার পঞ্চম রূপটি হল ভৈরবী। ভৈরবী মূলত ভৈরব এর স্ত্রী রুপ। এ রুপটি কালীর মতই প্রায় একইরকম হিংস্র ও ভয়ানক দৃষ্টিভঙ্গি বিশিষ্ট একটি রূপ। তিনি সাধকের ভালোর জন্য আশীর্বাদ এবং খারাপের জন্য ভয়ংকরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিতা হন। ভুবনেশ্বরীর সাথে 'ভৈরবী' মূর্তির পরম সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি 'উদ্ভানুসহস্রকান্তিম্ অরুণক্ষৌমাং' ও 'রক্তালিপ্তপয়োধরাম্'। তিনি বসেছেন পদ্মের উপরে, পদ্মে ডান পা-টি রেখে, ঠিক ভুবনেশ্বরীর ভঙ্গীতে। তিনিও ত্রিনয়না; তাঁর চোখগুলি অতুলনীয় সুন্দর। প্রভায় তিনি ষোড়শীকেও হার মানান। তাঁর পরনে থাকে 'ক্ষৌমবাস' অর্থাৎ 'রেশমি বস্ত্র' বা 'তিসির ছাল থেকে তৈরী কাপড়'। তাঁর পয়োধরে রক্তের দাগ; রত্নালঙ্কারে তিনি ভুবনেশ্বরীর সমকক্ষ। তাঁরও চারটি হাত; হাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই - রয়েছে জপের মালা ও কাপড়। তিনিও মুক্তকেশী, রত্নমুকুটধারিণী ও পদ্মবনবাসিনী।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভুবনেশ্বরীর গলায় কোন মুণ্ডমালা নেই।

ছিন্নমস্তাদেবী দশমহাবিদ্যার ষষ্ঠ এবং মহাশক্তির একটি ভীষণা রূপ। ছিন্নমস্তাদেবী ছিন্নমস্তিকা বা প্রচণ্ডচণ্ডিকা নামেও পরিচিতা। তাঁর এক হাতে থাকে নিজের ছিন্নমুণ্ড, অপর হাতে থাকে একটি কাটারি। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা হলেও এককভাবেও তাঁর পূজা কম প্রচলিত। সারা ভারতবর্ষে ছিন্নমস্তার একাধিক মন্দির রয়েছে। তবে গৃহস্থবাড়িতে তাঁর পূজা করা হয় না। কেবলমাত্র তান্ত্রিক, যোগী ও সর্বত্যাগীগণ বীরাচারমতে তাঁর পূজা করে থাকেন। ছিন্নমস্তা' নামটি এসেছে ছিন্ন মস্তক বা মাথা থেকে। রূপকল্পনায় এ দেবীটি অত্যদ্ভুত; তিনি নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে রক্তপান করছেন! এদিক থেকে তিনি অনন্যা। তিনি জাতে বৌদ্ধ, কিন্তু পরিচয়ে হিন্দু। তিনি 'প্রত্যালীঢ়পদা' অর্থাৎ তাঁর বাঁ পা প্রসারিত আর ডান পা সংকুচিত। তাঁর দুটি হাত; একটিতে ধরেছেন নিজের কাটামুণ্ড অন্যটিতে খড়্গ। তিনি বিবসনা। নিজের গলদেশ থেকে যে রক্তধারা ঝরছে তা পান করছেন তিনি নিজেই, তাঁর ছিন্ন মস্তকের মুখ দিয়ে। একই সাথে সেই রক্ত পান করছেন তাঁর দু'জন সঙ্গিনী—'বর্ণিনী' ও 'ডাকিনী'। বর্ণিনী রয়েছেন দেবীর ডানদিকে; তাঁর কেশ আলুলায়িতা, এক হাতে খর্পর, অন্য হাতে খড়্গ। তিনি বিবসনা। দেবীর বাঁ দিকে রয়েছেন ডাকিনী। তিনিও কৃষ্ণবর্ণা, মুক্তকেশী ও বিবসনা। তাঁরও হাতে খর্পর ও খড়্গ। প্রলয়ের কালে তিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ অনায়াসে গ্রাস করতে পারেন - এমনই তাঁর শক্তি। দেবীর গায়ের রং জবাফুলের মত লাল। তাঁর মাথায় (অর্থাৎ ছিন্নশিরে) সর্পাবদ্ধ মণি, তিনটি চোখ, গলায় পদ্মের মালা। তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন 'মদন' (কামদেব) ও 'রতি' - এই দম্পতির ওপরে। তাঁরা শায়িত রয়েছেন একটি ফোটা পদ্মের মধ্যে। বর্ণিনী ও ডাকিনী দাঁড়িয়েছেন সেই পদ্মটিরই দুটি পাঁপড়ির ওপরে।

মহাবিদ্যা 'ধূমাবতী'র চিত্রে পাওয়া যায় মহা ঐশ্বর্যময়ী দেবীদের ঠিক বিপরীত ছবি। তাঁর ধ্যানরূপ হল —

'বিবর্ণা, চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণাকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা।
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া।'

ধ্যানমন্ত্র অনুসারে, তিনি মলিন, চঞ্চল, ক্রুদ্ধ, উগ্র, নিষ্ঠুর, স্বামীহীনা, বিগত-যৌবনা, খল-স্বভাবা, সদা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর ও সর্বদা কলহে তাঁর অভিরুচি। ময়লা একখানা কাপড় পড়ে চড়েছেন রথে - সে রথের চূড়ায় বসে রয়েছে একটি কাক। তাঁর হাতে রয়েছে একখানি সূর্প অর্থাৎ কুলা! এই বিধবা দেবীমূর্তি দশমহাবিদ্যার মধ্যে সপ্তমা ও অন্যতমা এক তান্ত্রিক দেবী। তিনি কখনও কখনও অলক্ষ্মী বা জ্যেষ্ঠাদেবী

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নামেও অভিহিতা হন। তাঁকে সাধারণত শ্মশানচারিণীরূপে কল্পনা করা হয়। এ হেন 'গুণশালিনী' দেবীকে কি পরমাশক্তির প্রতীক বলে মানা যায়? হয়ত মনে দ্বিধা আসে। কিন্তু তিনি যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই মন্ত্রের ব্যবহার হয় শত্রুদলনে, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে। হয়ত ষটকর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাঁর রূপকল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু কি কারণে তিনি মহাবিদ্যার দলে ঠাঁই পেয়েছেন তা বলা দুষ্কর। কেবলমাত্র এটাই বলা যায় যে, তিনি 'তামসী শক্তির প্রতীক'। ধূমাবতীর মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। বারাণসীর একটি মন্দিরে ধূমাবতী হলেন প্রধান দেবতা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি ও কামাখ্যা মন্দিরের কাছে ধূমাবতীর ছোটো মন্দির রয়েছে। বারাণসীর মন্দিরটিকে শক্তিপীঠ বলে দাবি করা হয়। এই মন্দিরে দেবী রথারূঢ়া ও চতুর্ভুজা, তাঁর চার হাতে কুলো, ঝাঁটা, পাত্র ও অভয়মুদ্রা।

বগলামুখী হলেন দশমহাবিদ্যার অষ্টম দেবী। বগলামুখী মূলত দুটি শব্দ থেকে এসেছে এক বগলা এবং অন্যটি হলো মুখ। বগলামুখীদেবীর দুই রূপের বিবরণ পাওয়া যায়। যার একটিতে তিনি দ্বি-ভুজা অন্যটিতে তিনি চতুর্ভুজা। মুক্তকেশী দেবী 'বগলামুখী' শত্রু পরিপীড়নে ব্যস্ত। সাধারণতঃ তিনি দ্বিভুজা; বাঁ হাতে শত্রুর জিহ্বা টেনে ধরেছেন আর ডান হাতে তাঁকে গদা দিয়ে আঘাত করছেন। তিনি রত্নসিংহাসনের ওপর বসে রয়েছেন। 'পীতাম্বরাভরণমালা বিভূষিতাঙ্গীং' অর্থাৎ তাঁর পরনে হলদে শাড়ি, মালায় বিভূষিত দেহ। তিনি 'চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত চারুগণ্ডস্থলীং' - তাঁর সুন্দর কপোল বা গাল সোনার দোদুল কর্ণাভরণে আরো শোভাময় হয়েছে। তিনি গৌরাঙ্গী, বিম্বাধরা অর্থাৎ তাঁর ঠোঁট পাকা তেলাকুচার মত লাল রঙয়ের। বগলামুখীর শরণ নিতে হয় কখন?. চৌরসঙ্ঘে, প্রহরণ সময়ে, বন্ধনে, ব্যাধিতে, স্তম্ভনে, বিবাদে, রিপুবধ সময়ে। তাঁর পূজার মন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের মত অব্যর্থ - স্তম্ভনে অমোঘ, এমন কি সেই মন্ত্রে পবনেরও গতিরোধ করা চলে। দেবী বগলামুখীর প্রধান মন্দির বানখান্দি, হিমাচলপ্রদেশে হলেও দেবীর আরও কিছু মন্দির দেখতে পাওয়া যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, কামাখ্যায়, বাংলাদেশ ও নেপালে।

দেবী মাতঙ্গী হলেন দশমহাবিদ্যার মতে নবম মহাবিদ্যা। দেবী মূলত সরস্বতীদেবীর তান্ত্রিকরূপ হিসাবেই চিহ্নিতা হন। তাকে একজন চণ্ডালিনী হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অন্য ধ্যানমতে দেবীকে উচ্ছিষ্টা মাতঙ্গী হিসাবে দেখানো হয়েছে। এখানে মাতঙ্গীদেবীকে একটি মৃতদেহের উপর উপবিষ্টা এবং লাল কাপড় পরেন। দেবীর সম্পূর্ণরূপে বিকশিত স্তন ও একটি অল্প বয়স্কা কুমারী হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনি এক হাতে একটি নর করোটি এবং অন্য হাতে একটি তরবারি বহন করেন। তাঁর গায়ের রং নীল, কোমর পাতলা, কপালে চাঁদ। তাঁর তিনটি চোখ এবং হাস্যমুখে থাকেন। তিনি মণিরত্ন পরিধান করেন এবং একটি অলঙ্কারসজ্জিত সিংহাসনে বসেন।

দশমহাবিদ্যার নবম রূপ হল মাতঙ্গী। ধ্যানরূপে 'মাতঙ্গী' বা 'মাতঙ্গিনী' দেবী হলেন —

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

'শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্ন সিংহাসন স্থিতাং।
বেদৈব্বাহুদন্তৈরসি খেটকপাশাঙ্কুশধরাম্।'

দেবী মধ্যযৌবনা ও তপ্তকাঞ্চণবর্ণা, ত্রিনয়নী, রত্ন-সিংহাসনে বসে রয়েছেন। তাঁর চারটি হাত; হাতে অসি বা খড়্গ, খেটক বা দণ্ড, পাশ ও অঙ্কুশ। তাঁর সাধনায় সাধকের অগ্নিস্তম্ভন, জলস্তম্ভন ও বাক্যস্তম্ভনের শক্তি জন্মায়। বিবাদে, শাস্ত্রে ও কবিত্বে পরম অধিকার জন্মে। তাঁর পূজায় ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে মৎস্য, মাংস ও পায়েস সর্বশ্রেষ্ঠ। তন্ত্রশাস্ত্রে দশমহাবিদ্যার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে দেবী মাতঙ্গীকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শিবকে আক্রমণ করতে দেখানো হয়েছে। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে উচ্ছিষ্টা মাতঙ্গীর উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একবার দেবতা বিষ্ণু ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী এসে ভগবান শিব এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী পার্বতীকে দর্শন করেন। তাঁদের খাবার খাওয়ার সময় তাঁদের খাদ্য অবশিষ্ট থাকে। কিছু খাবার দেবতারা মাটিতেও ফেলেছিলেন। ঐ স্থানে থাকা এক কুমারী অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করেন বলে সেদিন থেকেই কুমারী উচ্ছিষ্টা মাতঙ্গিনী নামে পরিচিত হন।

দশমহাবিদ্যার সর্বশেষ বা দশম রূপ হল মহাবিদ্যা 'কমলা', যিনি পদ্মবনের রানী। তাঁকে স্নান করাচ্ছে চারটি হাতি - তারা সোনার ঘড়াতে করে অমৃত নিয়ে এসেছে। তাঁর হাত চারটি, তাতে রয়েছে বর ও অভয় আর দুটি পদ্ম; কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। তাঁর পরনে ক্ষৌম বসন, গায়ে অপূর্ব ও অসংখ্য রত্নালঙ্কার; পদ্মাসনে, পদ্মের ওপরে তিনি বসে রয়েছেন। সোনার মতই তাঁর দেহকান্তি।

দেবী কমলা বরাভয় প্রদায়িনী শুদ্ধ চৈতন্যের দেবী এবং তান্ত্রিক লক্ষ্মী নামেও তিনি পরিচিতা। কমল মানে হচ্ছে পদ্ম। দেবীকে মূলত বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে। কমলার সঙ্গে সমৃদ্ধি ও সম্পদ, উর্বরতা ও ফসল, এবং সৌভাগ্য এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদান রয়েছে। কমলা হলো প্রথম এবং প্রধান স্ত্রীশক্তি। শাক্ত মতে কমলকে স্ত্রী-যোনীর সংগে তুলনা করা হয়েছে। সুন্দরের প্রতীক হিসাবে আমরা যে সকল দেবীকে পাই তাঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন এই কমলা দেবী। কোথাও কোথাও তাঁকে কমলাসুন্দরীও বলা হয়েছে। তাঁর সাধনায় সাধকের সম্পদ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। 'শ্রীং' - এই একাক্ষর বীজই কমলা দেবীর মন্ত্র।

কালী অঘোর মন্ত্র সাধনা

তবে এই দশমহাবিদ্যার প্রধানা দেবী কালী তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের একটি মূল সত্তা যা স্বর্গীয়, ঐশ্বরিক বা শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝায়। দেবী হলেন মূল মাতৃকাশক্তি। তিনি সর্বাধিকা, সর্বশক্তিসমন্বিতা, একমদ্বিতীয়াম্। এইবার আমাদের আত্মরক্ষার জন্য কালী

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অঘোর মন্ত্র সাধনা বিষয়ে আলোচনা করব। অনেকেই কিছু প্রয়োজনীয় সাধনা বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে জানতে চেয়ে থাকেন ও সাধারন মানুষও এই সাধনা করতে পারবেন, তাই এই সাধনাটি নিয়ে লিখলাম। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে আপনি নিজের ও অন্যের সুরক্ষা করতে পারবেন।

সাধনার সামগ্রী—

১) মা কালীর যন্ত্র বা মা কালীর মূর্তি, আম কাঠের তক্তার উপর লাল কাপড় বিছিয়ে ঐ মুর্তি বা যন্ত্র তার উপরে রাখতে হবে যাতে আবাহন বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

২) রুদ্রাক্ষের জপ মালা, তান্ত্রিক মতে মালা সংস্কার বিধিতে তৈরী হতে হবে।

৩) আসন, দীক্ষার সময় থেকে যেটা ব্যবহার করছেন সেটা হলে ভালো।

৪) দেবী মাকে অর্পণ করার ফুল, ফল, মিষ্টি, ধুপ, দীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি সাধ্যমতো।

৫) এছাড়া অঘোর মন্ত্র জপ করছেন বলে কর্পূর, ধুনো, গুগ্গুল, লোবান, পান, সুপারী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, চামেলীর তেল এসবও লাগবে এই ক্রিয়াতে।

সাধন পদ্ধতি—সাধনা শুরু করার আগের এক সপ্তাহ আপনি নিজে রান্না করে সাধারণ সিদ্ধ ভাত খাবেন এবং গুরু মন্ত্র, বীজ মন্ত্র বা কোনো মন্ত্র নিত্য জপ করার থাকলে তা করবেন। সাধনার আগের দিন থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। যে স্থানে সাধনা করবেন সেই জায়গাটি সাধারণ শুদ্ধ ও পবিত্র করে নেবেন। গুরু গোরখনাথের নামে একটা অখণ্ড প্রদীপ জ্বালাবেন ঘি দিয়ে।

প্রথমেই গুরুর পূজা ও নবনাথের পূজা করে নেবেন। তরপর কালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সাধারণ পূজার নিয়ম অনুযায়ী যথা সাধ্য উপচারে পূজা করবেন। এরপর সামনে একটি প্রদীপ জ্বালাবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ধুনিতে কর্পুর, ধুনো, গুগ্গুল ও লোবান জ্বালাবেন। প্রভু শিব, আদিনাথ দত্তাত্রেয়, নবনাথ ও চুরাশি সিদ্ধদের প্রণাম করবেন।

মন্ত্র —

ওঁ কালিকাদেবী
কালরূপিনী মহাকালী
নব নাড়ি বাহাত্তর জালি
মম ভয়ম্ হর হর
রক্ষাম্ কুরু কুরু স্বাহা।

এই মন্ত্র জপ করার সময় ধুনিতে লোবান যেন জ্বলতে থাকে, একই সাথে চামেলীর তেলের একটা প্রদীপ জলবে। রাত ১১ টা থেকে ভোর ৪ টার মধ্যে এই মন্ত্র রোজ ১১০০ বার করে ১১ দিন ধরে করতে হবে। কোনো হোম না করলেও

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই মন্ত্র জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে পরে প্রয়োগ করা যায়। সাধনা চলাকালীন যদি বন্য জন্তুর স্বপ্ন আসে বা কেউ যদি নিজেকে পথ হারাতে দেখেন, তবে বুঝবেন সাধনায় কোনো ভুল হচ্ছে বা কোনো বিধি লঙ্ঘন হচ্ছে। তখন গুরুমন্ত্র জপ করবেন। সাধনা চলাকালীন ঘরে হটাৎ কালো পিঁপড়ে বেড়ে যেতে পারে এটা শুভ লক্ষণ, এমন দেখলে জানবেন এবার আপনার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

প্রয়োগ বিধি—এই মন্ত্রের অনেক গুলি প্রয়োগ বিধি আছে প্রায় মাত্র কয়েকটি এখানে দিলাম।

১) এই মন্ত্র দ্বারা ১১ বার পরে সুরক্ষা-ঘেরা দিয়ে রাখলে ভুত-প্রেত উপদ্রব বা কোনো বাধা প্রবেশ করতে পারে না।

২) এই মন্ত্র ভোজপত্রে লিখ ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে ধাতুর তাবিজে ভরে ধারন করবেন বা করাবেন, এতে আত্মরক্ষা হবে।

৩) এই মন্ত্র দিয়ে লোবান অভিমন্ত্রিত করে সেই ধোঁয়া ঘর ও বাস্তু-এর সব স্থানে ঘুরাবেন, এতে ঘরে কোনো বিজাতীয় উপদ্রব থাকবে না।

দশমহাবিদ্যার সাধনায় বর্ণিত সাধনায় কালী প্রথম স্থানে রয়েছেন। ভববন্ধন মোচনে কালীর আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। শক্তি উপাসনার ক্ষেত্রে শক্তিপীঠে কালীর পূজাই শ্রেষ্ঠ আর কামাখ্যাধামে তা সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তি পথে শক্তির আরাধনা যে কোন রূপে করা যায়, কিন্তু সাফল্য লাভের জন্য সর্বদাই বীরত্বের সাথে তার পূজা করতে হবে। সাহসী সাধক বিরল। যে ভক্তরা তাদের মন থেকে মোহ, আসক্তি, গুরুত্ব, অনুরাগ ইত্যাদি অনুভূতি দূর করেননি, তারা তাদের পূজায় সফল হন না। অনেক ধ্যানের মাধ্যমে যখন সম্পূর্ণ শিশুসুলভতা ফুটে ওঠে, তখন ভগবতীর শ্রীবিগ্রহ সাধকের সামনে উপস্থিত হয়। এতে ভক্তের একান্ত ভক্তি এবং গুরুর কৃপা বিশেষ সহযোগী। সেই সময় মায়ের রূপ অবর্ণনীয় আর তা শুধুমাত্র সাধকের সামনেই ঘটে। দিগ্বসনা মুক্তকুন্তলা কাজল পর্বতের মতো, মৃতদেহের উপর বসানো, মুণ্ডমালধারিণী ভগবতী স্বশরীরে আবির্ভূতা হন। তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন সাধককে সফল করে তোলে।

মহাকালীর ধ্যান, উপাসনা পদ্ধতি এবং তন্ত্র-মন্ত্র বিভিন্ন সাধক, সিদ্ধরা বিভিন্ন ভাবে করে থাকেন যা সম্পূর্ণ লেখা অসম্ভব। রূপগুলি যেমন বহু, তেমনি তাদের সাধনা পদ্ধতিগুলিও আলাদা। কোন রূপে মা আমাকে আশীর্বাদ করবেন তা বলা যায় না। মায়ের শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত এবং তিনি নিজেই সমস্ত কৃতিত্ব প্রদানে সক্ষম। 'মহাকাল সংহিতা' গ্রন্থে এই পুজোগুলোর বিস্তারিত পদ্ধতি আছে। এখানে একটি বিশেষ পদ্ধতি লিখে দিলাম —

সাধককে প্রথমে সমস্ত ব্যবস্থা যেমন যম, নিয়ম, সংযম, প্রাণায়াম ইত্যাদি করার পর, একটি নিরিবিলি নির্জন স্থান বা এমন একটি কক্ষ বেছে নেওয়া দরকার যেখানে কোনো শব্দ বা মানুষের আনাগোনা নেই কিম্বা গুরুর অনুমতি নিয়ে শ্মশান বা শ্মশানের মত কোনও জায়গা বেছে নেওয়া উচিত। সমস্ত, জায়গাটি শুদ্ধ করার পরে,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেখানে দেবীর মূর্তি এবং প্রয়োজনীয় মণ্ডল স্থাপন করে আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করুন।

এখানে প্রথমে অমাবস্যায় সাধনা পদ্ধতি দেওয়া হল। প্রথমে ৯হাত ৯হাত একটি জায়গা পরিষ্কার করুন। সেখানে কালীর একটি ছোট পাথরের মুর্তি স্থাপনা করুন। যদি এমন মূর্তি না রাখতে পারেন তবে ধাতু, পিতল, তামা বা মাটির মূর্তি স্থাপন করা যেতে পারে। এবার লাল কম্বল, কাঁচা আতপ চাল, লাল কাপড়ের সাড়ে পাঁচ হাত, মণ্ডল তৈরীর বিভিন্ন রঙ ইত্যাদি, মাটির প্রদীপ, আলো, ঘি, হবন সমগ্রী, কুমকুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা, অগর, তগর, কর্পূর, জাফরান, হিঙ্গুল, হলুদ, শিলাজিৎ, জটামাংসী, দেবদারু, গুগ্গুল, লবঙ্গ, নাগরমোথা, খস, নারকেল, মধু, লাল চন্দনের মালা, পঞ্চপল্লব, লাল গুঞ্জা, গুঞ্জা মূল, কালো তিলের তেল, আমলা, চিনি। এছাড়া বলির জন্য ছাগল বা মোরগ ইত্যাদি।

জপ মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লীং ক্রং ক্রাং ক্রিং ক্রীং ক্রুং ক্রূং ক্রৈং ক্রোং ক্রৌং কং ক্রং ক্রঃ লং শং ষং হুম্ ফট্ স্বাহা।

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের দিন থেকে অমাবস্যার রাত পর্যন্ত এই সাধনা করা হয়।

প্রাথমিক কাজ—পূর্ণিমার শুভ সময়ে, পুজোর স্থানটি পরিস্কার করে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তার আগে চারপাশে মাটি দিয়ে এক হাত উঁচু বাঁধ তৈরি করে তার বাইরে আট আঙ্গুল চওড়া, এক হাত গভীর গর্ত খুঁড়ে নিতে হবে। এবার এটি জল দিয়ে পূরণ করতে হবে।

একটি কম্পাস দিয়ে সাধনাস্থলের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করুন। এখন প্রতিটি দিককে নয়টি সমান অংশে ভাগ করুন এবং এর লাইনগুলিকে যুক্ত করুন। কোণের অবস্থান নিম্নরূপ হবে। এবার উত্তর-পূর্ব দিকে আবার নয়টি চৌকো করে সিঁদুর দিয়ে ঘিরে দিন। এই চত্বরের উত্তর-পূর্ব দিকে কালো মাটির পাত্রে প্রতিমা বা ছবি স্থাপন করে ১০৮ বার স্নান করান। ১০৮ বার জপ করে মাটির পাত্র থেকে মুর্তি বা প্রতিমা বের করে তারপর ১০৮ বার মন্ত্র পড়ে মা কালীকে পুনরায় স্নান করান। স্নানের পর প্রতিমাকে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। এই অবস্থানে কোনো মানুষ বা কোনো প্রাণী যেন এখানে না আসে। এবার মূর্তির পাশে একটি ছোট বেদী তৈরি করুন, যার প্রান্তটি চার আঙ্গুল উঁচু হতে হবে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের এই বেদীর গভীরতা সমতল পৃষ্ঠে নয় আঙ্গুল হওয়া উচিত। কালো মাটি দিয়ে বেদীতে ভালোভাবে প্রলেপ দেওয়ার পর কালী মন্ত্রে জলে ভর্তি করে দিন।

সাধনা পদ্ধতি—প্রথমত, সাধকের প্রতিদিন সকালে স্বাভাবিকভাবে মায়ের আরাধনা করা উচিত এবং মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত—'হে মা, এই সাধনা সফল করতে, সবকিছু কেবল আপনার কৃপায় নির্ভর করে।' এই বলে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করুন। সূর্যাস্তের পর ঐ স্থানে পৌঁছে সমস্ত সামগ্রী দেখে সূর্যাস্তের আগে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের চরণে শান্তি ও সাধনার সাফল্য প্রার্থনা করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মূল মন্ত্র পাঠ করে চার দিকে জল ছিটিয়ে দিন।

পুজা পদ্ধতি—একাক্ষরী দক্ষিণা কালীর পুজোর মতো বিনিয়োগ, ঋসিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস করে ধ্যান করুন, পুজা করুন।

বর্ণমালার প্রতি অক্ষর বীজমন্ত্রের আগে ও পরে বসিয়ে নিজের উপর বিশ্বাস রেখে মন্ত্র জপ করুন। জপ সমর্পণ করুন। প্রনাম করুন।

এখন আতপ চাল, ঘি, মধু, অগর, তগর, কর্পূর, হিঙ্গুল, গুগ্গুল, হলুদ, জটামাংসী, মরামাংসী, দেবদারু, নারকেল, মধু, কালো তিল, বটের বীজ, গুঞ্জা মূল, সাদা চন্দন, লাল চন্দন, গুঁড়ো হলুদ ইত্যাদি মিশিয়ে দিতে হবে। এবার আম, কাঁটাল, বট, অশ্বথ, বকুল/যজ্ঞডুমুর—এই পাঁচটি লাঠি বেদীতে রাখুন। একটি থালাতে আমলা, ভাং, নাগরমোথা, গোরোচনা, কুমকুম, সিন্দুর ইত্যাদি আলাদা আলাদা করে রাখুন। একটি প্রদীপে তিল তেলে ভর্তি করে ঐ থালায় রাখুন।

এখন প্রদীপ জ্বালিয়ে মাকে প্রণাম করার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ষোড়ান্যাস সম্পুর্ন বা সংক্ষিপ্ত ষোড়ান্যাস করার পরে পদ্মাসন বা সুখাসন ভঙ্গীতে বসে কালীর ধ্যান করুন। যজ্ঞবেদীতে আগুন জ্বালান। ১০৮ বার মন্ত্র পাঠ করে কালীকে আহুতি নিবেদন করুন। এর পরে, মূল মন্ত্রটি ১১ বার পাঠ করে দেবীর চরণে জবা ফুল অর্পণ করুন। তাঁর পায়ে কুমকুম ও গোরোচনার টিকা এবং সিঁদুর টিকা লাগিয়ে প্রনাম করুন।

মূল মন্ত্রে হোম করে আহুতি দিন। হোমের বিভুতি, আমলা ও ভাং নিয়ে ভালো করে পিষে নিয়ে (৩:১ ভাগে) তা থেকে পাঁচ গ্রাম নিয়ে কালীকে স্মরণ করে নিজের কপালে টিকা এঁকে বাকিটা বিশুদ্ধ জলে দিয়ে পান করুন। যদি কাঁচা আমলকি না পাওয়া যায় তবে শুকনো আমলকিও দেওয়া যেতে পারে।

এবার একটু বিশ্রাম নিয়ে গুরুর ধ্যান করুন, পরে মা কালীর চরণ ধ্যান করুন। তার পর কালীর পায়ের আঙুলে নয় মিনিট ত্রাটক করুন। পরে মূল মন্ত্রটি সাতবার জপ করে কালীর তৃতীয় নেত্রে ত্রাটক করুন এবং পুরো দেবীমূর্তিটি মানসপটে ধারণ করার চেষ্টা করুন। এবার নয় বার মন্ত্র পাঠ করে মায়ের প্রতি পায়ে একটি একটি করে আঠেরোটি লবঙ্গ নিবেদন করুন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শুক্লপক্ষে অন্যভাবে মা কালীর পূজা করতে পারেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা এবার করছি। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের থেকে এই পদ্ধতিতে সাধনা করুন। অন্য সব পদ্ধতি আগের মত একই থাকবে। চারিদিকে খনন করা প্রতিরক্ষামূলক গর্তে প্রতিদিন মন্ত্র উচ্চারণ করে জল ঢালতে থাকবেন।

এবার আসন পেতে বসুন। প্রথমেই মুলাধার চক্রে মনোনিবেশ করুন। এই মুলাধার হল কুন্ডলিনী শক্তির আবাস। মুলাধার চক্রে ধ্যান করুন। প্রথমে পুরো চক্রটিকে মনে মনে চিন্তা করুন। তারপর তার কেন্দ্রের শিবলিঙ্গকে দীপ্তিময় রূপে প্রতিষ্ঠা করে 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র যথাসম্ভব বেশী করে জপ করুন।

এই চক্রের অবস্থান আমাদের সুষুম্না কান্ডের একদম শুরুতে। যারা সাধনপথে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আছে, অথবা যারা নিয়মিত ধ্যান ও যোগ চর্চা করেন তারা অবশ্যই জানবেন অশ্বিনীমুদ্রার কথা। অশ্বিনী মুদ্রায় গুহ্যদ্বার কে ভিতরের দিকে সংকুচিত করলে, ঠিক যতটা পর্যন্ত সংকুচিত হয় সেখানেই অবস্থান এই মূলাধার চক্রের। অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নিগূঢ় বিদ্যা আরোপিত রয়েছে এই চক্রে। এই চক্রের মোট ৪টি পাঁপড়ি, চক্রের রঙ গাঢ় লাল, অধিষ্ঠাতা দেবতা ব্রহ্মা, অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ডাকিনী, অধিদেবতা গণেশ, বীজ লং, বীজের বাহন ঐরাবত, তত্ত্ব পৃথ্বী, তীর্থ ব্রহ্মতীর্থ বা পুষ্করতীর্থ। এই চক্রের সাধনায় জয় লাভ করলে বা এই চক্র জাগরিত হলে, সাধক নিজের ইচ্ছায় ঘ্রাণশক্তি কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, এছাড়া আরও কিছু গুণ লাভ হয়। এই চক্রে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করুন। এবার ডাকিনীকে এই চক্রে স্থাপনা করে চক্রটির বীজমন্ত্র—'লং' মাত্র ১০৮ বার জপ করুন। ডাকিনী দেবীর গায়ের রঙ উজ্জ্বল লাল বর্ণের। ডাকিনীর প্রতি ধ্যান রেখে ডাকিনী মন্ত্র—'ওঁ নমো লং বং শং সং হং ডাকিনি হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা।' এই মন্ত্রটিও ১০৮ বার জপ করুন। ৯ বার জপের পর একটি করে লাল জবা ফুল, অর্থাৎ ১২টি ফুল কালীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন। এই মন্ত্রটি জপ করার সময় যথাক্রমে বাম থেকে ডানে পাঁপড়িগুলিতে মনে রেখে করুন। এবার পরপর চারটি পাঁপড়িকে লক্ষ্য করে চারটি মন্ত্র একে একে ১০৮ বার করে জপ করুন।

ওঁ নমঃ লং বং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা।
ওঁ নমঃ লং শং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা।
ওঁ নমঃ লং ষং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা।
ওঁ নমঃ লং সং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা।

মূলাধারের পদ্মের চারটি পাঁপড়িতে উপরের এই চারটি মন্ত্র পরপর ১০৮ বার পাঠ করুন এবং কালীর ধ্যান করুন। এবার সাধক কালীর পূজা আগের মত করে নিন। সাধক গুরুর কাছ থেকে পৃথকভাবেও পুজার পদ্ধতি শিখে নিন।

চক্র সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, ধ্যান করার আগে, সাধকের উচিত ধ্যান প্রক্রিয়াটি পদ্ধতিগতভাবে অনুশীলন করা। এই অনুশীলনটি বেশ কয়েক দিন সময় নিতে পারে। এই অনুশীলনের পরে, শিবলিঙ্গ, ডাকিনী এবং কালীকে একটি একটি করে প্রতিষ্ঠা করার সময় জপ করুন। এই প্রক্রিয়ায় একে একে সব অংশের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। ধীরে ধীরে, ত্রাটক করার বলে লক্ষ্য বিষয়গুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠে প্রকট হবে। পরে পূজার সময়ে প্রতিটি বিষয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে বিষয়গুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসতে থাকে। পরবর্তীকালে সাধনা পদ্ধতিতে সাধক বিভিন্ন ধরনের রহস্যময় দর্শন করেন বা কণ্ঠস্বর শুনতে পান। সাধকদের উচিত তাদের অভিজ্ঞতা গোপন রাখা, কারো সামনে প্রকাশ করলে তাদের প্রভাব কমে যায়।

এর পরে আসে ভৈরবী সাধনার সাথে কালীর পূজা। এই তামসিক সাধনা পদ্ধতিতে প্রাথমিক প্রস্তুতি ও পূজা ইত্যাদি সব উপরে আলোচিত সাধনার মতই থাকে, তবে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হবন করার সময় মদ ও মাংস দিয়ে আহুতি দেওয়া হয় এবং মহিষের চর্বি, লবঙ্গ, মদ, নাগরমোথা, চাল দিয়ে মিশ্র বলি দেওয়া হয়। প্রতি ১০৮ মন্ত্র জপের পর একটি মোরগ, পাঠা বা মহিষ বলি দেওয়া হয় এবং তার মাংস রান্না করে মদের সাথে প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ধ্যান ইত্যাদির সকল পদ্ধতি একই।

এর পরই শুরু হয় 'ভৈরবী সাধনা'। এতে কুমারী বা অন্য ধরনের দীক্ষিতা ভৈরবীকে সাধনায় সহকারী করা হয় এবং উভয়ে একসঙ্গে পূজার আচারে অংশগ্রহণ করেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব না, এই সাধনা বিষয়ে নিজের গুরুদেবের সাথে আলোচনা করুন ও প্রয়োজনে তার সাহচর্যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন।

শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধককে প্রথমেই সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

সাধক প্রথমে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে, স্নান করে প্রথমে প্রাণায়াম করে এবং পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে হবে। তারপর নিত্যকর্ম করুন।

সাধকের উচিত সবসময় তার শরীর সোজা রাখা এবং হাত হাঁটুর উপর রাখা। এবার মাথা সোজা রেখে নাকের ডগায় দৃষ্টি ঠিক রাখুন।

এর পরে নাসাগ্রের ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ অনুভুত হবে ও ধীরে ধীরে চোখের পাতা বন্ধ হতে শুরু করবে। চোখের পাতা বন্ধ করে, মানসিক শক্তি দিয়ে অন্ধকার পর্দায় একটি আলোর বিন্দুকে অনুসরণ করতে থাকুন।

প্রতিদিন এই ভাবে কিছু সময় করে অনুশীলন করলে একটি বিন্দু উদয় হবে, কখনও তা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং কখনও এটি দেখা যাবে। মানসিক একাগ্রতার সাথে এই বিন্দুটিকে স্থির করুন এবং এটিকে বড় করুন। যখন পুরো অন্ধকার স্থান আলোকিত হবে, তখন এই তীব্র আলোতে কালীর জীবন্ত মূর্তির ধ্যান করুন। কিছুদিনে যখন এই আলোকিত প্রতিচ্ছবি পূর্ণ মুর্তিতে অবতরণ করবে, তখন সমস্ত শরীরে শক্তির স্রোত অনুভুত হবে।

সাধকের উচিত এই জীবন্ত মূর্তিটিকে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে পূজা করা এবং মাথার খুলির উপরে নিয়ে নীচের দিকে নিয়ে যাওয়া—এটাও শুধুমাত্র মানসিক শক্তির মাধ্যমেই ঘটবে। কালীর মূর্তিকে ত্রাটক যোগের মাধ্যমে নাকের সরলরেখায় তুলে নিন, তারপর সেখান থেকে মেরুদণ্ড বরাবর মুলাধার পর্যন্ত নিন। বেশ কিছু দিন এইভাবে সাধনার পরে সাধক কালীর কাছে যা চাইবে তাই পাবে, তবে সাধককে তার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টা করতে হবে। এই সাধনায় কোনো প্রকার পূজা-জপ, উপকরণ, আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। এই সাধনার বিষয়ে বিশেষ কিছু বিষয় জানতে হবে। যেমন—

সাধকের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিদিন ২১ বার স্বাভাবিক প্রাণায়াম চক্র অনুশীলন করা উচিত। সুখাসনে বসে ডান নাক বন্ধ করে বাম নাকের ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিয়ে ভিতরে পূর্ণ হওয়ার পরে যতটা সম্ভব শ্বাস বন্ধ করতে হবে। এই ক্রিয়াকে কুম্ভক

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বলা হয়। কুম্ভক শেষ হওয়ার পর বাম নাকের ছিদ্র বন্ধ করে ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। এই শ্বাস ছাড়াটি দ্রুত করা উচিত নয় কারণ এটি হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। সম্পূর্ণরূপে শ্বাস ছাড়ার পরে, এখন যতটা সম্ভব বাহ্যিক কুম্ভক করুন, তারপরে, ডান নাক বন্ধ করার পরে, বাকী ক্রিয়াটি আগের মতো করুন অর্থাৎ কুম্ভকের পরে বাম নাকের ছিদ্র দিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। এভাবেই একটি প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম শাস্ত্র অনুসারে একে অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম বলা হয়। এটি শরীরের বাতাসকে বিশুদ্ধ করে এবং আত্মাকে শক্তি দেয় এবং প্রাণের আরাম হয়। একইভাবে, সাধকের ২১ বার প্রাণায়াম করা উচিত।

ধ্যানের সময় সাধকের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত এবং সচেতন থাকতে হবে। মানসিক দুশ্চিন্তা কোনোভাবেই হওয়া উচিত নয়। এইভাবে, তিনি যম-নিয়ম এবং ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে তার সমগ্র ব্যবহারিক জীবনের কাজ করতে পারেন। এমন কাজ করবেন না যাতে আপনার মন অন্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় যার কারণে ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটে।

শক্তি সাধনার মাধ্যমে শরীরে উৎপাদিত বীর্যের শক্তি মহাজাগতিক শক্তির উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে ওজঃ শক্তিতে প্রকাশ পায় তাই বীর্য রক্ষা করে সাধককে ব্রহ্মচর্য অনুসরণ করা উচিত।

একজন গৃহস্থ যদি আধ্যাত্মিক সাধনা করেন, তাহলে তার শরীরের আভ্যন্তরীণ চক্রের আধ্যাত্মিক অনুশীলনই তার জন্য যথেষ্ট এবং এই অনুশীলন ক্রমাগত হওয়া উচিত। সিদ্ধির পরে সাধনার সময় রাতের চতুর্থ প্রহরে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

কালী সাধনায়, সাধকের মনকে সব উপায়ে নিবদ্ধ রাখতে হয়, অন্যথায় সাধনা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

আপনি যদি কোনো ইচ্ছা পূরণের জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা করে থাকেন, তবে সেই ইচ্ছাটিকে একপাশে রাখুন এবং সাধনা শেষ হলেই আপনার মনে সেই ইচ্ছার চিন্তা আনুন, তাহলে আপনি সফলতা পাবেন।

কালী সাধনা মানসিক শান্তির সাথেও জড়িত, তাই সাধকের উচিত বাড়ির বাইরে নির্জন স্থানে গিয়ে পূজার স্থান প্রস্তুত করা। সর্বপ্রথম মা কালীর পূজা করার পরে, অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলন করা উচিত। মূল মন্ত্রটি জপ করুন এবং মানসিক একাগ্রতা অর্থাৎ ত্রাটক পদ্ধতিতে মা কালীর মূর্তি শিখায় স্থাপন করা। ধ্যান সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় হয়ে উঠলে ভয়ঙ্কর অনুভব হতে পারে, তবে সাধককে ভয় পেলে চলবে না বা বিভ্রান্ত হওয়াও উচিত নয়। এই দৃশ্যগুলো শেষ হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফুটে উঠবে মা কালীর পূর্ণাঙ্গ অবয়ব। আপনি তাঁর কাছ থেকে যা কিছু চাইবেন, সাধককে তা মানসিকভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সাধকের ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ হবে।

তামসিক বামমার্গী সাধনায় মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মদ এবং ভৈরবী ইত্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে, তাই ইন্দ্রিয়জয়ী সাধক ছাড়া বাকিদের এই বামমার্গের সাধনা কঠোরভাবে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এড়িয়ে চলা উচিত এমন কি তামসিক সাধনার আলোচনা ও দর্শনও করা উচিত নয়।

ভৈরবী স্বেচ্ছায় ব্যবহার করা উচিত, সাধিকাকে কোনোভাবেই সাধনায় অংশগ্রহণে বাধ্য করা উচিত নয়, অন্যথায় সাধনায় বিঘ্ন ঘটবে ও সাধকের ক্ষতি হবে। যোগ্য ভৈরবী-সাধনার ক্ষেত্রে এই চিন্তা মাথায় আনা উচিত নয় যে এটি একটি পাপ, কারণ সাধক ও ভৈরবীর মিলনই পূর্ণ সাফল্যের একমাত্র প্রাপ্তি। ভৈরবী, যে এই ধ্যানে মগ্ন থাকে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের শক্তি লাভ করে এবং তার বয়স ও যৌবন স্থায়ী হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার প্রভাবে দৈহিক সুখ ও ইচ্ছা আপনাআপনি পূর্ণ হতে থাকে।

তন্ত্র মার্গে ভৈরবী মহামায়াকে 'পার্বতী'-র রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এতে সাধকের কোনো ভোগের অনুভূতি থাকা উচিত নয়, আছে কেবল যোগ কর্মের অনুভূতি। এই কারণেই অনেক অবিবাহিত যুবতী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভৈরবী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু শতাধিকের মধ্যে মাত্র দু'-একজন ভৈরবী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই সাধনা পদ্ধতিটিকে বামাচার বা বাম মার্গের সবচেয়ে গোপনীয় এবং সবচেয়ে কঠিন সাধনা বলে মনে করা হয়। সাধনার পর, সাধক নিজে শিবের মতো হয়ে ওঠেন এবং ত্রিতাপ জ্বালার সম্মুখীন হতে হয় না, তিনি সিদ্ধ যোগী হিসাবে বিবেচিত হন।

এই শক্তির প্রভাবে সাধকের বয়স বাড়ে কিন্তু যৌবন চিরন্তন থাকে। সাধকের মানসিক শক্তি এতটাই বেড়ে যায় যে তিনি রাগান্বিত দৃষ্টিতে কাঁচ ফাটাতে পারেন ও কাঠে আগুন ধরিয়ে দিতে পারেন, বরফকে গলিয়ে জল করতে পারেন আবার তাজা ফুলকে শুকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কারও অতীত, ভবিষ্যত বা বর্তমান বলে দেওয়ার ক্ষমতা সাধকের লাভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এখন ভারতবর্ষ থেকে এই সাধনা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে ও এমন সাধকও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, আসাম, ত্রিপুরা এবং হিমালয়ের গোপন কিছু সাধক এখনও এই জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভাগ্যবান কিছু সাধারণ মানুষ তাঁদের সংস্পর্শে এলেও বুঝতে পারেন না যে এরা বামাচারী সাধক। বর্তমান সময়ের সামাজিক পরিবেশ ও জনবিশ্বাস পরিবর্তনের কারণে এই শিক্ষার ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আমার কাছে পশ্চিম ও পূর্ববাংলায় এমন সাধকের কোনও খোঁজ নেই।

ভৈরবী সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত কালী-সাধককে দেবী অপরিমেয় শক্তি দান করেন, যার প্রভাবে সাধক ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেন। জীবনে কোনও চাহিদা অপূরিত থাকে না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মন্ত্র জপ, পুরশ্চরণ ও গুপ্ত জ্ঞান

এই জীবনকে চার ভাবে যাপন করা যায়—১) এই জীবন একটি যুদ্ধ, জীবন একটি সংগ্রাম, ২) জীবন একটি স্বপ্ন, শুধু স্বপ্নপুরণেই কাটুক এই জীবন ৩) জীবন একটি উদযাপন, আপনি যে পরিস্থিতিতে বাঁচতে চান সেই ভাবেই বাঁচতে পারেন, ৪) জীবন একটি কাল, যে ভাবে চলছে সেই ভাবেই চলুক—দুঃখকষ্টে সমভাব। সাধারন মানুষ এই প্রথম ভাব নিয়ে সংগ্রাম করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন। তারা উদরপূর্তি আর বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই বেঝেন না, এরাই সংসারে সংখ্যায় বেশী। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ 'আধ্যাত্মিক জীবন'-এর স্বপ্ন দেখেন ও গুরুদীক্ষা নিয়ে থাকেন। তারা দীক্ষা নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ জপ, ধ্যান, গুরুসাক্ষাৎকার নিয়ে গর্ববোধ করেন ও নিজেকে ধার্মিক মানুষ হিসাবে প্রচার করতে ব্যস্ত হন। তৃতীয় প্রকার মানুষ দীক্ষা গ্রহণ করে গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখেন। এর সাথে সাথে তীর্থভ্রমণ, সৎসঙ্গ লাভ ইতাদি প্রক্রিয়ায় নিজেদের আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত করে তোলেন কিন্তু আকস্মিকভাবে সাংসারিক বিষয়ে এতটাই অসুবিধার সম্মুখীন হন যে মূল স্রোত থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। এরা মানসিক ভাবে আধ্যাত্মিক, কিন্তু সাংসারিক দায়দায়িত্বকে কখনওই এড়াতে পারেন না। চতুর্থ প্রকারের ব্যক্তিরা খুব ছোট বেলা থেকেই, সংস্কার বশতঃ, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে, বিয়ে করুন বা না করুন, জীবনকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে সংসারে বসবাস করেন। পরমব্রহ্মের স্বরূপ তারাই উপলব্ধি করে পরবর্তীকালে 'গুরু' পদবাচ্য হন। এঁরা সংখ্যায় খুবই অল্প। এঁদের কেউ কেউ দীক্ষাদান করেন আবার কেউ কেউ সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হন।

চতুর্থ প্রকার গুরুপদবাচ্য সাধকেরা জানেন—'ওঁ' কথাটি স্বয়ং 'ব্রহ্ম' স্বরূপ। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চেতনা শক্তি। এঁকে কখনই জানা যায় না কিন্তু এর শক্তিকে অনুভব করা যায়। ঈশ্বরতত্বকে ব্যাখ্যা করলেও কেউ একে চোখে দেখার কৌশল বলে যেতে পারেননি। কারণ শক্তির আধারকে কখনই চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর স্বয়ং একটি শেষ বিজ্ঞান, তাই বিজ্ঞানের আলোকে বলি—তাঁকে উপলব্ধি করতে চাইলে সচ্ছতাই একমাত্র রাস্তা। একটি পাত্র জলপূর্ণ করলে সূর্য তাতে পরিস্কার প্রতিভাত হয়, এইরকম একাধিক পাত্রে রাখলে একাধিক বার প্রতিভাত হয় কিন্তু জল গুলিয়ে দিলে যতক্ষণ না তা স্থির হচ্ছে ততক্ষণ সূর্য পরিস্কার দেখা যাবে না।

কেনোপনিষদের ১/৬ শ্লোকে বলা হল, 'যন্মন সা না মনুতে' অর্থাৎ যাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না তিনিই ব্রহ্ম। কেনোপনিষদের প্রথম খন্ডের ৭ম, ৮ম এবং ৯ম শ্লোকে বলা হয়েছে—চোখ যাকে দেখতে পায় না অথচ যার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে চোখ দেখার শক্তি পায়। কান যাকে শুনতে পায় না অথচ কর্ণ নামক ইন্দ্রিয়টিকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যিনি শক্তি দেন। প্রাণ যাঁর সন্ধান জানে না অথচ তাঁরই শক্তিতে প্রাণের স্পন্দন। নাক যাঁর ঘ্রাণ নিতে পারে না অথচ তাঁরই শক্তিতে নাক সব কিছুর গন্ধের অনুভূতি নিতে পারে তিনিই ব্রহ্ম। কেনোপনিষদের ৪র্থ খন্ডে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে ঋষি একটি সুন্দর কাহিনীর অবতারণা করেছেন—এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দেব ও অসুরের যুদ্ধে দেবতারা বিজয়ী হয়ে দেবসভায় যখন জয়ের উল্লাসে আপন আপন বীরত্ব প্রকাশ করতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় একটি বেঁটেখাটো ও সবার অচেনা পুরুষ এসে হঠাৎ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এটা দেবরাজ ইন্দ্রের চোখ পড়ল। তিনি একটু কৌতূহলী হলেন ভাবলেন এই বেঁটে পুরুষ মানুষটি কে? কি ব্যাপার? এখানে কেন এসেছেন? তখন তিনি অগ্নি দেবতাকে ডেকে বললেন—যাও তো, ঐ অচেনা মানুষটির পরিচয় জিজ্ঞাসা কর তো।

অগ্নি দেবতা সভা থেকে বেরিয়ে এসে ঐ অচেনা মানুষটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ঐ ব্যক্তি অগ্নি দেবতার পরিচয় জানতে চাইলেন। অগ্নি দেবতা তাঁর ভীষণ দর্পের সঙ্গে বললেন—"আপনি আমাকে চেনেন না? আমিই সেই জাতবেদা অগ্নিদেব, আমি ইচ্ছে করলেই এই সমগ্র বিশ্বকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি।"

অচেনা ঐ ব্যক্তিটি বিস্ময়ের সুরে বললেন—তাই নাকি? আপনার তো অসীম ক্ষমতা বলতে হয়! কিন্তু চোখে না দেখলে তো একথা আমি কেন কেউই বিশ্বাস করতে পারবে না।

অগ্নিদেব আত্মাভিমানে ক্ষুন্ন হয়ে বললেন—বেশ, বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

অচেনা ঐ ব্যক্তিটি একগুচ্ছ শুস্ক ঘাস তুলে বললেন—এটিকে পোড়াও দেখি!

বিস্ময় ও একরকম একটি তুচ্ছ অসম্মানজনক পরীক্ষায় ক্ষুব্ধ হয়ে অগ্নি দেবতা ঘাসের গুচ্ছটির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং মনে করলেন যে এতে ঐ ব্যক্তির হাতও পুড়ে যেতে পারে। কিন্তু এ কি! দেখলেন আগুন তো জ্বলল না! রাগে, অপমানে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অগ্নিদেব। তাঁর সমস্ত শক্তি নিক্ষেপ করলেন ঐ একগুচ্ছ শুস্ক ঘাসের উপর। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঐ একগুচ্ছ শুস্ক ঘাসে কোন আগুন লাগল না।

অগ্নিদেবের দম্ভ চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল, মাথা নিচু করে ভিতরে চলে গেলেন তিনি। দেবরাজ ইন্দ্রকে সব কিছু জানালেন। ইন্দ্রদেব অবাক হয়ে এবার পবনদেবকে পাঠালেন। তারও একই অবস্থা হল। প্রবল ঝড় তুলেও ঐ একগুচ্ছ শুস্ক ঘাসকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। পবনদেব লজ্জায় মুখ নীচু করে ফিরে আসলে ইন্দ্রদেব বুঝতে পারলেন যে ঐ ব্যক্তিটিকে উনি সাধারণ ভেবে নিশ্চয় ভুল করেছেন। তিনি নিজেই গেলেন তাঁর পরিচয় জানতে।

কিন্তু তিনি যাওয়ার আগেই ঐ অচেনা মানুষটি তখন চলে গেছেন, তাঁর পরিবর্তে দেখা পেলেন হৈমবতী দুর্গার। দেবরাজ ইন্দ্র বিনম্র চিত্তে দেবীকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করলেন—ঐ অচেনা মানুষটি কে ছিলেন মা? যাঁর উপরে অগ্নির দহন শক্তি ম্রিয়মান, যাঁর কাছে পবনের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের শক্তিও স্তব্ধ?

হৈমবতী সস্নেহে বললেন—বৎস্য, এখনও তুমি উনাকে চিনতে পারলে না? যাঁর শক্তিতে অগ্নির দহন শক্তি, যাঁর শক্তিতে পবনের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের শক্তি, যাঁর শক্তিতে তোমার বজ্রের মারন শক্তি, যাঁর বিহনে সবাই ক্ষমতাহীন, তিনিই স্বয়ং 'ব্রহ্ম'। মুনিঋষিগণ এঁকেই বলেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এঁকেই বলা হয়েছে—'ওমিতি ব্রহ্ম-ওমিতীদং সর্বম্'।

পরমব্রহ্মের ধ্যানে বলা হয়েছে —

হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহম্।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ-স্বরূপম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে।।

যিনি নির্বিশেষ, দয়াঘনমূর্তি, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জ্ঞানগম্য, যাঁকে যোগীগণ নিয়ত ধ্যান করেন, যিনি জন্ম মরণের ভয় নাশকারী, যিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যিনি সকল সৃষ্টির আদিকারণ, আমি সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপকে হৃদয়কমলে উপাসনা করি। তাঁর জপমন্ত্র হলো—'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।'

তন্ত্রপথেও এই পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ হয় তবে তন্ত্রপথে দীক্ষা একটি অত্যন্ত রহস্যময় প্রক্রিয়া। শক্তি-সাধনা সম্পর্কিত তন্ত্রশাস্ত্রে শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমাদীক্ষা, সাম্রাজ্য দীক্ষা প্রভৃতি কর্মের বর্ণনা রয়েছে। দীক্ষায় ব্যক্তি পূর্ণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গুরুশক্তি লাভ করে ব্যক্তি ভিতর থেকে যখন জেগে ওঠেন, তখনই তার শক্তি লাভের পথ প্রশস্ত হয়। শক্তি সাধনায় দশ মহাবিদ্যার ক্রম প্রচলিত। দশ মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম তিনটি বিদ্যা ত্রিশক্তি নামে পরিচিতা—কালী, তারা ও ষোড়শী। সাধকদের জন্য এই তিন মহাবিদ্যাকে সাধনার চূড়ান্ত নীতি বলে বিবেচিত হয়েছে। কালী তারা, ষোড়শী—দশমহাবিদ্যার প্রথম এই তিনটি রূপ হল সাধনার 'তিন পা'। শক্তিসাধকের দীক্ষা হয় কালী মন্ত্রে। তখন তিনি দক্ষিণাচারী। এই মন্ত্র সিদ্ধ করে তিনি সদাচারে সিদ্ধি লাভ করেন ও ইন্দ্রিয় জয় করে তারা মন্ত্র লাভ করেন। বীরাচারী তারা সাধক তারা মন্ত্র সিদ্ধ করে চিদানন্দে যথেচ্ছ ভ্রমণ করে চিন্ময়ী তারার সাহচর্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি ষোড়শী মন্ত্রে মহানন্দে পরমপদ লীন হওয়ার যোগতা পান। দশ মহাবিদ্যার প্রথম তিনটি মহাবিদ্যাতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি বিষয় দেখানো হয়েছে তাই কালী শুদ্ধসত্তারূপিণী, তারা শুদ্ধচিদ্রূপিণী আর ষোড়শী শুদ্ধানন্দ রূপিণী। বিভিন্ন তিথিকে তান্ত্রিক রাত্রি বলে অভিহিত করে দশমহাবিদ্যা সহ তান্ত্রিক দেবীর আবির্ভাব তিথি বলা হয়। যেমন—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

০১) মহারাত্রি - চান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণা একাদশী (দেবী কালিকার আবির্ভাব তিথি)।
০২) ক্রোধরাত্রি - চৈত্র শুক্লানবমী (দেবী তারার আবির্ভাব তিথি)।
০৩) দিব্যরাত্রি - জ্যৈষ্ঠ দশহরা (ষোড়শী দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
০৪) সিদ্ধরাত্রি - চৈত্র সংক্রান্তি যুক্ত অষ্টমী তিথি (ভুবনেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
০৫) বীররাত্রি - মাঘী রটন্তী চতুর্দশী (ছিন্নমস্তা দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
০৬) কালরাত্রি - দীপান্বিতা চতুর্দশী অমাবস্যা যোগে (ভৈরবী দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
০৭) দারুনরাত্রি - বৈশাখী শুক্লা অক্ষয় তৃতীয়া (ধূমাবতী দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
০৮) বীররাত্রি - মাঘী রটন্তী চতুর্দশী অমাবস্যা যোগে (পীতাম্বরী বগলামুখী দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
০৯) মোহরাত্রি - ভাদ্র জন্মাষ্টমী (মাতঙ্গী দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
১০) মহারাত্রি - ফাল্গুন কৃষ্ণা একাদশী (কমলা দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
১১) পূর্ণারাত্রি - অগ্রহায়ণ শুক্লা সপ্তমী (অন্নপূর্ণা দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
১২) কুহুরাত্রি - অগ্রহায়ণ অমাবস্যা (ত্রিপুটা দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
১৩) অক্ষয়রাত্রি - কার্তিক শুক্লা নবমী (জয়দুর্গা দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
১৪) গণপতি রাত্রি - মাঘী শুক্লা চতুর্থী (গৌরীপুত্র গণেশের আবির্ভাব তিথি)।
১৫) শিবরাত্রি - ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্দশী (চন্দ্রমৌলি দেবের আবির্ভাব তিথি)।
১৬) ঘোররাত্রি - অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অষ্টমী (মহাকাল ভৈরবের আবির্ভাব তিথি)।
১৭) অঘোররাত্রি - ভাদ্র কৃষ্ণা চতুর্দশী (মহামৃত্যুঞ্জয় শিবের আবির্ভাব তিথি)।
১৮) ঋদ্ধরাত্রি - আশ্বিন কৃষ্ণা অষ্টমী (কামাখ্যা বাসিনী বালা ভৈরবী দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
১৯) তারারাত্রি - মাঘী পূর্ণিমা (নিত্যা দেবী আবির্ভাব তিথি)।
২০) জয়ন্তীরাত্রি - বৈশাখ শুক্লাষ্টমী (বাগবাদিনি দেবীর আবির্ভাব তিথি)।
২১) অবলারাত্রি-আশ্বিন শুক্লা মহাষ্টমী (দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আবির্ভাব তিথি)।

এই সকল সময়ে তান্ত্রিক সাধক দেবীর পূজায় নিরত থাকেন।

আধ্যাত্মিক সাধনার পথে আসার পর সাধক স্থুল শরীর ও জগৎ ভেদ করে সাধনজগতের ভিতরের দিকে এগিয়ে যান। তার একটাই লক্ষ্য—শূন্যতা ভেদ করা। এর জন্য সাধক কর্মদীক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ খুঁজে পান। প্রথমে নামমন্ত্র লাভ ও তার পরে শাক্তাভিষেক হলে ক্রমে মন্ত্র জপের মাধ্যমে পূর্ণাভিষিক্ত হয়। এর ক্রিয়া মন্ত্রমুখী এবং এর দেবী কালী। তন্ত্রশাস্ত্রে অতি মহাপ্রলয়ে যে শক্তি বিরাজ করে সেই শক্তিই মহাকালী। পৃথিবী যখন প্রায় অন্ধকারে ঢেকে যায়, তখন তারা দেবীর পূজা হয়।

এই ধরনের অভিষেক ক্রিয়া শেষ হওয়ার পর, দক্ষিণাচার পথ সিদ্ধান্তাচারে পরিণত হয়, এই মন্ত্রচর্চার সাথে সাথে চলতে থাকে সাধকের উত্তরণ। শারীরিক ও মানসিক পবিত্র হওয়ার পরে, দেবী কালী এবং তারা উভয়ই তাদের নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করেন। এরপর দেবী ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরীর আবির্ভাব হয়। এ সময় ইচ্ছা ও কর্মের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পর সাধকের জ্ঞানলাভ হয়। এই পর্যায়ে পৌঁছানোর পর সাধকের অর্ধনারীশ্বরের দর্শন হয়। এখানে পৌঁছে মন্ত্র ধ্যান শেষ হয়, শুধুমাত্র ছন্দই তখন গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি শ্বাসে তখন মন্ত্রজপ চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এখানে যোগ সম্পন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত যখন সম্পূর্ণ দীক্ষাক্রম শেষ হয়, তখন সাধক নিজে ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। চতুর্দিকে শুধু শূন্য।

সাধারণত, সাধককে দীক্ষা দেওয়ার সময় যে জ্ঞান দেওয়া হয় তাকে 'মন্ত্র' বলে। জপ করার মাধ্যমে, এই মন্ত্র বিকশিত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং সাধকের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করে। নিয়মিত জপ ও যজ্ঞ করার মাধ্যমে মন্ত্রের বিকাশ ঘটে। তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্র সাধনার অনেক নিয়ম-কানুন রয়েছে। সকল প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য সাধকের শক্তির উন্নতি সাধন। জপ-ধ্যানের সময় অনেক বাধা ও দোষের আশঙ্কা থাকে। তাদের প্রতিরোধের জন্য, সাধকের গুরুর দেওয়া ব্যবস্থা ও নির্দেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হল—সাধক কোন মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করবে। এর জন্য সনাতনী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা আছে। এখানে সামান্য ভাবে কিছু আলোচনা করা হল।

শাস্ত্র অনুযায়ী এ জীবনের কর্ণধারকেই ইষ্ট নাম অবিহিত করেন বা যার আশীষে অনিষ্ট নষ্ট হয়ে চরম সুখের প্রাপ্তি হয় তিনিই ইষ্ট। তার স্মরণ-মনন-চিন্তন-পূজনে জীবনের ফুলবনে নিত্য সুগন্ধী ফুল ফোটে। জ্যোতিষশাস্ত্রে ইস্ট দেব-দেবী বা 'ইষ্ট মন্ত্র' নির্বাচন এবং মোক্ষপ্রাপ্তির সমস্ত খোঁজ দেওয়া আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে লগ্নকুন্ডলী, নবমাংশ এবং ভাব-চলিত চক্রের বাইরেও অনেকগুলি বর্গচক্র আছে। এর অন্যতম হলো কারকাংশ চক্র ও এই কারকাংশ চক্রই খোঁজ দেবে আপনার ইস্ট মন্ত্র এবং ইস্ট দেব-দেবীর। এই সন্ধান পেতে আপনাকে দেখতে হবে আপনার আত্মকারক গ্রহকে। আপনার লগ্নকুণ্ডলীতে সর্বোচ ডিগ্রীতে থাকা গ্রহই আপনার আত্মকারক গ্রহ। যে কোনো ফলাদেশ করতে এই আত্মকারক গ্রহ, তার অবস্থা এবং অবস্থান দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। বলতে পারেন, আপনার আত্মকর্ম গ্রহই আপনার রাশিচক্রের মূল চালক। কারকাংশ চক্র নির্মাণ করে আপনাকে দেখতে হবে আপনার আত্মকারক গ্রহ নবমাংশচক্রে কোন রাশিতে আছেন।

ধরা যাক, আপনার ক্ষেত্রে এই গ্রহ হলেন রবি (স্থির আত্মকারক) এবং নবমাংশচক্রে তার অবস্থান মেষ রাশিতে। এরপর কারকাংশচক্র নির্মাণ করতে, আপনাকে কারকাংশ লগ্ন মেষ নির্ধারণ করে সেই ঘরে রবির অবস্থান ধরতে হবে। এর পর, আপনার লগ্নকুণ্ডলীতে থাকা অন্য গ্রহদের কারকাংশ চক্রেও সেই সেই রাশিতেই বসাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বৃহস্পতি যদি আপনার লগ্নকুন্ডলীতে ধনুরাশিতে থাকেন, তাহলে কারকাংশচক্রেও তার অবস্থান হবে ধনুরাশিতে। এই ভাবেই অন্য গ্রহদের বসিয়ে নিলে সম্পূর্ণ কারকাংশ চক্র পাওয়া যাবে।

এই চক্র প্রস্তুত হলে, সহজেই আপনি আপনার ইষ্টদেব-দেবীর সন্ধান পাবেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আপনাকে দেখতে হবে, কারকাংশচক্রের দ্বাদশ ঘরে কোন গ্রহ অবস্থান করছেন। এরপর দেখুন, কারকাংশের পঞ্চমঘরে কোন গ্রহ বসে আছেন। অথবা এমনও হতে পারে যে এই দুই ঘর ফাঁকাই আছে. এখন থেকেই ইষ্ট এবং মন্ত্র নির্বাচনের কাজ শুরু। কারকাংশের পঞ্চম ও দ্বাদশঘরে যদি শনি, মঙ্গল, রাহু, বা কেতু অবস্থান করেন বা এই দুই ঘরের অধিপতি বা ঘরদুটি যদি এই তামসিক গ্রহদের প্রভাবে থাকে, অবশ্যই আপনার জন্য শক্তিমন্ত্র গ্রহণ প্রশস্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দুই ক্ষেত্রে এই তামসিক গ্রহদের প্রভাবে জাতক কে তান্ত্রিক সাধনের পথে নিয়ে যাবেই। শুভ প্রভাবে সেই জাতক-জাতিকা তন্ত্রের সাধন পথে অনেকদূর অগ্রসর হবেন, তিনি তান্ত্রিক গুরু হবেন এবং তার হাতে তান্ত্রিক ক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকৃত হবেন। বিশেষত যদি এই অবস্থানে যদি রাহুর সুপ্রভাব থাকে সেই সাধক তার সাধনবলে প্রভূত জাগতিক সুখ ভোগ করবেন। উল্টোদিকে যদি এই সব ঘরের উপর তামসিক গ্রহদের কুপ্রভাব থাকে, সেই সাধক প্রবঞ্চক হবেন এবং অভিচারিক তন্ত্রকর্মে লিপ্ত হয়ে জনসাধারণ ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবেন।

ইষ্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতকের ব্যক্তিগত প্রবণতার সাথে সাথে, তার পারিবারিক আধ্যাত্মিক চর্চার ধারা এবং তার অঞ্চলের ধর্মাচরণের ধারাও বিচার্য। লক্ষ্যণীয়, কারকাংশের পঞ্চম এবং দ্বাদশ ঘরে তামসিক গ্রহদের সবল প্রভাব থাকে, তাহলে ইষ্টদেবী হবেন, মা দুর্গা বা মা দক্ষিণাকালী। যদি এই গ্রহ সংযোগের মধ্যে বৃহস্পতি এসে যান, তাহলে মা তারার মন্ত্রগ্রহনে বিশেষ শুভফল হবে। একইভাবে যদি চন্দ্র যুক্ত হন, মা অন্নপূর্ণা ইষ্ট হতে পারেন কারণ, মা অন্নপূর্ণার 'বিশ্বজননী বিশ্বপালন তৎপর' ভাবের সাথে চন্দ্রের মাতৃভাব মিলেমিশে যায়।

বাংলায়, সাধারণ ভাবে, দশমহাবিদ্যার অন্য দেবীগণের মন্ত্র প্রাথমিক দীক্ষায় সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। এবার মায়ের কৃপায় যদি জাতকের পূর্ণাভিষেক বা তদূর্ধ্ব সংস্কার প্রাপ্ত হয়, তখন নির্দিষ্ট সময়ে তিনি ১৮ মহাবিদ্যার মন্ত্র প্রাপ্ত হন। অনেক পন্ডিতের মতে, এই দুই ঘরে কেতুর প্রভাব থাকলে গণেশমন্ত্র গ্রহন কল্যাণকর হয়ে থাকে। কিন্তু, শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব বাংলায় গাণপত্য সাধনের পরম্পরা প্রবল না হওয়ায় তা আর আলোচনা করা হলো না।

এরপর আসি গ্রহপতি সূর্যের কথায়। যদি কারকাংশের পঞ্চম এবং দ্বাদশ ঘরে রবির প্রভাব থাকে, তাহলে সেই জাতক জাতিকার উচিত শিবমন্ত্র গ্রহণ করা। কারণ, শিব হলেন রবির অধিদেবতা। এই দুই ঘরে যদি তামসিক কোনো গ্রহের প্রভাব সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বুধ অবস্থান করেন জাতিকে/জাতিকার জন্য বৈষ্ণব সাধন নির্দিষ্ট। তবে যদি শনি যুক্ত হন, কৃষ্ণমন্ত্রের সেবা করা উচিত। বৈষ্ণব পরম্পরায়, সবকটি গ্রহের অবতারের মন্ত্রদানের বিধি আছে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণের মন্ত্রে দানের বিধি অধিক প্রচলিত। উক্ত দুইঘরে যদি চন্দ্রের প্রভাব থাকে, তাহলেও জাতক/ জাতিকার শ্রীদুর্গামন্ত্র গ্রহনে শুভফল প্রাপ্তি হবে। বিশেষত, যদি কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র হয়,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বা চন্দ্রের সাথে শুক্রের প্রভাব থাকে তাহলেও শ্রীদুর্গা, জগদ্ধাত্রী, জয়দুর্গা এই সব মন্ত্র গ্রহণীয়। শুক্রের একক প্রভাবে শিবমন্ত্র বা দুর্গামন্ত্র গ্রহন বাঞ্চনীয়। কিন্তু, যদি তামসিক কোনো গ্রহেরও প্রভাব ওই দুই ঘরে থাকে তাহলে, শ্রীদুর্গার তান্ত্রিক সাধন করা উচিত। যদি, পঞ্চম ঘরে শনি, এবং দ্বাদশ ঘরে শুক্র থাকেন, সেই ক্ষেত্রে দক্ষিণাকালী মন্ত্র গ্রহনেই সর্বাধিক শুভফল লাভ হবে, এমন কি, যদি আপনার দীক্ষা না ও হয়ে থাকে, এই সূত্র ধরে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজা বিধিবৎ ভাবে করালে আপনি অবশ্যই সমস্যা মুক্ত হবেন। সাধারণ মানুষ যতই রত্ন বা কবচ ধারণ করুন না কেন, কাম্য পুজাপাঠ বা নৈমিত্তিক পুজাপাঠ করুন না কেন, কোনো কিছুই সঠিক ইষ্টদেব-দেবীর মন্ত্রগ্রহন এবং নিত্য ইষ্টমন্ত্র সেবার থেকে বেশী শুভফল দিতে পারে না। তাই, আমাদের উচিত, রাশিচক্রের মূল্যায়ন করে সঠিক দেবতার মন্ত্র গ্রহন করা ও নিত্য ইষ্টের জপ এবং ইষ্টের পূজা যথাসাধ্য করা। প্রকৃত ভক্ত সোনার থালা চায় না, কিন্তু তার ইষ্টদেব-দেবী তার কোনও অভাব রাখেন না। ভক্ত যদি একান্ত স্মরণাগত হতে পারেন, তবেই ইষ্টদেব-দেবী বা 'মা' হয়ে সাধকের যোগ-ক্ষেম বহন করেন।

গুরুদেব সাধককে মন্ত্র দেওয়ার আগে মন্ত্রগুলির শ্রেণীবিভাগ করেন এবং ব্যক্তির প্রকৃতি বা প্রবণতা অনুসারে মন্ত্র দান করেন। সাধারণত মন্ত্রগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়—প্রমাণিত মন্ত্র যা সাধকের জন্য উপকারী, সাধ্য মন্ত্র যা সাধকের জন্য সেবক আকারে থাকে, সুপরিচিত মন্ত্র যা সাধকের জন্য রক্ষক হয়ে ওঠে ও অরিমন্ত্র যা সাধকের প্রতি বিরূপ। মন্ত্র হল সাধকের পাঠকারী শক্তি। মন্ত্রজপের মাধ্যমে সাধক শক্তি অর্জন করেন, মন্ত্র জপে মন্ত্র-শক্তি উৎপন্ন হয়। সাধকের অন্তর্জগতে সেই শক্তি জেগে উঠে অজ্ঞানতার আবরণ সরিয়ে দেয় ও ইষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

একটি মন্ত্রের বারবার পাঠ করা হল জপ। জপ সাধকের চেতনাকে জাগ্রত করে। কয়েকদিন জপ করার পরও যদি সাধকের চেতনা জাগ্রত না হয়, তবে নিরাশ না হয়ে মন্ত্র জপ আরও একাগ্রতার সাথে করতে হবে। চেতনা অবশ্যই জেগে উঠবে। একমাত্র চেতনাই সাধককে ইষ্টের সাক্ষাৎকার নিতে সক্ষম করে। মন্ত্র হল চেতনার রূপ, বারবার পুনরাবৃত্ত হলে সেগুলি সাধকের আচারে পরিণত হয় এবং যখন বিশুদ্ধ চেতনা থাকে তখন সেই মন্ত্রগুলি বাস্তব হয়ে ওঠে। শব্দ হল চিন্তার আকৃতি। জপের মাধ্যমে চিন্তা বাস্তব হয়ে ওঠে, জপ সম্পর্কিত পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির উচ্চারণ আবৃত্তি করা জপ। কেউ কেউ বলেন যে মন্ত্রের অর্থ ধ্যান করার সময় নিজের গুরুর মন্ত্রের সাথে একাত্ম হয়ে জপ করা উচিত, তবে তন্ত্রে সকলের উপসংহার দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় সংযত করে মন্ত্রটি অভ্যন্তরীণভাবে পাঠ করতে হবে। উচ্চস্তরে উঠলে আসলে অভ্যন্তরীণ জপ হল জপ, বাহ্যিক জপ জপ নয়। জপ ও মন্ত্রের পুরশ্চরণ বিষয়ে একটু

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিস্তারিত আলোচনা করি।

একদিন ট্রেনে তারাপীঠ যাওয়ার পথে 'মন্ত্র জপ' নিয়ে এক বাউল গাইছিলেন—

'কালী কালী কালী বলে
জপ কর ওরে কুটিল মন
কালী যে সনাতনী বিদ্যা
কালী মন্ত্র অমূল্য ধন।

পূজা-জপ-হোম সবই মিথ্যা
পুরশ্চরণ ব্রত সবই বৃথা
যদি না হয় মন খানি তোর
কালী-ভক্তির বৃন্দাবন।
কালী যে সনাতনী বিদ্যা
কালী মন্ত্র অমূল্য ধন।

বেদ পুরাণ কি করে বুঝবে কালী শক্তি!
মনটাকে কি দিলি আজ্ঞায় পুর্ণ মুক্তি?

পঞ্চ ম-কার রাখ সব তুলে
অহং মন তোর মাথা তোলে
কালী নামের ভক্তিফুলে
ভরে দে কালীর শ্রী চরণ।
কালী যে সনাতনী বিদ্যা
কালী মন্ত্র অমূল্য ধন।'

ঈশ্বরের কোন বিশেষ মূর্তি, যিনি আমার ইষ্ট দেবতা তাঁর নাম বা মন্ত্র, কিম্বা শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র ইত্যাদি বার বার আবৃত্তি করার নাম 'জপ'। আর মন্ত্র হল—যা আমাদের মনকে বাইরের জগৎ থেকে টেনে এনে ভগবৎ পাদপদ্মে ধরে রাখে—তাই বার বার আবৃত্তি করা হল জপকর্ম। আর 'বীজ' মন্ত্র হচ্ছে বীর্য বা শক্তি যা মন্ত্র জপের সাথে অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফূরিত করে বা যে শক্তির জোরে মানুষকে আস্তে আস্তে ভগবদ্দর্শনের দিকে নিয়ে যায়।

সেইজন্যই দীক্ষিত মানুষের স্থান-কাল-দিক নির্দিষ্ট করে নিয়মমত জপ করাটাই হচ্ছে মুখ্য কর্ম। জপের ভিতর যে বীজমন্ত্র তার মধ্যে গুরুপ্রদত্ত সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। মনে রাখতে হবে নিত্য ও নিয়মমত জপ না করলে সেই শক্তির স্ফূরণ কখনই হবে না। আপনি কোন 'মহারাজ' বা গুরুজীর থেকে দীক্ষা নিয়েছেন সেটা কোনও বিষয়ই নয়, আপনি নিজে কতটুকু জপকর্ম করলেন সেটাই মুখ্য। আমরা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সংসারী মানুষ, আমাদের সংসারের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম নিতে হবে, মনে মনে স্মরণ করতে হবে, জপ করতে হবে সবসময়।

এছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যতই ধর্মজীবন যাপন্ করি, আমাদের সংসারের প্রতি টান থাকে। তাহলে বেশি এগোনো যাবে না, তাই আমাদের বৈরাগ্য অবলম্বন করতে হবে। বৈরাগ্য অবলম্বন করতে গেলেই প্রথমে বিচার করতে হবে। বিচার করে আমরা সংসারের নশ্বরতা নিয়ে চিন্তা করব। আর যিনি সর্বদা আছেন, যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ হয়ে সগুনে আছেন সেই গুরুদেব আর নির্গুণ ভগবানের ধ্যান করতে থাকব।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন বোধ করছি যে—জপের সময় করমালা বা অন্য কোনও মালা ব্যবহার করলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, তাই মালাবিহীন জপই প্রকৃষ্ট। আর মন্ত্র জপের সময় মন যাতে বিক্ষিপ্ত না হয় তাই মন্ত্রজপের স্থান ও কাল যথেষ্ট ভাবে বিবেচ্য।

ঋষিগণ বলেছেন, শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে 'বাহ্য শৌচ' বলে; যেমন স্নান। সত্য ও অন্যান্য ধর্মানুশীলনে মনের শুদ্ধিকে 'আভ্যন্তর শৌচ' বলে। বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই উভয় শুদ্ধিই আবশ্যক। কেবল ভিতরে শুচি থেকে বাইরে অশুচি থাকলে শৌচ যথেষ্ট হ'ল না। যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ-অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না থাকলে কেউই জপের উপযোগী হ'তে পারেন না।

জপকর্মের সময় কল্পনা করতে হবে, মাথা থেকে সামান্য উপরে একটা পদ্ম রয়েছে, ধর্ম তার কেন্দ্র, জ্ঞান তার মৃণাল, সাধকের অষ্টসিদ্ধি ঐ পদ্মের অষ্টদল, আর বৈরাগ্য তার ভিতরের কর্ণিকা। যদি সাধক বাইরের শক্তি (অষ্টসিদ্ধি) পরিত্যাগ করতে পারে, তবেই সে মুক্তিলাভ করবে। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বাইরের অষ্টদলরূপে এবং ভিতরের কর্ণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধিতেও 'বৈরাগ্য'-রূপে বর্ণনা করা হ'ল। এই পদ্মের ভিতরে হিরন্ময়, সর্বশক্তিমান্, অস্পর্শ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, জ্যোতির্মন্ডলের মধ্যবর্তী ইষ্টকে ধ্যান করতে করতে জপ করতে হয়। আর একপ্রকার জপের বিষয় হল—চিন্তা করতে হবে, জপকর্মীর হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রয়েছে, আর ঐ আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখা জ্বলছে; ঐ শিখাকে নিজ আত্মারূপে চিন্তা করে ঐ শিখার অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ময় আলোকের চিন্তা করতে হবে। এই হল সাধকের আত্মার আত্মা—পরমাত্মা, ঈশ্বর। হৃদয়ে এই ভাবটি ধ্যান করেই জপকর্ম এগোনো ভাল। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, সত্য, আস্তিক্য ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তি সিদ্ধ না হলেও, দুঃখিত বা ভীত না হয়ে ঐ সব বৃত্তির অনুকুল কর্ম চেষ্টা করা উচিৎ, ধীরে ধীরে সবই আসবে। বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে, নিজ গুরুদেবের দেখানো পথে যিনি ভগবানে তন্ময় হয়েছেন, জপকর্মে নিরত হয়ে তাঁরই শরণাগত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হয়েছেন, যাঁর হৃদয় পবিত্র হয়েছে, তিনি ভগবানের কাছে যা কিছু আশা করেন, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করে দেন।

মন্ত্র ও জপ সম্পর্কে শাস্ত্র বলেছেন, 'মননাৎ তারয়েৎ যস্ত স মন্ত্র পরিকীর্তিতঃ'—অর্থাৎ 'যাহা মনে স্মরন মাত্রই জীব ভববন্দন হইতে মুক্ত হয় তাহাই মন্ত্র, এক কথাই মন বা অন্তঃকরণকে বহিঃকরণ বা প্রকৃতি থেকে ত্রান করার কৌশলকেই মন্ত্র বলে।' মন্ত্র জপ পদ্ধতি প্রধানতঃ তিন প্রকার —

১) মানসিক জপ—মনে মনে মন্ত্র উচ্চারন করার নাম মানসিক জপ।

২) উপাংশু জপ—শব্দ বিহীন জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারন করার নাম উপাংশু জপ।

৩) বাচিক জপ—নিজ কর্ণের গোচরে অর্থাৎ নিজ কানে শোনা যায় এমন মন্ত্র উচ্চারন করার নাম বাচিক জপ।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন বোধ করছি যে—জপের সময় করমালা বা অন্য কোনও মালা ব্যবহার করলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, তাই ইষ্টকর্মে মালাবিহীন জপই প্রকৃষ্ট। কাম্যকর্মে মালাযুক্ত জপ চলতে পারে।

ধন্য ভারতীয় মনীষা, ধন্য বেদ-পুরাণ-গীতা ও সনাতনী হিন্দু ধর্মশাস্ত্র। বারবার উচ্চারিত ইতিবাচক শব্দের প্রভাব সম্পর্কে সনাতনী সাধু মানুষেরা সচেতন ছিলেন আদিকাল থেকেই। তাই জপে সিদ্ধি লাভ করতে হলে মন্ত্র পুরশ্চরণ একটি পর্যায়। কিছু বিশেষ সময়ে, নির্দিষ্ট তিথি ও যোগ অনুযায়ী সাধক প্রবরেরা শ্রী গুরুর নির্দেশে বসেন মন্ত্র পুরশ্চরণে। আসুন, জেনে নিই আধুনিক জড়-বিজ্ঞানীর চোখে 'মন্ত্রের পুরশ্চরণ' বিষয়টি কি।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম সারির বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের এ বিষয়ের গবেষণা ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া তাক লাগিয়ে দেয় পুরো বিশ্বকে। এমনই একজন ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ডা. এমিল কোয়ে। ১৯১০ সাল থেকে তিনি শুরু করলেন নিরাময়ের ক্ষেত্রে 'অটোসাজেশন' চর্চার গুরুত্ব নিয়ে গবেষণা। কোনো প্রকার ওষুধ ছাড়াই শুরু করেন বিভিন্ন ধরনের মনোদৈহিক রোগের চিকিৎসা। তার ক্লিনিকে আসা রোগীদেরকে সকাল-বিকাল একাগ্র মনোযোগ দিয়ে একটি অটোসাজেশন বলতে হতো—'ডে বাই ডে ইন এভরি ওয়ে আই এম গেটিং বেটার এন্ড বেটার'। এভাবেই সকাল-বিকাল বিশ বার চর্চা করে হাজার হাজার রোগী মাইগ্রেন, মাথাব্যাথা, বাতব্যাথা, প্যারালাইসিস, তোতলামি, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, অনিদ্রা এমনকি টিউমার পর্যন্ত ভালো হয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে— ইতিবাচক এ অটোসাজেশনের শক্তির মূল রহস্য কোথায়?

মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে আমাদের মন বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাই নাটক বা সিনেমায় কোনো হাসির জিনিস দেখলে যেমন চোখে মুখে হাসির রেশ ফুটে ওঠে, তেমনি কোনো বিরহ বা বিচ্ছেদের ঘটনা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ আমরা জানি এর পুরোটাই অভিনয়। তার পরেও

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উত্তেজনা ও বিষাদের রেশ আমাদের মনের ভেতর অনেকক্ষণ থাকে। বাস্তবেও যখন আমরা কখনো এরকম কোনো ইতিবাচক বা নেতিবাচক শব্দ উচ্চারণ করি তার প্রভাব আমাদের দেহে মনে অনুভব করি। কারণ বারবার ভালো থাকার একই বাণী উচ্চারণ করার ফলে মস্তিষ্কে ভালো থাকার তরঙ্গ তৈরি হয়। ভালো থাকার বিশ্বাস মনে ভালো থাকার আকুতি সৃষ্টি করে। নিউরো সাইন্টিস্টরা দীর্ঘ গবেষণা করে দেখেছেন, মস্তিষ্কে যখন কোনো নতুন তথ্য যায়, তখন একটি নিউরোন থেকে আরেকটি নিউরোনে নতুন সংযোগ পথ তৈরি হয় এবং মস্তিষ্কের কর্ম কাঠামো বদলে যায়। তখন নতুন বাস্তবতা সৃষ্টিতে মস্তিষ্ক কাজে লেগে যায়। সচেতন মনে বা অবচেতন মনে আমরা যা চিন্তা করি বা মস্তিষ্কে কমান্ড করি তারই বাস্তবতা আমাদের চারপাশে সৃষ্টি হয়। যে কারণে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নিজেরাই নিজেকে অযোগ্য করে তুলি। সারাদিন পোড়া কপাল ভাবলে বা নিজেকে অবহেলিত ও অযোগ্য ভাবলে যার কাছে গেলে অবহেলিত হবেন মূল্যায়িত হবেন না, অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তার কাছেই পৌঁছাতে মস্তিষ্ক কাজ শুরু করে দেবে। নিজেকে সফল সুস্থ ও প্রশান্ত রাখার জন্য তাই 'অটোসাজেসন' হচ্ছে এক অব্যর্থ প্রক্রিয়া। যখন আপনি মস্তিষ্কে ভালো থাকার 'প্রোগ্রাম' দেবেন, মস্তিষ্কই তখন আপনাকে 'আইডিয়া' দেবে কিভাবে কাজ করলে আপনি সফল হবেন বা প্রশান্ত থাকতে পারবেন ও সুখী হবেন। মনোবিজ্ঞানীরা এই সূত্রটিকেই ব্যবহার করেছেন কখনো অটোসাজেশনে আবার কখনো মন-ছবিতে। শুধু রোগ-ব্যাধি নয়, জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে অটোসাজেশন চর্চায় বদলের হাওয়া লাগে নি! এই 'সেল্ফহিপ্নোটিক অটোসাজেশান' বা স্বমোহন পুরশ্চরণ জীবনের প্রতিটি বিষয়েই আমাদের আরও উন্নত করে তুলতে পারে ও এই বিদ্যা আমাদের কাজে আসতে পারে।

মন্ত্রের পুরশ্চরণ কি ও পুরশ্চরণের লক্ষ্য কি

পুরশ্চরণ শব্দ অভিধানে - পুরঃ+চরণ,পুবঃ অর্থাৎ পুরস্ অর্থাৎ পূর্ব্বে, প্রথমে বা অগ্রে এবং চরণ অর্থে আচরণ বা অনুষ্ঠান। অর্থাৎ পুরশ্চরণ হল মন্ত্রযোগীর মন্ত্র প্রধান সাধনার পূর্ব্বের বা প্রাথমিক আচরণ বা অনুষ্ঠান, যা ঠিক অগ্রদূতরূপে তার ফলপুষ্টির প্রধান কারণস্বরূপে পরিচালিত হয়।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং মন্ত্র উচ্যতে।
তৎসিদ্ধয়ে পুরো যচ্চ চর্য্যতে তৎ প্রকীর্তিতম্।।

অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধনমন্ত্র। সেই মন্ত্র সিদ্ধির জন্য পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে যে চর্যা বা অনুষ্ঠান করতে হয় তাই পুরশ্চরণ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিনা পুরস্ক্রিয়াং দেবী মন্ত্রো মৃত ইতীরিতঃ।
জীবহীনো যথা দেহঃ সর্ব্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।

তন্ত্রের অভিমত যে মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়নি তাকে বলা হয় মৃত। প্রাণহীন দেহ যেমন কোনও কর্মই করতে পারে না পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তেমনই কোন ফল দিতে পারে না।

গন্ধর্ব তন্ত্রে বলা হয়েছে অশ্রদ্ধা, নাস্তিক্য এবং পূর্বজন্মকৃত অশুভ কর্ম্মফল—এই তিনটি মন্ত্র সিদ্ধির প্রতিবন্ধক। এই সব প্রতিবন্ধক বিনাশ করার জন্যই যত্নপূর্বক পুরশ্চরণ করতে হবে। ক্রিয়াসার তন্ত্র মতে জপ, তর্পন, হোম, অভিষেক এবং বিপ্রভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলা হয়।

আবার মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে জপ, হোম, তর্পন, মার্জন এবং বিপ্রভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ কর্ম্মকে পুরশ্চরণ বলে। কুলার্ণব তন্ত্রমতে ত্রৈকালীন পূজা, নিত্য জপ, তর্পন, হোম এবং ব্রাহ্মণভোজনকে পুরশ্চরণ বলে।

শাস্ত্রে দশাঙ্গ পুরশ্চরণেরও উল্লেখ আছে। কৌলাবলী নির্ণয়ে বলা হয়েছে যে—জপ, হোম, তর্পন, অভিষেক, অঘমর্ষণ, সুর্যার্ঘ্য, জলপান, প্রণাম, পূজা এবং ব্রাহ্মণভোজন পুরশ্চরণের এই দশাঙ্গ।

পশ্বাদিভাবভেদে পুরশ্চরণ ভিন্ন হয়ে যায়। পশুভাবের পুরশ্চরণ ও বীরভাবের পুরশ্চরণ এক নয়। পশুভাবের সাধকের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধি হল—সাধক হবিষ্যাশী হয়ে দিনের বেলা পুরশ্চরণ করবেন।

মুণ্ডমালাতন্ত্রমতে বীরভাবের সাধক রাত্রির প্রথম যাম শেষ হলে জপ আরম্ভ করে তৃতীয় প্রহর অবধি জপ করবেন। শেষরাত্রে জপ করবেন না। তিনি সংযত জীবন যাপন করবেন। বীরসাধকের পঞ্চ ম-কার সহযোগে পুরশ্চরণ করণীয়।

পুরশ্চরণ কর্ম পঞ্চ বা দশবিধ ক্রিয়াপ্রধান হলেও জপের প্রাধান্যই বেশি। পুরশ্চরণের প্রধান অনুষ্ঠানই জপ। হোমাদি জপের অঙ্গ। এইজন্য তন্ত্রান্তরে হোমাদি কর্ম্মের অনুকল্পে জপের বিধান আছে। বিভিন্ন মন্ত্রের জন্য বিভিন্ন সংখ্যা ধার্য্য করা হয়েছে। নক্ষত্র পুরশ্চরণ, বার পুরশ্চরণ, তিথি পুরশ্চরণ, মাস পুরশ্চরণ, পক্ষ পুরশ্চরণ, নবরাত্রি পুরশ্চরণ, গ্রহণ পুরশ্চরণ ইত্যাদি বিভিন্ন পুরশ্চরণের উল্লেখ তন্ত্রান্তরে আছে।

পুরশ্চরণের বিধিনিষেধেও আছে তন্ত্রে বিভিন্ন রকমের। মেরুতন্ত্রমতে লোভ, ক্রোধ, মাৎসর্য, কাম, দ্বেষ, তাড়ন, দম্ভ, উচ্চারন, অভ্যঙ্গ, অপ্রিয় কথা, মিথ্যাচার, গীত, বাদ্য, মধু, বহেড়া ও করঞ্জা গাছের ছায়া, মাংস, প্রতিগ্রহ, মাল্য, তাম্বূল, স্থানত্যাগ, পরান্নগ্রহন, পরগৃহবাস, ক্ষৌরকর্ম্ম, নদীপার, মৈথুন, পাপীর সঙ্গে বাক্যালাপ ইত্যাদি পুরশ্চরণকারী বর্জন করবেন।

পুরশ্চরণের ফল হল মন্ত্রসিদ্ধি। এই মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ নিয়ে ভৈরবতন্ত্রে বলা হয়েছে—যে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়েছে তিনি সর্বত্র জ্যোতি দেখেন।তিনি নিজের শরীরকেও জ্যোতির্ময় ও দেবতাময় দেখেন। এই নিয়ে মেরুতন্ত্রে বলেছেন, অল্পভোজন, অল্পনিদ্রা,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সর্বদা চিত্তের প্রসন্নতা, প্রকাশযুক্ত শরীর এবং সত্যবাক্য। আরও বলা হয়েছে মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তিসিদ্ধবাক, সিদ্ধমনোরথ, দাতা, ভোক্তা ও অযাচক হন।

শেষে বলি কেবল কতগুলি অনুষ্ঠানবহুল কর্ম্ম করলেই পুরশ্চরণ হয় না। ভক্তিযুক্ত হয়ে একাগ্র বুদ্ধির দ্বারা আত্মলক্ষ্য ভেদ করাকেই পুরশ্চরণ বলে। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বময়ী আত্মচৈতন্যশক্তিরূপা কুণ্ডলিনীর জ্ঞানলাভার্থে তার অনুষ্ঠান ও স্বরূপ সাধনক্রিয়াকেই পুরশ্চরণ বলে। কুণ্ডলিনী শক্তি জীবের জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি। কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও মন্ত্রচৈতন্যের জন্য শক্তি প্রদানে যিনি অভিজ্ঞ তিনিই প্রকৃত গুরু।

কিন্তু আজকাল নকল জিনিসের সময়। ব্রহ্মচারী নকল, গৃহস্থরা নকল, বানপ্রস্থও নকল, ঋষিরাও নকল, এমনকি শাক-সবজি, ফুল-পাতা, মরিচ-মশলা, দুধ ইত্যাদিও সব নকল পাওয়া যায়। সবই নকল, তাহলে আসল গুরুর সন্ধান পাবেন কি ভাবে? আসলে আজকাল সত্যিকারের এমন গুরু পাওয়া কঠিন—যিনি তন্ত্র-বিজ্ঞান জানেন। যিনি নিজে তন্ত্রের পথ জানেন না, তিনি শিষ্যকে কী শিক্ষা দেবেন? বর্তমানে খুব কম গুরুই আছেন যারা তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম জানেন। আজ তন্ত্রের প্রকৃত চর্চাকারীকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ তন্ত্রের আসল রূপ জানতে পারেন এবং তার আলোকে একজন যোগ্য গুরুর সন্ধান করতে পারেন। এমন অনেক শিষ্যের সাথে আমার দেখা হয়েছে, যারা নিজেরা গুরুদীক্ষা নিয়ে পরে শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছেন। তাই যিনি নিজের কল্যাণ চান, তিনি যেন ভালোভাবে মেলামেশা না করে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে বুঝে নিয়ে তবেই দীক্ষা গ্রহন করেন।

তন্ত্র-মার্গে অনেক মন্ত্র ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণের জন্য। তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রের পূজার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান শুধুমাত্র ঐ তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্ত করা যেতে পারে। তবুও তন্ত্রমার্গে শুধুমাত্র একজন গুরুর কাছ থেকেই মন্ত্র পাওয়ার নির্দেশ রয়েছে এবং মন্ত্রটিকে গোপন রাখার উপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। ঐকান্তিকতার সাথে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করুন, শক্তি এবং শিবের মিলন হোক। শিব ও শক্তি সাধকের মধ্যে বিদ্যমান। তন্ত্রমার্গী ভৈরব যখন ভৈরবীর সাথে মিলিত হন, তখন তিনি তার 'অহং' মাঝখান থেকে সরিয়ে সেই মিলনকে শিব-শক্তির মিলনের রূপ দেন। অহংকার ও ভোগের পর্দা দূর হয়ে গেলে শিব-শক্তির দীপ্তিময় রূপের প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে সাধক কৃতজ্ঞ হন।

তন্ত্র-মার্গ নিজের উপকারে বা অন্যের উপকারে ব্যবহার করা উচিত। কারো ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, জীবন হুমকির মুখে, সম্মান বিপন্ন, তারপর কর্মের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সমস্ত মন্ত্র, তন্ত্র তখনই ফলদায়ক হয় যখন সেগুলি শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও ধার্মিক চেতনায় করা হয়। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছন্নতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভগবতী কালীর একটি বিশেষ সাধনার পদ্ধতি দেওয়া হল,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালী শাবর মন্ত্র —

সত্তি পান্তি শারদা বারাহ বরস কোঁয়ার।
একে দেবী জানিয়ে, চৌদহ্ ভুবন দোওয়ার।।
দ্বি-পক্ষে নির্মলিয়ে, তেরহ্ দেবন দেব।
অষ্টভুজী পরমেশ্বরী, গ্বারহ্ রুদ্র দেব।।
সোলহ্ কলা সম্পূর্ণী, তীন নয়ন ভরপুর।
দসোঁ দোয়ারী তু হি মাঁ, পাঁচোঁ বাজে নুর।।
নব নিধি ষড় দর্শনী, পন্দ্রহ তিথি জান।
চারো যুগ মেঁ কাল কা, করো কালী কল্যান।।

বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন, উপরোক্ত মন্ত্রের সাথে যদি নিচের মন্ত্রের এক মালা জপ প্রতিদিন করা হয়, তাহলে মন্ত্রটি আরও শক্তিশালী ভাবে কাজ করে। মন্ত্র—ওঁম্ কঙ্কালী মহাকালী কেলি-কলাভ্যাম্ স্বাহা।

৭ সত্তি পান্তী শারদা
১২ বারাহ্ বরস কুঁয়ারী
১ মাই পরমেশ্বরী
১৪ চৌদহ্ ভুবন নিবাস
২ দোই পক্খী নির্মলী
১৩ তেরহ্ দেবী দেশ
৮ অষ্ট-ভুজা পরমেশ্বরী
১১ গ্বারহ্ রুদ্র সৈনী
১৬ ষোলা কলা সম্পূর্ণোঁ
৩ ত্রি নয়ন ভরপুর
১০ দসোঁ দোওয়ার নির্মালি
৫ পঞ্চ করে কল্যাণ
৯ নও-দুর্গা
৬ ষট্-দর্শানী
১৫ পন্দরহ্ তিথি জান্
৪ চারহ্ যুগ প্রধান

যন্ত্র আঁকার পদ্ধতি—ডালিমের কলম দিয়ে জাফরান এবং লাল চন্দন ভালো করে গোলাপ জলে গুলে নিয়ে কালি তৈরী করুন। একটি শুভ নক্ষত্রে বসে ভোজপত্রে 'যন্ত্র' লিখুন। উল্লিখিত যন্ত্রটি লেখার সময় মন্ত্রটি ক্রমানুসারে পাঠ করে লিখতে হবে। যেমন, প্রথম লাইনের প্রথম ঘরে ৭ লিখে পড়বেন—'সত্তি পান্তী শারদা'। তারপর দ্বিতীয় ঘরে ১২ লিখতে লিখতে পড়তে হবে- 'বারাহ্ বরস কুঁয়ারী।' একই পদ্ধতিতে পরপর মন্ত্র পাঠ করে করে যন্ত্রটি লিখতে হবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পূজার উপকরণ—১) কালী-যন্ত্র ও চিত্র, ২) বন-বেগুনের ফুল ৭টি, ৩) হলুদ কলকে ফুল ৫টি, ৪) লবঙ্গ ৫টি, ৫) এলাচ ৫টি, ৬) পঞ্চ মেওয়া, ৭) পাতি লেবু ৩টি, ৮) সিঁদুর ১ কৌটো, ৯) আলকুশীর বীজ - ১০৮টি, ১০) প্রদীপ ১২টি, ধূপ, ১টি নারকেল।

সাধনার সময়—নবরাত্রি, দীপাবলি, হোলি, চতুর্থী, অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদির মতো যে কোনও শুভ দিনে মন্ত্র জপ করা শুরু করুন। লাল চন্দনের জপমালায় ২১ দিন ধরে, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে, ভক্তি মনে একাগ্র চিত্তে এক মালা করে জপ করুন। এতে মন্ত্রটি সিদ্ধ হবে। জপের সময় ধূপ ও ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে লাল ফুল ও বাতাসা অর্পণ করুন। ২১ দিন পরে জপ শেষে ২২ দিনে আবারও পূজা করে 'আহুতি' দিন।

আহুতির মন্ত্র—আং ক্রীং ভদ্রকালী! কর কল্যাণ স্বাহা।

সাধনার পদ্ধতি

সাধনা শুরু করার আগের এক সপ্তাহ আপনি নিজে রান্না করে সাধারণ সিদ্ধ ভাত খাবেন এবং গুরু মন্ত্র, বীজ মন্ত্র বা কোনো মন্ত্র নিত্য জপ করার থাকলে তা করবেন। সাধনার আগের দিন থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। যে স্থানে সাধনা করবেন সেই জায়গাটি সাধারণ শুদ্ধ ও পবিত্র করে নেবেন। গুরু গোরখনাথের নামে একটা অখণ্ড প্রদীপ জ্বালাবেন ঘি দিয়ে।

প্রথমেই গুরুদেবের পূজা করে নেবেন। এবার গোরখ-ধুনি তৈরী করুন। ধুনি জ্বালান। এর সঙ্গে সঙ্গে ধুনিতে কর্পুর, ধুনো, গুগ্গুল ও লোবান্ন জ্বালাবেন। প্রভু শিব, আদিনাথ দত্তাত্রেয়, নবনাথ ও চুরাশি সিদ্ধ ও যোগী গোরখনাথকে পূজা ও প্রণাম করে এবং গোরখ-ধুনিতে

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং গুং গুরবে হুং ফট্ স্বাহা,
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শিং শিবায় হুং ফট্ স্বাহা,
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং আং দত্তাত্রেয়ায় হুং ফট্ স্বাহা,
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নং নবনাথায় হুং ফট্ স্বাহা,
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সিং চুরাশি সিদ্ধায় হুং ফট্ স্বাহা,

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং গোং গোরখনাথায় হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে একটি একটি করে আহুতি দিয়ে আগুনকে প্রজ্বলিত করুন। এর পর মূল পূজায় প্রবেশ করবেন।

এই সাধনা কোনও নির্জন মন্দিরে করা হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। তবে নির্জন স্থানে বা বাড়িতে অবশ্যই করা যায়। প্রথমে আপনার সামনে একটি চৌকো

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আম কাঠের তক্তা নিন, তার উপরে একটি লাল কাপড় বিছিয়ে 'শ্রী কালী-যন্ত্র' ও 'চিত্র' বসান। কালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঘি-এর একটি চারমুখি প্রদীপ জ্বালান। সাধারণ পূজা এর নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চোপচারে পুজো করুন। তারপর লালচন্দন ও জাফরান দিয়ে তৈরী কালি দিয়ে ভোজপত্রে উপরে উল্লিখিত বিধিতে 'চৌত্রিসা যন্ত্র' লিখুন এবং নিম্নলিখিত আচারের সাথে এটির পূজা করুন। পূজা করার সময় যন্ত্র ও ছবিতে বন-বেগুনের ফুল ও হলুদ কলকে ফুল নিবেদন করুন। তিনটি লেবুতে সিঁদুরের তিলক বা টীকা লাগান এবং এটিও অর্পণ করুন। নারকেল, শুকনো ফল, লবঙ্গ এবং এলাচ নিবেদন করুন, তবে এর আগে গণেশ, গুরুদেবের পূজা এবং মন্ত্র জপ আবশ্যক। 'কালী শাবর মন্ত্র' জপ করার সময় প্রতিবার কালী চিত্রের সামনে একটি করে আলকুশীর বীজ নিবেদন করতে থাকুন। জপ শেষে এই মন্ত্রের ঘি ও গুগ্গুল দিয়ে এগারোটি আহুতি দিন। এর পরে, একটি লেবু কেটে তাতে আপনার অনামিকা থেকে রক্ত যোগ করুন এবং আগুনে আহুতি দিন। যজ্ঞের আগুন নিভে যাওয়া অবধি আপনি—'ওঁম্ কঙ্কালী মহাকালী, কেলি-কলাভ্যাম্ স্বাহা'—মন্ত্রটি যথাসাধ্য জপ করতে থাকুন।

প্রতিদিনের হোমের বিভুতি, শুকনো ফল, লেবু, আলকুশীর বীজ এবং ফুল নিরাপদে রাখুন। ২১দিন পরে মন্দিরে নারকেল ফাটিয়ে দিন এবং ধূপ নিবেদন করুন, পরে ব্রাহ্মণকে অন্নভোজন করান। এটি ব্যবহার করার সময় ২১ বার মন্ত্রটি জপ করুন। প্রতিদিন ১০৮ বার মন্ত্রটি জপ করলে সাধকের সমস্ত সৎ মনোকামনা পূর্ণ হয় এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকেন, প্রতিটি বাধা এমনিভাবে দুর হয়ে যায় এবং সাধক সুস্থ থাকেন ও দীর্ঘায়ু হন।

বিভিন্ন ব্যবহার—উপরোক্ত মন্ত্রের সাহায্যে শত্রুর বাধা, ভূত বাধা, আর্থিক বাধা, ঋণের ফাঁদ, রোগ, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শান্তিকরণ, বশীকরণ, আকর্ষণ, মোহন, উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদি ষটকর্মের জন্য এই মন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কখনও কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র প্রয়োগ করলে অবশ্যই সাধকের বা প্রয়োগকর্তার বিপদ অবশ্যাম্ভাবী। প্রয়োগ যেমন—

১) মোহন—উপরের মন্ত্রটি ১১ বার উচ্চারণ করে সিঁদুর ও যজ্ঞের বিভুতি সমভাগে মিশিয়ে কপালে তিলক লাগান, যে আপনাকে দেখবে সে আপনার প্রতি মুগ্ধ হবে।

২) বশীকরণ—পাঁচটি শুকনো ফল থেকে সামান্য করো নিন এবং এই মন্ত্রটি ১১ বার জপ করুন। প্রতিদিন সামান্য পরিমানে নিজে প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করতে থাকুন। আপনি যার সাথে কথা বলবেন সেই পুরুষ বা মহিলা আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

৩) ভূত-প্রেত বাধা নিবারণে—হবনের ভস্ম সাতবার জপ করা হয়। কর ফুঁ দিয়ে কপালে তিলক লাগান। ভোজ কাগজে 'চৌতিসা যন্ত্র' বানিয়ে তামার তাবিজে রেখে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পরুন। ভূত-বাধা চিরতরে দুর হয়ে যাবে।

৪) আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে—মহাকালী যন্ত্রের সামনে ঘি জ্বালিয়ে উপরের মন্ত্রটি ২১ দিন ধরে ২১০০ বার জপ করুন। আর্থিক বাধা অবশ্যই দুর হবে।

৫) শারীরিক যন্ত্রণা ও রোগ থেকে মুক্তিলাভে—বিভুতিকে সাতবার অভিমন্ত্রিত করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিন এবং ভোজ পাতায় অষ্টগন্ধা দিয়ে চৌত্রিশা যন্ত্র লিখে রোগীর গলায় বেঁধে দিন। রোগ থেকে মুক্তি পাবেন।

বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণের প্রয়োগ এখানে (অপপ্রয়োগের কারণে) উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে তা লিখলাম না।

অনাবৃতা সাধিকা মিনতি

আদিমকাল থেকেই তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান দীর্ঘকাল ধরে নথিবদ্ধ আছে। আদিম কৌম সমাজের প্রকৃতিপূজা, জাদু-টোনা, অলৌকিকের প্রতি কৌতূহল ইত্যাদি ক্রমশঃ পরিস্রুত হতে হতে একটা অন্যধরনের সাধনপদ্ধতি হয়ে গড়ে উঠেছিলো। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি একে আমল না দিলেও বৌদ্ধ আচার্য অসঙ্গের প্রত্যুৎপন্নতায় তা বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু বজ্রযান বা সহজযান যুগের পর যখন এদেশে বৌদ্ধধর্ম নিজস্ব স্ব-বিরোধের কারণে ক্রমশ লয় হয়ে যায় তখন নবপর্যায়ের সনাতনধর্ম নিজের মতো করে এই সাধনপদ্ধতিটিকে আত্মস্থ করে নেয়। এই বাংলায় দেবীতত্ত্বকে কেন্দ্রে রেখে তন্ত্রসাধনার ধারাটি তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতক থেকে দেবী হিসেবে কালী এবং দশমহাবিদ্যার সাধনা তন্ত্রচর্চার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। এইসময় কালীপূজার বিধান রচনা করেন বিখ্যাত শাক্তসাধকেরা।

বাঙালি মাত্রেই হয় শাক্ত নয় তো বৈষ্ণব। বৈষ্ণবধর্মের বীজ স্থান করে নিয়েছে শাক্তধর্মে বা তন্ত্রাচারে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ধর্ম সাধনার মূল কাণ্ড তন্ত্রনির্ভর। বাঙালির জীবনধারার পরিক্রমার পথেই তন্ত্রের উদ্ভব। তন্ত্রপ্রধান অঞ্চল বলতে বোঝায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রাগজ্যোতিষপুর। বৌদ্ধতন্ত্রের আবির্ভাব বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপে, আজ যা বাখরগঞ্জ নামে পরিচিত। তন্ত্র সম্পর্কে বাঙালির ধারণা শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, তন্ত্র অসামাজিক এবং পঞ্চ ম-কার সাধনার মাধ্যমে ব্যভিচারের মাধ্যম। সত্য কথা, এই তন্ত্র সম্পর্কে এসব ধারণা অজ্ঞানতা-প্রসূতির পথ ধরে গড়ে উঠেছে।

বর্তমান বাঙালির ধারণায় তন্ত্র জটিল অনাচরণীয় ধর্ম। এসব ধারণা যাদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে, তাদের কাছে তন্ত্র একমাত্র ভৈরব-ভৈরবীর গুহ্যাচারের ধর্ম। তারা খোঁজ রাখেন না যে তন্ত্র, হাজারদুয়ারীর প্রাসাদ। ভৈরব-ভৈরবী সাধনা তার নির্ধারিত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

একটি প্রকোষ্ঠ মাত্র। তন্ত্রাচার বহুবিধ, নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এক পথে এক-একজন সাধনা করে থাকেন। যাঁরা ভৈরব-ভৈরবী রূপে সাধনা করেন তাঁদের বলা হয় বীরাচারী। এসব আচরণ সবার পালনীয় নয়। অথচ বাঙালির প্রচলিত ধারণায় তন্ত্রসাধনা মানেই এক রকম যৌন ব্যভিচারের সুযোগ আর মৃতদেহ নিয়ে শবসাধনার নামে ভয়ংকর রকমের কারসাজি।

আমার তন্ত্র-জীবনের আগে থেকেই এসব কাহিনী আমি শুনে এসেছি। বিভিন্ন সাধকের কাছে কামাখ্যাতেও এই সকল সাধনার কৌশল সম্পর্কে শুনে এসেছি। পরবর্তীকালে এমন সাধনা প্রত্যক্ষ করা ও অংশগ্রহণ করতে বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করতে করতে পৌঁছে গিয়েছিলাম ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বে অসম রাজ্যের ডিমা হাসাও জেলার হাফলংয়ে। শুনেছিলাম এখানে একজন সাধিকা এখানে আছেন।

গত বছর কাশীতে গিয়ে এক অঘোরী সাধকের আখড়ায় পরিচয় হয়েছিল কৌলাচার্য মাধবানন্দ গিরির সাথে। তাঁর মুখে দেবী ভৈরবী ও তাঁর সাধনা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি। দশমহাবিদ্যার অন্যতম বিদ্যা দেবী ভৈরবী। পৌরানিক কাহিনী অনুযায়ী ভগবান শিবের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল দক্ষকন্যা সতীর। কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষরাজ কিন্তু শিবকে নিজের জামাই হিসাবে মেনে নিতে পারেননি। একবার শিবকে জব্দ করার জন্য দক্ষরাজ এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, পুরাণের ভাষায় যাকে দক্ষযজ্ঞ বলা হয়। এই বৃহৎ যজ্ঞে দেশের বিভিন্ন স্তরের রাজা, নরনারী এবং যজ্ঞেশ্বর নারায়ন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবদেবী আমন্ত্রিত থাকলেও কেবলমাত্র শিব ও সতী এবং নন্দী, ভৃঙ্গী সহ শিবানুচরেরা বাদ ছিলেন। যজ্ঞের দিন সতী জানতে পারলেন যে তার পিতা এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন এবং তাতে সমস্ত দেবদেবী থেকে শুরু করে নর-নারী সকলে আমন্ত্রিত কেবলমাত্র তারা বাদে। তখন সতী স্বামীর প্রতি এই অন্যায় অবিচারের কথা ভেবে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দক্ষযজ্ঞ পন্ড করতে উদ্ভুত হয়ে উঠলেন। সতী বারবার স্বামী অর্থাৎ শিবকে অনুরোধ জানালেন পিতার ঘরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু শিব কোনভাবেই রাজি হলেন না। কারণ সতীর পিতা তাকে এবং সতীকে নিমন্ত্রণ করেননি।

বারংবার অনুরোধ করার ফলেও যখন স্বামী তাকে অনুমতি দিচ্ছেন না, তখন সতী তার স্বামী মহাদেবের সামনে ভয়ংকরী দশমহাবিদ্যা রূপে প্রকট হলেন, যাতে সেই ভয়ানক রূপ দেখে স্বামী তাকে কোনভাবেই বাধা না দেয় বরং সম্মতি জানায়। মহাদেবের সামনে সতীর দেহ দশটা রূপে প্রকট হয়। এঁরা মহাশক্তিশালী মহামায়ার বিশেষ ১০ টি রূপ—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা। সতী এই দশটি রূপে শিবকে দশ দিক থেকে ঘিরে ধরেন। তখন শিবের একদম সামনেই যেই মহাবিদ্যা রূপে সতী প্রকট হন তিনিই ভৈরবী।

মহাদেব দেখেন মহাসলিল থেকে উঠে এসেছে এক অতিউজ্জ্বল পদ্ম। সেই পদ্মে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অধিষ্ঠান করছেন সহস্র অগ্নিপিন্ডের মত ঘোর রক্তবর্ণা এক দেবী মূর্তি। দেবীর গলায় নর করোটির মালা। তার রক্তবর্ণ তিনটি চোখ, চারটি হাত। ডান দিকের দুটি হাতে যথাক্রমে বর মুদ্রা এবং জপ মালা, বাঁদিকের দুটিতে অভয় মুদ্রা এবং পুস্তক। দেবীর পরিধানে রক্ত বস্ত্র, মাথায় জটাজুট ও রুদ্রাক্ষ মালা এবং চন্দ্রকলা শোভা পাচ্ছে। স্তনযুগল রক্তলিপ্ত এবং মুখে মৃদু হাসি—এই হলো মোটামুটি ভৈরবীর বর্ণনা।

ভৈরবী তন্ত্র অনুসারে ভৈরবীর ভৈরব হলেন 'বটুক'। এই বটুক ভৈরব শ্মশানের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ভৈরবীর হাতে যে পুস্তকটি থাকে সেটি আসলে ব্রহ্মবিদ্যা। এই কারণে ভৈরবীর সাধনায় সাধক উত্তীর্ণ হতে পারলে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের বিদ্যা সাধক ধারণ করতে সক্ষম হয়।

আগম শাস্ত্র বলছে ভৈরবী বিদ্যা থেকে সমগ্র ভুবন প্রকাশিত হয় আবার তার মধ্যেই লীন হয়। 'অ' থেকে 'অঃ' পর্যন্ত ষোলটি বর্ণকে তন্ত্রের ভাষায় ভৈরব বলা হয়। একইভাবে 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত বর্ণগুলিকে ধ্বনি অথবা ভৈরবী বলা হয়।

আবার মুণ্ডমালা তন্ত্র বলছে দেবী দশভুজা দুর্গা যখন মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন তার আগে এই ভৈরবী মদিরা পান করে খড়্গ দিয়ে মহিষের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন। ভৈরবীর গলায় যে-নর করোটির মালা রয়েছে সেটি ৫০ টি নরকপাল দিয়ে তৈরি। এই ৫০ টি কপালে ৫০টি পৃথকদিব্যশক্তি লুকিয়ে আছে।

ভৈরবী কাল রাত্রিতে আবির্ভূত হন। এঁর তিনটি চোখ ঋক, সাম এবং যজু বেদের স্বরূপ। এই মহাবিদ্যা ভৈরবী সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করে বসে আছেন এবং ইনি রজোগুণ প্রধানা। তন্ত্র শাস্ত্রে ১৩ রকম ভৈরবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এরা হলেন—কৌলেশ ভৈরবী, ভয়নাশী ভৈরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, ষটকুটা ভৈরবী, রুদ্র ভৈরবী, ত্রিপুরাবালা ভৈরবী, অন্নপূর্ণা ভৈরবী, সিদ্ধিকা ভৈরবী, ত্রিপুরা ভৈরবী, সম্পদ প্রদায়িনী ভৈরবী, চৈতন্য ভৈরবী, নিত্যা ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী। এই প্রত্যেক ভৈরবীর আলাদা আলাদা ধ্যান মন্ত্র রয়েছে এবং পূজা পদ্ধতিতেও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ভৈরবী বামাচার এবং দক্ষিণ আচার এই দুই ভাবেই পূজিতা। ভৈরবী তন্ত্রে আছে তন্ত্রের সব নিগূঢ় এবং অতি গুহ্যতন্ত্রাচার। একজন বীরাচারী সাধকের ক্ষেত্রে তার সাধন সঙ্গিনী সাধিকাকে ভৈরবী রূপেই সাধন ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হয়। সেখানে সাধক নিজে স্বয়ং ভৈরব। পঞ্চমুন্ডি সাধনা থেকে শুরু করে তন্ত্রের অতি নিগূঢ় এবং গুহ্যাতিগুহ্য সাধনা ও ক্রিয়া-কলাপ ভৈরবী তন্ত্রের উপর করা হয়। রহস্য চক্র, লতা চক্র, ভৈরবীচক্র, মহাচক্র, যোনী চক্র ইত্যাদি অতি গুপ্ত সাধনা এবং বীরাচার, কৌলাচারের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ভৈরবী তন্ত্রের উপর করা হয়। একজন বামাচারীর সাধন জীবনে ভৈরবী তার শক্তি। সে রক্তে-মাংসে গড়া নারী হোক বা বিশেষ কোনো শক্তি হোক। যেমন সতী হীন শিব শব ঠিক তেমনি ভৈরবী হীন ভৈরব শব মাত্র। তাই সাধনপথে ভৈরবী হলেন সাধকের মহাশক্তি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাধকের সাধন ক্ষেত্রে ভৈরবী অর্থে একজন সৎ উচ্চকোটির সাধকের কুলসাধিকা থাকে। সাধক অতি গোপনীয়তা বজায় রেখে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় প্রস্তুতি নিয়ে এবং শৃঙ্খলা মেনে মাতৃজ্ঞানে বিশেষ অঙ্গে পুজো জপ করে মহা শক্তি অর্জন করবে। সেই কুলনায়িকা সাধকের কাছে মহাবিদ্যা ভৈরবী স্বরূপ। তন্ত্রে আবার এই ভৈরবীকে রক্ত চামুন্ডাও বলা হয়। সেক্ষেত্রে দেবী একটি মস্তকহীন শবের উপর উপবিষ্টা।

এই ভৈরবী তন্ত্রে অনেক কঠিন থেকে কঠিনতম গুপ্ত তন্ত্র সাধনা লুকিয়ে আছে যা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্তরের সাধকেরা বীরাচারে সাধনা করে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন তথা মহামায়ার মায়াজালের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছে। তবে তন্ত্রাচারে এই মহাবিদ্যা ভৈরবী সাধনা অতি কঠিন সাধনা এবং বীর ভাবের সাধক ছাড়া সাধারণ পশু ভাবের সাধকের দ্বারা তা কখনোই সম্ভব নয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এই দেবীর সাধনা উচ্চকোটির সৎগুরুর বিদ্যা। এই বিদ্যা সবার সামনে ব্যক্ত করলে ফল হানি এবং গোপন রাখলে সিদ্ধি ঘটে। ভৈরবী মন্ত্র-তন্ত্রের বিভিন্ন কর্ম এবং ষটকর্মের মধ্যে সম্মোহন এবং বশীকরণে বিশেষ প্রয়োগ করা হয়। শত্রুর বিনাশের উদ্দেশ্যে রুদ্র ভৈরবীর মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়াতে ভৈরবী মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। এছাড়া দেবী চতুর্বগ এবং ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন তার সাধককে। ভৈরবী তন্ত্র অনুসারে সাধনা করলে সাধক বিভিন্ন ভোগের মাধ্যমেই সমস্ত কামনা-বাসনার বাঁধন ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। তবে মহাশক্তি মহাবিদ্যা ভৈরবীর শক্তিতে এবং তার আশীর্বাদে সাধক বলিষ্ঠ হয়ে সাধনার চরম থেকে চরমতম স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

মহাসিদ্ধসার তন্ত্র অনুসারে, বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বভাগে যে সমস্ত তন্ত্রপদ্ধতি প্রচলিত, তাদের 'বিষ্ণুক্রান্তা' বলে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনায় এক সময় এক ভৈরবীকে 'গুরু' বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। বিষ্ণুক্রান্তা-য় প্রচলিত ৬৪টি তন্ত্রর প্রতিটি সাধনপদ্ধতি রামকৃষ্ণকে দিয়ে একে-একে পালন করিয়েছিলেন সেই ভৈরবী ও বীরভাবের সাধনমার্গে উত্তীর্ণ করিয়েছিলেন। ভৈরবীর সাথে বাঙালীর পরিচয় এই ভাবেই হয়।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ১৮৬১ সালে দক্ষিনেশ্বর আসেন, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল যোগেশ্বরী এবং বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি এবং তিনি ছিলেন তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনে সিদ্ধা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে মাতৃরূপে দেখতেন। মাতাজী ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন ও পরবর্তীতে ভৈরবী তাঁকে বীরভাবে সাধনা করান।

যোগেশ্বরী ভৈরবীর পথনির্দেশনায় ঠাকুর জপ ও পুরশ্চরণের মতো মন্ত্রসাধনায় চিত্ত শুদ্ধ করে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ স্থাপন করলেন। সমস্যা দেখা দেয় যখন ঠাকুর জানলেন তন্ত্রসাধনায় বামাচারের মতো পন্থাও অভ্যাস করতে হবে, যার মধ্যে মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ, মদ্যপান ও যৌনাচারও অন্তর্ভুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর জীবনীকারগণের কথা থেকে জানা যায়, শেষোক্ত দুটি তিনি অভ্যাস করেননি, শুধুমাত্র সেগুলির চিন্তন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করেই কাঙ্খিত সাধনফল লাভ করেছিলেন। একটি কথা একবাক্যে স্বীকার করতে হয় ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই তন্ত্র সাধন পর্ব এবং এই পর্বে প্রধান চালিকা শক্তি ভারতের এই মহান তন্ত্রসাধিকা ভৈরবী মাতা। এমনই এক ভৈরবীর ও এক শবসাধক তান্ত্রিকের কথা এখন বলতে চলেছি।

অসম সহ ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিখ্যাত তার প্রাকৃতিক বনাঞ্চল, বহু প্রজাতির প্রানী, উদ্ভিদ, বিচিত্র সংস্কৃতি, বিভিন্ন প্রাচীন জনজাতি, প্রাচীন অজস্র মন্দির, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, কামাখ্যা মন্দির ও তান্ত্রিক সাধনা নিয়ে। আমার তন্ত্রজীবনের প্রধান আকর্ষণ এই কামাখ্যা মন্দির ও গোটা উত্তরপূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলও। বিশেষ কোনও সাধনার জন্য আমি ত্রিপুরার চাকমা উপজাতির সাধকের কাছেও দৌড়ে গিয়েছি। এমনই একবার আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম অসম রাজ্যের ডিমা হাসাও জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যা সারা বিশ্বে এমন গর্বিত দেশ হিসাবে পরিচিত যার ইতিহাস হাজার বছরের প্রাচীন ও ভারতকে সোনার পাখি বলা হয়। ভারতের মানচিত্রটি খুব চমৎকার, যার ছবি দেখলে মনের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগে। ভারতে, মন্দির থেকে নদী, জলপ্রপাত এবং বনজঙ্গল, মরুভুমি থেকে শৈলশহর—সবই পাওয়া যাবে। এই জন্যই ভারতবর্ষ কে পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব বলা হয়। সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষেরই আকর্ষণ এই বৈচিত্রপূর্ণ ভারতবর্ষ ভ্রমণের। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মতবাদ, আধ্যাত্মিকতা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র, মানুষজন, খনিজদ্রব্য—সবকিছুর প্রতিই সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিবেশী রাজ্য অসমের শৈল শহর ‘ডিমা হাসাও’ জেলার সদর শহর এই হাফলং, আর সত্যি কথা বলতে কী, সৌন্দর্য্যের বিচারে এই ডিমা হাসাও কিন্তু অসমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটনক্ষেত্র।

ডিমাসা ভাষায় ‘হাঁফলাঁও’ শব্দের অর্থ সাদা উইপোকার ঢিবি। আর এই হাঁফলাঁও থেকেই এসেছে ‘হাফলং’ শব্দটি। শৈল শহরটির চারদিকে পাইন এবং নীল অর্কিডের ছড়াছড়ি। শহরের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হল এর হ্রদটি। হ্রদের ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখলে মনে হয় যেন প্রকৃতির কপালে কমলা রঙের টিপ পরিয়ে দিয়েছে কেউ। দার্জিলিঙের মতো এই শহরের প্রাণকেন্দ্রও হল তার ম্যাল্। হাফলং বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে লেক পর্যন্ত বিস্তৃত এটি। পূর্ব হিমালয়ের ছোট্টো এই শৈলশহরের বাসিন্দারা বেজায় অতিথি বৎসল। হাফলং অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের কাছে যেন স্বর্গরাজ্য। ট্রেকিং, প্যারাগ্লাইডিং সহ নানা অ্যাডভেঞ্চার বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। পাহাড় জুড়ে শুধু সবুজ গাছপালা। বরাক নদীর উপত্যকার এই পাহাড়ি শহরের আরেকটি দারুণ আকর্ষণ রয়েছে একটি খাদ্য—ডিম পোলাও। নিউ হাফলং স্টেশনে নামলে সারি সারি খাবারের দোকানে বিক্রি হয় পোলাও আর ডিমের কারি, আদিবাসীদের রান্না করা সেই পোলাও এবং ডিমের কারির স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখনই এর স্বাদ নিতে ভুলিনি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিকেল বেলায় শহরের মাঝখানে অবস্থিত প্রকাণ্ড আকারের শান্ত হাফলং হ্রদটির পাশে বসে স্থানীয়রা ও ভিন রাজ্য বা দেশের অচেনা পর্যটকরাও সৌন্দর্য উপভোগ করেন। শহরের মাঝখানের প্রকাণ্ড আকারের শান্ত হাফলং হ্রদটি শহরকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। হ্রদের ধারে যখন মানুষের আড্ডা তখন হ্রদের মধ্যে আড্ডা চলে মাছেদের। মানুষের ছুঁড়ে দেওয়া খাবার খেতে অভ্যস্ত তারা। হ্রদের এ পার থেকে ও পার যাওয়ার জন্য রয়েছে একটি ছোট্ট সেতু। হ্রদ এবং তাকে কেন্দ্র গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোনও তুলনা হয় না, হাফলঙের সবচেয়ে সুন্দর স্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্ফটিক স্বচ্ছ জলের এই ঝিলে নৌকাবিহার করতে করতে সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতাই আলাদা।

হাফলং থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পানিমুর জলপ্রপাত। দুর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জল নয়, পাহাড়ের উপর থেকে ছলকে পড়ছে দুধের স্রোত। এটি আসলে অসমের কোপিলি নদীর এক দুরন্ত রূপ। পাথুরে পথ পেরিয়ে কোপিলি নদী নীচের পাথরে আছড়ে পড়ে নতুন নাম নিয়েছে—পানিমুর জলপ্রপাত। এখানকার নিকটতম রেল স্টেশন লামডিং। পানিমুরের কাছেই রয়েছে ছবির মতো সুন্দর মাইবং এবং উমরাংসো নামে দুটি গ্রাম।

হাফলং থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত থুরুক গ্রামটি শীতের সময় সাদা বরফে ঢেকে যায়। সেই বরফ দেখতে ভিড় জমান পর্যটকরা। গ্রামে যাওয়ার জন্য কোনও পাকা সড়ক নেই। শুধু মাটি কেটে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অসাধারণ হলেও এর মুল আকর্ষণ শীতকালে। কাছেই একটি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য হল বরাইল। এটি মূলত পার্বত্য বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলে চিরসবুজ এবং অর্ধ চিরসবুজ গাছ দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস, বাঁশ এবং অর্কিড। জঙ্গল সাফারির সময় হাতি, চিতাবাঘ, বন বিড়াল, উল্লুক, রামকুত্তা, ভালুক, মুখপোড়া হনুমানদের দেখা মিলতে পারে। চোখে পড়বে বিভিন্ন রকমের পতঙ্গ, ধনেশ, হাড়গিলার মতো পাখি, অজগর, কচ্ছপ তো আছেই।

ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা গ্রাম হাফলং থেকে মাত্র সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এবং এই গ্রামে প্রতি বছরই সেপ্টেম্বর মাসের নির্দিষ্ট একটি সপ্তাহ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত হাজার হাজার পাখি আত্মহত্যা করে, আর এই কারণেই গ্রামটি বিশ্ববিখ্যাত। এই ঘটনা চাক্ষুস করতে বছরের পর বছর দেশ বিদেশের পর্যটকের দল সেখানে গিয়ে পৌঁছোয়। কোন রহস্যময় কারণে এখানে পাখিরা আত্মহত্যা করে তা আজও জানা যায়নি। আগুন দেখে যেমন পতঙ্গরা ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে ঝাপ দেয় তেমনই জাটিঙ্গা গ্রামের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে আকাশ থেকে টুপটাপ করে মরে পড়তে থাকে পাখিরা। স্থানীয়রা মৃত পাখিদের মাংস খান। জাটিঙ্গা গ্রামে সেই সময় রীতিমতো উৎসব চলে। এইখানে এখন পাখিদের উড়তে অবশ্য বিশেষ দেখতে পাবেন না। তবে হ্যাঁ, পাখিদের আত্মহত্যা করতে অবশ্যই দেখতে পাবেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই ডিমা হাসাও জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক বাঙালী সাধক থাকেন বলে আমি শুনেছিলাম। সেখানে তার সাথে দেখা করতে আমি চলেছি, সাথী পুরুলিয়ার এক উগ্র-তান্ত্রিক সাধক, কামাখ্যা ধাম থেকে আমার সঙ্গী হয়েছেন। শুনেছি ঐ বাঙালী সাধককে না কি নিকটবর্তী গ্রামের সকলেই খুব শ্রদ্ধা করে, স্থানীয় লোকজন তাকে 'ভয়হারী বাবা' বলে তাঁকে সম্বোধন করে ও অনেক সম্মান করে। পায়ে পায়ে আমরা দুজন তার সাথে দেখা করতে চলেছি।

এখানে একটি উপজাতি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি বিখ্যাত জনশ্রুতি রয়েছে। এই উপজাতি পরিবারের মহিলারা না কি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নান করেন এবং যদি কোনও অচেনা লোক প্রত্যক্ষ ভাবে বা প্রতারণামূলক ভাবে তাদের দিকে তাকায় তবে সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির উপর 'কালো যাদু' ভর করে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তান্ত্রিক শাপে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং সেই ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হিসাবে সেই ব্যক্তি বহু রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়।

কথিত আছে, সময়মত এই বিষয়টি জানা গেলে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবে ঐ জায়গার স্থানীয় নিরাময়কারীরা তাকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ ও মন্ত্র-চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলেন। জনশ্রুতি আছে, এই অঞ্চলে বসবাসকারী মহিলারা তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধ। সমগ্র পূর্বভারতে ও বিশেষ করে আসামে নারীর সংখ্যা বেশি, তারা পুরুষদের তুলনায় বেশি পরিশ্রমী এবং শারীরিকভাবে সুসংগঠিত হয়। এদের সৌন্দর্যে এক অদ্ভুত কামুক আকর্ষণ রয়েছে। কথিত আছে তন্ত্র-মন্ত্রের বাম পথে ও তামসিক কালী বিদ্যায় তারা দক্ষ। তাদের ছোট এবং পেশীবহুল শরীর বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের কারণে তাদের মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। তারা ভীষণ আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী। কথিত আছে, এখানকার পুরুষরা কেবল তাদের মেয়েদের করুণায় বেঁচে থাকে।

এখন আমি যে ঘটনাটি লিখতে যাচ্ছি তা এককথায় অনন্য ও অন্যান্য ঘটনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘকাল ধরে আমার স্মৃতিতে রয়েছে। অন্য কেউ যদি এই ঘটনাটি আমাকে বর্ণনা করত, আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু নিজের অতীতকে তো অবিশ্বাস করতে পারব না!

আমরা চলেছি সেই 'ভয়হারী বাবা'-র সাথে সাক্ষাৎ করতে। আমরা বলতে আমি ও কামাখ্যা মন্দিরে সদ্য পরিচিত একজন উগ্র-তান্ত্রিক। এর পরে আমার উদ্দেশ্য ভৈরবী মিনতি মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার। আমি আর ঐ তান্ত্রিক এতক্ষন নির্জন বনপথে হেঁটে এসে এই সন্ধ্যায় একটা গ্রামের শেষ দিকে নির্জন শ্মশানের পাশে প্রাচীন ভাঙাচোরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছি। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। শুকনো খাবার খেয়ে কেবলমাত্র শুয়েছি, এমন সময়, তখন প্রায় মধ্যরাত হবে, হরিনাম করতে করতে একটা মৃতদেহ নিয়ে কিছু লোক এসে শ্মশানে ঢুকলো। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেছিল তখন। কিন্তু শ্মশানে তখনও একটা চিতায়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সামান্য আগুন জ্বলছিল ও ধোঁয়া উঠছিল। চিতার লাল ও হলুদ শিখার হালকা আলোতে দেখলাম কয়েকজন মানুষ একটি মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে ঢুকলো। আমি উঠে বসতেই দেখি সেই তান্ত্রিক তখন প্রায় মৃতদেহের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। আমি দুরে বসে সবকিছু লক্ষ্য করছি। আমার সঙ্গী এই তান্ত্রিক এক মৃতদেহ সন্ধানকারী। তিনি এই সময় শবসাধনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে লাশের খোঁজ করছিলেন তিনি। অবশেষে আজ রাতে তার খোঁজ শেষ হয়েছে। আজ তিনি শবসাধনার উপযুক্ত সেই অপঘাতে মৃত্যুজনিত লাশ মনে হয় পেয়ে গিয়েছেন।

লাশ দেখে ভয়ংকর অট্টহাসিতে দিগ্বিদিক কম্পিত করে তিনি হেসে উঠলেন। তার সাদা দাঁতগুলো তখন জ্বলজ্বল করছে এবং তিনি শিশুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। মৃতদেহের সঙ্গীদের কিছু কথা বলে শ্মশান থেকে তাড়িয়ে দিলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃতদেহটিকে বাঁশের খাটিয়া থেকে টেনে বের করে একটা গাছ তলায় নিয়ে এসে শবসাধনার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

শবসাধনা সম্পর্কে এবার কিছু বলে নিই আর জেনে নিই এর পিছনে লুকিয়ে থাকা মস্ত বিজ্ঞান। এই বিষয়ে বলতে গেলে আগে জানতে হবে—শব কি? প্রাচীন ভারতীয় দর্শনমতে, ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্‌, এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে দেহ নির্মিত। যখন এই পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয়, তখন জীবের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। আর এই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহকেই শব বলা হয়। শবদহনে এই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহকে মহাকালের সাথে মিলিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন করে দেওয়া হয়। আর শবসাধনে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহে মহাকালের আবাহন করে পঞ্চভূতকে আবার অস্তিত্বে আনা হয়। প্রথমটি বিলোম, দ্বিতীয়টি অনুলোম যাতে যোগিনী দন্ড দুই হাতের নিচে রেখে ডাকিনী ন্যাসের দ্বারা প্রেতবীজ এবং কালকুট বীজের মিলনে ভদ্রকালীর বীজ বপন করা হয় শবের শরীরে। সাক্ষী থাকেন নিজ ইষ্ট আর মহানিশা।

শবসাধনার আগে সাধারণ শবদাহন নিয়ে একটু বলি কারণ, দুটি বিপরীত ক্রমের বিষয় হলেও পরস্পর সম্পর্কিত। কোনও মানুষ মারা গেলে মৃতদেহকে শ্মশানভূমিতে দক্ষিণদিকে মাথা রেখে নতুন কাপড় আচ্ছদিত করে শবকে ঘি মাখিয়ে চিৎ করে শুইয়ে স্নান করানোর সময়

"ওঁ গয়াদিনী চ তীর্থানি যে চ পূণ্য শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং।
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্বপাপপ্রণাশিনীম।".... ইত্যাদি

এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে কিছু কাটা কুশ আর কিছু তিল নিয়ে

"ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভীঃ পথিভীঃ পূর্বিণেভিঃ।
দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিযচ্ছ।" —মন্ত্রে প্রেতকে আবাহন করা হয়। যাবতীয় ক্রিয়া কাণ্ডের পরে —

"ওঁ কৃত্বা তু দুষ্করং করলাম জাত্তা বাপ্যজানতা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান দোকান সা গচ্ছতু”—বলে সাত পাক ঘুরে আগুন দেওয়া হয়। কিন্তু, এখানেই কি শেষ? আত্মা কি মুক্তি পেলো? না, মুক্তি পায় না। শ্রাদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় পিন্ড দ্বারা প্রেত শরীর লাভ করে, চিত্রগুপ্তের খাতার হিসেব নিকেষ সেরে আবার জন্ম চক্রে আসতে হয় তাকে।

এবার আসি মূল আলোচনা শবসাধনাতে। বীরাচারী সাধক ছাড়া এই সাধনার অধিকারী কেউ নন। এই সাধনার বিষয়ে ভাবচূড়ামনি গ্রন্থে বলা হয়েছে, শুন্যাগারে, নির্জন নদীতীরে, পর্বতে অথবা বিল্বমুল বা বেলগাছের নিচে সাধনা করতে হবে। বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী যদি মঙ্গলবারে পড়ে, তাহলে সেই রাত্রিতে সাধনা করলে দ্রুত সিদ্ধিলাভ হয়। শ্যামারহস্য ও কৌলাবলীনির্ণয় গ্রন্থেও এই একই কথা বলা হয়েছে তবে সেখানে বলা হয়েছে যে মহাশ্মশানই শ্রেষ্ঠ স্থান। কারণ কালী শ্মশানে বিরাজ করেন এবং শিবাবলি দেওয়ার প্রশস্ত স্থান। আবার তন্ত্রসারে বলা হয়েছে, গাঢ় অঞ্জন বা কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ যে কালী সর্বদা শ্মশানে বাস করেন, তিনিই শ্মশানকালী। এই দেবীর পূজো শ্মশানেই করতে হয়।

শবসাধনার ক্ষেত্রে কয়েকরকম শব সাধনার জন্য শাস্ত্রমতে প্রশস্ত। তেমন আবার কয়েকরকম শব নিষিদ্ধ। সেগুলি কি রকম? পুরশ্চর্যার্ণব গ্রন্থে বলা হয়েছে, লাঠির আঘাতে, শূলবিদ্ধ হয়ে, খড়্গাঘাতে, জলে ডুবে, গলায় দড়ি দিয়ে, সাপে কামড়ালে এবং সন্মুখসমরে মৃত শব এই শবসাধনার জন্য প্রশস্ত। কিন্তু স্বেচ্ছামৃত বা আত্মঘাতী, বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক, দ্বিজ, অনাহারে মৃত, কুষ্ঠরোগে মৃত, দুই বছর বয়সের আগে মৃত শিশু ও সাত রাতের আগে মৃত, এই আট প্রকার শব শবসাধনার ক্ষেত্রে বর্জনীয়। যদিও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বলেছেন, উপযুক্ত শবের অভাবে কুশনির্মিত বা যবতন্ডুল নির্মিত শব ব্যবহার করা যায়, তবে চণ্ডাল শব হলো মহাশব।

কৌলাবলীনির্ণয় মতে এই সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলো, মাছ, মাংসযুক্ত অন্ন, ছাগ, পিষ্টক বা পিঠে, পায়সান্ন, সুরা, মাষকলাই মিশানো অন্ন, তিল, কুশ, শ্বেত সরষে, দীপ, ধূপ, এলাচ, লবঙ্গ, খয়ের, আদা, পান, পট্টসূত্র, মৃগচর্ম, কম্বল, যজ্ঞকাঠ, পঞ্চগব্য ও স্বকল্পোক্ত পূজাদ্রব্য। শবসাধনার জন্য সাধককে ভালোমতো আমিষ খাবার খেয়েই সাধনায় বসতে হয় এবং সাধনা শুরুর শুরুতেই তন্ত্রমতে কিছু ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতে হয়। যেমন যাগভূমি প্রোক্ষণ, গুরু, গনেশ, বটুক,–যোগিনী, মাতৃকা এঁদের পূজো। এবার সাধনস্থানে উপস্থিত দেবতা, রাক্ষস, পিশাচ, উপদেবদেবী, যক্ষ, গন্ধর্ব, ডাকিনী, হাকিনী, শাকিনী এঁদের উদ্দেশ্যে পুষ্পদান, শ্মশানাধিপতি ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালের কাছে বলিদান, অঘোরমন্ত্র বা সুদর্শনমন্ত্রতে দেহরক্ষা, ও দেহবন্ধন করে দুর্গাবীজ উচ্চারণ করে দশদিকে শ্বেতসরষে ছিটিয়ে সাধনা শুরু করতে হবে। যদিও কোনো দেহ বন্ধন এই সাধনায় কাজ করে না। এবার শুরু হবে আসল কাজ। সাধক শবকে শাস্ত্রমতে সুগন্ধি জলে স্নান করিয়ে ধূপ জ্বেলে, গোলাপ জল, অগুরু, চন্দন মাখিয়ে পূজো করবেন। এবার তাঁর মুখে এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, খদির বা খয়ের ও

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পান দিয়ে শবকে অধোমুখে বা উপুড় করে তার পিঠে চন্দন মাখিয়ে দিতে হবে। এবার বাহু থেকে কোমর পর্যন্ত চতুর্ভুজ যন্ত্র কল্পনা করে ও তার মধ্যে চতুর্দ্বারে অষ্টদল পদ্ম কল্পনা করে তার উপর কম্বলাবৃত মৃগচর্ম আসন স্থাপন করতে হবে। এবার ডাকিনী ও যোগিনীদের সামিষবলি দিতে হয়। এবার সাধক শবকে স্পর্শ করে প্রণাম করবেন একটি বিশেষ মন্ত্রে। শবকে স্পর্শের আগে সাধক একটি বিশেষ বীজমন্ত্রে বারো আঙুল মাপের যজ্ঞকাঠ চারদিকে স্থাপন করে সমস্ত লোকপাল, দিকপাল, শ্মশানধীপ, গণ, যোগিনীদের পুজো করে শবকে প্রদক্ষিণও করবেন ও আরও একটি মন্ত্র পড়ে শবের উপর পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। এবার তন্ত্রমতে আসনের পুজো করে মূল বীজমন্ত্র জপ করতে করতে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গীতে শবের উপরে বসবেন ও নিজের পায়ের নিচে কুশ স্থাপন করবেন। সাধক এবার শবের ঝুঁটিতে পীঠপূজা করে ষোড়শোপচারে দেবীর পুজো করবেন। এখন কিন্তু শব আর সাধারণ মৃতদেহ নন। তার মধ্যে প্রাণ তথা দেবতার আবেশ ঘটেছে। নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে—'ততঃ শবাস্যে বিধিবৎ দেবতাপ্যয়নং চরেৎ' অর্থাৎ এখন শব পঞ্চভৌতিক সত্বার শুদ্ধরূপ, নিষ্পাপ কামনাবাসনাহীন। এইজন্যই নির্গুন ব্রহ্মস্বরূপিনী মহাবিদ্যাকে শবদেহে আহ্বান ও উদ্বুদ্ধ করা যায়। শবদেহকে আশ্রয় করেই নির্গুণা শক্তি সগুণা হন। দেবী ভাগবতে এই নির্গুণা শক্তিকে সংসার বিরাগী সাধকদের পূজ্য বলা হয়েছে। তিনি জ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্মসনাতনী। শব হল পঞ্চভৌতিক সত্বার শুদ্ধদেহরূপ। নিষ্পাপ কামনাবাসনা বিহীন এবং এই জন্যই নির্গুন ব্রহ্মস্বরূপিনী মহাবিদ্যাকে শবদেহে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এই শবকে আশ্রয় করেই নির্গুনা হন সগুনা। এবার সাধক সাধনার মূল অঙ্গে প্রবেশ করবেন। শবমুখে কারণবারি ঢেলে উঠে দাঁড়াবেন এবং শবের সম্মুখে সিদ্ধিলাভের জন্য একটি প্রার্থনা জানাবেন। বীরতন্ত্র বচনে বলা হয়েছে —

'বশমে ভবদেবেশ সমামুকং পদং ততঃ
সিদ্ধিংদেহি মহাভাগ ভূতাশ্রয়পাদমবঃ।।'

'হে দেবেশ, আমি অমুক ব্যক্তি, আমার বশ হও। সকল প্রানীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হে মহাভাগ, আমায় সিদ্ধি দাও'—মন্ত্র পাঠ করে সাধক বীজমন্ত্র পড়ে পাটের সুতো দিয়ে শবের পা দুটি খুব শক্ত করে বাঁধতে হবে। এবং একটি মন্ত্র পড়ে শবের পায়ের তলায় ত্রিকোনচক্র আঁকতে হবে।

কৌলাবলীনির্নয় গ্রন্থে এই মন্ত্রটি আছে —

"ওঁ ভীম ভীরু ভয়াভাব ভবলোচন ভাবুক।
ত্রাহিমাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।।"

এই পর্বে আমি মন্ত্রগুলি উল্লেখ করলাম কারন একাক্ষরী বীজমন্ত্র ও আগের ক্রিয়ার মন্ত্রশক্তিগুলির সহায়তা ছাড়া এই মন্ত্র কোনো কাজে লাগবে না। যাই হোক, এবার সাধক মনস্থির করে শবের উপর বসে দেবীর ধ্যান করে জপ করবেন। এইবার হবে আসল পরীক্ষা। সিদ্ধিলাভ সহজ ব্যাপার নয়। এই সময় সাধককে নানান কঠিন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পরীক্ষার সামনা করতে হয়। শব নিজে খাদ্য চায়, সাধককে ঠেলে ফেলে দিতে চায় দেহের উপর থেকে। তখন তার মুখে খাদ্য দিতে হয়। এছাড়া চারপাশ থেকে নানা প্রেত-পিশাচ দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে ঘিরে ধরে সাধককে। নানান পৈশাচিক দৃশ্য দেখা যায়। নানা লাস্যময়ী যোগিনীরা সাধনাভঙ্গের চেষ্টা করেন।

এখন নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ সমাপ্ত হলে ও সাধক যখন বোঝেন যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা গেছে, তখন সাধনার সমাপ্তি সূচনা হয়। প্রসঙ্গত বলি এই শবসাধনা কিন্তু সাধক জীবনে একাধিকবার করতে হয়, ইষ্টদেবীর দর্শন ও সিদ্ধিলাভের বা ফললাভের জন্য। কেবল একটি শবসাধনাতে পূর্ন সিদ্ধি হয় না বললেই চলে। সাধনা শেষে সাধক এবার শবের ঝুঁটি ও পায়ের বাঁধন খুলে দেন। পায়ের নিচে আঁকা চক্র মুছে দেন ও পুজোর দ্রব্য জলে ও শবকে গর্তে বা জলে বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফেরেন। পরদিন নিত্যকর্ম শেষ করে সাধক পঞ্চগব্য পান করেন ও ব্রাহ্মন ভোজন করান। কৌলাবলী নির্নয় গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শাস্ত্রসন্মত ভাবে সাধনা করা হলে সাধক সিদ্ধিলাভ নিশ্চয় করবেন। তবে একটি সতর্কবার্তাও আছে। কোনো ব্যক্তির অ-কল্যানের জন্য বা নিজের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সাধনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আদিকাল থেকেই মানুষ মনে করত দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা থাকে। মৃতের আত্মার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সন্মানই ধর্মের মূল। সাধক তার তপঃশক্তির প্রভাবে এই আত্মাকে দেবত্বে ও পরে ব্রহ্মত্বে নিয়ে যেতে পারেন। অথর্ববেদে এই শক্তিকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এটি তপঃশক্তি। ব্রহ্মবিদ্যাবলে ঋষিরা রোগীকে আরোগ্য এমনকি মৃতকে জীবনদানও করতে পারতেন। আর জীবমুক্তির জন্য প্রয়োজন দেহের। রসেশ্বর দর্শনে এই মুক্তিলাভের জন্য স্থির দেহের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হয়েছে। দেহ স্থির না হলে শক্তির স্ফুরন হয় না। আর শিবের কর্তৃত্ব যখন শক্তির উপর নির্ভরশীল তখন শিব মুক্তি দিতে পারেন না, মুক্তি দেন শক্তি। তাই শবসাধনায় শক্তির উপাসনা করা হয়। যদিও গন্ধর্বততন্ত্র বলেছে যে যিনি শক্তি তিনিই শিব, এদের মধ্যে ভেদ নেই। তবে শবসাধনার চরম কথাটি হলো, যে কোনো বস্তুমাত্রেরই নিজস্ব প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই সামর্থ্যটিই হলো শক্তি। এই শক্তিই হলো আদ্যাশক্তির বিভূতি। আর এই শক্তির আধার হলেন শিব, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে প্রকাশরূপে অবস্থান করছেন আর এখানেই শক্তি সুপ্ত ভাবে অবস্থান করেন। প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম বা গুন এবং বস্তুর স্বরুপের প্রকাশরূপ হল শিবের বিভূতি। শিব ও শক্তি স্বরূপত অভিন্ন। এই চিৎশক্তিকে জাগানোই হলো শবসাধনার মূল উদ্দেশ্য।

এবার আমার সঙ্গী ঐ তান্ত্রিক-সাধক মন্দিরের ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন আর এক হাতে তার ঝোলাটিকে নিলেন। মৃতদেহটিকে যে জায়গায় রেখেছিলেন, সেই শ্মশানেই বেড়ে ওঠা অশ্বত্থ গাছের নিচে এসে আমরা দাঁড়ালাম। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি যে সামগ্রী ঝোলায় করে এনেছিলেন সেগুলো মাটিতে এক এক করে রাখতে লাগলেন। আমি বেশ কিছুটা দুরে একটা বড়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পাথরের উপরে খানিকক্ষণ বসলাম তারপর স্নান করে এসে আসন পেতে বসে ইষ্ট মন্ত্র জপ করতে শুরু করলাম। তান্ত্রিক সাধুকে দেখলাম নির্ধারিত স্থানে শবদেহ স্থাপনের পর নির্দিষ্ট দিকে শবের মাথা রেখে তার কাছে বসে 'ক্রীং ক্রীং ফট্' বলে উচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। শ্মশান কেঁপে উঠল। আমার মনে হল কত শত বিদেহী আত্মা যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে সাধককে অভ্যর্থনা করছে।

নির্দিষ্ট দিকে মাথা করে শুইয়ে তান্ত্রিক এবার মৃতদেহকে প্রণাম করার পর গোলাপজল দিয়ে স্নান করালেন। ধূপ, দীপ প্রভৃতি জ্বেলে দিয়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম শুরু করলেন। তিনি মৃতদেহের কোমর ধরে উপুড় করে শোয়ালেন। মাটিতে রাখা পুজা দ্রব্য এবং পূজার স্থানে যেখানে তিনি ইতিমধ্যে একটি বড় পাতায় কিছু পুজাদ্রব্য রেখেছিলেন, সেখানে তিনি আস্ত শস্য, কর্পূর, সুপারী, ইত্যাদির থেকে মৃতদেহের মুখে জায়ফল গুঁজে দিলেন। মৃতদেহের পিঠে লাল চন্দন দিয়ে যন্ত্র এঁকে নিলেন। তারপর কালো কালিতে একটি অদ্ভুত যন্ত্রলিপি লিখে ফেললেন ও মৃতদেহের মাথার কাছে রাখলেন। এই কাজ শেষ করে তার কাছে রাখা চারটি মানুষের খুলি তুলে চার দিকে রেখে শুরু হল তার শ্মশান জাগরণের মন্ত্রোচ্চারণ। আমি দীক্ষাপরবর্তী কালে এই সব ক্রিয়া বহুবার দেখছিলাম এবং এটা আশ্চর্যজনক ছিল না কারণ আমি আমার শিক্ষার সময়ে অনেককেই এই সাধনা করতে দেখেছি।

সাধনার এই অনুষ্ঠান শেষ করে উগ্রতান্ত্রিক সাধক নির্ভয়ে জপ করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ জপ করার পর মৃতদেহের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হল। তিনি জপ বন্ধ করে মৃতদেহের পা ছুঁয়ে সেখানে পড়ে থাকা একটি মরাবাঁধা দড়ি দিয়ে পা দুটো একসাথে বেঁধে একটা যন্ত্র এঁকে দিলেন ও পুনরায় জপ করতে শুরু করলেন। কিছু সময় পরে দুরে শিয়াল ডাকতে লাগল। চারিদিকে গাছে ফিসফিস আওয়াজ হতে লাগলো, পিছন দিক থেকে কয়েকটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছে, কয়েকটা প্রেতাত্মা বিকৃত চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে যেন, কিন্তু সাধকের সেদিকে খেয়াল নেই, তার অভিব্যক্তিতে নিবিড় মনঃসংযোগ এবং নির্বিকার ভঙ্গীতে তিনি নির্দিষ্ট মন্ত্রজপ করে চলছেন।

এমন সময় আমার মনে হল কে যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মহিলা কণ্ঠ আমাকে নাম ধরে ডেকে পিছন ফিরে তাকাতে বলছে। আমি জানি না এটা আমার ভ্রম না কি সত্য যে এর আগেও আমি রাতের ধ্যানের সময় দু-তিনবার এই মহিলা কণ্ঠের মুখোমুখি হয়েছিলাম, কিন্তু গুরুজীর আদেশ অনুসারে আমি পিছনে ফিরে কখনওই তাকাইনি। সম্ভবত এই কারণেই ভূত-প্রেত বা অশরীরী আত্মা সম্পর্কে আমার ভয় কিছুটা কমে গিয়েছিল, আমি কখনও ভয় পাইনি। কি ভয়ানক সেই মুহূর্ত ছিল তা একমাত্র আমিই জানি।

ধীরে ধীরে চিতার আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে এসছে। শুধু সাধকের প্রদীপের আলোটিই টিমটিম করে জ্বলছে। চারিদিকে এক ভয়ঙ্কর নীরবতা ছড়িয়ে পড়েছে। কালো রাত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এবং বিভিন্ন ভৌতিক আওয়াজে পরিবেশ আরও ভীতিকর হয়ে ওঠল। তান্ত্রিক তখনও জপ করে চলেছেন।

এই ভাবে সময় পার হতে থাকার পরে আমি আমার মোবাইলের ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত তখন তিনটে। শরীরের উত্তাপে আমার ভেজা কাপড় কিছুটা শুকিয়ে গিয়েছিল। চোখ ভারী হয়ে আসছে, ঘুম পাচ্ছে। ঘুমালে একটু শান্তি পেতাম, দেহও ভারী হতে লাগল। এমন সময় সাধক নেমে পড়লেন শব থেকে। শব ধীরে ধীরে নড়ছে, উগ্রতান্ত্রিক শবের মুখে কারণবারি ঢেলে উঠে দাঁড়ালেন এবং শবের সামনে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা জানালেন। শব নিজে খাদ্য চাইলো। তান্ত্রিক তার মুখে পাতায় রাখা ভাজা চাল ও ছোলাভাজা গুঁজে দিলেন। আবারও তান্ত্রিক হাতজোড় করে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা করলেন। শব বেশ খানিকটা নড়ে উঠে আবারও স্তব্ধ হয়ে উপুড় হয়ে পড়লো। তান্ত্রিক এখন হাসছেন। অন্ধকারে তার বড়োবড়ো সাদা দাঁত প্রদীপের নরম আলোতেও ঝকমক করছে। তার মানে কি তান্ত্রিক সিদ্ধিলাভ করলেন? এমন সময় 'জয় কালী' চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তান্ত্রিক চিৎকার করে উঠলেন। এক নিমেষেই চারিদিকের ভয়ার্ত পরিবেশ স্থির হয়ে গেলো।

আমি এবার এগিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম—সব ঠিকঠাক হল তো?

সাধক বললেন—জয় মা, সব ঠিক আছে। এতদিন পরে আমি আজ আজ্ঞা পেলাম। এর আগে চারবার শবসাধনা করেও মায়ের আজ্ঞা পাইনি, আজ পেলাম। একমাত্র তুমি ছিলে তাই এমন হল। আমি আজ খুব আনন্দিত। আর একটাই ক্রিয়া বাকি, আশাকরি তা ও সফল হবে।

রাত শেষ হয়ে আসছে, পুবের আকাশে হালকা আলোর আভাষ। একটু পরেই অরুণোদয় হবে। সাধক সেদিকে লক্ষ্য করে চলে গেলেন শবদেহের কাছে। পুজার সামগ্রীগুলো কুড়িয়ে নিলেন আর এক হাতে শবদেহের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন শ্মশানের একপাশে বয়ে চলা খাদের পাশে খরস্রোতা এক নালার দিকে। আস্তে করে শবদেহকে সেই খরস্রোতা নালায় টুপ করে ফেলে দিলেন। রাতের বেলার কোনওরকম সাধনার চিহ্ন রইলো না বটে তবে আমার মনের স্মৃতিকোঠায় রয়ে গেল এই সাধনার ঘটনাক্রম।

সাধকের সিদ্ধিলাভের মুহূর্তের সঙ্গী হওয়ায় আমারও ভালো লাগছিল বটে কিন্তু তখনই আরও একবার বাম কানের কাছে পিছন দিক থেকে আমার নাম ধরে সেই মহিলা কণ্ঠ ফিসফিস করে আমাকে ডাকল। আমি ভিতরে ভিতরে বেশ অবাক হলেও ভয় পেলাম না, গুরুদেবের কথামতো ঐ কণ্ঠস্বরকে অবজ্ঞা করলাম। আমি একটু আনমনা হয়ে পড়লে তান্ত্রিক সাধক আমাকে বললেন—তুমি কি কিছু ভাবছ?

আমি তাকে মিথ্যা বললাম—কই, কিছু না তো!

তান্ত্রিক সাধক বললেন—চলো, রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, আমরা একটু বিশ্রাম নিই।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আমি বললাম—চলুন যাই।

আমরা শুয়ে পড়লাম।

সকালে আমার ঘুম ভাঙলো একটু দেরী করে। চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে। কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে চরাচর। তান্ত্রিক তখনও নাক ডেকে ঘুমিয়ে চলেছেন। অভ্যাসমতো আমি একটু জল পান করে চললাম প্রাকৃতিক কাজে। ফিরে এলাম স্নান করে। ভিজে কাপড় পরিবর্তন করে আসন নিয়ে কালীমন্দিরে বসে পড়লাম নিত্যকর্মে। নিত্যকর্ম শেষ করে যেই উঠছি আবারও শুনতে পেলাম সেই মহিলার কণ্ঠস্বর, হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি। অনবরত সেই আওয়াজ আসছিল, মনোযোগ দিতেই বুঝলাম এটা সেই মহিলার গলা। এখন মন্দিরের ভিতর থেকেই সেই আওয়াজ হচ্ছে। যদিও আমি খুব নির্ভীক, তবুও সেই ভীতিকর একাকী পরিবেশের মর্মান্তিক পরিস্থিতি সেরা সাহসী মানুষকেও ভয় দেখাতে পারে। না এটা আমার হ্যালুসিনেশন ছিল না, আমার কান বাজছিল না, আমি কোন ভয়ানক স্বপ্নও দেখছিলাম না কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম সেই মহিলার সুরেলা কণ্ঠ, যা আগেও বহুবার শুনেছি, আর এখন শুনছি কাছের কোথাও থেকে ভেসে আসছে। সে যাই হোক, খুব মিষ্টি কণ্ঠে আমাকে সে ডাকছিল। এটা আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক ছিল কারণ ওই মন্দিরে কেউ আমাকে ডাকছে এটা মেনে নিতে তখন আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ সামনে তাকাতেই দেখি ঐ মন্দিরের ভিতরেই এক ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট নারীমুর্তির অবয়ব, মুখে মৃদু হাসি নিয়ে কোমল চাউনিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কি সুন্দর সেই নারী! আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কে?

নারীমুর্তি কথা বলল—ভয় পেয়ো না পৃথ্বীশ, যা বলি মনোযোগ দিয়ে শোনো, তুমি এই শ্মশানে একটুও সুরক্ষিত নও। এখনই বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

আমি আবারও জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কে বলুন, আর আমার বিপদই বা কি?

অস্পষ্ট নারীমুর্তির অবয়ব বলে উঠল—আমি সিমোহি। আমি এখন মাইবঙ মঠে আছি। এখানে তুমি আসতে পারবে না। তবে তুমি চলে এসো থুরুক গ্রামে। ভৈরবী মিনতি মা সেখানে তোমার অপেক্ষা করছেন। তুমি চলে এসো।

বারবার এমন কথা শুনে আমি বিরক্ত যেমন হলাম তেমনই ভয়ও পেলাম, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কিসের বিপদ?

সে নীচু স্বরে ফিসফিস করে বলল—সামনে বিপদ, এখনই বের হয়ে পড়ো।

আমি বললাম—সে তো বুঝলাম আমি যাবো, কিন্তু আমার বিপদটা কি?

নারীমুর্তির অবয়ব বলে উঠল—আমি তোমাকে সাবধান করছি, এখনই চলে যাও। এই তান্ত্রিক তোমাকে আগামী অমাবস্যায় বলি দেবে। এখনই এই জায়গা ছেড়ে চলে এসো। ও গতকাল রাতে শবসাধনায় সিদ্ধ হয়েছে আর ওর একটা সাধনা বাকি আছে, আর সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভে দরকার নরবলি। তাই সে তোমাকে কামাখ্যা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মন্দির থেকে এতদুর মিথ্যা কথা বলে নিয়ে এসেছে।

এসব শুনে আমার যেমন অবাক লাগলো তেমনই বিশ্বাসও হল, কেন না, এই নারীমুর্তি যা বলছে তা তো সবই ঠিক। ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপতে লাগলো।

তখন বাতাস ছিল না, মন্দিরের ভাঙা দরজার পাল্লা দুটো একবার একে অপরের সাথে ধাক্কা খেয়ে বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেলো। দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই হঠাৎ আমার মনে হল কেউ যেন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং আমার চেয়ে সে বেশ লম্বা। এর সাথে চারিদিকে প্রবল সুগন্ধ ছড়াতে থাকলো, বিভিন্ন ফুলের মিশানো গন্ধ। আমি দ্রুততার সাথে দরজার দিকে ছুটে গেলাম। আমি ভাবলাম, এটা হয়তো আমার একটা ভুল, তাই ছুটে গেলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার সামনে আবারও একটা ঝাপসা মহিলার অবয়ব অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম। ঠিক এক ভাবেই সে কোমল স্বরে বললো—তুমি ঠিক সময়মতো চলে এসো কিন্তু, ভৈরবী মিনতি মা তোমাকে জরুরীভাবে ডেকেছেন।

কিন্তু তুমি কি ভাবে জানলে আমি এখানেই আছি?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বলল—আমাকে তিনিই পাঠিয়েছেন, আমি তার শিষ্যা, আমি সিমোহি। আমি প্রয়োজনমতো তোমার খুব কাছাকাছিই থাকি।

আমি বললাম—আমি তো ভৈরবীর আশ্রম চিনি না, এই তান্ত্রিক না কি চেনে, তাই সাথে করে আমাকে সে ভৈরবীর কাছে নিয়ে যাবে বলেছিলো।

সে বলল—তুমি এখন এতকিছু বুঝবে না। বর্তমানে আমি মাইবঙ মঠে আছি। সেখান থেকে থুরুক মঠে যাবো। আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়ো। তুমি বের না হওয়া অবধি তান্ত্রিকের ঘুম ভাঙবে না। এখান থেকে পশ্চিম দিকে হেঁটে চলা শুরু করো, দিন তিনেক লাগবে, তুমি থুরুক গ্রামের দিকে নিশানা করে চলো। আমি তোমাকে সময় মত বার্তা পাঠাবো। আমি ও মিনতি মা তোমার অপেক্ষায় থাকবো।

সাধনার এ ও এক বিভুতি—অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বা অদৃশ্য হয়ে থাকা। আমি তাকে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সেই আবছা ও অস্পষ্ট নারীমুর্তি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি এবার মন্দির সংলগ্ন ভাঙাচোরা ঘরটিতে ফিরে এলাম। এখনও বহাল তবিয়তে তান্ত্রিক ঘুমাচ্ছে। দ্রুত আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে পশ্চিমদিক বরাবর হাঁটা শুরু করলাম। গ্রামটি শেষ হতে চার-পাঁচ মিনিট সময় লাগলো, মাত্র তিরিশ-চল্লিশটা ঘর নিয়ে গ্রামটি। জঙ্গলের মধ্যেকার জনজাতিদের গ্রাম এমনই হয়। এখান থেকে পাকা রাস্তা বেশ কয়েক কিলোমিটার দুরে। সিমোহির কথামতো দ্রুত হাঁটছি আর মনে করছি সেই তান্ত্রিকের কথা। কিন্তু ঐ তান্ত্রিক কি সত্যিই আমার এত বড় ক্ষতি করত? কি জানি, হতেও পারে। আর না হতে পারেই বা বলি কি করে! আমি তো কলকাতা থেকে দশ দিনের মত সময় নিয়ে বেরিয়েছিলাম এই ভৈরবীর আশ্রমে যাব বলে। পথে কামাখ্যা দর্শন করতে যেতেই এই তান্ত্রিকের দেখা পেলাম। ভেবেছিলাম এর থেকেও কিছু বিদ্যা শিখে নেব। কথাবার্তায় একবারও মনে হয়নি যে সে মনেমনে এমন কিছু

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভেবে রেখেছে! আবার সিমোহির কথাও অ-বিশ্বাসের মতো নয়। সে কি করে জানবে যে আমি মিনতি ভৈরবীর সাথে দেখা করতে চলেছি!

যাই হোক্, পথ চলা শুরু হল। পাহাড়ী উঁচুনীচু পথ। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছি। গতকাল অনেক পথ হাঁটার পর প্রায় সারারাত জাগা, আজও হাঁটছি। পেট তো এখনও খালি। যতদুর চোখ যায় কোনও গ্রামের চিহ্নও নেই। বুনো জন্তু এদিকে তেমন না থাকলেও এই জঙ্গলের পথে একা একা চলা ঠিক নয়। একটু দুরে একটা ছোট ঝর্ণা চোখে পড়লো। অসংখ্য নাম জানা-না-জানা ফুলের সমারোহের মাঝখান দিয়ে ছোট্ট পায়ে হাঁটা পথ। নিকটবর্তী গ্রাম্য মানুষজনের পায়ে পায়ে ক্ষীণ একটা পথ। ছোট ছোট নুড়িপাথরের পথ। একটু এদিকওদিক হলেই পা পিছলে পড়ে যেতে হবে। হেঁটে ঝর্ণার কাছে এসে পেট ভরে জল পান করলাম। পাহাড়ী ঠাণ্ডা জলে মনপ্রাণ জুড়িয়ে শীতল হয়ে উঠল। আবারও পথচলা শুরু করলাম। কতক্ষণ হেঁটেছি তা জানি না। হঠাৎ পথের এক বাঁকে মোড় ঘুরতেই দেখি একটা গাছে কয়েকটা পেয়ারা ঝুলে রয়েছে। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল তাই গাছে চড়ে পেয়ারাগুলো পেড়ে নিয়ে আবার একটু দুর হাঁটতেই জংলী কলাগাছে এক কাঁদি পাকা কলা দেখতে পেলাম। আমি বেশ কয়েকটি পাকা কলা পেড়ে আমার ঝোলাতে রেখে হাঁটা শুরু করলাম। আমার লক্ষ্য পাকা রাস্তায় ওঠা। জানি না কতদুরে পাকা রাস্তা আছে! পাকা রাস্তা পেলেই আমি যে কোনও ভাবে হাফলং চলে যেতে পারব। এসব চিন্তা করে হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা ছোট্ট গ্রামে বা বনবস্তিতে পৌঁছে গেলাম।

তখন প্রায় বিকেল, পুরুষ-মহিলারা একেএকে ফিরছে তাদের ঘরের পথে। এমনি একজন পুরুষ ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—এখানে আমি কি ভাবে এলাম।

ক্ষিধেয় তখন আমার পেট জ্বলছে। তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আমি তার কাছে কিছু খেতে চাইলাম। সে ঘর থেকে দুটো শুকনো রুটি একটা গাছের পাতায় করে এনে দিলো। আমি সেই রুটি দুটো পাকা কলা দিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে ঢকঢক করে সাথে রাখা জল পান করে সটান তাদের উঠোনেই ঝোলাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে আমার শরীর ভেঙে পড়েছে। এই দেখে সেই লোকটি আমাকে হাত জোড় করে তাদের বারান্দায় উঠে শুতে বলল। আমি উঠে বসতেই সে ঘর থেকে একটা ঘাসে বোনা মাদুর জাতীয় কিছু এনে পেতে শুয়ে পড়তে বলল। আমি শুয়েই চোখ বুজলাম আর সাথে সাথে ঘুমিয়েও পড়লাম।

রাত্রিতে ঘুম ভাঙলো সেই লোকটির ডাকে। রাতের খাবার খাওয়ার জন্য সে ডাকছে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে, একটু বিশ্রাম করে খেতে বসলাম। গরম ভাতের সাথে নাম-না-জানা শাক-পাতা আর আলুর একটা তরকারি দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করলাম। শরীর তখনও ক্লান্ত ছিল। তবুও রাতের জপ করতে হবে বলে আমি এ বারান্দাতেই জপ করতে বসে পড়লাম। জপ শেষ করে বাড়ীর উঠোনে একটু হাঁটাহাঁটি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করে আবারও শুয়ে পড়লাম।

খুব ভোরবেলায় উঠে নিত্যকর্ম করে পরিবারটিকে বিদায় জানিয়ে আবারও পথচলা শুরু করলাম। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছি। এবার ঐ আশ্রয়দাতা লোকটির থেকে থুরুক যাওয়ার দিকনির্দেশনা নিয়ে চলেছি। আশাকরি খুব তাড়াতাড়ি পোঁছে যাবো। পথে যেতে যেতে দুটো গ্রাম পার হওয়ার পরে দুরে পাকা রাস্তা দেখতে পেলাম। কিন্তু আমি থুরুক মঠে যাওয়ার জন্য আর পাকা রাস্তার পথে যাবো না। লোকটির কথামতো জঙ্গলের পথ ধরবো। ঐ পথ জনবিরল নয়। বনবস্তি কম থাকলেও বেশ কিছু চা বাগান আছে। আর চা বাগান শেষ হওয়ার পরে কিছু পথ গেলেই থুরুক গ্রাম।

আমি লোকটির কথামতো পাকা রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। কয়েকশো মিটার যাওয়ার পরেই এক সৌম্যদর্শন সাধুর দেখা পেলাম। প্রায় ছয় ফুট উচ্চতা, সুঠাম চেহারা, লম্বা বলিষ্ঠ হাত, মাথায় লম্বা জটা, মুখে এক গাল দাড়ি, বড়ো বড়ো একজোড়া চোখ, কাঁধে ঝোলা ও হাতে কমণ্ডলু নিয়ে চলেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে উনি স্মিত হাসলেন। আমি সাধুমশাইয়ের দিকে দেখে একদম মোহিত হয়ে পড়লাম, মনে হল উনি যেন চোখের ঈশারায় আমাকে ডাকছেন। উনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন আর আমি এগিয়ে গিয়ে উনার দুই চরণে দুই হাত স্পর্শ করে মাথায় ঠেকোলাম। উনি বরদ ভঙ্গীতে আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন—শুভমস্তু। আপনি থুরুকের পথে চলেছেন তো?

আমি বললাম—হ্যাঁ, থুরুক যাব।

তিনি বললেন—আপনি যার সাথে দেখা করতে চলেছেন আমিও সেই জায়গায় যাচ্ছি, আপনি যদি আমার সাথে আসতে চান তবে আপনি অবশ্যই আসতে পারেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমি থুরুক যাচ্ছি ও এখানে কারো সাথে দেখা করতে এসেছি উনি কিভাবে জানলেন! আমি খুব নীচু স্বরে তাকে প্রশ্ন করলাম—আপনি কার সাথে দেখা করার কথা বলছেন মহারাজ?

তিনি সারা মুখে স্মিত হাসি ছড়িয়ে বললেন—তুমি সাধিকা ভৈরবী মিনতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, আমি তার শিষ্য। রাস্তায় তোমার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

এই পৃথিবীতে কেউ আমাকে নিয়ে ভাবছে এটা আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর। আমি এখানে আসার কথা কামাখ্যার ঐ উগ্র তান্ত্রিক ছাড়া আর কাউকে বলিনি, তাহলে এত দূরে বসে থাকা মিনতি আমার কথা জানলেন কি করে এবং এই সন্ন্যাসীও আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু কিভাবে চিনলেন? নিশ্চয়ই এ এক কঠিন ও অসাধারণ সাধনার ফসল। আমাকে জানতেই হবে এই সাধনার বিষয়ে।

তবুও আমার মন আমাকে বলেছিল সাবধানে সিদ্ধান্ত নাও, বুঝেশুনে কাজ করো, কিন্তু ওপাশ থেকে সাধুমশাই একদৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, আমাকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখছিলেন তিনি। এই বিভ্রান্তিতে কিছু সময় কেটে যায়। কয়েক মুহূর্তের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জন্য আমি শ্রী গুরুদেবকে স্মরণ করলাম। অনুভব করার চেষ্টা করলাম তাঁর আদেশ পাওয়ার জন্য, এবং পেলামও। আমার মনে হল শ্রী গুরুদেব আমাকে বলছেন—'প্রথম থেকেই তোমার বিপদ নিয়ে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। তুমি সাহসী ও বুদ্ধিমান। আমি তোমাকে শিখিয়েছি সমুদ্রের তীরে বসে কিভাবে পানীয় জল তুমি পেতে পারো, তাই চেষ্টা থাকলে কয়েক ফোঁটা হলেও তুমি পাবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে লড়াই তুমি আগেও করে জিতেছো। তাই এই মুহুর্তে, পরিস্থিতি বুঝে, সাহস থাকলে সমুদ্রের মাঝখানে ঝাঁপ দিতে পারো। আর ঝাঁপ দিয়ে এক ডুবে সমুদ্রের তলদেশে চলে যাও, তাহলে নিশ্চিত তুমি নিশ্চয়ই মুক্তো খুঁজে পেতে সক্ষম হবে।'

ব্যস, আমি সেই সন্ন্যাসীর সাথে যাবো বলে ঠিক করলাম এবং সন্ন্যাসীর সাথে হাঁটতে সম্মত হলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ভৈরবীর আশ্রমে একটা রাত কাটিয়ে সকালে ফিরে আসার চেষ্টা করব।

আমি তাকে অনুসরণ করছিলাম। চা বাগানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। কত পুরুষ মহিলা সেখানে চা-পাতা তুলছে ও অন্যান্য কাজ করছে। একটা দুটো ছোট ছোট দোকান। আমরা চুপচাপ হেঁটে চলেছি—সামনে সাধুমশাই আর পিছনে আমি। কি সুন্দর যে সেই পরিবেশ তা বাক্যে প্রকাশ করতে পারব না। অনেক পথ হাঁটার পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আশ্রমটি এখনও কতদুর?

তিনি বললেন—আমি হাঁটছি এবং আপনি আমাকে অনুসরণ করুন। আমাদের আশ্রমে পৌঁছাতে এখনও প্রায় কুড়ি কিলোমিটার রাস্তা বাকি। আপনি শহরের মানুষ, তাই ধীরে হাঁটছি, তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারলে বলুন, একটু আগেভাগে পৌঁছাতে পারব। আমাদের সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাতে হবে। রাত্রি বেলা চক্রানুষ্ঠান আছে।

আমি প্রশ্ন করলাম—চক্রানুষ্ঠানটা কেমন হয়?

সাধুমশাই হাসতে হাসতে বললেন—আপনি জানেন না বুঝি! তবে আমাদের অনুষ্ঠানের কিছু বিশেষত্ব আছে। সময় মতো জেনে যাবেন, মিনতি মায়ের কথামতো সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাতে হবে, এখন দ্রুত পায়ে আমাকে অনুসরণ করুন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম— 'আমাদের অনুষ্ঠান' মানে, আপনারা কোন সম্প্রদায়ের সাধক?

সাধুমশাই এবার দাঁড়ালেন, বললেন—আসুন, দু'দণ্ড বসি।

তিনি সামনে একটা পাথরের উপর বসতেই আমিও তার উল্টোদিকে মাটিতে বসে পড়লাম। সাধুমশাই বললেন—আমরা অঘোরী, চোলী অঘোরী মানে অঘোরীদের মধ্যে চোলী সম্প্রদায়ের।

'অঘোরী' শব্দটা মনে পড়লেই শরীরে শিহরণ জাগে। অঘোরীদের সম্পর্কে অজানা অনেক কিছু আছে, আবার যতটুকু জানি তা ও ভয়প্রদ ও রোমাঞ্চকর। সাধুমশাই কিছুটা জল পান করে বেশ গম্ভীরতার সাথে বলে চললেন—ভগবান শিবের পাঁচমুখ—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত। হিন্দু শাস্ত্রের বিশ্বাস সমস্ত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মন্ত্র ও উপমন্ত্র এই পাঁচমুখ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। এই পাঁচমুখের মধ্যে অঘোর মুখের উপাসনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারন, অঘোরমুখের উপাসনা করলে সাধক সর্বমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে থাকেন। অঘোরমন্ত্রের পরে দিব্যাস্ত্র মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়। কোনো দিব্যাস্ত্র সিদ্ধ করতে হলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করে বিধানবিধি মেনে অঘোর মন্ত্র সাধনা করতে হয়, তবেই শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। অঘোর সাধনা প্রত্যেক সাধকের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, অঘোর শিব সাধনার সঙ্গে মহাবিদ্যার সাধনা করলে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করা যায়। প্রত্যেক সাধকের জীবনে পূর্ণতা অর্জনের জন্যে এই সাধনা করা প্রয়োজন, অঘোরত্ব লাভ হলেই সাধকের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। শ্রাবণ মাস, চৈত্রমাস ও শিবরাত্রিতে এই সাধনা বিশেষ ফলদায়ী হয়। এই সাধনা চলাকালীন সাধককে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিনটি জিনিসকে ত্যাগ করতে হবে। এই সাধনায় কুলকুন্ডলীনি শক্তি উর্ধমুখী হয়।

জয় শম্ভো শিব অঘোরেশ্বর স্বয়ম্ভু জয় শঙ্কর।
জয় ঈশ্বর জয় ঈশান ভয়ে ভয়ে সর্বজ্ঞ কামদম্।।

গভীর রাত্রে ঈশান দিকে মুখ করে আসনে বসতে হয়, এই সাধনার জন্যে কালো বা সাদা বস্ত্র পরিধান করে, ভস্ম, চন্দন, বেলপাতা, দই, দুধ, আতপ চাল, গন্ধ, বস্ত্র, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য, ঘি, মধু, চিনি অতি প্রয়োজনীয়। অঘোর বিদ্যার অতি উগ্র ও বীর গুরুর মুখ থেকে এই মন্ত্র গ্রহণ করে সাধন করতে হয়, নচেৎ কোটি জপেও কোনো ফল হবে না। ঈশানমুখ শিবের ক্রিয়ামুখ, আত্মার সঙ্গে চিত্তের যে সংযোগ তা জ্ঞান, যোগ, সর্ববিদ্যা সিদ্ধির জন্যে শিবের ঈশান মুখের সাধনাও এর সাথে করতে হবে। পূর্বদিকে শিবের তৎপুরুষ মুখকে তপস্যা মুখ বলা হয়। সাধন জগতে নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্যে শিবের তৎপুরুষ মুখের সাধনা করতে হয়। উত্তরদিকে শিবের সদ্যোজাত মুখকে জ্ঞান মুখ বলা হয়। এই মুখ শিবের অতি শক্তিশালী মুখ। এই মুখের সাধনা করলে সর্বসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। আর শিবের বামমুখের নাম বামদেব, এই মুখের সাধনায় তেজস্বীতা লাভ করা যায়।

আমি বললাম—অনেক কিছু জানলাম।

সাধুমশাই বললেন—শুধু জানলেই হবে না, সাধন করতে হবে। অঘোর সাধনায় পঞ্চমুখের সাথে নীলকণ্ঠ সদাশিবের সাধনা সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের সাথে পালন করে করতে হয়। সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফলাদি আহার করে সূর্যাস্তের পরে ঘি মিশানো হবিষ্যান্ন ও দুধ, এছাড়া সিদ্ধি, ভাঙ ও গাঁজাও সাধক পুজোয় ব্যবহার করতে পারে। এই সাধনা চলাকালীন নিজেকে শৈব ভাবে বিভোর রেখে সাধনা করে সমস্ত ঘোর কাটিয়ে নিজেকে শিব জ্ঞানে অঘোর হতে হবে। এই সাধনার ফলে কুন্ডলীনি শক্তি দ্রুত জাগ্রত হয়ে আজ্ঞা চক্রের উপরে সহস্রারে স্থির হয়। নিজেকে ঐ স্থানে স্থিত করতে পারলে সাধক প্রকৃত অঘোরী হবেন। এই সম্পুর্ন সাধনা প্রকৃত সদগুরুর অনুমতি ছাড়া করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আমি বললাম—অসাধারণ বললেন আপনি। তবে বছর পাঁচেক আগে এ বিষয়ে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা আমি বেনারসে শিবনাথ অঘোরী বাবার থেকে পেয়েছি। তখন আমি বেশিদিন তার সঙ্গে থাকতে পারিনি। পরে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কাজে গিয়ে বেনারসে গিয়ে তাঁর খোঁজ করেছি, পাইনি। খুব ভালো মানুষ ছিলেন তিনি, ভীষণ স্নেহ করতেন আমাকে। বেনারসের সমস্ত লোভনীয় খাবার তিনি আমাকে খাইয়েছেন। কি জানি, এখন কোথায় থাকেন, কে জানে!

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সাধুমশাই হেসে উঠলেন। বললেন—ভগবতীর কৃপা হলে নিশ্চয়ই কখনও সাক্ষাৎ হবে।

আমি বললাম—তবে আমি শুনেছিলাম যে অঘোরী সাধক মরা মানুষের মাংস খায়, মৃতদেহের সাথে যৌনক্রীড়া করে? তারা খুব ছোট কামরায় লোকচক্ষুর অন্তরালে দিনযাপন করে আর রাত হলেই না কি শ্মশান-মশানে গিয়ে ক্রিয়াকর্ম শুরু করে? তারা না কি এতটাই নোংরা যে তাদের শরীরে দুর্গন্ধ হয়?

সাধুমশাই স্মিতহাস্যে বললেন—আমাকে দেখে কি আপনার তেমন কিছু ধারণা হল? আর আশ্রমে গেলে আপনার ধারণা আশাকরি আমূল বদলে যাবে। চলুন, আমরা আবার হাঁটা শুরু করি।

আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু অঘোরীদের জীবন সম্পর্কে আমার খুব ভালো প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। আমি তার কথায় তখনকার মতো নিশ্চুপ রইলাম। মনে পড়ে যাচ্ছে তারাপীঠের হরিরাম অঘোরী, পশ্চিম দিনাজপুরের কক্কড় অঘোরী বা কামাখ্যাধামের ভুতনাথ অঘোরীর কথা। আমার সাধক জীবনের বিভিন্ন সময় এদের সঙ্গলাভ করেছি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছি এঁদের থেকে। তবে বেনারসের শিবনাথ অঘোরী বাবা এঁদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উনি বাঙালী শরীরের ছিলেন। চৌষট্টী যোগিনী ঘাটে গঙ্গার ধারে বসে উনি আমায় শত্রুকে বশীকরণের এক প্রয়োগ শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই ক্রিয়াটি, যিনি ভুক্তভোগী, একমাত্র তিনি নিজে করবেন। অন্য কেউ করলে চলবে না। অমাবস্যা তিথিতে চারটি কাকের পালক জোগাড় করে নিতে হবে। একটু সরষের তেল একটা ছোট শিশিতে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসতে হবে।

৪ ইঞ্চি মাপের ৫ টি সাদা কাগজের টুকরো জোগাড় করে নিতে হবে। যে কোনও মঙ্গলবার দুপুর বেলায় একটার পরে নির্জন স্থানে বসে একটি লোহার পাত্রে ওই কাকের পালকগুলি ভালো করে পুড়িয়ে নিতে হবে। পুড়ে যাওয়ার পরে যে ছাই তৈরি হবে, সেগুলিকে ঐ তেলের শিশিতে জড়ো করে রাখতে হবে।

এই ছাই দিয়েই পর পর কয়েকদিন একই ক্রিয়া করা চলবে। কোনও এক মঙ্গলবারে প্রথমে আগের জড়ো করা সাদা কাগজের মধ্যে থেকে একটি সাদা কাগজ নিয়ে, কাগজের মাঝখানে শত্রুর পুরো নামটি পদবীসহ লিখতে হবে। তেলের সাথে ওই ছাই মিলিয়ে নিয়ে এমনভাবে গুলতে হবে, যাতে করে তা দিয়ে কালির মতো

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ব্যবহার করা যায়। কালি তৈরি করে শত্রুর নামটি লোহার শলাকা দিয়ে গোটা গোটা ও পরিষ্কার করে লিখে, আগুনে কাগজটিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই ভাবে পরপর পাঁচদিন ঐ কাজটা করতে হবে।

একবার করে নাম লিখে, একটি করে কাগজ পোড়াতে হবে। এইভাবে পরপর পাঁচদিন একটি করে কাগজ শনিবার পর্যন্ত পোড়াতে হবে। এই ক্রিয়াটি করলে শত্রু আর শত্রুতা করবে না। মাথা তুলে সামনে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারবে না।

এই ক্রিয়াটি খুব প্রয়োজন হলে তবেই করবেন। মনে রাখবেন, এগুলি পাপ কর্ম বা অভিচার কর্ম। শুধুমাত্র কৌতূহল মেটানো বা অবৈধ কর্মে এই ক্রিয়াগুলিকে কখনও ব্যবহার করলে, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে, সেইদিকে সতর্ক থাকতে হবে। এই ভাবে হাতে ধরে বিভিন্ন প্রয়োগের কাজ যেমন শিখিয়েছেন তেমনই আধ্যাত্মিক বিভিন্ন বিষয়, বেনারসের মন্দির পরিক্রমা, ভারতীয় দর্শনের বিশ্লেষনও করেছেন। যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি করা ও সকলের সাথে আমাকে মেলামেশা করতে বারণ করেছিলেন।

হঠাৎ সাধুমশাই দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে আমাকে বললেন—দেখুন বাবা, সাধনায় একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার উপসম্প্রদায়ও আছে। প্রত্যেকের জীবনাচরণ পৃথক। তাই বলে সকলকে এক করে দেখা উচিত নয়। আসলে আমাদের সাধারণ জ্ঞানে যা আসে না আমরা মনে মনে নিজেরাই তা নিয়ে কিছু কল্পকাহিনী তৈরী করে নিই। এমনটা ঠিক নয়। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো, আসুন, একটু জোরে পা চালাই, আর আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

অবশেষে পৌঁছে গেলাম সাধিকা মিনতির আশ্রমে। আশ্রম না বলে এই স্থানকে 'সাধন কুঠি' বলাই ভালো। ভৈরবী মিনতি মা একটা বড় বাঘের চামড়ায় বসে ছিলেন। সামনের বিরাট ধুনি, সেখানে ধোঁয়ার স্তূপে কিছু একটা জ্বলছিল, যার দুর্গন্ধে নাক ভরে যাচ্ছিল। আমি নারকেলের পোড়া গন্ধ পাচ্ছিলাম এবং আগুনের লাল-হলুদ শিখার উত্থান ও পতন দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐ পরিবেশে ভৈরবীর সারাদেহে অনাবৃত থাকলেও কোমরে একটা খণ্ড মাত্র বস্ত্র ছিল। ধুনির চারিদিকে অনেক অঘোরী সাধক-সাধিকা বসে ছিলেন। সকলেই প্রায় অনাবৃত। প্রায় সকলের হাতে পানপাত্র, সামনে মাংস ও মাছ খাদ্য হিসাবে ছিল। চারিদিকের পরিবেশ আমার কাছে প্রায় ভীতিকর এবং ভয়ঙ্কর ছিল। আমি গিয়ে মিনতির সামনে দাঁড়ালাম, রীতি অনুযায়ী তাঁকে প্রণাম জানাতেই তিনি বললেন—আদেশ আদেশ, তুমি এখন অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছো, একটু বিশ্রাম নাও, রাতে কথা হবে। আমি হাতমুখ ধুয়ে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলাম সাধুমশাইয়ের কুঠিতে।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মিনতির সামনে দাঁড়াতেই সে আমাকে প্রতি নমস্কার জানিয়েই আদেশ করল—বসো।

সোজা তার মুখের দিকে আমি তাকালাম। তার সুন্দর ও আকর্ষক চোখ দুটো লাল হয়ে ছিল। মুখে স্মিত হাসি। সুন্দর দর্শন না হলেও সে খুব আকর্ষক ব্যক্তিত্বসম্পন্না

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মহিলা। আমি হাত জোড় করে তার সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। সে বলল—দীর্ঘদিন ধরে আমি তোমাকে বার্তা দিয়ে আসছি, তোমাকে ডাকছি, অথচ তুমি আসছিলে না। আমি তোমাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এখানে ডেকেছি, আমি অঘোর বিদ্যায় তোমাকে দীক্ষা দিতে চাই কারণ এটি আমার গুরুর আদেশ।

কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই সাহস সঞ্চয় করে তার কাছে আমার মতামত স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করলাম—কিন্তু আমি অঘোর বিদ্যায় দীক্ষিত হতে চাই না।

এতক্ষণে লক্ষ করলাম এটা কোনও মঠ বা আশ্রম নয়, এটা শ্মশান আর মিনতি এখানে নিজের মত করে সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে শ্মশানের মাঝখানে আশ্রমের মত করে নিয়েছে। সে মহাশঙ্খ মালায় জপ করছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর সে বলল—হ্যাঁ, কি বলছিলে?

সাহস সঞ্চয় করে আমার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলাম—আমি অঘোর বিদ্যায় দীক্ষিত হতে চাই না।

কিন্তু কেন?—মিনতি ঘাড় একটু বেঁকিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল। অঘোরবিদ্যার ক্ষমতা কম মনে হচ্ছে?

আমি বললাম—তা নয়, কিন্তু মনে হয় আমি আমার গুরুদেব ও আমার সাধনায় সন্তুষ্ট।

মিনতি ভৈরবী বলল—এই সাধনা নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করতে তোমার কত সময় লেগেছে?

আমি বললাম—প্রায় ছয় বছর।

মিনতি ভৈরবী জিজ্ঞাসা করল—তুমি এটা থেকে কি পেয়েছো?

আমি বললাম—বিশেষ কিছু না, তবে শুধু স্বাভাবিক শক্তি পেয়েছি। আর যে শক্তি পেয়েছি তা থেকে আমি তোমাকে কালী বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলব। এখান থেকে বিদায় নিয়ে নাও, চলো, আমরা এক সাথে সাধনা করব।

মিনতি ভৈরবী বলল—তা হলে তুমি কালী সাধনার বিষয়ে কিছু বলো, আমি শুনি।

আমি বললাম—বিশেষ কিছু বিশদে বলবো না, তবে আমি অন্তর যোগে কালী পূজা বিষয়েই বলি। দেখো, কালের ঊর্দ্ধে কালী বিরাজ করছে। কাল তিন কালের আবরণে কালীকে আড়াল করে রেখেছে, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনকাল চিন্তারূপে আত্ম চৈতন্যকে আড়াল করে রেখেছে। অতীত কালের স্মৃতিরূপ চিন্তা, বর্তমান কালের আসক্তিরূপ চিন্তা ও ভবিষ্যৎকালের আশারূপ চিন্তার আবরণে আমাদের চৈতন্য সত্তা আড়াল হয়ে আছে। চিন্তার প্রবাহ যখন জাগতিক আকর্ষণে বাহ্য গতিতে বিক্ষিপ্ত হয়, তখনই চেতনার মধ্যে চিন্তার কোন একটা কালের আবির্ভাব হয়ে ব্যক্তি-চেতনাকে কালবদ্ধ করে। যেহেতু সীমাবদ্ধ জীবচেতনা সদা বাহ্যগতিতে ক্রিয়াশীল সেহেতু চেতনা সদা চিন্তা বা কালবদ্ধ থাকে। তাই কালীর দর্শন-স্পর্শন হয়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

না। তিন কাল তিনগ্রন্থি হয়ে জীব চেতনাকে বদ্ধ রাখে। বর্তমান কাল হল বিষ্ণুগ্রন্থি। বিষ্ণু গ্রন্থি হল আসক্তি বা মোহ, যা জীব চেতনাকে মায়ায় বদ্ধ রেখেছে। তাই বিষ্ণুগ্রন্থির স্থান হল হৃদয়মূলে। আসক্তি এর মাঝখানে বিরাজ করেই তার স্থিতিকে বজায় রেখেছে। নাভিমূলে ব্রহ্মগ্রন্থি হল কর্মবন্ধনে জড়িত অবস্থা এবং কপালে রুদ্রগ্রন্থিতে লয় বা পরিবর্তন অব্যাহত। কাল এইভাবে চিন্তার গতিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অহংকার বা চিন্তার কর্তৃত্বই হল রুদ্রগ্রন্থি। আসক্তি বা চিন্তার আকর্ষনই হল বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আয়োজন বা চিন্তার কর্মই হল ব্রহ্মগ্রন্থি। এইভাবে চিন্তা বা কাল তিনটি গ্রন্থিতে জীব চেতনাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। চেতনার যদি জাগতিক অহংকার, আসক্তি ও আয়োজনের ক্ষয় হয় তবে গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। অন্তর-কর্ম বাড়লেই বাহ্য কর্মমল শোধন হয়, অন্তর শোধন হলেই বাহ্য মোহ চলে যায় এবং বাহ্য মোহ চলে গেলেই বাহ্য অহংকার যায়। তখন অহংটা কার? সেই অহংকারের অনুসন্ধান আসে। পরিশেষে আত্মস্থিতি লাভ হয়ে সোহংকার জাগে। এইভাবে অন্তর কর্মযোগ দ্বারা কর্মমল শোধন হয়ে অন্তরে স্থিতি হয়। অন্তর স্থিতি হতেহতেই ক্রমে বিস্তৃতি লাভ ঘটে আর এইভাবে কালের গতি হতে অব্যাহতি পেয়ে কালীর সান্নিধ্য ঘটে। কাল হল চিন্তাবদ্ধ ও কালী হল চৈতন্যসত্তা। তাই চিন্তামুক্ত চেতনা সহায়ে চৈতন্যকে লাভই হল কালের গ্রন্থিভেদে কালী প্রাপ্তি। যেমন চেতনা থেকে চিন্তা সৃষ্টি, তেমনি কালী থেকেই কালের সৃষ্টি। কোন চিন্তার যেমন স্থায়িত্ব নেই, সদা পরিবর্তনশীল, তেমনি কালের গতি সদা পরিবর্তনশীল। চিন্তার মত কাল টুকরো টুকরো হয়ে বহুবিভাগে বিভাজিত। যথা সকাল, বিকাল, অকাল, কাল, কালাকাল ইত্যাদি। এইভাবে চিন্তাই বহুকালের বিভাজনে বহুরূপে অহংকার, আসক্তি ও আয়োজনের তারতম্যে বিকৃত হয়ে আছে। তাই চিন্তার গুটিয়ে আসাই কালের সংকোচন বা চেতনার উন্মেষ। চেতনার উন্মেষ হতেই চৈতন্যে প্রবেশ বা কালী প্রাপ্তি। কালী লাভ হলে তখন কাল বিশ্বরূপে অখন্ডে প্রকাশ পায়। কালী সীমাবদ্ধ কালের উর্দ্ধে বলেই উলঙ্গ। উলঙ্গ ভাব হল শূন্যতার প্রতীক। জীব চেতনার যখন অহংকার শূন্য হয় তখন চেতনার চৈতন্য ঘটে, যাকে কালীর প্রকাশ বলে। কালী শক্তি—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই অব্যক্ত চারহাতের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ চিন্তা কালকে পরিচালনা করে। কালীর মুখ গহ্বরে জিহ্বার প্রকাশ হল বাক্ এর জন্ম। মুখগহ্বর হল যোনি ও জিহ্বা সেখানে হল লিঙ্গ। এই দুই-এর মৈথুনেই বাক্ এর সৃষ্টি। এইভাবেই কালী থেকে কালের মধ্যে শব্দ ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটছে। কাল এই জড়জগৎ পরিচালিত করছে। তাই কালের বুকে কালী হল ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ব্রহ্মময়ীর অবস্থান, পূর্ণ জ্ঞানের উপরে দন্ডায়মান শক্তি। এইভাবে অন্তরযোগে চৈতন্য প্রাপ্তিই হল কালী প্রাপ্তি। কালকে দেখা যায় না বলেই কালী কালো। এইভাবে শূন্যের মধ্যে পূর্ণ বিরাজমান বলেই শব-এর উপর ব্রহ্মময়ীর প্রতিমা দন্ডায়মান। দুই চোখে দ্বৈত জগতের দ্রষ্টা এবং তৃতীয় চক্ষে অদ্বৈত জগতের দ্রষ্টা। এইভাবে খন্ডকাল ও অখন্ড কালের একত্রে দ্রষ্টাই হল কালী বা আত্মচৈতন্য। তাই উলঙ্গকে পেতে হলে উলঙ্গ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হতে হয়, অর্থাৎ আসক্তি শূন্য হলেই পূর্ণ শক্তি পাওয়া হয়ে যায়—যাকে শক্তি পূজা বলে। আসক্তি হল শক্তির আবরণ। চিন্তার এই আবরণ গেলেই চেতনা মুক্ত বা উলঙ্গ হয়ে উলঙ্গিনী কালীর দর্শন হয়।

মিনতি বলল—শোনো, অঘোর বিদ্যা হল ....

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—আমি জানি, অঘোরী সাধক হলেন সকল সাধকের উর্ধে। তিনি একজন কৌল আবার অবধূতও।

এতক্ষণে মিনতি ভৈরবীর মুখটা ক্রমশই প্রসন্নতায় আলোকিত হল। এখন তার বাক্ স্ফুর্তি পেল। সে বলল—শোনো, অঘোর বিদ্যায় যোনির কাছে একটি রেখা দেখানো হয়েছে, যা যোনিপথ ঘন চুলের নির্দেশক। পুরুষ লিঙ্গ হল শক্তি ত্রিভুজের বিন্দুর সমার্থক। এসব কথা শুনে অনেকেই সমালোচনা করে তবে ধর্মীয় সংকীর্ণতা উপযুক্ত নয়, সব উপাসনা পদ্ধতিই ঠিক, প্রত্যেকের নিয়ম-কানুন আলাদা হতে পারে, কিন্তু কৌলরা এটা পছন্দ করে না।

আমি বললাম—কে কি পছন্দ করে বা না করে তা নয়, তবে সাধনা সকলের আগে।

মিনতি বলল—অঘোর বিদ্যা সম্পর্কে আশাকরি তুমি জানো, বহু মানুষই এই সাধনা করে। কিন্তু আমাদের উপসম্প্রদায় রয়েছে। আমাদের সমস্ত সাধন পদ্ধতি আলাদা। আমরা ক্ষ্মচোলীক্ষ্ম সম্প্রদায়ের। আমরা নিজেদের 'চোলি' বলি। সাধনার একটি পর্যায়ে সাধিকারা নিজেদের ওড়না বা চোলী খুলে নিয়ে একটি মাটির পাত্রে রাখে। তারপর নারী-পুরুষ সবাই মিলে এক সাথে বসে জপ করে। গুরুদেব ঐ মাটির পাত্রের কাছে দাঁড়িয়ে 'এসো' বললে সাধক পুরুষেরা হাঁড়ির দিকে ছুটে যায়। একজন পুরুষ সাধক যে চোলীটি পায় তখন ঐ চোলীটির অধিকারী সাধিকার দেহের অধিকারী সে হয় এবং ওই সময়ের জন্য সে তার সঙ্গিনী হয়ে যায় এবং পুরুষ ও মহিলা একসাথে থাকে। তবে আমরা কোনও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—তা হলে তোমাদের সাধনা সম্পূর্ণ দেহ-সাধনার উপর বা যৌনতার উপর ভিত্তি করেই?

মিনতি ভৈরবী বললো—শুধু তাই নয়, আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ দেহ-সাধনার উপর ভিত্তি করে অবশ্যই তবে আরও বেশকিছু বিষয় আছে। 'তন্ত্র' শব্দটিই তো তনু বা দেহ নিয়ে তাই তন্ত্র-সাধনাও দেহগত সাধনার উপর নির্ভরশীল। এই যে বর্তমানে 'পুরোহিত' পুজো করছে,আর ঐ যে সর্বতোভদ্রমণ্ডল এঁকে নিয়ে পুজোপাঠ করছে, ঐ পদ্মটি যে কি, তা জানো?

আমি সাধিকা মিনতির কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম! আগেই বিভিন্ন গুরুদেবদের থেকে জেনেছি যে তন্ত্র-সাধনায় বা সাধারণের পূজায় যে রকম চিত্রের ব্যবহার আছে সেগুলিকে 'যন্ত্র' বলে। যন্ত্রগুলির সবই স্ত্রী-জননাঙ্গের প্রতীক। কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-বিশ্বাস থেকেই এই যন্ত্রগুলির উদ্ভব হয়েছে। সভ্যতার কোনো এক পর্যায়ে মানুষ এই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নারী-জননাঙ্গকেই প্রজননের মূল কারণ বলে কল্পনা করেছে আর তাই তারই সাহায্যে প্রকৃতির উর্বরা-শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশকে আয়ত্তে আনতে চেয়েছে। এই ভাবেই প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে নিয়ে আসার আশায় আদিম মানুষ জননাঙ্গকেই গুরুত্ব দিয়েছে ও সেই আদিম বিশ্বাসের দিক থেকে তন্ত্রের লতাসাধনা, ভগযাগ ও যন্ত্রগুলিকে বুঝতে হবে। প্রাচীনকালের 'মাতৃকামুর্তি' রচনায় যোনি বা নারী-জননাঙ্গের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপণ করার চেষ্টাটা এক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। এই যোনি ক্রমশই জ্যামিতিক ত্রিকোণের আকার ধারণ করেছে।

আমি এই ভৈরবীর কথা শুনে সত্যি অবাক হলাম কারণ এখানে এসে এত গুরুগম্ভীর আলোচনা শুনতে পাবো তা কল্পনাও করিনি। মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া 'গর্ভসঞ্জাত লতাগুল্মসহ বসুমাতা-মূর্তি'-র মতো দেবীর সমস্ত অঙ্গের মধ্যে জননাঙ্গটিকেই প্রধানতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে তার কারণ, এর মূলেও প্রাচীন বিশ্বাসের সেই চিন্তা—'নারী-জননাঙ্গ শুধুমাত্র সন্তান-এর উৎস নয়, পার্থিব ঐশ্বর্যের উৎসও।'

এবার আসা যাক লজ্জা গৌরীর প্রসঙ্গে। অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনকোটা, কর্নাটকের সিদ্দানকোট্টে এবং মহারাষ্ট্রের ভোকারদান এলাকায় ১৯ শতকের প্রথম দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এক দেবী মূর্তি উদ্ধার হয় যিনি পা ফাঁক করে এমন ভাবে বসে রয়েছেন যাতে তাঁর যৌনাঙ্গ ও স্তনযুগল পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। তবে মূর্তির মাথার জায়গায় পদ্মফুল বসানো। এটি পার্বতীরই এক রূপ বলে মনে করা হয় ও এই মূর্তিরই পুজো হয়। এই দেবীর নাম লজ্জা গৌরী। দেবীর এই লজ্জা গৌরী রূপ হল প্রাচুর্য, উর্বরতা এবং যৌনতার। কখনও কখনও তাঁকে জন্ম দেওয়ার ভঙ্গিতেও দেখানো হয় তবে সেখানে গর্ভাবস্থার বাহ্যিক লক্ষণ থাকে না। বৈদিক ঐতিহ্যে লজ্জা গৌরী হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা হন না। দেবী একসময় গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামগুলিতে উপাসনা করা হত। পুরাণে আবার লজ্জাগৌরীর গল্প মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে শিব-পার্বতীর সঙ্গে। পুরাণে বলা হয়েছে, একদিন অগ্নিদেব গুহার প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দেখলেন যে শিব ও শক্তি যৌনমিলনে মগ্ন রয়েছেন। অগ্নিদেবের আগমনের শব্দ শুনে দু'জনেই সতর্ক হয়ে গেলেন। যৌন মিলনের দৃশ্য তৃতীয় ব্যক্তি দেখে নিয়েছেন ভেবে পার্বতী লজ্জা পেলেন এবং একটি পদ্মফুল দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নেন। দেবীর সেই রূপই লজ্জাগৌরী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। খরা থেকে বাঁচতে, প্রচুর ফসল উৎপাদনে, মহামারী ঠেকাতে এবং সন্তান কামনায় মানুষ তাঁর পুজো করতো।

অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশর্য্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্যের নাম 'ভগ'।

> ঐশ্ব্যর্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
> জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যণ্নাং ভগ ইতীরিতঃ। -বিষ্ণুপুরাণ ৬-৫-৪৭

কোন আদিম বিশ্বাসের প্রভাবে নারী-জননাঙ্গবাচক শব্দটিই ষড়ৈশ্বর্যবাচক শব্দে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পরিণত হয়েছে,—সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য 'ভগ' বলে আদিতে জনৈক বৈদিক দেবতাকেও বোঝাতো, ঐশ্বর্য বিতরণই ছিলো সে-দেবতার বৈশিষ্ট্য। তবুও আদিতে যে নাম ছিলো ঐশ্বর্যবাচক বা ঐশ্বর্যবিতরণ-মূলক, সেই নামই নারী-জননাঙ্গবাচক হয়ে দাঁড়ালো কারণ—আদিম মানুষ নারী-জননাঙ্গকেই পার্থিব ঐশ্বর্যের উৎস বলে বিশ্বাস করেছিলো।

তন্ত্রমতে নারী-জননাঙ্গের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। 'স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ' বা এইজাতীয় কথা তন্ত্রে বহুবার পাওয়া যায়। বস্তুত, তন্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ সাধনার নামই হলো 'ভগযাগ'—

তথাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ ভগযাগমথাচরেৎ।
কামিনীং যুবতীং যত্নাং পুষ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ।
তামানীয় প্রযত্নেন স্বঞ্চ ভূষপমাচরেৎ।
তামূর্ত্তেং স্বয়ং গন্ধৈররভূষণৈর্ব্বসনৈস্তথা।
মিষ্টান্নৈর্ভোজয়িত্ব চ ভক্ত্যা পরময়া শিবে।
তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদুর্দ্ধতল্পপে।
ততঃ পুজাং বিধায়ৈব নানাসম্ভারসংযুতৈঃ।
তত্রৈব রময়েৎ যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ।
ভগনামাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং।
পুজয়েদষ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপুজয়েৎ।
রক্তগন্ধৈঃ রক্তমালৈঃ রক্তবস্ত্রৈর্মনোরমৈঃ।
পুজয়েদ্ভক্তিতে মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়।।
এতস্মিন সময়ে দেবী রতিমিচ্ছতি সা যদা।
লতান্ত রময়েদেবী যাবস্কোমং করোতি ন।
পুষ্পিনী মকরলেন ততো হোমং সমাচরেৎ।
ওঁ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগন্ধপধরে শুভে।
ভগন্ধপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনী।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, ওই আদিম বিশ্বাসটির উপরে এখানে পূজা, মোক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ আধুনিক শব্দের রঙ চড়ালেও, তাকে অনুসন্ধান করার জন্যে অন্তত একটি সূত্র উপরের উদ্ধৃতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। সূত্রটি হলো, 'লতা' শব্দের ব্যবহার। কেননা, তন্ত্র-সাহিত্যে 'লতা' শব্দের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। সে-অর্থ হলো, নারী-জননাঙ্গ। এখানে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা যায়—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ।।
কিংবা,
নগ্নাং পরলতাং পশ্যন্ জপেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ।।
কিংবা,
মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ।।
কিংবা,
লতাভির্বেটিতে ভূত্বা জপেৎমন্ত্রধীঃ।।
কিংবা,
রাত্রে তাম্বুলপুরান্তে লতামণ্ডলমধ্যগঃ।।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তন্ত্র-বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তারা এই 'লতা' শব্দের তাৎপর্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। 'লতা-সাধনা' বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধনারও নির্দেশ রয়েছে। এ-সাধনাও অতি গোপন, 'গুহ্যাৎ গুহ্যতরং' এবং অতি কঠিন এই সাধনা।

এমন গোপন ও কঠিন 'লতা-সাধনা'-র মূল কথাটা ভগযাগের মতোই—

লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুম্ব হরবল্লতে।
শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দুরমণ্ডলে।।
স্তনদ্বয়ে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি।
শতং যোনী মহেশানি উত্থায় চ শতত্রয়ম্।
এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধিশয়ো ভবেৎ।
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভম্।।
রজোহবস্থাং সমানীয় তদ্ যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্।
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিনিদং পূজয়েন্মনুম্।।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক রুচি ও নীতিবোধযুক্ত সমাজের কাছে এই জাতীয় চিন্তাধারা বীভৎস কামবিকারের মতই। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই 'তান্ত্রিক সাধনা' সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না, ভারতীয় সংস্কৃতির, বিশেষ করে বাংলা দেশের সংস্কৃতির চোদ্দ আনার উপরই হলো তান্ত্রিক। কেউ মানুক বা না মানুক, এখন ভারতের সর্বত্রই ও বিশেষত এই বাংলায় যে-সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তা সমস্তই তান্ত্রিক যন্ত্রের উপরই হয়। 'তন্ত্র' নিছক কামবিকার, বা অন্তঃসারশূন্য আজগুবি ধারণামাত্র হয় কি করে! আবার 'তন্ত্র' একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে কী করে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারলো তা ও এক চিন্তার বিষয়। তবে এই প্রশ্নের মাত্র দুটি উত্তর সম্ভবপর—হয় পুরো জাতটাই হলো কামবিকারগ্রস্থ নয় তো আধুনিক যুগের পটভূমিতে এই সব তান্ত্রিক ধ্যানধারণা বা সাধন-পদ্ধতির পরিণাম যাই হোক না কেন, এগুলির আদি-তাৎপর্য নিশ্চয়ই অন্য রকম ছিলো। অর্থাৎ, সমাজ-বিকাশের কোনো এক পর্যায়ে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই জাতীয় ধ্যানধারণা এবং সাধন-পদ্ধতিই বাস্তব অর্থে উদ্দেশ্যমূলক ছিলো, জীবনের কোনো এক বাস্তব তাগিদ মেটাতে চেয়েছিলো। আমরা এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটিকে—পুরো জাতটাকে কামবিকারগ্রস্ত বলে কল্পনা করবার কোনো কারণ নেই তাই আমরা দেখতে চাই যে আধুনিক যুগের পটভূমিতে ওই তান্ত্রিক সাধনা যতো বীভৎস ও বিকৃত বলে মনে হোক না কেন, সমাজবিকাশের যে-পর্যায়ে এগুলির উদ্ভব হয়েছিলো একমাত্র তারই পটভূমিতে এগুলির আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধান করা উচিত। এবং আমাদের দেশের উৎপাদন-কৌশলের উন্নতি ব্যাঘাতগ্রস্ত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থেকেছে বলেই সমাজবিকাশের সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণা এবং আচার-অনুষ্ঠানের স্মারক এমন জোরালোভাবে আমাদের সংস্কৃতিকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই আমরা যদি প্রকৃত অর্থেবাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্মকে বুঝতে চাই তো বাংলার তন্ত্র এবং তান্ত্রিক ধর্ম বুঝতে ও জানতে হবে।

তন্ত্রের বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় গুপ্তযুগ থেকে আজও বহু জালজুয়াচুরি চলছে, পুরোহিত ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করেছেন, স্মার্তরা নাটোর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরো অনেক গোলমাল স্মৃতিশাস্ত্রের নামে ঢাকা দিয়েছেন। এই সব আবরণ খুলে সত্যের অনুসন্ধান করে তন্ত্রের আলোচনা অবশ্যই করতে হবে। বাংলার গত দুই হাজার বৎসরের প্রকৃত ইতিহাসের প্রচার প্রয়োজন এবং নির্ভয়ে সত্য কথা বলার বুকের পাটারও দরকার; এই তিন প্রয়োজন সিদ্ধ না হলে বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাস ঠিকমতো প্রকাশিত হবে না, বাংলার পুরানো গৌরবের মহিমা আমরা বুঝতে পারব না। এই ভাবে বাংলার তান্ত্রিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করলে এইটুকু স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে আমাদের দেশের তন্ত্রসাধনায় স্ত্রী-জননাঙ্গ প্রভৃতির উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো তার মূলে ছিলো অত্যন্ত আদিম পর্যায়ের এক বিশ্বাস—স্ত্রী-জননাঙ্গ শুধুই সন্তানদায়িনী নয়, শস্যাদি ঐশ্বর্যদায়িনীও বটে। তখনকার মানুষ ও তান্ত্রিকেরা নারী-জননাঙ্গের উপর যে এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার মূলে বিশ্বাসটি হলো যে, নারী-জননাঙ্গের স্পর্শেই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য বর্ধিত হবে। তাই সকল শুভ কর্মে সেই বিশ্বাসটিকে যত্ন করে 'বিশেষ চিত্রলেখা'-র মাধ্যমে সামাজিকভাবে যুক্ত করা। পৌরাণিক কালে তন্ত্রে এই জাতীয় চিত্রলেখাকে 'যন্ত্র' বলে।

যন্ত্র সাধারণত দুই প্রকার—পূজাযন্ত্র ও ধারণ-যন্ত্র। পুজাযন্ত্রে যে দেবতার পূজা করতে হয় সেই দেবতার যন্ত্র এঁকে তার পুজা করতে হয় আর যে যন্ত্র এঁকে ধারণ করা হয় তাহার নাম ধারণ-যন্ত্র। এই ধারণ-যন্ত্র ভূর্জপত্র বা কোনও ধাতব পাতে এঁকে অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হয়। তান্ত্রিক বিশ্বাস অনুযায়ী যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হয়ে থাকে, এই জন্য যন্ত্র এঁকে তার উপর দেবতার পুজা করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রগুলি পূজা বা দেবতার থেকেও প্রাচীন।

তান্ত্রিক যন্ত্রগুলি যে নারী-জননাঙ্গের প্রতীকমাত্র, এ-বিষয়ে আগে দর্শনিকেরা দৃষ্টি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আকর্ষণ করেছেন। এইভাবে নারী-জননাঙ্গের ছবি আঁকার পিছনে এক আদিম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়; সেই বিশ্বাস হলো নারীজননাঙ্গের উপরই প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতাও নির্ভরশীল। তন্ত্রের প্রধানতম অঙ্গ ওই যন্ত্র ও ঘটের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। যন্ত্রটির নাম 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল'। যন্ত্রটির অঙ্কনবিধি নিয়ে বলা হয়েছে যে—'তন্মধ্যে ৩৬টি ঘর লইয়া সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ৩৬টি ঘরের বাহিরের এক পংক্তিতে পীঠ, তাহার পরের দুই পংক্তিতে বীথিকা হইবে। পরে অবশিষ্ট দুই পংক্তি দ্বারা মধ্যস্থলে দ্বার, উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া শোভা এবং শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটি করিয়া উপশোভা এবং পরে কোণ প্রস্তুত করিতে হইবে। যে ৩৬টি ঘর লইয়া পদ্ম অঙ্কিত, তাহার দ্বাদশটি ঘর বাহিরে পৃথক রাখিয়া তন্মধ্যস্থ ২৪টি ঘরকে ৩টি বৃত্ত দ্বারা সমভাগে বিভক্ত করিবে। উহার প্রথম বৃত্ত কর্ণিকা, দ্বিতীয় বৃত্ত কেশর ও তৃতীয়টি পদ্মপত্র। যে দ্বাদশাংশ বাহিরে রাখা হইয়াছে, উহা পত্রের অগ্র। তৃতীয় বৃত্তের মধ্যস্থ স্থানের পরিমাণে পদ্মপত্র রচনা করিবে। কেশর সমূহের অগ্রভাগে অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিবে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা-সমূহের মধ্যভাগে সূত্রপাত করত পদ্মপত্রের অগ্রগুলির সমান মাপে বৃত্তরেখা আঁকিবে।'

মধ্যস্থ সূত্রপাতের দুই পার্শ্বে স্থির হস্তে দলাগ্র আঁকিবে। দলমূলে দুই দুইটি করিয়া কেশর করিতে হয়। ইহাকেই তন্ত্রবেত্তারা সাধারণ পদ্ম কহেন। এক অঙ্গুলি উৎসেধ অর্থাৎ বেধ পরিমাণে শুভ্রবর্ণদ্বারা সীমারেখা সকল চিত্রিত করিয়া পীতবর্ণদ্বারা কর্ণিকা, রক্তবর্ণ গুণ্ডিকাদ্বারা কেশর ও শুক্লবর্ণদ্বারা পত্রসকল রঞ্জিত করিয়া শ্যামবর্ণে সমস্ত সন্ধিস্থান চিত্রিত করিবে। প্রকারান্তরে যথা—কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশরসকল পীত রক্তবর্ণ, পত্রসকল রক্তবর্ণ, সন্ধি কৃষ্ণবর্ণ, পীঠগর্ভ শুক্লবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ, পীঠপাদ রক্তবর্ণ ও পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া বীথিচতুষ্টয়ে পত্র ও পুষ্প সহিত কল্পলতা সর্ববর্ণদ্বারা বিচিত্রিত করিবে। এই কল্পলতিকা দর্শনমনোহর করিবে। দ্বারসকল শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণ চতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণ করিবে। মণ্ডলের বহির্দেশে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটি রেখা চিত্রিত করিবে। এই প্রকারে সাধারণ সর্বতোভদ্রমণ্ডল নির্মাণ করিতে হইবে।'

এতোখানি জ্যামিতিক নিষ্ঠা নিয়ে, শোভা এবং উপশোভায় বিভূষিত করে, এই যে সর্বতোভদ্রমণ্ডলটি আঁকার নির্দেশ পাওয়া গেলো, কিন্তু এর মূল কথা কী? আসলে এর মূল কথা হলো 'অষ্টদলপদ্ম ও বীথিকা'—

'ষট্‌ত্রিংশত পদৈর্ম্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্।
বহিঃ পঙক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তিযুগ্মেন বীথিকা।'

সুলক্ষণ পদ্ম এবং বীথিকা; ওই বীথিকার নাম হল কল্পলতিকা —

'আলিখেৎ কল্পলতিকা দলপুষ্পসমন্বিতাং।'

প্রথমে মনে রাখা দরকার, তন্ত্রে এই পদ্ম এবং বীথিকার গুরুত্ব কতোখানি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কেননা, শুধুমাত্র সর্বতোভদ্রমণ্ডল নয়, প্রায় সমস্ত তান্ত্রিক যন্ত্রেরই মূল বিষয়বস্তু বলতে এই পদ্ম এবং বীথিকাই। কয়েকটি তান্ত্রিক যন্ত্রের ছবিগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে খুঁটিনাটির তারতম্য থাকলেও অষ্টদলপদ্ম এবং বীথিকাই সমস্ত চিত্রের মূল বিষয়বস্তু। তাই যন্ত্র-প্রসঙ্গে প্রধানতম প্রশ্ন ওঠে, ওই পদ্ম বা অষ্টদলপদ্মের প্রকৃত তাৎপর্য কী? বাংলার পূজাপদ্ধতি এবং তন্ত্রের যন্ত্র-সংকেতের সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচয় যার আছে তিনিই জানেন, তন্ত্রে পদ্ম বা অষ্টদলপদ্ম নারী-জননাঙ্গের প্রতীক মাত্র। অনেক সময় তান্ত্রিক রচনায় 'পদ্ম' শব্দটিকে একেবারে সোজাসুজি সেই অর্থেই গ্রহণ করা হয়।

'পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে।' তন্ত্রে 'পদ্ম'-শব্দের এই জাতীয় ব্যবহার একটুও দুর্লভ নয়। তাহলে পদ্মের অর্থ নারীজননাঙ্গই। এই পদ্মই হলো সর্বতোভদ্রমণ্ডলের ও সমস্ত তান্ত্রিক যন্ত্রের মূল বিষয়বস্তু। এর মূলে আছে এক আদিম বিশ্বাস, যে-বিশ্বাস থেকে দেবীর নাম হয়েছিলো শাকম্ভরী। এইভাবে প্রাকৃতিক উর্বরতার সঙ্গে মানবীর উর্বরতার সংযোগ কল্পনা করা হয়েছে বলেই তন্ত্রে নারী-জননাঙ্গকে উদ্ভিদ-বাচক নাম 'লতা' দেওয়া সম্ভব হয়েছিলো।

বর্তমান কালেও পুজোর প্রথমেই সর্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুজোর নির্দেশিকায় লেখা আছে—'অনন্তর সর্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি ঘট স্থাপন করিবে। যথা—শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করিবে, তদুপরি ধৌত সুলক্ষণ ঘট, তাহাতে দধ্যক্ষত বা দই মাখানো আতপ চাল দিয়া শুদ্ধ জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে। তাহার কণ্ঠে আচারৎ লাল সুতা ও আলতাপত্র দেওয়া হয়। মধ্যে পঞ্চপল্লব অর্থাৎ আম, কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, যজ্ঞযডুমুরের শাখা, অলভে কেবল আম্রপল্লব দিবে। তদভাবে দুইটি পানও দিবার ব্যবস্থা আছে। এক সরা চাউলে একটি হরিতকী কিংবা সুপারী দিয়া তদুপরি স্থাপনা করিবে। তদুপরি একটি নির্দোষ সশীর্ষ ফল যেমন—নারিকেল অথবা কদলী দিবে; ঐ ফলকে সিন্দুর রঞ্জিত করিবে। ঘটে একটি সিঁদুরের পুত্তলিকা আঁকিবে, পুষ্পমাল্য দিয়া শোভিত করিবে।'

তাহলে দেখা গেল—সর্বতোভদ্রমণ্ডলের যেমন অর্থ হলো নারী-জননাঙ্গ ঠিক তেমনই তার উপর স্থাপিত ঘটের গায়ে সিঁদুরের পুত্তলিকা—মানবীয় প্রজননের প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ ফলপ্রসূ করার কল্পনা এবং ঘট-স্থাপনার মধ্যে সেই চেষ্টাকেই আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করা হলো। শুদ্ধ ভিজে মাটিতে পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করে ফসল ফলানোর মহড়া শুরু হলো আর তারপর ঘটের উপরের পল্লবকে স্পর্শ করে কামনা জানানো হল যে—

'ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উজ্জীব ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতের্নুত্বে নুত্বা চ সুয়তাং রয়িঃ।'

অর্থাৎ, হে শক্তিমতী বৃক্ষ, (তুমি) বাঁচিয়া ওঠো ও ফলবতী হও। বনস্পতির পাতাকে সেবা করে ধন প্রসব কর।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অনেক সময় ঘটের উপরের ডাবটির গায়েই সিঁদুরের পুতুল এঁকে দিয়ে মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সাদৃশ্য বিশ্বাসকে আরো স্পষ্ট ও অভ্রান্ত করবার আয়োজন দেখা যায়। বর্তমান কালেও ওই যন্ত্র আর ঘটই হলো পূজার প্রধানতম অঙ্গ। তার মানে, কৃষি-আবিষ্কার পর্যায়ের এক আদিম বিশ্বাসই পুজোর প্রাণবস্তু। অথচ, আমাদের আধুনিক চেতনার দিক থেকে এ বিশ্বাস একেবারে অর্থহীন। নারী-জননাঙ্গের সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সম্পর্ক কোথায়! কিন্তু আধুনিক চেতনার মাপকাঠিতে তন্ত্রকে বোঝা যাবে না। তার বদলে, আমাদের পদ্ধতি অনুসারে, এই তান্ত্রিক বিশ্বাসটিকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের আচার-অনুষ্ঠানকে বা পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়কে বিচার করতে হবে।

মিনতির কথায় আমার চিন্তার সূত্র কেটে গেল—কি হল, তোমাদের সভ্য সমাজ যে সর্বতোভদ্রমণ্ডল এঁকে নিয়ে পুজোপাঠ করছে, ঐ পদ্মটি যে কি, তা জানো?

আমি বললাম—তুমিই বলো।

মিনতি বলল—অঘোর সাধনা যদি বিকৃতি হয় তো পুরো সমাজই বিকৃত মানসিকতার। আমাদের সাধনা কিছু নিয়মশৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয় যা সভ্য সমাজে বিশৃঙ্খলতার নামান্তর। আমাদের গুরুদেবরা সিদ্ধির অনেক উপকারিতার কথা বলেছেন ও আমরা তা লাভ করি। সাধনার পথে চললে শরীর হয় হালকা, স্বাস্থ্য ও সুস্থ, মুখটা অত্যাশ্চর্য উজ্জ্বল, মন থেকে লোভ দূর হয়, কথাবার্তা মধুর ও উদ্যমী হয়ে ওঠে, শরীর থেকে সুগন্ধ আসতে থাকে, মনকে নিয়ন্ত্রণে সফলতা পাওয়া যায়। আমার মতে সমাজের ভিত্তি সাধিকা নারী। কঠিন নিয়মে যে সিদ্ধি অর্জিত হয় না তা কি-এর সঙ্গে অর্জিত হয়। 'প্রজ্ঞাপয়বিনিশ্চয় তন্ত্র'-এ লেখা আছে—মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে গ্রাস করো তবে আত্মরূপে নিজেকে পাবে। যারা নারীর সাথে তত্ত্বযোগ করেন একমাত্র তারাই সিদ্ধি লাভ করেন। শৈশবকালে যৌন কামনায় লিপ্ত হওয়া যেমন সঙ্গত নয়, তেমনি যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ থেকে দূরে থাকাও অনুচিত, যৌন মিলনের মাধ্যমেই মানব জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেজন্য শৃঙ্খলা মেনে নারী-পুরুষের জীবনযাপন করা উচিত। প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত চলছে কৌশল ও পাল্টা কৌশল। মৃত্যুর পরিধি বিশাল ও মৃত্যু অনিবার্য তাই জীবনের পরিধি বৃদ্ধি করতে সঠিক সাধনা চাই। সাধনার বিভিন্ন মার্গ আছে। তবে শ্রেষ্ঠ মার্গ হল 'অঘোর' পথ। তুমি অঘোর মন্ত্রে সাধনা করো—এই আমার গুরুদেবের নির্দেশ। তিনি কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসেন।

আমি বললাম—কিন্তু আমি তো তাঁকে জানি না।

মিনতি ভৈরবী বলল—উনি সারা ভারতবর্ষের প্রকৃত সাধকদের সম্পর্কে খোঁজ রাখেন। তিনি বলেছেন, তুমি অঘোর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করো, আর মানুষের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উপকার করো। তুমি জানো, জ্ঞানহীন মানুষ পশুর মতো। এদের সকলকে নিঃস্বার্থ সহায়তা করো, মানুষকে 'মানুষ' হতে সাহায্য করো। এতে তুমি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করবে, পরম আনন্দ, অসীম শান্তি এবং অফুরন্ত সন্তুষ্টি লাভ করবে।

আমি বললাম—গুরুদেবের নির্দেশ বিষয়ে আমি কয়েকদিন ভেবে নিই, তার পরে বলবো।

ভৈরবী বলল—এ বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়। শ্রীগুরুদেবের নির্দেশে সাধনা করলে তুমি অনেক উচ্চপদ লাভ করবে।

আমি বললাম—আমি কালীর পদে আশ্রয় চাই, অন্য কোনও পদ নয়। আমি জাগতিক পদলোভী নই।

এই সাধনস্থলের পাশেই একটা বেদী রয়েছে। সেইটি দেখিয়ে মিনতি বললো—এই যে বেদী দেখছো, এটা পঞ্চমুন্ডির আসন, এতে শিয়াল, কুকুর, সাপ, বেজী আর মানুষের মাথা আছে। আমার পরম গুরু ছিলেন যোগিনীবিদ্যাতে সিদ্ধ। তিনি যোগিনী তন্ত্রমতে পাঁচটি মানুষের মাথার খুলি দিয়ে আসন তৈরি করেছিলেন। সেই আসনে কৌশিকী অমাবস্যার দিন ধ্যানরত অবস্থাতেই মহাসমাধিতে চলে গিয়েছিলেন। আসনভঙ্গ হয়নি বলে ভৈরবী গুরুদেবের আসনবেদী খুঁড়ে অপঘাতে মরা পাঁচটি মানুষের খুলি বের করে, সে সমস্তের পুজো সংস্কার করে এখানকার নবমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর গুরুদেব এখানে কচ্ছপের মাংস ও শোল মাছের নৈবেদ্য দিয়ে সুরসুন্দরী দেবীর সাধনাতে সিদ্ধ হয়েছিলেন বারো বছর আগে এক অমাবস্যার রাতে। এখানে প্রতি অমাবস্যায় তাই নবমুণ্ডির আসনে বিশেষ পুজো হয়।

আমি লক্ষ্য করলাম বেদীর কাছেই একটি যোনিকুণ্ড রয়েছে, সদ্য হোম শেষ হয়েছে এখানে। শ্মশানের মানুষ পোড়ানো আধপোড়া একরাশি কাঠ ডাঁই করা তার পাশেই। আমি মিনতিকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি আমি যজ্ঞ করতে পারি?

মিনতি বলল—তুমি গুরুদেবের প্রিয় তাই যজ্ঞ নিশ্চয়ই করতে পারবে। তবে যজ্ঞ তো আমাদের ভিতরে সকল সময়ই চলছে, শুধু তা অনুভবের বিষয়। চিন্তা করো, অমানিশার যজ্ঞ চলছে ভিতরে, দাউদাউ করে জ্বলছে, এ আগুন আত্মার প্রতীক। আত্মার রূপ খোলে উর্ধ্বমুখীন দশায়, আগুনেরও তাই। সেই আগুন যখন গিয়ে সহস্রদলে পৌঁছবে তখন চেতনার বড়সড় একটা এলাকায় ঢুকে পড়বে মানুষ। সে তখন সাধক, ভাবুক, ঋষি, সন্ত, সত্যদর্শী, তা না হলে সে কিছু নয়। যতই তার বিষয় আশয়, সামাজিক প্রতিপত্তি থাকুক না কেন সে বেরিয়ে পড়বে বাইরে—মুক্তচৈতন্য হয়ে, শুরু হবে আত্মার জাগরণ। সাধক তখন সাধনায় সফল।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাধনায় কিভাবে সফলতা পাওয়া যাবে

আমরা পূজার্চনা করে দেবতার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমায় জয়, শারীরিক-মানসিক চিকিৎসা ইত্যাদি জাগতিক সুবিধা প্রার্থনা করি, কারণ এগুলো হলে আমরা সুখী হব, কিন্তু যার কাছে এই জিনিসগুলি এখনই যথেষ্ট রয়েছে তাকে বিবেচনা করুন, সে কি সত্যিই খুশি? মনে হয়—কখনওই সে সুখী নয়, কারণ সম্পদের প্রাচুর্য ও অনুকুল পরিবেশ তাদের জাগতিক চাহিদা ও আরও সম্পদ লাভের ইচ্ছা বাড়িয়ে তোলে। এবং জিনিসের আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের একমাত্র কারণ। গীতায় অর্জুন যখন ভগবানকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ভগবান বলেছেন—জাগতিক কষ্টের কারণ হল তৃষ্ণা। আকাঙ্ক্ষা করে কখনওই কোন বস্তু পাওয়া যায় না। 'অ-ভাব' হল দুঃখের কারণ। যতক্ষণ নিজের মধ্যে অভাব থাকবে, ততক্ষণ সে সুখে থাকবে কী করে! মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রয়োজন পূরণ করা যেতে পারে কিন্তু, ইচ্ছা সবসময়ই অপূর্ণ থেকে যায়। তন্ত্র সাধনা প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না।

সাধক-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি পৃথক। যারা অর্থকে গুরুত্ব দেয় এবং জাগতিক সুখ পেতে চায়, তারা সাধনক্ষেত্রে ভুল করে। ভুলকে গুরুত্ব দিলে তার দ্বারা অধর্ম ঘটবে এবং অধর্ম অনুশীলন করলে কখনো সুখ হয় না এবং হবেও না। পক্ষান্তরে আমরা যদি প্রকৃত সাধনার প্রতি (আত্মসাধনা) গুরুত্ব দিয়ে তার মাধ্যমে সুখ পেতে চাই, তাহলে আমরা চিরকাল সুখ পেতে পারি, তাই আমাদের উচিত সাফল্য অর্জনের জন্য লক্ষ্য ঠিক রাখা এবং পার্থিব জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে প্রবেশ করতে না দেওয়া। এই কারণেই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে প্রত্যেকের নিজেকে আন্তরিক ভাবে নিয়োজিত করা উচিত। একজন মানুষ পৃথিবীর সব জিনিস কিভাবে পাবে! আবার জাগতিক বস্তু সুখ দিতে পারে, শান্তি নয়। শাস্ত্র বলেন—কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই শান্তি লাভ করা যেতে পারে, অপূর্ণ ও সীমিত জড় বস্তু থেকে নয়।

এই পৃথিবীতে যত কিছু সম্পদ আছে, তার সবকিছু একত্রে মানুষের তৃপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়। তাই কোনও মানুষের ভোগ-বাসনার তৃষ্ণা কখনও মেটে না, কারণ একটা ভোগের পর আর একটি ভোগের বাসনা নতুন করে মনে জেগে ওঠে—যা মনের প্রশান্তির ও ধ্যানের পক্ষে বড় বাধা। তাহলে সুখ, শান্তি ও সফলতা কি জীবনে লাভ হবে না? সুখ বা শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে? আমার মনে হয় সহজে সফলতা লাভের উপায় হল—তন্ত্র দ্বারা বর্ণিত পথের আচার ও আচরণ। এ কথার অর্থ হল, যখন আমাদের আচার আধ্যাত্মিক এবং আমরা অন্যায় ভাবে কিছু পেতে চাই না, তখন আমরা তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হব। এই কলিযুগে যে ব্যক্তি কোনও সৎ ইচ্ছা নিয়ে গোপনে তন্ত্র সাধনা করে, সে দ্রুত সাফল্য লাভ করে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আমার আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আগে আমি আপনাকে এক প্রয়োজনীয় সাধনার কথা বলি। ভগবান যাকে ভালোবাসেন তাকে জাগতিক সুখ দেন না বরং যারা ভগবানের সঙ্গসুখ নিতে চায় তারা প্রাথমিক জীবনে বড়ই দুঃখকষ্ট পেয়ে থাকেন। ভক্ত মানুষেরা ভগবানকে নিজের সাধ্যাতীত প্রেম-ভক্তি-ভলোবাসা দিতে চায় এবং নিজেকে উন্নত ও সুন্দর করার জন্য সকল কিছুই করতে প্রস্তুত তাকে, সৌন্দর্যের মায়ায় আটকা পড়ার জন্য নয়। দয়া করে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবুন। তন্ত্রের সন্ধানকারী কি সেই মূল গাছের চেয়েও নিকৃষ্ট, যেটি প্রতি বছর শীতের আগমনে নতুন সাজে সাজে, রেশমী কাপড়ে শরীর সাজায়?

আপনার কাঙ্খিত দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় স্থূলতা কমানো, অন্যকে আপনার প্রতি আকর্ষিত করা, উপস্থিত বুদ্ধির জন্য এবং দাম্পত্য সুখ লাভের জন্য কিছু সাধনা করার বিধান রয়েছে। এর মধ্যে একটি বলব। এই সাধনার আগে নিজের মনকে যথেষ্ট স্থির করে তুলুন। সাধনা শুরুর আগে কিছু দিন নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ করুন। সাধনা শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার থেকে শুরু করুন। রাত্রি ঠিক ন'টায় সাধনার জায়গায় এসে শিব-পার্বতীর একটি ছবির সামনে পূর্বমুখী হয়ে হলুদ আসনে বসতে হবে। ছবিটির সামনে একটি তামার পাত্রে সদ্য গজানো সাদা ফুলের কুঁড়ি রেখে জল দিয়ে স্নান করাতে হবে এবং গোলাপ, সুগন্ধি, ফুল, অক্ষত, বেলপাতা ইত্যাদি দিয়ে প্রাথমিক পূজার পর নিচের মন্ত্রটি ৩১ বার জপ করতে হবে। একটি স্ফটিকের অভিমন্ত্রিত জপমালা সঙ্গে রাখবেন এবং জপ সম্পূর্ণ করুন, তারপর ২১ দিনের জন্য প্রতিদিন জপটি করুন। মন্ত্রটি নিম্নরূপ—

ওঁ শং উমাপতয়ে শং নমঃ।

২১ দিনের মন্ত্র-জপ সম্পূর্ণ হলে ১০০টি আহুতি দিন। আপনার মন্ত্র সিদ্ধ হবে। এবার মন্ত্রটিকে সক্রিয় রাখতে প্রতিদিন ১১ বার করে জপ করবেন। আপনার মঙ্গল হবে।

শত্রু ধ্বংস

মনে রাখবেন, সময়ের চাকা তার নির্দিষ্ট গতিতে ক্রমাগত চলে এবং প্রতিটি ঋতুতে তার গুণাবলী দেখাতে থাকে। কখনও পৃথিবী শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কখনও ভগবান ইন্দ্র গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে পৃথিবীকে ভিজিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন, কখনও শরতের জ্বলন্ত অথচ কোমল সূর্যরশ্মি পৃথিবীকে আদর করে আবার কখনও এই পৃথিবী ঘন কুয়াশায় নিজেকে মুড়ে নিয়ে বিষন্ন মনে একলা পড়ে থাকে। মানুষের জীবনের মতো, প্রকৃতির উত্থান-পতনের সাথে সাথে সময়ও কোনো

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

না কোনো অজানা লক্ষ্যের দিকে নিরন্তর গতিশীল থাকে। কিন্তু এসবের মাঝে এমন একটা উপলক্ষ আসে যখন শুধু প্রকৃতিই নয়, মানুষ নিজেই তার অলসতা ত্যাগ করে, চোখ বড় বড় করে ভাবতে শুরু করে, চারিদিকে হঠাৎ কী হলো! এই ঘটনাটি প্রকৃতি এবং তন্ত্র সাধনার একটি মিশ্র রূপ। এখানে, তন্ত্রের শক্তি প্রমাণের লক্ষ্যে, একটি তীব্র অথচ গোপনীয় আধ্যাত্মিক অনুশীলন উপস্থাপন করা হয়েছে।

পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে শত্রুর ভয় নেই, সে রকম মানুষ পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আর আমরা সকলেই নিজের শত্রুকে খুবই ভয় পেয়ে চলি। কারণ, কখন কোন মুহূর্তে যে সে আমাদের ক্ষতি করে দেবে, তাঁর কোনও ঠিক নেই। শত্রুর দ্বারা ক্ষতি হওয়ার প্রবণতা জন্মছক দেখে বোঝা যায়, কোন দিক থেকে মানুষ তাঁর ক্ষতি করতে পারে।

শত্রু যে সব সময়ে বাইরের কেউ হবে, সে রকমটা নিশ্চিত ভাবে বলা খুব কঠিন। কারণ, অনেক সময়ে দেখা যায়, বাইরের নয়, ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে শত্রু। অর্থাৎ, নিজেদের মানুষরাও যে কখন শত্রু হয়ে উঠেছে, তা বুঝেই ওঠা যায়নি। বাইরের শত্রুদের হাত থেকে কিছুটা হলেও ছাড় পাওয়া যায়, কিন্তু শত্রু যখন ঘরে থাকে, তখন তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া খুব মুশকিল হয়। সে ক্ষেত্রে এমন একটি পদ্ধতি রয়েছে, যা সঠিক নিয়মে করতে পারলে শত্রুদের হাত থেকে অতি সহজেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

প্রথমেই কালীর পূজা করুন। মদ, মাংস, মাছ, আট রকমের ভাজা শস্যদানা, অন্ন, লাল শাক ভাজা, পায়েস ও পান ভোগ হিসাবে নিবেদন করুন। এবার মন্ত্র জপ করুন।

কালীর মন্ত্র—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং মহাকালী ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

এবার বলি দিন। বলি উৎসর্গ করার সময় নীচের মন্ত্র বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। যথা- মন্ত্র ঐং এহ্যেহি জগন্মাতর্জগতাং জননি গৃহ্ন গৃহ্ন বলিং সিদ্ধিং দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু হুং হুং হ্রীং হ্রীং ফট্ ফট্ ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ফট্ স্বাহা।

পূজাবিধি সমস্তই দক্ষিণ কালিকা পূজার মতো, শুধুমাত্র বিশেষত্ব হলো —যন্ত্রের ভূপুরে ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, ভূপুরের চতুদ্বারে বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণেশের, তার বাইরে দেবীর অস্ত্রাদির পূজা করতে হয়।

ধ্যান মন্ত্র

মহামেঘ সমাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রোসিধারিণীম্।
লোল জিহ্বাং ঘোরদ্রষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্।।১।।
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃত শেখরাম্।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাসবং পিবম্।।২।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নাগ যজ্ঞোপবীতাঙ্গী নাগশয্যানিষেদুষীম্।
পঞ্চাশমুণ্ডসংযুক্তং বনমালা মহোদরীম্।।৩।।
সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি।
চতুর্দিক্ষু নাগফণা বেষ্টিতাং মহাকালিকাম্।।৪।।
তক্ষকং সর্পরাজেন বামকঙ্কণ ভূষিতাম।
অনন্তনাগ রাজেন কৃতদক্ষিণ কঙ্কণম্।।৫।।
নাগেন রসনাহার কল্পিতাং রত্ননূপুরাম্।
বামে শিব স্বরূপন্তং কল্পিতং বৎসরূপকম্।।৬।।
দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবী নাগযজ্ঞোপবীতিনাম্।
নরদেহ সমাবদ্ধ কুণ্ডল শ্রুতিমণ্ডিতাম্।।৭।।
প্রসন্ন বদনাং সৌম্যাং নবরত্ন বিভূষিতাম্।
নারদাদ্যৈমুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীম্।।৮।
অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্।।৯।।

ধ্যানের ভাবার্থ—দেবীর দেহের বর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণবস্ত্রাবৃতা এবং অসি ধারণ করে আছেন। তাঁর লোল জিহাটি রক্তবর্ণ। দন্তপংক্তি অতীব ভয়ঙ্কর। তাঁর নেত্র কোটরগত এবং মুখে হাসি। তাঁর কণ্ঠদেশে নাগহার। কপালে অর্দ্ধচন্দ্র। মস্তকের জটার একটি আকাশগামী। তিনি শোণিত পানরতা। নাগের যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছেন ও নাগশয্যায় স্থিতা। তাঁর কণ্ঠে পঞ্চাশটি মুণ্ড সংযুক্ত বনমালা বিরাজিত। উদরদেশ অতি বৃহৎ। তাঁর মস্তকে সহস্রফণাধারী নাগরাজ অনন্ত শোভা পাচ্ছে।

দেবী চারিদিকে নাগ ফণার দ্বারা বেষ্টিতা। নাগরাজ তক্ষক তাঁর বাম বাহুর কঙ্কণ, অনন্ত তাঁর দক্ষিণ বাহুর কঙ্কণরূপে শোভা পাচ্ছে। দেবীর কটিবন্ধ নাগ দ্বারা নির্মিত। তিনি রত্ন খচিত নূপুর ধারণ করেছেন। তাঁর বামভাগে শিবস্বরূপ কল্পিত বৎস অর্থাৎ বালক।

এই নাগযজ্ঞোপবীতিনী দেবি দ্বিবাহুবিশিষ্টা। তিনি নিজের দুটি কর্ণে নরদেহ যুক্ত কুণ্ডল ধারণ করে আছেন। তাঁর মুখ প্রসন্ন ও আকৃতি সৌম্য। এই নবরত্ন বিভূষিতা শিবমোহিনী দেবীকে নারদ আদি ঋষি মুনিগণ সেবা করছেন। অট্টহাসযুক্তা এই দেবী মহাভয়ঙ্করী দেবী কালিকা সাধকের অভীলিত বর প্রদানকারিণী।

পূজা, মন্ত্র সাধনা ছাড়াও এই স্তোত্র পাঠে কল্যাণ এবং অভীষ্ট ফলদায়ক। শুধুমাত্র এই সব পাঠেই সাধক সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

শ্রীকালিকা অর্গলম্

ওঁ অস্য শ্রীকালিকার্গল স্তোত্রস্য ভৈরব ঋষিঃ
অনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীকালিকা দেবতা
মম সর্বসিদ্ধিসাধনে বিনিয়োগঃ।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ওঁ নমস্তে কালিকে দেবি আদ্য বীজত্রয় প্রিয়ে।
বশমানয় মে নিত্যে সর্বেষাং প্রাণিনাং সদা।।
কুর্চ্চযুগ্মং ললাটে চ স্থাতু মে শববাহিনা।
সর্বসৌভাগ্যং সিদ্ধিঞ্চ দেহি দক্ষিণ কালিকে।।
ভুবনেশ্বরি বীজযুগ্মং ভ্রূ যুগ্মে মুণ্ডমালিনী।
কন্দর্প রূপং মে দেহি মহাকালস্য গেহিনি।।
দক্ষিণে কালিকে নিত্যে পিতৃকাননবাসিনী।
নেত্রযুগ্মং চ মে দেহি জ্যোতিরালেপনং মহৎ।।
শ্রবণে চ পুনর্লজ্জাবীজযুগ্মং মনোহরম্।
মহাশ্রুতিধরত্যঞ্চ মে দেহি মুক্ত কুন্তলে।।
হ্রীং হ্রীং বীজদ্বয়ং দেবি পাতু নাসাপুটে মম।
দেহি নানা বিধিমহাং সুগন্ধিং ত্বং দিগম্বরে।
পুনস্ত্রীবীজ প্রথমং দন্তোষ্ঠরসনাদিকম্।
গদ্য পদ্যময়ীং বাজীং কাব্যশাস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতম্।।
অষ্টাদশ পুরাণানাং স্মৃতিনাং ঘোরচণ্ডিকে।
কবিতা সিদ্ধিলহরীং মম জিহ্বাং নিবেশয়।।
বহ্নিজায়া মহাদেবি ঘণ্টিকায়াং স্থিরা ভব।
দেহি মে পরমেশান্ বুদ্ধিসিদ্ধিরসাত্মকম্।।
তুর্যাক্ষরী চিৎস্বরূপা কালিকা মন্ত্র সিদ্ধিদম্।
সা চ তিষ্ঠতু হৃৎপদ্মে হৃদয়ানন্দরূপিণী।।
ষড়ক্ষরী মহাকালী চণ্ডকালী শুচিস্মিতা।
রক্তসিনী ঘোরদংষ্ট্রা ভুজযুগ্মে সদাহবতু।।
সপ্তাক্ষরী মহাকালী মহাকাল শবোদ্ধতা।
স্তন যুগ্মে সূর্যকর্ণো নরমুণ্ড সুকুন্তলা।।
তিষ্ঠ স্বজঠরে দেবি অষ্টাক্ষরি শুভপ্রদা।
পুত্রপৌত্রকলত্রাদি সুহৃন্মিত্রাণি দেহি মে।।
দশাক্ষরী মহাকালী মহাকাল প্রিয় সদা।
নাভৌ তিষ্ঠতু কল্যাণী শ্মশানালয় বাসিনী।।
চতুর্দশার্ণবা যা চ জয়কালী সুলোচনা।
লিঙ্গমধ্যে চ তিষ্ঠস্ব রেতস্বিনী মমাঙ্গকে।।
গুহ্যমধ্যে গুহ্যকালী মম তিষ্ঠ কুলাঙ্গনে।
সর্বাঙ্গে ভদ্রকালী চ তিষ্ঠ মে পরমাত্মিকে।।
কালি পাদযুগে তিষ্ঠ মম সর্বমুখে শিবে।
কপালিনী চ যা শক্তিঃ খড়গমুণ্ডধরা শিবা।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পাদদ্বয়াঙ্গুলিস্বঙ্গে তিষ্ঠস্বপাপনাশিনী।
কুল্লাদেবী মুক্তকেশী রোমকূপেষু বৈষ্ণবী।।
তিষ্ঠতু উত্তমাঙ্গে চ কুরুকুল্লা মহেশ্বরী।
বিরোধিনী বিরোধে চ মম তিষ্ঠতু শঙ্করী।।
বিপ্রচিত্তে মহেশানি মুণ্ডধারিণী তিষ্ঠ মাম্।
মার্গে দুর্মার্গগমনে উগ্রা তিষ্ঠতু সর্বদা।।
প্রভাদিক্ষু বিদিক্ষু মাম দীপ্তাং দীপ্তং করোতু মাম্।
নীলাশক্তিশ্চ পাতালে ঘনা চাকাশ মণ্ডলে।।
পাতু শক্তির্বলাকা মে ভুবং মে ভুবনেশ্বরি।
মাত্রা মম কুলে পাতু মুদ্রা তিষ্ঠতু মন্দিরে।।
মিতা মে যোগিনা যা চ তথা মিত্রকুলপ্রদা।
সা মে তিষ্ঠতু দেবেশি পৃথিব্যাং দৈত্যরূপিণী।।
ব্রাহ্মী ব্রহ্মকুলে তিষ্ঠ মম সর্বার্থদায়িনী।
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া মোক্ষদ্বারে চ তিষ্ঠ মে।।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কালিকাপুরবাসিনী।
শিবতাং দেহি চামুণ্ডে পুত্রপৌত্রাদি চানঘে।।
কৌমারী চ কুমারাণাং রক্ষার্থ তিষ্ঠ মে সদা।
অপরাজিতা বিশ্বরূপা জয়ে তিষ্ঠস্বভাবিনী।।
বারাহী বেদরূপা চ সামবেদ পরায়ণা।
নারসিংহী নৃসিংহস্য বক্ষঃস্থল নিবাসিনী।।
সা মে তিষ্ঠেৎ দেবেশি পৃথিব্যাং দৈত্যরূপিণী।
সর্বেষাং স্থাবরাদীনাং জঙ্গমানাং সুরেশ্বরী।।
স্বেদজোদ্ভিজশুজানাং নরাণাং চ ভয়াদিকম্।
বিনাশ্যাপ্যহভিমতং চ দেহি দক্ষিণ কালিকে।।
য ইদং চার্গলং দেবি যঃ পঠেৎ কালিকার্চনে।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি খেচরো জায়তে তু সঃ।।

শ্রীকালিকা কবচম্

ভৈরব্ উবাচ—
কালিকা য়া মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা।
তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরুষ্ব ১।।
কবচন্তু মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া।
য়দি নো কথ্যতে মাতর্ব্বিমুঞ্চামি তদা তনুংষ্ব ২।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীদেব্যুবাচ —
শঙ্কাপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতিগুহ্যতরং মহৎশ্চ ৩।।
কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী ৪।।
কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।
কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুল্লা তথোত্তরে।৫।।
বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তা তু চক্ষুষী।
উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণৌ চোগ্রপ্রভা মতা। ৬।।
বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা।
ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকং। ৭।।
মাত্রা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষোমুদ্রা সদাবতু।
মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিমণ্ডলদেবতা।৮।।
ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা।
ঊরু মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকং।৯।।
কৌমারী চ কটীং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকং।
অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীন্।১০।।
সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু।
রক্ষাহীনন্তু যৎস্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।১১।।
তত্সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোরদক্ষিণে।
ঊর্দ্ধমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ।১২।।
হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ।
দক্ষিণাকালিকা দেবী ব্যপকত্বে সদাবতু।১৩।।
— কালীকুলসর্ব্বস্বে কালীকবচং সম্পূর্ণম্।।

এইবার শত্রুধ্বংসের মুল কাজে প্রবেশ করতে হবে। শত্রু ধ্বংসের সহজ অর্থ এই যে, যে বিনা কারণে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করেছে, প্রতিনিয়ত আমাদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই অশুভ প্রবৃত্তির অবসান হোক। শত্রু যদি গোপন হয়, তাহলে 'অমুক'-এর পরিবর্তে 'গোপন শত্রু' শব্দটি উচ্চারণ করুন। মন্ত্র জপ করার সঙ্গে সঙ্গে পরের দিন ঘর থেকে সমস্ত জিনিসপত্র দক্ষিণ দিকে ফেলে দিন। এই পরীক্ষার ফলাফল এমনকি মামলায় সাফল্যের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের ভয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

সাধকের এই সাধনাটি কৃষ্ণপক্ষের যে কোনও রবিবার রাত ১২টার পরে করা উচিত। তন্ত্রবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এর কৌশলও অন্তর্ভুক্ত করেছে। সাধকের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

স্বয়ং গাঢ় বাদামী রঙের কাপড় পরিধান করে একটি কালো রঙের পশমী আসনে দক্ষিণমুখী হয়ে বসতে হবে এবং তার সামনে মাটিতে কাঠ-কয়লা দিয়ে নিচের যন্ত্রটি আঁকতে হবে। আগে থেকে সংগ্রহ করা আট আঙুল পরিমিত চারটি যজ্ঞডুমুরের ডাল নিন।

উপরে আঁকা যন্ত্রে যেখানেই সংখ্যাগুলি চিহ্নিত করা আছে সেখানে একটি করে কালো মাসকলাইয়ের বীজ রাখুন। মাঝখানে শত্রুর নাম লিখুন বা গোপন শত্রুর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'গোপন শত্রু' লিখুন এবং যজ্ঞডুমুরের ডালগুলি যন্ত্রের উপর সাবধানে রেখে দিন। এবার নিম্নলিখিত মন্ত্রটি মাত্র ১০০৮ বার জপ করুন। শুধুমাত্র কালো হকিকের অভিমন্ত্রিত জপমালা ব্যবহার করুন। জপমালাতে ১০০টি পুঁতি থাকতে হবে।

মন্ত্রটি নিম্নরূপ—ওঁ নমঃ কালসংহারায় মহাকালী (অমুক) হন্ হন্ ফট্ স্বাহা।

মন্ত্রজপের পরে যজ্ঞডুমুরের ডালগুলি শত্রুর বাসস্থানের চারিদিকে পুঁতে দিন। শত্রু তার কাজে বিরত থাকবে। মনে রাখবেন, মূর্খের দ্বারা করা পরীক্ষা তাকে ধ্বংস করে তাই কখনও এমন পরীক্ষা করবেন না। যদি প্রতিকুল পরিস্থিতিতে নিজেকে সর্বদা রক্ষা করতে চান তবে শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে রক্ষামূলক কবচ্ ধারন করতে হয়। সামনে বিপদ দেখে, নিজেকে রক্ষা করার জন্য সুরক্ষা কবচ্ আপনার অবশ্যই ধারণ করা উচিত।

নিয়োগকর্তাকে আকৃষ্ট করতে কালী বশীকরণ মন্ত্র

কখনও কখনও এমন একটি পরিস্থিতি হয় যখন চাকরিতে আপনার সাফল্য এবং পদোন্নতি নির্ভর করে আপনার অধিকর্তার পাশাপাশি অন্যান্য নির্বাহী সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্কের উপর। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্য পক্ষের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই মন্ত্রটি নিয়োগকর্তাকে পদোন্নতি পেতে এবং নিয়োগকর্তার সাথে ভাল সম্পর্ক রাখতে আকৃষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়।

এই ক্রিয়াটি শুক্রবার থেকে শুরু করুন। পুজো রাত্রি এগারোটার পরে শুরু করবেন। প্রথমে নিয়মমতো ভগবতী কালীর পুজো করুন। এবার জগন্মঙ্গল কবচ পাঠ করুন। তারপর জপ শুরু করুন। এই উদ্দেশ্যে জপ করতে সাদা কাপড় ও উত্তরীয় ধারণ করবেন, সাদা আসনে বসবেন। 'সংকল্প' গ্রহণ করার পর এই মন্ত্রটি প্রতিদিন ৫০১বার জপ করুন। কাঙ্খিত ফল পেতে ২১ দিন এই সাধনা করুন। ২১ দিনে জপ শেষ হলে ১১০০ আহুতি দিন। শক্তিযুক্ত গোলাপী স্ফটিক মালায় কালী বশিকরণ মন্ত্র জপ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালী বশীকরণ মন্ত্র—ওঁম্ ক্রীং ক্রীং ক্রীং অমুকং বশ্য মম আজ্ঞা পালয় পালয় ফট্।

ভৈরবী কালী সাধনা

বাঙালির আদি উদ্ভাবনা হল তন্ত্রধর্ম, যা আজকে আমরা শাক্তধর্ম নামে জানি। এই উপাসনা ধর্ম যে কত প্রাচীন তা বলা যায় না। কিছু পণ্ডিত বলেন, ঋগ্বেদের কালে রাত্রির উপাসনা আজকের কালী পুজো। হরপ্পা সভ্যতার ঊষা ছিলেন অবৈদিক দেবী, আর হরপ্পা সভ্যতা ছিলো মাতৃধর্মী তাই মাতৃকা উপাসনার শুরু হয়েছিল এই হরপ্পা সভ্যতায়। হরপ্পা সভ্যতায় পুজিত নিশা বা রাত্রি, যাঁর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার জগৎ সৃষ্টির দ্যোতনা, যিনি কালের নিয়ন্ত্রক বলে কালী এবং কালো রঙের দ্বারা প্রকাশিত হন বলেও কালী। তাই, বিগত চার হাজার বছর ধরে বাঙ্গলায় মা কালীর উপাসনা হয়ে চলেছে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর প্রাচীনতম প্রত্ন ক্ষেত্র হল পাণ্ডু রাজার ঢিবি, যা অন্তিম হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক। প্রাচীন 'বঙ্গ'-এর রাজধানী চন্দ্রকেতুগড়েও মাতৃধর্ম প্রচলিত ছিল। যে পাল রাজারা ভারতবর্ষে ৪০০ বছর রাজত্ব করে গিয়েছেন তারা তন্ত্রধর্মের ধারক ও বাহক ছিলেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ছিলেন মা চণ্ডীর (চুন্তা) উপাসক। ধর্মপাল মা তারার উপাসক ছিলেন। মহীপাল মা ভবানীর এবং নয়পাল মা চর্চিকার উপাসক ছিলেন। পালদের পরে সেনরা এই মাতৃধর্মী ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। অতীশ দীপঙ্কর তান্ত্রিক ছিলেন, বজ্রযোগিনীর উপাসক ছিলেন। পালযুগের শেষে যে সহজ আন্দোলন হয় অতীশ দীপঙ্করের পরম গুরু নারোপা ও নিগুমার নেতৃত্বে, সেখানে বজ্রযোগিনীর বিশিষ্ট রূপ নারো ডাকিনীর উপাসনা শুরু হয়, যেখান থেকে আজকে মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা। মধ্যযুগের বিপুল মাতৃধর্মের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা আগে জানতাম না। মধ্যযুগে মা চণ্ডীর চরণ ছুঁয়ে বাঙালি বারবার গৌড় পুনর্দখল করেছে, দেববংশীয় দনুজমাধব (দনুজ রায়) গৌড় পুনরুদ্ধার করে মহোৎসব অর্থাৎ দুর্গোৎসব পালন করেন ত্রয়োদশ শতকে, এবং পঞ্চদশ শতকে দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব গৌড় পুনরুদ্ধার করেন। এরপরে বাঙালির আধুনিক যুগের নবজাগরণের কেন্দ্রে আছে আমাদের আবহমান তন্ত্র, অগ্নিযুগের কেন্দ্রেও ছিল মাতৃধর্ম, সত্যিই আগে এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের কেউ দেখিয়ে দেয় নি।

এই বৃহত্তর বাঙ্গলা কালীক্ষেত্র। বঙ্গ দেশে মধ্যযুগে বারো ভূঁইয়ার অন্যতম যশোর সম্রাট প্রতাপাদিত্য কালীর উপাসক ছিলেন, তাঁর ইষ্ট দেবী ছিলেন যশোরেশ্বরী কালী যা মানসিংহ চুরি করে নিয়ে জয়পুর রাজমহলের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ব্রহ্মানন্দর শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী এবং আগমবাগীশের তন্ত্রসার সাক্ষ্য দেয় যে মা কালীকে কেন্দ্র করে বাঙালির অন্ধকার মধ্যযুগ আলোকিত হয়েছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগে দশ হাজার কালীপুজোর আয়োজন হত সারা নদীয়ায়। রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত ও অন্যান্য সাধকদের শাক্তগান সাক্ষ্য দেয় বাঙ্গালীর আদি ও অন্ত কালীময়। সাংখ্য দর্শন হল তন্ত্রের অন্যতম আদি রূপ, যেখানে প্রকৃতির প্রাধান্য। এই প্রকৃতি হলেন আদ্যা, নিত্যা, অব্যক্তা ও জগদকারণ। ইনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিশ্বচরাচর, জীব ও জড়, নারী ও পুরুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, চেতন ও অচেতন জগতের উৎস, বিস্তার ও বিলয়।

পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়লেই বোঝা যায় যে নবদ্বীপে সকলেই শাক্ত ছিল। অনেকেই বাসুলীর পুজো করতেন যা আজকে বিশালাক্ষী উপাসনায় ধরা আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বহস্তে একটি শ্রী শ্রী চণ্ডী পুস্তক অনুলিপি করেছিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ছিলেন শাক্ত অবধূত, তিনি ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র সর্বদা নিজের বুকে ধারণ করতেন এবং খড়দায় তাঁর শ্রীপাট মন্দিরে আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপুজো হয়। 'বাংলায় আগে সবাই বৈষ্ণব ছিল' এমন ভাবনা করা কি সঠিক, যখন কৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা? আমরা একটু গভীর চিন্তা করলে দেখবো যে, তন্ত্রধর্ম বা শাক্তধর্মই বাঙালির প্রাচীন, সর্বব্যাপী এবং বাঙালির একমাত্র পরিচিতি। বাংলার যে সকল বৈষ্ণবরা শ্রী রাধার উপাসনা করেন, তিনি নিজেই তো শক্তি স্বরূপা!

কলিযুগে তন্ত্রধর্ম অনুশীলনকারীদের মধ্যে দেবী কালীর নাম অত্যন্ত জনপ্রিয়। মাতৃদেবীর আরাধনা করে প্রত্যেক সাধক নিজেকে তার চরণে সমর্পণ করে অত্যন্ত নিরাপদ বোধ করে। কিন্তু, অনেক ভক্ত দেবীর করালী রূপকে ভয় পান, এইটি বাহ্যিক দৃশ্য রূপ, দেবীর আসল রূপ খুব মধুর। একজন দেবী-শক্তির রূপ তখনই ভীষণ ও ভীতিকর হতে পারে যখন তাঁর ভক্ত পাপ-কর্ম করেন, দেবী-শক্তি দানবীয় রূপ ধারণ করেন আমাদের শত্রু থেকে রক্ষা করতে, তা বাইরের শত্রু হোক বা অভ্যন্তরীণ শত্রুই হোক। তাই আদি-শক্তি দেবী কালীর সাধক কখনওই তাঁর ভয়াল রূপ দেখে ভয় পান না বা কোনও দ্বিধা বা সংকোচ রাখেন না। মহাকালের শক্তি, শ্রী মহাকালী সকল সময়ে ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকেন কারণ বাধা অতিক্রম করেই জীবন এগিয়ে যায় এবং সাধক জীবনের নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করেন। আদি শক্তি কালীর অনেক রূপ আছে, যার সবগুলোই শুভ। তারই একটি রূপ হল দক্ষিণা কালী। দেবী ত্রিনয়না, ও এই তিনটি নয়ন হল সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির স্বরূপ। এটি তাঁর তিনটি শক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, বাসনা এবং কর্মে পূর্ণ হওয়ারও একটি ইঙ্গিত, এটি ছাড়াও এটি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি অনুভূতিও। এইভাবে সত্ত্ব ভাবের রূপটি আমাদের অভ্যন্তরীণভাবে শুদ্ধ করে শান্তি নিয়ে আসে, তমঃ ভাবের মাধ্যমে বাহ্যিক শত্রুকে ধ্বংস করে এবং রজোভাব আমাদের শারীরিক জীবনে সুখ ও আনন্দ নিয়ে আসে। দেবীর এই রূপের সাধনা ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ম মতো করা অত্যন্ত কঠিন এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অর্জন করা খুবই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কষ্টকর। গুরুমুখী প্রথার কারণে দেবী সম্পর্কিত অনেক গোপন আচার-অনুষ্ঠানও প্রচলিত আছে। কিন্তু ছোট ছোট কিছু সাধনা গুরু ঐতিহ্যের কারণে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। এই সাধনাটি একটি বিরল এবং অথচ প্রয়োজনীয় সাধনা। মাত্র এক রাতের মধ্যে এই সাধনা সম্পূর্ণ করে সাধক নিজেকে খুব দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিতে পারে। এই সাধনায় সাধক নিম্নলিখিত কিছু ফল লাভ করে, যেমন —

এই সাধনা করলে সাধক তার সকল প্রকারের ভয় থেকে মুক্তি পায়।

* সাধক সমস্ত অজানা ভয় এবং আসন্ন বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা পায়।
* সাধকের চেহারায় আকর্ষণীয় ভাব তৈরি হয় এবং এমন আকর্ষণ তার কথাবার্তায়ও ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যার ফলে সাধকের প্রভাব বৃদ্ধি হয়।
* সাধকের প্রতি শত্রুদের অশুভ চিন্তা-ভাবনা বন্ধ হয়ে যায়।
* যদি সাধক পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এই সাধনাটি সম্পন্ন করে, তবে নিশ্চিতভাবেই সে এক রাতে স্বপ্নে কালীর কৃপা লাভ করে।
* এছাড়াও, সাধক তার দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে অনেক সুবিধা লাভ করে, যা সাধক তার জীবনে অনুভব করতে পারেন।

সাধনার নিয়মাবলী

সাধক যে কোন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে এই সাধনা করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সাধকের উচিত যে কোনও রবিবার রাত্রিতে এই সাধনা করা।

* এই সাধনা রাতের সময়, সময় ১১ টার সময় শুরু করা উচিত।
* এই সাধনায় প্রদীপ হতে হবে সরিষার তেলের এবং ধূপ হতে হবে চন্দনের গন্ধের।
* পূজার সময় সাধককে জবা ফুল বা লাল ফুল অর্পণ করতে হবে।
* সাধক যে কোনও ফল দেবীকে নিবেদন করবেন, তবে তা কাটা উচিত নয়। ফল গোটা হতে হবে। খোলা বাজারে তৈরি কোনো মিষ্টি ব্যবহার করবেন না, বাড়িতে তৈরি মিষ্টান্ন ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। হনুমানজী ও ভৈরবকেও ফল বা গুড় নিবেদন করুন। ভগবান মহাকালকে যে কোনও ফলও নিবেদন করা যেতে পারে।
* এই সাধনার সমস্ত মন্ত্র জপে, সাধক প্রবাল মালা, রুদ্রাক্ষ মালা বা কালো হকিক মালা ব্যবহার করতে পারেন।
* সাধককে প্রথমে স্নান করে লাল কাপড় পরিধান করতে হবে। তারপর সাধক লাল আসনে উত্তরমুখী হয়ে বসবেন।
* সাধক প্রথমে গুরু পূজা এবং গণেশ পূজা করবেন। এর পরে সাধক মানসিক

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভাবে ভৈরবের পূজা করবেন।

* এর পর সাধককে ২১ বার 'ওম ভ্রাং সর্ব করি সিদ্ধয়ে ভৈরবায় ফট্' ভৈরব মন্ত্র জপ করতে হবে। মন্ত্র জপ করার পরে, সাধক মানসিকভাবে ভগবান হনুমানের পূজা করবেন তারপর ২১ বার হনুমানজীর মন্ত্র 'হুম্ পবনন্দনায় ফট্' জপ করবেন। এর পরে, সাধনার সাফল্যের জন্য সাধকের মানসিকভাবে ভগবান মহাকালের কাছে প্রার্থনা করা উচিত এবং মহাকালের মন্ত্র 'ওঁম্ য়ং শং মং মহাকালায় ঘোররূপায় নমঃ' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করবেম।

এর পর সাধক তার সামনে কালীর মূর্তি স্থাপন করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সাধকের উচিত 'কালী যন্ত্র' স্থাপন করে যন্ত্রে মা কালীর (একাক্ষরী মন্ত্রের মত) স্বাভাবিক পূজা সম্পূর্ণ করবেন এবং দেবী কালীর মন্ত্র জপ করার জন্য দেবীর কাছে মানসিক অনুমতি নিতে হবে। সাধককে 'ওঁম্ ক্রীং ক্রীং ত্রিনয়নী কালিকে ক্রীং ক্রীং ফট্' মন্ত্রটি ১০০৮ বার জপ করতে হবে। মন্ত্র জপ শেষ হওয়ার পরে, সাধক যোনি মুদ্রায় দেবীকে প্রণাম করে দেবীর জপফল সমর্পণ করবেন। এবার সাধক নিজের ডান অঙ্গ দেখিয়ে দেবীকে প্রণাম জানাবেন। পরিপূর্ণ ভক্তিভাবে এই সাধনা শেষ হওয়ার পরে, সাধক নিজে ভোগ হিসেবে দেওয়া ফল এবং মিষ্টি ইত্যাদি খেতে পারেন এবং পরিবারের সদস্যদেরও খাওয়াতে পারেন।

সাধককে পূজার স্থানে একই কাপড়ের উপর ছবি/যন্ত্র/মূর্তি ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে। জপমালা নদীতে ডুবিয়ে দিতে হয় না, এই জপমালা সারাজীবন ব্যবহার করা যায়।

কামাখ্যা ভ্রমণ ও ত্রিপুরাসুন্দরী

২০২৩ সাল। আমরা চলেছি কামাখ্যাধামে। আমরা বলতে আমি, চিন্ময় বাবু, পায়েল, ভোলানাথ আর নানু। এবার আমরা অম্বুবাচীর তিনরাত কাটাবো ধর্মনগরের মাতাবাড়ীর ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে। তারপর ওখান থেকে ট্রেন পথে গৌহাটি হয়ে নীলাচল পাহাড়ে, সেখানে দুই রাত কাটিয়ে ট্রেনে কোলকাতা ফিরে আসা। এমন করেই মলয়বাবু টিকিট কেটে দিয়েছিলেন।

আকাশযাত্রাটা খুব মসৃণ ছিল। দমদম এয়ারপোর্টে সকালে ফ্লাইট, গন্তব্য আগরতলা। নির্ধারিত সময়ের আগেই, প্রায় পঞ্চাশ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম আগরতলা এয়ারপোর্টে। ছোট্ট, ছিমছাম, শান্ত এয়ারপোর্ট। লাগেজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে অটো ধরে শহরে চলে এলাম। দয়াময় জুয়েলারীর মালিক শ্রী অপূর্ব বণিক বাবু অপেক্ষা করছিলেন শহরের মহিলা থানার বিপরীতে আদর্শ হোটেলের সামনে। আমরা হাতমুখ ধুয়ে ঐ হোটেলেই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

খেতে বসে পড়লাম। খাওয়াদাওয়া সেরে একটা প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করে চললাম, আমাদের গন্তব্য এখন ধর্মনগর।

ত্রিপুরার অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য সারাটা রাস্তা নানু, মানে পায়েলের ছেলে, অতিউৎসাহী হয়ে বর্ণনা করতে করতে চলেছে আর আমরা সকলে ভাতঘুমের মেজাজে লক্ষ্য করতে করতে চলেছি। ধর্মনগরে যাওয়ার মাঝ-রাস্তাতেই ফোন করলেন ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের পাশের পুজাসামগ্রী ও পেঁড়ার দোকানের মালিক শ্রী সুব্রত রায় মহাশয়। তিনি মন্দিরের পাশেই হোটেল দেখে রেখেছেন। তার সাথে কথা বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেলাম মন্দিরের পাশের হোটেলে। মালপত্র নিয়ে হোটেলের ঘরে ঢুকে আমরা যার যার বিছানায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে এলিয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে একটুও দেরী হয়নি।

সন্ধ্যাবেলায় ঘুম ভাঙলো স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুজাসামগ্রী ও পেঁড়ার দোকানের মালিক শ্রী সুব্রত রায় মহাশয়ের ডাকে। উনি এসেছেন সন্ধ্যাবেলার চা পানের নিমন্ত্রণ করে উনার বাড়ীতে নিয়ে যেতে। আমারাও সাগ্রহে চোখেমুখে জল দিয়ে চললাম মন্দিরের নিকটবর্তী তার বাড়ীতে। আমরা যখন হোটেল থেকে বের হলাম তখন মায়ের মন্দিরে আরতি চলছে। ঢাক, ঘন্টা, কাঁসরের আওয়াজ শুনতে শুনতে পায়ে হাঁটা পথে মিনিট তিনেক হেঁটে তার বাড়ীত পৌঁছে গেলাম। এক মেয়ে, এক ছেলে, স্ত্রী ও অশীতিপর বৃদ্ধা মা নিয়ে তার সংসার। তার বসতবাড়ীটি মনোমুগ্ধকর। এখানে আসার পর থেকেই পায়েলের বর ভোলানাথ কেমন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছেন। সুব্রত বাবুর বাড়ীতে ঢুকেই ডানদিকের মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্দিরের বারান্দায় বসে পড়লেন। তার দেখাদেখি আমরাও একেএকে প্রণাম করলাম। আর চিন্ময়বাবু আমাদের সাথে আসেননি, চলে গিয়েছেন মন্দিরে। মায়ের দর্শন করে জপ করবেন বলে। নানু ততক্ষণে সুব্রত বাবুর ছেলের সমবয়সী বলে চলে গেল তার সাথে ভাব জমাতে। আমি ও পায়েল সুব্রত বাবুর সাথে ঘরে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুব্রত বাবুর স্ত্রী রাজশ্রী মা চলে এলেন চা নিয়ে। আমরা চা খেতে খেতে পরিচয়পর্ব সেরে বিভিন্ন আলোচনায় মেতে উঠলাম। এমন সময় হুইলচেয়ারে করে ধীরেসুস্থে সুব্রত বাবুর বৃদ্ধা মা আমাদের ঘরে ঢুকলেন। আমরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তিনি আশীর্বাদ করলেন। আস্তে আস্তে আমরা মন্দির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলে সুব্রত বাবুর মা বললেন—দেখো বাবা, উত্তর পূর্ব ভারতের একটি ছোট্ট রাজ্য হল এই ত্রিপুরা। কিন্তু এই রাজ্য এত ছোট ছিল না। সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক কারণে এত ছোট্ট হয়ে গেলেও আমরা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদকে মাথায় নিয়ে বেশ আনন্দেই আছি।

আমি জানি, ত্রিপুরা অনেক প্রাচীন রাষ্ট্র। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রগুলির কথা বলার আগে এটুকু বলি, মিং রাজত্বের সময় লিখিত চীনা রাজবংশের ইতিহাস 'মিংশিলু' -তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে ত্রিপুরার নাম। ত্রিপুরিদের উল্লেখ করা হয়েছে 'দি-উ-লা'

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নামে। 'মিংশিলু'-তে উল্লিখিত এই তথ্য নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। পরবর্তীকালে ভারতীয় শাস্ত্রে ত্রিপুরিদের 'কিরাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ত্রিপুরাকে বলা হয়েছে 'কিরাতদেশ'। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে উল্লিখিত হয়েছে ত্রিপুরা, এ ছাড়া পঞ্চমপাণ্ডব সহদেবের অভিযানে সম্মুখস্থ ত্রিপুরার রাজা এবং প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলির পরাজয়ের কথাও বর্ণিত হয়েছে। আবার ভীষ্ম পর্বে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কৌরবদের সেনাবাহিনীর বিন্যাসেও উল্লেখিত হয়েছে ত্রিপুরার কথা—দ্রোণের পাশে ছিলেন বীর অহম রাজ ভগদত্ত। ভগদত্তের পিছনে ছিলেন মেকল, ত্রিপুরা এবং চিচিলাদের সাথে কোশলের রাজা বৃহদ্বলা। ত্রিপুরার মহারাজা ত্রিলোচন যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অংশ নিয়েছিলেন তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাই মহাভারতে। বিভিন্ন পুরাণেও ত্রিপুরা রাজ্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এত প্রাচীন জনপদ হওয়া সত্ত্বেও আজও এই রাজ্যের মতই দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের কথা কিন্তু অনেকেরই অজানা। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত উত্তরপূর্বে হওয়াতে ও যাতায়াতের কিছু অসুবিধায় এই মনোহর ও আধ্যাত্মিক মন্দিরটি এখনও ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ ভক্তের কাছে অদেখা রয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম—আপনি ঠিক বলেছেন। আশা করি আমরাও মা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ লাভ করব।

সুব্রত বাবু তার মায়ের কথার রেশ ধরে বললেন—ইতিহাস বলছে, এই জায়গার আগে নাম ছিল 'রাঙামাটি'। প্রায় হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে রাঙামাটি তথা বর্তমান উদয়পুর ছিলো ত্রিপুরার রাজধানী। মন্দিরনগরী এই উদয়পুরের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং এখনও রয়েছে ছোট বড় বহু মন্দির, প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ। ঠিক এমনই এক সুপ্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় সাক্ষ্য বহন করে চলেছে শ্রীশ্রী ত্রিপুরেশ্বরী মাতাবাড়ি মন্দির।

আমার মনে পড়ে গেল যে ত্রিপুরার ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখেছিলাম—উদয়পুর শহর থেকে সামান্য দূরে মাতাবাড়ি গ্রামের এই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির অনেক প্রাচীন। পীঠনির্ণয় তন্ত্রানুয়ায়ী মাতা ত্রিপুরেশ্বরী হলেন ৫১পীঠের মধ্যে পঞ্চদশতম পীঠ।

'ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।

'ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ।।'—অর্থাৎ, দেবী সতীর ডান পা পতিত হয়েছে ত্রিপুরায়। দেবী হলেন ত্রিপুরাসুন্দরী আর ভৈরব হলেন ত্রিপুরেশ। দেবীর ভৈরব এই ত্রিপুরেশ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন মাতাবাড়ি থেকে প্রায় ৪ কিমি. দূরে উদয়পুর শহরের উপকণ্ঠে বিজয়সাগর দীঘির পাড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ত্রিপুরা সফরে আসা অসম রাজার দুই দূত তাদের বিবরণীতে দেবীকে 'ত্রিপুরা ঠাকুরানী' নামে উল্লেখ করেছেন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত সমসের গাজীর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ গাজীনামায় পাওয়া যায়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যে, সেই সময় ত্রিপুরার প্রজাসাধারণের মধ্যে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী পরিচিত ছিলেন 'মাতা ঠাকুরানী' নামে। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী হলেন ত্রিপুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অর্থাৎ ত্রিপুরার ঈশ্বরী তিনি, তাই হয়তো মায়ের ত্রিপুরেশ্বরী নামটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

মধ্যযুগের ত্রিপুরার প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, মহারাজ ধন্যমাণিক্য উদয়পুরে কূর্মপীঠের উপর এই মন্দির নির্মাণ করান ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে, কিন্তু বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগেই মহারাজ স্বপ্নাদেশ পেলেন ভগবতী আদ্যাশক্তির মুর্তি, চট্টগ্রাম থেকে দেবী চট্টেশ্বরীর বিগ্রহ এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হোক, কারণ এই কূর্মপীঠ ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম।

রাজমালার ধন্যমাণিক্য খণ্ডে রয়েছে—

'আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল।
বাস্তুপূজা সঙ্কল্প বিষ্ণুপ্রীতে কৈল।।
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহাসত্বে।।
চাটিগ্রাম চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।।
তথা হতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ।।'

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহারাজ ব্রাহ্মণদের সাথে পরামর্শ করে সেনাপতি রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণকে চট্টগ্রামে পাঠালেন দেবীবিগ্রহ উদয়পুরে নিয়ে আসার জন্য।

চট্টগ্রাম তখন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে আর ত্রিপুরেশ্বরীর এই বিগ্রহ চট্টগ্রামে এক গাছের নীচে চট্টেশ্বরী রূপে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। এই সম্পর্কে 'ত্রিপুর বংশাবলী'তে বলা হয়েছে, রাজাকে ভগবতী স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন যে—

'এই মঠে যদি আমা স্থাপন না কর।
তবে জান রাজা তোমার নাহিক নিস্তার।।
চট্টগ্রামে সদরঘাটে এক বৃক্ষমূলে।
পূজয়ে আমাকে সদা মগধ সকলে।।
সেই স্থান হৈতে শীঘ্র আনহ আমায়।'

যাই হোক রসাঙ্গমর্দ্দন মগেদের বিতাড়িত করে মহাসমারোহে দেবীবিগ্রহ উদয়পুরে নিয়ে আসেন। কূর্মপীঠের নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।

এই বিষয়ে রাজমালার বক্তব্য —

'রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে।
স্বপ্নে সেই স্থান দেখে মিলিলেক ভালে।।
উৎসব মঙ্গলবাদ্যে রাজ্যেতে আনিল।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সত্ত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল।।
কতদিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল।
পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল।।'

কিন্তু দেবীর সাথে একই বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হলেন শালগ্রামশিলা রূপে জগৎপালক বিষ্ণু যিনি আজও মন্দিরে রয়েছেন ও নিত্যসেবিত হচ্ছেন। শক্তিদেবী আর বিষ্ণুর সহাবস্থান এই মন্দিরকে দিয়েছে এক অনন্য স্বাতন্ত্র্য। হিন্দুধর্মের আপাত পরস্পরবিরোধী দুই মতের প্রতি ত্রিপুরার রাজাদের সহনশীলতা আর শ্রদ্ধাবোধও ফুটে উঠেছে এখানে। মন্দিরের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর ডানপাশেই প্রতিষ্ঠিত আছেন মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহের আদলেরই আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট কষ্টিপাথরের শক্তিবিগ্রহ, ভক্তরা এই দেবীকে 'ছোটমা' নামে ডাকেন।

আমার চিন্তার রেশ কেটে গেল সুব্রত বাবুর কথায়—৫০০ বছরের প্রাচীন এই মন্দিরে পরিবর্তন ঘটেনি পূজাপদ্ধতির, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের প্রচলিত নিয়মেই পুজো হয়ে আসছে আজ অবধি। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী পূজিতা হন ষোড়শী রূপে আর ছোটমা পূজিতা হন চণ্ডী রূপে। গর্ভগৃহে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আমি বললাম—ওহ্। তা মন্দিরের পূজারীরা কি বাঙালী?

সুব্রত বাবুর বললেন—উনারা এখন বাঙালী সংস্কৃতির অনুগামী হয়ে গেলেও এদের পূর্বপুরুষের দেশ হল উত্তরপ্রদেশ। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর মায়ের সেবাপূজার জন্য মাহারাজা ধন্যমাণিক্য কনৌজ থেকে বাৎস্য গোত্রের গদাধর পাণ্ডে এবং শাণ্ডিল্য গোত্রের ধনঞ্জয় পাণ্ডে নামক দুই ব্রাহ্মণকে এখানে নিয়ে আসেন ও নিষ্কর জমি দান করে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন সাথেসাথে তাঁদের চক্রবর্ত্তী উপাধিতে ভূষিত করেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি রোজ পশুবলি হয়?

সুব্রত বাবুর বললেন—মাতাবাড়িতে একসময় নরবলি হতো। শোনা যায়, মন্দির প্রাঙ্গণে দুটি তালগাছের সাথে সুলক্ষণযুক্ত কোনও হিন্দু বালককে বেঁধে বলি দেওয়া হতো, কিন্তু একবার বলির আগেই নাকি মায়ের বিগ্রহের অভিমুখ ঘুরে গিয়েছিলো অন্যদিকে। সেই থেকে মাতাবাড়িতে নরবলি বন্ধ হয়ে যায়। শোনা যায় মন্দিরচত্বরের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে দুটি তালগাছ রয়েছে সেখানেই নাকি নরবলি দেওয়া হতো।

নরবলির ইতিহাস আমার মনে পড়ে গেল। নরবলির প্রথা আমাদের কাছে এখন নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত বলে মনে হলেও হিন্দু ধর্মে এক সময় তা মনে হয়নি। শুধু হিন্দু ধর্মে কেন, সারা পৃথিবীর সকল ধর্মমতে ও সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীন সমাজে নরবলি প্রথাসিদ্ধ ছিল। নরবলি দেওয়া হতো ক্রুদ্ধ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের সাধারণ লাভ-ক্ষতির কথা বিবেচনা করে।

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে আদি বঙ্গে নরবলির ব্যাপক প্রচলন ছিল। নরবলি হতো কৃষিভিত্তিক সমাজে ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য। সেই সমাজে নরবলির রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হত ফসলের ক্ষেতে। প্রাচীন মানুষ ভাবতো, ফসলের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দেবী তুষ্ট হবেন। ক্ষেত ভরে উঠবে ফসলে। তাছাড়াও সেই রক্ত দিয়ে উপাসনা স্থান পরিষ্কার করার রীতিও প্রচলিত ছিল। কখনো কখনো গণনরবলিও সংঘটিত হতো; যেমন দ্রাবিড়দের কৃষিভিত্তিক নগর সভ্যতার প্রাক্কালে। এই বৃহত্তর বাঙ্গলায় অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর সাথে সাথে দ্রাবিড় ও আল্পীয় আর্য জনগোষ্ঠী প্রাচীন বাংলায় এসেছিল। তাদের ধর্মীয় কৃত্যে নরবলির প্রথা ছিল।

কালিকা-পুরাণে নরবলির লোমহর্ষক বিবরণ পড়লে আমাদের হৃৎকম্প হয়। কিন্তু দেবীকে প্রসন্ন করতে নরবলিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হত। রামায়ণে ঋষি ঋচীকের পুত্র শুনশেফকের বলির বর্ণনা পাওয়া যায়। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে—হিমালয় পার হয়ে মহাস্থানের পথে যেতে যেতে অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ অশ্বমেধ যজ্ঞের পশু হরণ করেন। অম্বরীষের পুরোহিত বলেন, রাজার দোষে পশু অপহৃত হওয়াতে রাজাকে নরবলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আবার মহাভারতের আদিপর্বে বাহাত্তরতম অধ্যায়ে নরবলির তথ্য পাওয়া যায়। কালিকা-পুরাণে নরবলির জন্য শত্রুরাজ্যের রাজপুত্রকে শ্রেষ্ঠতম বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর উচ্চজাতির যুবককে কয়েকদিন ভালো মতো খাওয়ানো হতো। তার পরে তাকে দেবীর প্রীতি কামনায় বলি দেওয়া হত। চণ্ডী, চামুণ্ডা, চর্চিকা বা কালীর পুজোতে নবমীর দিনে নির্দিষ্ট যুবককে মানকচুর পাতায় মুড়ে হাড়িকাঠে চাপিয়ে বলি দেওয়া হত। বাঙ্গলার আদি ইতিহাসে লক্ষ্মীমূর্তির সামনে নরবলি দেওয়ারও বিবরণ আছে। তার পরে সেই বলির সদ্যছিন্ন রক্তমাখা হৃদপিণ্ডটি রচনার পাত্রে রেখে পুরোহিত কালী মা কে প্রশ্ন করতেন—মা, তুমি তুষ্ট হয়েছো তো?

আগে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তান্ত্রিকদের একটা বিশেষ দল ছিল, যাদের বলা হতো কাপালিক। এই কাপালিকরা নরবলি দিত। তখন তান্ত্রিকরা অনেক বীভৎস আচরণ করতো। বলি প্রদত্ত মানুষের বুকের ওপর বসে করত ধ্যান। তারা ভাবতেন এভাবে লাভ করতে পারবে মহাশক্তি, এমন কি অমরতা। কখনো কখনো তান্ত্রিকরা বলির মৃতের মাথার খুলিকে পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করত ও নারীপুরুষ একসাথে বসে সেই খুলির পানপাত্র করে সুরা পান করত। যে কোনও শুভকাজে কালীপুজো ও নরবলি হতো।

হিন্দু শাস্ত্র মতে একটি নরবলিতে দেবী হাজার বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন, আর তিনটি নরবলিতে লক্ষ বছর তৃপ্তি লাভ করেন। মনুষ্য মাংস দ্বারা কামাখ্যা দেবী এবং ভৈরব তিন হাজার বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন।

আজ থেকে পাঁচ-ছ' শো বছর আগের ঘটনা। নরবলি নিয়ে উত্তরবঙ্গের এক গল্প কথা শোনা যায়। গল্পটা হল—এক রাজামশাইয়ের মহাকাল মন্দিরে নরবলির নিয়ম ছিল। প্রতিবছর বৈশাখী চতুর্দশীতে মহাকাল মন্দিরে নরবলি দিতে হত। তো সেই নরবলিতে একজন নাপিতের দুই ছেলেকে পর পর দুই বছর বলি দেওয়া হয়। নাপিতের তৃতীয় এবং শেষ পুত্র সন্তানকেও বলি দেওয়ার কথা জানিয়ে দেয় সেই রাজা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পুত্রের জীবন বাঁচাতে সেই নাপিত এক সাধকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সাধক তাদের অভয় দিয়ে বলেন, তোমরা নিশ্চিন্তে বাড়ী চলে যাও, তোমার ছেলেকে কেউ বলি দিতে পারবে না, আর খুব শীঘ্রই এই রাজার পতন হবে, এই রাজ্যে নরবলি প্রথা থাকবে না।

পরের দিন সকালে রাজার মহাকাল মন্দিরে পূজার আয়োজন চলছে। রাজামশাই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পুজোর যোগাড়ের কাজ তদারকি করছেন। মন্দিরের পুরোহিতদের একজন বললেন, মহারাজ, আপনি এবার প্রস্তুত হয়ে চলে আসুন, আপনি এলেই পুজো প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। ততক্ষণে পুজোর যোগাড় শেষ হয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে মন্ত্রপূত জল দিয়ে যূপকাষ্ঠটি ধোয়া হচ্ছে। ধোয়ার কাজে নিয়োজিতদের উদ্দেশ্যে পুরোহিত হাঁক ছাড়লেন—কই! বলির নর কে আনা হলো?

বলি দেওয়ার জন্য নাপিতের ছেলেকে স্নান করিয়ে পুরোহিতের সামনে আনা হল। পুরোহিত পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন সেই ছেলের। তারপর নাপিতের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন—তিনটে ছেলেকেই মহাকালের কাছে সমর্পণ করলি, তুই তো পুণ্যে আমাদেরকেও ছাড়িয়ে যাবি রে!

পুজো শুরু হল পুরোহিতের। নাপিত কাঁপতে কাঁপতে সেখানে বসে পড়লো। ছোট ছেলেটি এসবের কিছুই বুঝলো না। সে চুপ করে বসে অগাধ বিস্ময়ে মহাকালের পুজো দেখে যাতে লাগলো। শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে এই নির্জন জঙ্গলে মহাকালের পুজো চলছে। পুরোহিত, তার দুইজন সহকারী, বলি দেওয়ার জন্য একজন কর্মকার, তিন-চারজন বাদ্যকর, রাজা মশাই, নাপিত ও তার ছেলে এখানে উপস্থিত।

পুজো শেষ হল। গাম্ভীর্যের সাথে পুরোহিত ইশারা করলেন নাপিতের ছেলেকে যূপকাষ্ঠে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। রাজামশাই বললেন—বলিদান শেষ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, হাতে সময় আর খুব বেশি হাতে নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকঢোল বেজে উঠল। রাজা বিগ্রহের সামনে যজ্ঞকুণ্ডের কাছে একটা আসনে এতক্ষণ বসে ছিলেন। বলি হবে বলে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। পুরোহিত মশাই ও অন্য পুরোহিত বলির মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন আর একজন যূপকাষ্ঠের বলির তদারকি করছেন। বলির যোগ শুরু হতেই রাজামশাই হাত ইশারা করলেন। ততক্ষণে নাপিতের ছেলের মাথা যূপকাষ্ঠে আটকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলির দায়িত্বে থাকা পুরোহিত তখন কর্মকারকে আদেশ দিলেন বলি দিতে। আদেশ দিতে যতটুকু দেরী, কর্মকার নাপিতের ছেলের গর্দানে কোপ বসালেন। কিন্তু ছেলেটির ধড় মুণ্ডু আলাদা হল না। অবাক সকলে, পুরোহিত চিৎকার করে উঠলেন। কর্মকার আবারও কোপ বসালো। বিস্ময়ের ব্যাপার এবারও বলি হলো না। সকালেই একটু অবাক হয়ে গেলো। রাজামশাই বিব্রত হলেন। তিনি এবার তাড়া দিলেন—আবার করো! আবার কোপ বসালেন কর্মকার। কিন্তু এবারও কর্মকার বিফল হয়ে দুই পা পিছিয়ে এলো, খাঁড়া মাটিতে রেখে হাত জোড় করে দাঁড়ালো পুরোহিতের সামনে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এসে। সে তখন ভয়ে কাঁপছে!

এদিকে রাজা অবাক বিস্ময়ে সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যান্য সকলেই দেখার চেষ্টা করছেন কি সমস্যা হলো। বলির পুরোহিত তো রেগে অগ্নিশর্মা! 'অকর্মার দল'—বলে গজগজ করতে করতে নিজেই খাঁড়া উঠিয়ে নিয়ে ক্রমাগত বলি দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এমন সময় মনে হলো মুর্তিটা একটু নড়ে উঠলো! পুরোহিত বিষয়টা লক্ষ্য করে রাজাকে চিৎকার করে বললেন—মহারাজ, এ তো বড়ো অঘটন হলো। তাই শুনে হঠাৎ করে ঢাকঢোল বন্ধ হয়ে গেলো, সকলে চিৎকার করতে করতে হুড়োহুড়ি করে বের হয়ে এলেন মন্দির থেকে। বলির পুরোহিত মন্দিরের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন প্রচন্ডভাবে দুলতে শুরু করেছে বিগ্রহ, যে কোনো মুহূর্তে আছড়ে পড়বে দেওয়ালে।

এক মুহূর্ত সেই বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে আবার যূপকাষ্ঠের দিকে তাকালেন পুরোহিত। নাপিতের ছেলে তখনও সেখানে বন্দী। নাপিতের দিকে তখন নজর পড়লো। পুরেহিত দেখলেন নাপিত অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে। মুর্তি তখনও দুলছে। বলির পুরোহিত সাহস করে মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই চোখেমুখে জল ছিটিয়ে নাপিতের জ্ঞান ফিরালেন। সে তো হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো। তারপর পুরোহিত যূপকাষ্ঠ থেকে ছেলেটিকে আলাদা করে ফেললেন। ধীরে ধীরে থেমে গেলো বিগ্রহের দুলুনি। নাপিত অবাক বিস্ময়ে সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগলো। সবকিছু স্বাভাবিক হওয়ার পর করনীয় ঠিক করতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মন্দিরে উপস্থিত সকলে এতক্ষণে অবিশ্বাস্য এই ঘটনা দেখে আলোচনা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত ঘোষণা করলেন— 'এই নরের নিশ্চয়ই কোনও দোষ আছে! এর বলি হবে না!'

আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো নাপিত পিতা। তার দেহে যেন নড়ার শক্তিটিও অবশিষ্ট নেই আর। আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল সে। নাপিত দেখল তার সন্তানের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে, তবু নিজের চোখকে যেনো বিশ্বাস করতে পারছ না সে। ছেলেটি অবাক দৃষ্টিতে দেখছে নিজের শরীরের বাধন খোলার দৃশ্য। এ যেন যমের বাড়ীতে উঁকি মেরে ফেরত আসা, নতুন জীবন ফিরে পাওয়া। রাজা ঘোষণা করলেন—আজ থেকে বন্ধ হল নরবলি। সেই থেকে ঐ অঞ্চলে নরবলির প্রচলন বন্ধ হয়।

আমি সুব্রত বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—দেবী নিশ্চয়ই খুব জাগ্রত এখানে?

সুব্রত বাবু বললেন—এটি সতীপীঠ। ৫০০ বছরেরও বেশী হয়ে গেলো এই মন্দিরের স্থাপনা অথচ এত বছরের এত উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেও ত্রিপুরাবাসীর হৃদয় থেকে এতটুকু ম্লান হয়নি মায়ের মহিমা। ত্রিপুরার যে কোন হিন্দু বাড়িতে চলে যান, আর কিছু পান বা না পান, মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর একখানা ছবি পাবেনই। নিত্যদিন ত্রিপুরাবাসীর স্মরণে, মননে থাকে মায়ের নাম আর শুভকাজের প্রারম্ভে করতে হয় মায়ের দর্শন, বর্তমানে এ এক অলিখিত নিয়মের রূপ নিয়েছে ত্রিপুরায়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এরপরে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পরে আমরা উঠে চলে এলাম। আমাদের হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত ছিল। নীচে অর্ডার করে চলে এলাম আমাদের ঘরে। কিন্তু এখনও চিন্ময় বাবু আসেননি। তাই পায়েল চিন্ময়বাবুকে মোবাইলে কল করলো। চিন্ময়বাবুর মোবাইলের সুইচ্ অফ্। হয় তো চার্জ শেষ, এসে পড়বেন একটু পরেই। এই চিন্ময় বাবু খুব সাধাসিধে মানুষ। সংসারী পাটোয়ারী বুদ্ধি উনার একদমই নেই। আর ইষ্ট ও গুরুদেবের প্রতি তার অসীম ভক্তি। জপ-ধ্যানও নিয়মিত করেন, কোনও ত্রুটি নেই। স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে সুখের সংসার। পায়েল আবারও চিন্ময় বাবুকে কল করল, সুইচ্ অফ্। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। একে রাত্রিবেলা তার উপরে অচেনা জায়গা। নানুকে রেখে আমি, পায়েল ও ভোলানাথ চিন্ময় বাবুকে খুঁজতে একসাথে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে দেখি চিন্ময় বাবু উপরে উঠে আসছেন। তাই আমরাও ঘরের দিকে ফিরে চললাম।

আমি লক্ষ্য করলাম ঘরে এসে চিন্ময় বাবু একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছেন। মনে হয় জপে বিভোর ছিলেন। আমরা বাকি তিনজন নিজেদের কাজে বিভোর ছিলাম। চিন্ময় বাবু হাত-পা ধুয়ে এসে বসতে বসতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বাবু, আজ রাতে আমি কিছু খাবো না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পেটে কোনও সমস্যা হয়েছে?

চিন্ময় বাবু বললেন—না, আমি খেয়ে নিয়েছি।

পায়েল বলল—আমি তো হোটেলে খাবারের অর্ডার দিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে।

চিন্ময় বাবু বললেন—আমি রুটি, মাটন্ খেয়ে নিয়েছি, এক সাধুবাবা খাওয়ালেন।

পায়েল বলল—আমিও রুটি, মাটন্ অর্ডার দিয়েছি।

চিন্ময় বাবু বললেন—সাধুবাবাও তাই বললেন।

ভোলানাথ আশ্চর্য হয়ে চিন্ময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—সাধুবাবাও তাই বললেন মানে? আমরা কি খাব বা পায়েল কি খাবার অর্ডার করেছে তা সাধুবাবা জানলেন কি করে?

পায়েল বলল—কাকচরিত্র জানে হয়তো।

আমি চুপচাপ হয়ে গেলাম। মনোযোগ দিয়ে ওদের কথোপকথন শুনবো বলে মনস্থির করলাম। চিন্ময় বাবু বললেন—সে এক আশ্চর্যজনক মানুষ। উনাকে দেখলে আপনার মনেই হবে না যে উনি একজন সাধক মানুষ। খালি গা, কাঁধে একটা কম্বল আর পরনে ময়লা একটা খাটো কাপড়। একমাথা ধুলোবালি মাখা চুল। তবে গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল, ফর্সা, কিন্তু ময়লা। মন্দিরে উঠার সিঁড়ির একদম নীচের ধাপে বসেছিলেন। আমি মন্দিরে জপ করে নেমে আসার সময় অন্যান্য ভিক্ষুকের সাথে উনাকেও একটা পাঁচ টাকার কয়েন ভিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু উনার চোখের দিকে তাকাতেই শরীরে কেমন একটা শিহরণ হল। উনি পাঁচ টাকার কয়েনটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, এসো। বলে হাঁটতে থাকলেন। আমার সারা শরীর অবশ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হয়ে এলো। মনে হল উনি যেন চুম্বকের মতো আমাকে টানছেন।

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় নিয়ে গেল আপনাকে?

চিন্ময় বাবু বললেন—তখন আশেপাশে তেমন লোকজন ছিল না। উনি সিঁড়ি থেকে নেমে সোজা বাম দিকে হাটতে থাকলেন আর আমিও মন্ত্রার্পিতের মতো উনার পিছন পিছন মন্দিরের সামনের দিঘির ঐ পাশে নিরিবিলিতে এক আধো আলোছায়া গিয়ে বসলাম।

পায়েল বলল—চিন্ময় বাবু, একা একা যেতে আপনার ভয় করলো না?

ভোলানাথ কাহিনীটা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। এমন একটা রোমাঞ্চকর গল্পের মাঝখানে পায়েলের ঢুকে পড়ার কারণে বেশ বিরক্ত হয়ে পায়েলের দিকে না তাকিয়ে বললেন—ধুর্ তুমি থামো তো। চিন্ময় বাবু, তারপর কি হল?

এতক্ষণে হোটেলের খাবার এসে গিয়েছে। দরজা একটু খোলা ছিল। হোটেলের ছেলে দুটি দরজায় একটা ছোট্ট নক্ করে ঘরে ঢুকে এসে খাবার ও জলের বোতল রেখে চলে গেল। আমি চিন্ময় বাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, ভালো করে মুখের ভঙ্গী নজর করছিলাম। কি কি পরিবর্তন হচ্ছিল সেটা লক্ষ্য করছিলাম। চিন্ময় বাবু নির্বিকার ভঙ্গীতে বলে চললেন—আমরা দীঘির পাড়ে বসতেই একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটে এসে আমাদের কাছে ঐ সাধুবাবার গা ঘেঁষে বসল। মেয়েটি যেন দেবকন্যা। সাধুবাবা বললেন, ও এখানেই থাকে। আমিও আর কথা বাড়াইনি।

আমি এতক্ষনে চিন্ময় বাবুকে বললাম—আপনি ঐ লোকটাকে 'সাধুবাবা, বলছেন কেন?

চিন্ময় বাবু বললেন—ভদ্রলোক সব অলৌকিক কাণ্ড করলেন যে! বাবু, আপনার সাথে না এলে এমন ঘটনার সাক্ষী হতাম না। অসাধারণ সব ঘটনা। আর এমন ঘটনা তো সাধুমানুষই করতে পারেন, তাই।

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন অলৌকিক ঘটনা?

চিন্ময় বাবু বললেন—আমার অতীত জীবন নিয়ে দু-একটা ঘটনা বলে উনি বললেন যে এই মন্দির দর্শন করে আমরা না কি কামাখ্যায় যাবো আর আপনি না কি এখন পায়েল দিদির উপর কয়েকদিন খুব রাগ করে আছেন। কিন্তু আমরা যে এখান থেকে কামাখ্যা যাবো তা উনি জানলেন কি করে?

আমি বুঝতে পারলাম যে ভদ্রলোক একজন সাধক মানুষ, হয় কর্ণপিশাচী সিদ্ধ বা উনার মাতঙ্গীর সিদ্ধি আছে। আমি বললাম—পায়েল, ভোলানাথ, চিন্ময় বাবু, সকলে চলুন, আমরা ভদ্রলোককে খুঁজে আসি, তারপর এসে খাবো।

চিন্ময় বাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—এতক্ষণে উনি মন্দির চত্বর থেকে চলে গিয়েছেন, আজই কামাখ্যায় রওনা দিলেন, আর এও বলেছেন যে আপনার সাথে কামাখ্যায় গিয়ে উনার কথা হবে।

আমি বললাম—উনি বললেন যে আমার সাথে কামাখ্যায় গিয়ে উনার দেখা হবে,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উনি একথা বললেন?

চিন্ময় বাবু বললেন—হ্যাঁ বাবু, উনি বলেছেন। আপনার মতো আমার কোন জ্ঞান নেই ঠিক কথা তবে এটা বুঝলাম যে, সাধনার দ্বারা অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, তুই অনেক দুর যাবি।

ভোলানাথ একটা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল কোম্পানীর রিজিওনাল ম্যানেজার, ধার্মিক মানুষ, দীক্ষা নিয়েছেন, গলায় পাঁচটা রুদ্রাক্ষ মালা, জপ-ধ্যানও করেন, অনেক কষ্ট করে সাত দিনের ছুটি নিয়ে উনি এই সফরে এসেছেন। কিন্তু এমন একটা ঘটনার সাক্ষী না হওয়াতে মনে হয় কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন। কিছুটা ম্লান সুরে আমাকে বললেন—কাকু, আসুন খেয়ে নিই। আমরা খেতে বসলাম।

অম্বুবাচী এক লোকাচার

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতা।।'

অর্থাৎ কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—দশমহাবিদ্যার এক একটি রূপ। দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে আগে আলোচনা করা আছে বলে এখানে আর বিশদে আলোচনা করলাম না। এখানে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে এসেছি বলে এই বিষয়ে একটু কথা বলে নিই।

অম্বুবাচী সম্পূর্ণ ভাবে পূর্বভারতীয় রীতি ও লোকাচার। কি ভাবে এই লোকাচারের উদ্ভব সেই প্রসঙ্গেই আসছি।

দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্যেই দেবী কালীর পূজা করা হয়। দেবী কালীর আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দেবাসুরের যুদ্ধে পরাজিত দেবতাদের প্রার্থনায় আদ্যাশক্তি ভগবতি পার্বতীর দেহ কোষ থেকে দেবী কৌষিকী আবির্ভূত হন। তখন ভগবতি দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন বলে তাঁর নাম কালী বা কালিকা। এ হলো পুরাণের কথা।

বলা হয়, আমাদের বাংলায় দক্ষিণ কালীর পূজা প্রবর্তন করেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, আবার কালীনাথের 'শ্যামা সপর্যাবিধি'তে এই পূজার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। পূজায় বীজ মন্ত্রে দেবীকে আবাহন করা হয়। দুর্গা-চণ্ডী-কালী একই সত্তায় মহাশক্তি রূপে পরিণত হয়েছেন। 'দেবঃ তেজঃ সম্ভবা' রূপে তিনিই কালী কাত্যায়নী, চণ্ডী রূপে বধ করেন চণ্ড-মুণ্ড অসুরদ্বয়কে। দুর্গা রূপে বধ করেন দুর্গমাসুরকে। আবার তিনিই কালী রূপে পান করেন রক্তবীজ অসুর-রক্ত।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বহু নামেই তিনি বিরাজিতা—এই সব নাম ও রূপের বাইরেও মহাশক্তি সর্বত্র বিরাজ করছেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বৃক্ষে, লতায়, ওষধিতে, মানুষের দেহে, মনে, প্রাণে, বুদ্ধিতে, অহঙ্কারে, সবেতেই আছেন। তিনি আছেন মানব চেতনায়, স্মৃতিতে, শ্রদ্ধায়, নিদ্রায়, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্ষমায়, লজ্জায়, শান্তিতে, শক্তিতে। মাতৃ রূপে তিনি সর্বত্রই সংস্থিতা। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি কালিকা, তিনি শ্যামা, তিনি ভবতারিণী। কালিকাপুরাণে আমরা দেখি আদি শক্তিরূপে তিনি যোগীদের মন্ত্র ও তন্ত্র উদঘাটনে তৎপর। তিনি চতুর্ভূজা, খড়্গধারিণী, বরাভয়দায়িনী, নরমুণ্ডধারিণী। তিনি লোলজিহ্বা ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তিনি মুক্তকেশী, কৃষ্ণবর্ণা, শিববক্ষে দণ্ডায়মানা মাতৃমূর্তি। তিনি মূলতঃ শাক্তদের দ্বারা পূজিতা হন এবং কালীই দশমহাবিদ্যার প্রথমা দেবী ও বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। অন্ধকারবিনাশিণী তিনিই, দেবতা ও তাদের শুভাশুভ শক্তির সম্মিলিত রূপ তিনি। ধ্যানে আমরা তাঁকে মনন করি —

ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল কর্ত্তৃকাকরাম্।।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চর্তুবাহুসমাযুক্তাং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

কিন্তু প্রশ্ন হলো পৌরাণিক বা তৎপরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সমাজই কি কালীর উদ্ভব? উত্তর হল—না। কালীর বা দেবীর পূজা প্রাক আর্য যুগ থেকেই ভারতে প্রচলিত। সেই যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়াল রূপকে ঠিক মতো ব্যাখ্যা করতে পারত না। প্রাকৃতিক নানান দুর্যোগের কাছে তারা তখন নিতান্ত অসহায়। সেই জন্য তারা সেই সমস্ত অলৌকিক ও দুর্জয় শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন। প্রকৃতিকে স্বয়ং শস্যশ্যামলা মাতৃরূপে তথা মাতৃশক্তিরূপিনীকে জগদম্বা রূপে কল্পনা করত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও মহামায়াকে পরাশক্তির আধাররূপিনী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কালিকা পুরাণে আমরা দেখি, আদি শক্তিরূপে তিনি যোগীদের মন্ত্র ও মন্ত্রের মর্ম উদঘাটনে তৎপরা, পরমানন্দা সত্ত্ববিদ্যাধারিণী জগন্ময়ী রূপ তাঁর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টিই তাঁর। তাই ফলহারিণী কালীপুজোর জন্য অনেকেই বিভিন্ন ফলফলাদি বাজার থেকে কিনে পূজা দিয়ে থাকেন। এই ফলগুলিকে জীবাত্মার কর্মফলের প্রতীক হিসাবেই তারা মনে করেন। আসলে তা নয়, কালীর চরণে সকল কর্মফলের সমর্পণে সাধক হয়ে ওঠেন শুদ্ধাত্মা—কালীসাধনার এ এক অসাধারণ অধ্যায়।

কালী দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ, তাঁর রঙ কালো। সাধনার সুচলালগ্নে তো সাধককে অন্ধকার পথেই এগোতে হয়, কালী সাধনা যেন তাঁরই প্রতীক। এর পর আরো কত পথে কত সাধক সাধনা করেছেন, বিভিন্ন পথে খুজেছেন ইশ্বরকে, কালীর পরে তারা আর শেষে বন্দনা করেছেন মানবী রূপধারিণী দেবী ষোড়শীর। এই দেবী ষোড়শীই হলেন কালীর এক সুন্দরী ষোড়শবর্ষসম্পন্না বালিকার রূপ, যার সদ্য রজঃপ্রকাশ হয়েছে। এবার এই রজঃস্বলা বালিকা সন্তান ধারণ বা সৃষ্টি করতে সক্ষম। কামাখ্যা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেই রজঃস্বলা বালিকার রূপ। প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় আসামের নীলাচল পাহাড়ে অম্বুবাচী উপলক্ষে এক বিশাল মেলা বসে।

অম্বুবাচী, এক লোকাচার। গরমের মরশুমে বা গ্রীষ্মের দাবদাহে পৃথিবীর জীবকুলের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত ঠিক তখনউ বারিধারায় পৃথিবী শষ্যশ্যামলা হয়ে ওঠতে প্রস্তুতি নেয়। এই ঘটনাটিকে 'প্রতীক' হিসাবেই লোকাচারের মাধ্যমে 'অম্বুবাচী' ব্রতে পরিবর্তিত হয়েছে। শাস্ত্র বলছেন—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়ানাল্লিঙ্গমুচ্যতে।।

অর্থাৎ আকাশই লয়াত্মক লিঙ্গ বলে কথিত, পৃথিবী তাহারই পীঠিকা বা আসনস্বরূপ বা যোনি স্বরূপ। পিতাস্বরূপ আকাশ হতে বীর্যস্বরূপ বৃষ্টি, মাতাস্বরূপ বসুন্ধরাতে পড়ে তখনই বসুন্ধরা গর্ভবতী হন। তার সন্তানস্বরূপ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সেই বৃষ্টির জলে নতুন জীবনলাভ করে, শস্যশ্যামলা হয় বসুন্ধরা। গর্ভসঞ্চারের আগে মাতৃদেহের মতো প্রস্তুত হতে হয় পৃথিবীকে। দূষিত বস্তুকে মাটি থেকে নির্মূল করতে হয় গর্ভসঞ্চারের জন্য। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের পর যখন বর্ষার আগমনে ধরিত্রী সিক্ত হয় এবং নবরূপে বীজধারণের যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কখন নির্ধারিত হবে অম্বুবাচীর কাল বা সময়? শাস্ত্র বলছেন —

যস্মিন বারে সহস্রাংশু যতকালে মিথুনং ব্রজেৎ।
অম্বুবাচি ভবেন্নিতং পুনঃস্থকালবারয়োঃ—জ্যোতিষে।

অর্থাৎ, সূর্য আষাঢ় মাসে যে দিন যে সময়ে মিথুন রাশিতে আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে গমন করেন সেই সময়কাল থেকে মাতৃস্বরূপা পৃথিবী তার নব গর্ভসঞ্চারহেতু ঋতুমতী হন। এই সময়কে বলা হয় অম্বুবাচী অর্থাৎ জলবৃদ্ধি।

অম্বুবাচীর সময়ে বিভিন্ন কর্মে নিষেধ থাকে। শাস্ত্র বলছেন—

রজোযুকক্ষাম্বুবাচী চ রৌদ্রাদ্যপাদগে রবৌ।
তস্যাং পাঠোবীজবাপোনাহিভীর্দুগ্ধপানতঃ।
রজোযুক্ক্ষ্মা ঋতুমতী পৃথ্বী।।—মৎসসূক্তে।

ধরণ্যামৃতুমত্যাঞ্চ ভূমিকম্পে তথৈব চ।
অন্তরাগমনে চৈব বিদ্যাং নৈব পঠেদ্বুধ।।—জ্যোতিষে।

আর্দ্রানক্ষত্রের আদ্য-পাদে ধরিত্রী ক্ষারজোযুক্তা হন, তাকেই অম্বুবাচী বলে। এই সময় বসুমতী নবরূপে প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠেন, নিজেকে প্রস্তুত করেন নবসৃষ্টির জন্য তাই এই সময় বসুন্ধরা কে আঘাত করা, বৃক্ষ রোপন, ভূমিকর্ষণ, বেদমন্ত্র পাঠ ও বীজ বপন ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

এই লোকাচার সম্পূর্ণ ভাবে পূর্বভারতীয় কালী উপাসকদের বা প্রকৃতি পূজারীদের মস্তিস্কপ্রসূত। কামাখ্যার পূজা প্রচলিত হয় আদিম খাসিয়া জনজাতির হাত ধরে। এখন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

'পুরোহিত ব্রাহ্মন'-দের হাতে নতুন রূপ পেলেও আগম-নিগম শাস্ত্রে এই কয়দিন মন্দির বন্ধ রাখার কোনও অনুমোদন নেই। বামকেশ্বর তন্ত্রে ভগবান শিব বলছেন—

আষাঢ়স্য প্রথমে দেবী অম্বুবাচী দিনত্রয়ং।
সংগোপনে গৃহে দেবিং স্থাপয়েদ্বস্ত্রবেষ্টনে।।
রাত্রৌ মহানিশাযোগে পঞ্চাচারেণ দেশিকঃ।
পূজয়িত্বা বলিং দত্ত্বা হোময়িত্বা বিহারয়েৎ।।

এই সময় বস্ত্রবেষ্টনপূর্বক দেবীকে গোপনে রক্ষণ বিধেয়। এ সময় অভিষিক্ত ব্যক্তির পুরশ্চরণ কর্তব্য এবং তিনি মহানিশাকালে পঞ্চ 'ম'-কারে দেবীপূজা করবেন। সাধারণের পক্ষেও এসময় নিত্যপূজা বর্জনের সপক্ষে কোন যৌক্তিকতা নেই। তবুও একশ্রেণির পুরোহিত ও কূপমণ্ডুক কিছু মানুষ সারা দেশে বিভিন্ন মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রাখেন—যা অনুচিত। তবে কামাখ্যাধামেই একমাত্র এই মন্দির বন্ধ থাকে।

দেবী কামাখ্যা

কামাখ্যা নিয়ে রহস্যের শেষ নেই। অসম রাজ্যের 'কামাখ্যা' সতীর একান্ন পীঠের এক গুরুত্বপূর্ণ পীঠ। সতীর যোনি পতিত হয়ে কামাখ্যা মহামুদ্রাপীঠ রূপে খ্যাত হয়েছে। অন্নদামঙ্গলে লেখা আছে —

'মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগে যায়।
উমানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায়।।'

নীল পর্বতের চূড়ায় কামাখ্যা মায়ের মন্দির সতীর দেহত্যাগের স্মৃতি ধারণ করে আছে। কামরূপ কামাখ্যায় রয়েছে কত অনুষঙ্গ। মদনদেবের এক নাম কামদেব। সেই কামদেবের রূপ নতুনভাবে ফিরে এসেছিল কামাখ্যায়। ভস্মাচল, যা আজকের উমানন্দ শৈল, সেখানে মহাদেবের রোষে ভস্ম হয়েছিলেন কামদেব। আর কামাখ্যা এসে কামদেব শিবের নির্দেশে নিজের আগের রূপ ফিরে পেয়েছিলেন, তাই এই ক্ষেত্রের নাম 'কামরূপ'। কালিকাপুরাণে লেখা আছে —

'কামরূপে কামগিরৌ ন্যপতৎ যোনিমণ্ডলম্।
তত্রৈব ন্যপতভূমৌ পূর্বতো নাভিমণ্ডলম্।'

কামগিরির কামরূপে দেবীর যোনিমণ্ডল পড়ল। তারই পূর্বভাগে পড়ল নাভিমণ্ডল। এক অলৌকিক রহস্যময় আবেদন রয়েছে কামাখ্যা পাহাড়ে প্রতিটি কুণ্ডে। সকল মন্দিরেই তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। রহস্যে ঘেরা এই জলধারাই দেবীর অলৌকিকত্বকে প্রকাশ করছে। সারা কামাখ্যায় জলই তীর্থ। দেবীর যোনিমণ্ডলের জলই পবিত্র। আবার দেবীর নাভিমণ্ডলের জলই তীর্থ। গুয়াহাটির উজানবাজারে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জোড়পুখুরি স্থানে দেবী উগ্রতারার পীঠ রয়েছে ও এই মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত দেবীর নাভিমণ্ডল। দুটি কক্ষে পূজা হয়, প্রথম কক্ষে দেবী উগ্রতারা আর পরের কক্ষে ঘর ভর্তি জলের কুণ্ড আর কুণ্ডের উপরে শামিয়ানা টাঙানো আছে। জলের কুণ্ডটিই মূল পীঠ, কুণ্ডটি ঘেরা ও স্থানটি রহস্যে ঘেরা। দেবী এখানে অরূপা। নাভিরূপ জলমণ্ডলই উগ্রতারা তীর্থ। এই মণ্ডল ত্রিকোণ। বীজ হুঁ-কার। দেবীর দ্বারে নানা যোগিনীর অবস্থান। সমগ্র কামাখ্যা তীর্থে জল যে এত সুন্দরভাবে পূজিত হয় তা দেখলে অবাক হতে হয়। জলের উৎসস্থানই তো রহস্যে ভরা।

দক্ষযজ্ঞের পরে যেখানে যেখানে সতীর অনন্য অঙ্গ পতিত হয়েছিল সেখানেই মহাদেব সতীর স্নেহবশে বিমূঢ় হয়ে স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থান করলেন। কামাখ্যায় 'উমানন্দ' হলেন স্বয়ং সেই লিঙ্গ। তিনিই কামরূপিণী কামাখ্যার ভৈরব। ব্রহ্মপুত্রের বুকের ওপর থাকা ঘন গাছে ঢাকা দ্বীপে উমানন্দের অবস্থান। কামাখ্যা দর্শনের নিয়ম এমনই যে, প্রথমে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে দ্বীপে উমানন্দ ভৈরব দর্শন করে তবেই নীলাচল পাহাড়ে তিন রাত বাস করতে হবে, তারপর দেবী কামাখ্যার দর্শন, পূজন, প্রণাম ও তীর্থকাজ করা বিধি।

কামরূপ ত্রিকোণাকার। কামরূপের দৈর্ঘ্যে শতযোজন, তার বিস্তার ত্রিশ যোজন। ঈশানে কেদার, বায়ুকোণে গজশাসন, দক্ষিণে ব্রহ্মারেতঃ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম। ব্রহ্মারেতঃ শব্দের অর্থ ব্রহ্মপুত্র।

কালিকাপুরাণ লিখেছেন—

'কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরম্।
সদা সন্নিহিতস্তত্র পার্বত্যাসহ শঙ্করঃ।।'

মহাপীঠ কামরূপ। গুহ্যাদপি গুহ্যতর কামরূপ মহাপীঠে নিত্য পার্বতীর সঙ্গে শঙ্কর বাস করেন। তিনি এই পীঠে পুজিত হলে খুব দ্রুত প্রসন্ন হন। চতুর্বর্গ ফলপ্রদ গুহ্যপীঠ কামরূপ ছাড়া অন্য কোনও পীঠের নাম শাস্ত্র বলেননি, যেখানে তপস্যা করলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ কামরূপ-কামাখ্যাকে 'তীর্থ চূড়ামণি' বলেছে। এখানে লেখা আছে —

'তীর্থচূড়ামণিস্তত্র যত্র যোনিঃ পপাত হ।
তীরে ব্রহ্মনদাখ্যস্য মহাযোগস্থলং হি তৎ।।'

যে জায়গায় দেবীর যোনি পড়েছিল সেই স্থান 'তীর্থ চূড়ামণি' আখ্যা পেল। এই স্থান ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মহাযোগস্থল বলে জগতে হিতকর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দিকপাল, সিদ্ধ, চারণ সকলেই কামাখ্যায় উপস্থিত থেকে অহরহ ভগবতী সতীর আরাধনা করেন।

নীলাচল পর্বতের কামাখ্যাপীঠে এসে দেবীকে পুজো করার কিছু বিশেষ রীতি আছে। প্রথমেই যেতে হয় সৌভাগ্যকুণ্ডে। এই কুণ্ডরূপ পুষ্করিণীটি দেবী কামাখ্যার ক্রীড়াস্থল। কুণ্ডটি দুই ভাগে ভাগ করা। এক ভাগের জল পুণ্যার্থীরা ব্যবহার করেন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আর বাকি অংশের জল দেবী কামাখ্যার স্নানে, ভোগে ও পূজায় লাগে। প্রথমেই সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান বা কুণ্ডের জল মাথায় স্পর্শ, তারপর সৌভাগ্যকুণ্ডের সিঁড়িতে থাকা গণেশ বিগ্রহের কাছে জল স্পর্শ, ফুল নিয়ে সংকল্প করতে হয়। নিজের নাম, গোত্র, মাস, পক্ষ, তিথির কথা উল্লেখ করে অর্থদান করা বিধি। এখানে গণেশের কাছে কামাখ্যা দর্শনের অনুমতি নিয়ে কামাখ্যা দর্শনের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। সৌভাগ্যকুণ্ড ও দেবী কামাখ্যার গর্ভগৃহের মাঝখানে কম্বলেশ্বরের অবস্থান। দেবতার নাম কম্বলাখ্য। শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীমহাদেবের একাত্মবোধে হরিহর আত্মারূপে কম্বলাখ্য কামাখ্যাক্ষেত্রে বিরাজিত। কামাখ্যাভৈরব উমানন্দকে আগে দর্শন করতে না পারলে কম্বলাখ্য দর্শন করে মা কামাখ্যার কাছে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়।

কম্বলেশ্বর শুধু নয়, কামাখ্যার কোনও মন্দিরেই মুর্তি নেই, যোনিপীঠের গর্ভগৃহের মত ঘন অন্ধকারে প্রদীপের আলোই দিক-নির্দেশক। ফুল ও কাপড়ে কম্বলেশ্বরের গর্ভপীঠ আবৃত। এই মন্দির কুমারী পূজার জন্য বিখ্যাত। এরপর সৌভাগ্যকুণ্ডের পূর্বদিক দিয়ে পুণ্যার্থীরা সারিবদ্ধ ভাবে ধীরে ধীরে গর্ভকক্ষের দিকে এগিয়ে চলেন। কখনও উঠা কখনও বা নামা, সুশৃঙ্খল পরিবেশ। এই পথেই পড়বে বলিঘর। তার পাশ দিয়ে সারি দিয়ে যাওয়া।

গর্ভগৃহের আগের কক্ষে যে দেবী রয়েছেন তিনি কামেশ্বরী। ইনি কামাখ্যার চলন্তা মূর্তি। কেউ বলেন হরগৌরী মুর্তি, কারও মতে ইনি ভোগমূর্তি। দেবী যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়া নিয়ম। দেবীর চরণে ফুল, মালা, মিষ্টান্ন, অর্থ, চুনরি নিবেদন করা হয়।

দেবীর কাছে মন্ত্রোচ্চারণ —

'কামাখ্যে কামসম্পন্নে কামেশ্বরী হরপ্রিয়ে।
কামনাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরী নমোহস্তুতে।।'

নাম গোত্র ধরে পুজো হয়, এরপর দেবীর অনুজ্ঞামন্ত্র—

'কামদে কামরূপস্থে সুভগে সুরসেবিতে। করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।।

কামসম্পন্নে কামেশ্বরীর পিছনেই দেবী কামাখ্যার গর্ভগৃহের প্রবেশপথ। এই সেই গুহা যেখানে মহামুদ্রাপীঠ রয়েছে। প্রচণ্ড অন্ধকারে গুপ্ত গুহার নীচে নামতে হয়। দশটি সিঁড়ি পেরিয়ে নামতে হয়। দশটি সিঁড়ি দশ ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। আগেই বলেছি, যোনিমুদ্রা পীঠে নিবিড় আঁধার। বড় প্রদীপের আলোয় কক্ষটুকু আবছা দেখা যায়। দেবী কামাখ্যার কুব্জিকাপীঠ একটু নীচে লাল বস্ত্রে ঢাকা। কাপড়ের ওপর ভক্তের দান করা ফুল, ফল, মালা, অর্থ, কাপড় পড়ে আছে। যোনিপীঠ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পবিত্র জলধারা। দেবীপীঠের ওপর সোনার টোপর ঝুলছে।

আনন্দাখ্য মন্দিরের নিম্নাংশে অর্থাৎ গর্ভগৃহে গেলে বোঝা যায় এই অংশটি সবচেয়ে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রাচীন। কামাখ্যা মন্দিরে প্রবেশ করে গর্ভগৃহের তলদেশে সুগভীর আঁধারে ঢাকা, চারদিকে তাকালে বোঝা যায় মন্দিরের এই অংশ কত সুপ্রাচীন। কামাখ্যার চলন্তা মূর্তি দর্শন করে গর্ভগৃহের প্রবেশপথে পৌঁছালেই বোঝা যায় এই ক্ষেত্রটি একটি গুহা। সেই গুহার নাম কামদেবের নামে—মনোভব গুহা। কামাখ্যার এই গুহা, দেবীর যোনিপীঠ আবিষ্কার করে কামদেব দেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কাম দ্বারা আখ্যাত বলেই দেবীর নাম কামাখ্যা। শাস্ত্র বলছেন, এখানে মহামায়ার যোনিমণ্ডলে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে অন্তত একবারও তার জল পান করেন তাঁকে আর পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয় না। তিনি শ্রেষ্ঠ নির্বাণ পদপ্রাপ্ত হন।

কামাখ্যা মাকে প্রণাম করার মন্ত্র —

'কামাখ্যো বরদে দেবী নীলপর্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোহস্তুতে।।'

আবার যোনিপীঠ স্পর্শের মন্ত্র আলাদা —

'মনোভব গুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।'

চার হাত বর্গক্ষেত্র বিশিষ্ট দেবীপীঠ। এই সেই পবিত্র স্থান যেখানে সর্বদা পাতাল থেকে জলের ধারা উঠে আসছে। এ বড় রহস্যময়, কামাখ্যা মায়ের যোনিমণ্ডল, যার আয়তন দৈর্ঘ্যে এক হাত, প্রস্থে বারো আঙুল। দেবীপীঠ মাতৃঅঙ্গ, তাই পীঠের উপরের অংশ সোনার টোপরে ঢাকা দেওয়া তার উপরে কাপড় ও ফুলের মালা দিয়ে আচ্ছাদিত। পীঠের একটি অংশ দেখা যায়, সেখানটাই দর্শন ও স্পর্শন করা যায়। সতীর অঙ্গ থেকে পতিত হয়ে কামাখ্যাক্ষেত্রে যোনিপীঠ বিরাজিত হওয়ায় এই মহাতীর্থ শক্তিপীঠ রূপে জগতে বিখ্যাত হয়েছে। এই সেই পবিত্র স্থান যে তীর্থে দর্শন ও উপাসনা করাই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন তন্ত্রসাধকেরা।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—সকলেই মহাবিদ্যা নামে খ্যাত। দশমহাবিদ্যারূপে খ্যাতা পরমা আদ্যাশক্তি কালী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও চতুর্বেদের বন্দ্যনীয়া, তিনি ভোগদায়িনী আবার মোক্ষদায়িনীও। তাঁর মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গুপ্তভাবে রয়েছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হলেও তিনি সব কিছুর কারণ হলেও তাঁর অবস্থান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও অত্যন্ত গুপ্ত। সেই পরমাশক্তি চতুর্বগ প্রদায়িনী ও নির্বাণপদ প্রদায়িনী আবার তিনি দেবাদিদেবের প্রাণস্বরূপা ও সর্বদেবদেবীস্বরূপিণী। দশমহাবিদ্যার দশটি পীঠস্থান কুণ্ডরূপে এই কামাখ্যা পাহাড়ে আছে। দশমহাবিদ্যার 'ষোড়শী' রূপ হলেন কামাখ্যা। কামাখ্যা যোনিপীঠের পাশেই পূর্বদিকে দেবী মাতঙ্গী ও দেবী কমলা রয়েছেন। দু'জনেই কামাখ্যার সঙ্গে মনোভব গুহায় প্রতিষ্ঠিতা।

কামাখ্যা মন্দিরে প্রবেশের যে মুল পথ, যা ব্যাঘ্রদ্বার নামে পরিচিত, সেই ফটকে ওঠার মুখে সিঁড়ির ডান দিকে দুটি পরপর মন্দির। একটি কালী মন্দির, অন্যটি তারা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মন্দির। কালীমন্দিরে দেবীকুণ্ড কালীপীঠ। কয়েক পা উপরে তারার মন্দিরে শিলা পুজিতা। কালী ও তারা মন্দিরে দেবীর ছবি আছে বাইরে। আগেই বলেছি ষোড়শী আর কেউ নন, স্বয়ং কামাখ্যাদেবী। ব্যাঘ্রদ্বারে না গিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে একটু গেলেই ধূমাবতী মন্দির। রাস্তার মাপেই মন্দিরের চূড়া। কয়েকটা সিঁড়ি নেমে পাথরে মোড়া ধূমাবতীর গর্ভগৃহ। প্রাচীন শিলায় প্রাচীনত্ব ও দেবীত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। ধূমাবতীকে রেখে অনেকগুলি সিঁড়ি নীচে নামলে বাঁদিকে ভৈরবী মন্দির। এই মন্দির বীরাচারী তান্ত্রিকদের পীঠস্থান। সামনের পুকুরটি ভৈরবী কুণ্ড। ভৈরবী মন্দিরের কাছাকাছি কোথাও নরকাসুরের প্রাসাদ ছিল বলে জনমানসে বিশ্বাস। ভৈরবী চক্রের যে গুপ্তচর্চা তার আদি স্থল এই ভৈরবী পীঠ। দেবী ভৈরবী মন্দিরে শিলাপীঠের উত্তরাঙ্গ হয়, পশ্চিমাঙ্গ বিষ্ণুরূপী হেরুক ও দক্ষিণাঙ্গ ত্রিপুরভৈরবী। এই তিন ভাগে বিভক্ত ভৈরবীর শিলাপীঠ। শোনা যায়, ভৈরবী মন্দিরে গভীর অন্ধকারে না কি রাতে ভৈরবী চক্র চলে। এই বীরাচারী সাধনায় কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে সহস্রারে নিয়ে যেতে হয়। যে পথে সাধক সাধনা করেন, সেই কাজটি অত্যন্ত গোপন তাই গোপন রাখাই ভালো।

এবার একটু পিছিয়ে আসি। কামাখ্যা মন্দিরে উঠার সিঁড়ির মুখেই ডানদিকে ছিন্নমস্তা মন্দির। কয়েক ফুট নীচে বেশ বড় শিলায় যোনিপীঠ। প্রদীপের আলোয় অন্ধকারে বেশ রহস্যময় পরিবেশ। ছিন্নমস্তা কুণ্ডে অবিরাম জলের ধারা। ছিন্নমস্তা এখানে গুপ্তদুর্গা নামে পরিচিতা। নীলাচল পর্বতে কামাখ্যা মন্দিরের অগ্নিকোণে দেবী বগলামুখীর অধিষ্ঠান। মূল রাস্তা ধরে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে উঠার পথেই ডানদিকে বগলার ক্ষেত্র অনেকগুলি সিঁড়ি নেমে আবার অনেকগুলি সিঁড়ি উঠে বগলার দেবীপীঠ। নীলাচল পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে দেবী ভুবনেশ্বরীর গর্ভকুণ্ড। সারা পৃথিবীতে তন্ত্রসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ কামাখ্যার এই ভুবনেশ্বরী কুণ্ড। প্রাচীন মন্দির, প্রাচীন তীর্থ। লাল কাপড়ে আচ্ছাদিত ভুবনেশ্বরী কুণ্ডে নিবেদিত হয় রক্তজবা, গুলঞ্চ। ভুবনেশ্বরী মন্দির থেকে সমগ্র গুয়াহাটি শহর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র তার মৃদুমন্দ গাম্ভীর্য নিয়ে।

এক অলৌকিক রহস্যময় আবেদন রয়েছে কামাখ্যা পাহাড়ে প্রতিটি কুণ্ডে। সকল মন্দিরেই তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। রহস্যে ঘেরা এই জলধারাই দেবীর অলৌকিকত্বকে প্রকাশ করছে। আগে বলেছি, কামাখ্যা মন্দিরে দেবীর যোনিপীঠের পাশে গর্ভগৃহে যে শিলা অবস্থিত সেখানেই মাতঙ্গী ও কমলাপীঠ। একজন বিদ্যা অন্যজন সংস্কৃতির দেবী। মূল কামাখ্যা মন্দিরের গর্ভগৃহ সব সময় আঁধারের তীব্রতায় রহস্য প্রকাশ করছে। সেই অল্প আলোয় কুব্জিকাপীঠে কামাখ্যা, মাতঙ্গী, কমলার স্থান। জল বয়ে যায় ঝর্ণাধারার মতো। সেই জলই দেবী। সেই জলেই দেবীর পূজা হয়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কামাখ্যাদেবীর মাহাত্ম্য

একটি কাহিনী আছে কামাখ্যাদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে—একবার শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের ওপর চেপে আকাশপথে যাচ্ছেন। নীল আকাশ ভেদ করে গরুড় যাচ্ছেন। পথে পাওয়া গেল নীলাচল গিরি। সেই পর্বতে রয়েছেন দেবী কামাখ্যা। শ্রীবিষ্ণু দেবীকে কোনও গুরুত্বই দিলেন না, অবজ্ঞা করলেন। কামাখ্যাকে দর্শন না করে গরুড়কে নির্দেশ দিলেন কামাখ্যাক্ষেত্র দ্রুত অতিক্রম করতে। গরুড় যখন এগিয়ে চললেন তখন মহামায়া কামাখ্যা গরুড়ের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুকে আকাশপথে থামিয়ে দিলেন, একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। কামাখ্যার মায়ায় বিমোহিত গরুড় এগোতে বা পিছোতে, কোনওটাই পারলেন না। শ্রীবিষ্ণু রেগে গিয়ে গরুড়কে নড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এবার কামাখ্যাদেবী রাগে শ্রীবিষ্ণু ও গরুড়কে সিদ্ধসূত্র দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর অবলীলায় ও অবহেলায় দু'জনকেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ব্রহ্মপুত্রের জলে। দু'জনেই উত্থানশক্তিরহিত হয়ে নদে ডুবে গেলেন। শ্রীবিষ্ণুকে খুঁজে না পেয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে বিষ্ণু ও গরুড়কে অমন অবস্থায় দেখে দু'হাতে তোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! দেবী কামাখ্যার মায়ায় ব্রহ্মাও ব্রহ্মপুত্রে আটকে গেলেন। এবার এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনিও চেষ্টা করলেন কিন্তু ইন্দ্রও অনড় অবস্থায় গরুড়, শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মার সঙ্গে রয়ে গেলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি এঁদের খুঁজতে বেরিয়ে চলে গেলেন মহাদেবের কাছে। সেখানে তাঁদের অবস্থার কথা শুনে দেবগুরু ও মহাদেব মিলে ব্রহ্মপুত্রে গেলেন। তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে সব ঘটনা শুনলেন। মহাদেব তারপর 'কামাখ্যা-কবচ' পাঠ করলেন, যে পাঠে পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ দর্শন হয়। কামাখ্যা কবচের ঋষি বৃহস্পতি হওয়ার জন্য দেবগুরু কামাখ্যার মায়ায় আবদ্ধ হননি। মহাদেবের সঙ্গে বৃহস্পতি আসায় মহাদেবও কামাখ্যার মায়ায় আটকে যাননি। এই কবচের দেবতা কামেশ্বরী। ছন্দ অনুষ্টুপ। ঋষি বৃহস্পতি।

কামাখ্যা-কবচম্

'ওঁ কামাখ্যাকবচস্য মুনির্বৃহস্পতিঃ স্মৃতঃ।
দেবী কামেশ্বরী তস্য অনুষ্টুপচ্ছন্দঃ ইষ্যতে।।
বিনিয়োগঃ সর্বসিদ্ধৌ তঞ্চ শৃণ্বন্তু দেবতাঃ।
শিরঃ কামেশ্বরী দেবী কামাখ্যা চক্ষুষী মম।।
শারদা কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং তথা।
কণ্ঠে পাতু মাহামায়া হৃদি কামেশ্বরী পুনঃ।।
কামাখ্যা জঠরে পাতু শারদা পাতু নাভিতঃ।
ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু মহামায়া তু মেহনে।।
গুদে কামেশ্বরী পাতু কামাখ্যোরুদ্বয়ে তু মাম্।
জানুনোঃ শারদা পাতু ত্রিপুরা পাতু জঙ্ঘয়োঃ।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মাহামায়া পাদযুগে নিত্যং রক্ষতু কামদা।
কেশে কোটেশ্বরি পাতু নাসায়াং পাতু দীর্ঘিকা।।
ভৈরবী (শুভগা) দন্তসঙ্ঘাতে মাতঙ্গ্যবতু চাঙ্গয়োঃ।
বাহ্বোর্মে ললিতা পাতু পাণ্যোস্তু বনবাসিনী।।
বিন্ধ্যবাসিন্যগুলীষু শ্রীকামা নখকোটিষু।
রোমকুপেষু সর্বেষু গুপ্তকামা সদাবতু।।
বিন্ধ্যবাসিন্যঙ্গুলীষু শ্রীকামা নখকোটিষু।
রোমকূপেষু সর্বেষু গুপ্তকামা সদাবতু।।
পাদাঙ্গুলী পার্ষ্ণিভাগে পাতু মাং ভুবনেশ্বরী।
জিহ্বায়াং পাতু মাং সেতুঃ কঃ কণ্টাভ্যন্তরেহবতু।।
পাতু নশ্চান্তরে বক্ষঃ ঈঃ পাতু জঠরান্তরে।
সামীন্দুঃ পাতু মাং বস্তৌ বিন্দুর্বিন্দ্বন্তরেহবতু।।
ককারস্ত্বচি মাং পাতু রকারোহস্থিষু সর্বদা।
লকারঃ সর্বনাভিষু ঈকারঃ সর্বসন্ধিষু।।
চন্দ্রঃ স্নায়ুষু মাং পাতু বিন্দুর্মজ্জাসু সন্ততম্।
পূর্বস্যাং দিশি চাগ্নেয়্যাং দক্ষিণে নৈঋতে তথা।।
বারুণে চৈব বায়ব্যাং কৌবেরে হরমন্দিরে।
অকারাদ্যাস্তু বৈষ্ণব্যাঃ অষ্টৌ বর্ণাস্তু মন্ত্রগাঃ।।
পান্তু তিষ্ঠন্তু সততং সমুদ্ভববিবৃদ্ধয়ে।
উর্দ্ধাধঃ পাতু সততং মাং তু সেতুদ্বয়ে সদা।।
নবাক্ষরাণি মন্ত্রেষু শারদা মন্ত্রগোচরে।
নবস্বরাস্তু মাং নিত্যং নাসাদিষু সমন্ততঃ।।
বাতপিত্তকফেভ্যস্তু ত্রিপুরায়াস্তু ত্র্যক্ষরম্।
নিত্যং রক্ষতু ভূতেভ্যঃ পিশাচেভ্যস্তথৈব চ।।
তৎ সেতু সততং পাতু ক্রব্যাদ্ভো মান্নিবারকম্
নমঃ কামেশ্বরীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
য়া ভূত্বা প্রকৃতির্নিত্যা তনোতি জগদায়তম্।।

কামাখ্যামক্ষমালাভয়বরদকরাং
সিদ্ধসূত্রৈকহস্তাং শ্বেতপ্রেতোপরিস্থাং
মণিকনকযুতাং কুঙ্কমাপীতবর্ণাম্।
জ্ঞানধ্যানপ্রতিষ্ঠামতিশয়বিনয়াং
ব্রহ্মশক্রাদিবন্দ্যামগ্নৌ বিন্দ্বন্তমন্ত্র
প্রিয়তমবিষয়াং নৌমি বিন্ধ্যাদ্রতিস্থাম্।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মধ্যে মধ্যস্য ভাগে সততবিনমিতা
ভাবহারাবলী যা লীলালোকস্য কোষ্ঠে
সকলগুণযুতা ব্যক্তরূপৈকনম্রা।
বিদ্যা বিদ্যৈকশান্তা শমনশমকরী
ক্ষেমকত্রী বরাস্যা নিত্যং পায়াৎ
পবিত্রপ্রণববরকরা কামপূর্বেশ্বরী নঃ।'

এই কামাখ্যা কবচ শরীরে থাকলে যমভয়ও থাকে না। যিনি এই কামাখ্যা কবচ্ পাঠ করেন তিনি অনন্তকালের জন্য মহাদেবীর শরীরে প্রবেশ করেন। কামাখ্যা কবচ্ পাঠ শুনে শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্রদেব নিজেদের দেহে আলাদা আলাদা কবচ ধারণ করলেন। কামাখ্যা কবচ্ ধারণ করা মাত্রই তাঁরা মহামায়ার প্রভাবে ব্রহ্মপুত্রের গর্ভ থেকে উঠে পড়লেন। নদীর তীরে উঠেই তাঁরা নীলাচল পর্বতে চললেন। কামাখ্যা যোনিপীঠে পৌঁছে তাঁরা দেবীর প্রভাব বুঝতে পারলেন। সকলে সৌভাগ্য পুস্করিণীতে স্নান করে দেবীকে প্রণাম করলেন —

'ত্বমেব প্রকৃতিদেবী ত্বমেব পৃথিবী জলম্।
ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বমেব চ জগন্ময়ী।।'

—তুমি প্রকৃতি। তুমিই পৃথিবী ও জল। তুমি জগতের মাতা, তুমি জগন্ময়ী। তুমি প্রসন্না হও। তুমি প্রসন্না হলে দেবতারা প্রসন্ন হবেন।

এবার শ্রীবিষ্ণুর আর্তি শুনে দেবী কামাখ্যা দেখা দিলেন, বিষ্ণুকে বললেন—'ব্রহ্মা ও দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে তুমি আমার যোনিস্থিত জলে স্নান করো। সেই জল পান করো। তাতে তুমি অহংকার শূন্য হবে আর বিশেষ বীর্য লাভ করে গরুড়ে চেপে ব্রহ্মার সঙ্গে স্বর্গে গমন করো।'

মহামায়া কামাখ্যার নির্দেশে সবাই কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে পৌঁছালেন। পুণ্যজলে স্নান করলেন, সেই জল পান করলেন। আকাশপথে যেতে যেতে দেবতারা আকাশে স্থিত কামাখ্যাদেবীকে দেখতে পেলেন। আরও দেখলেন—নীল পর্বত সহস্রযোনি দ্বারা সঙ্গত হয়ে ঊর্ধ্বদেশ ও অধোদেশ জুড়ে ব্যাপৃত রয়েছে। সারা আকাশপথে দেবতারা কামাখ্যা যোনিমণ্ডলের স্তব উচ্চারণ করতে করতে স্বর্গের দিকে গেলেন। তাই কামরূপে জলেই হোক আর স্থলেই হোক যেখানেই পূজা করা হবে সেখানেই ফল লাভ হবে। কামাখ্যা যোনিতে যে ভক্ত একবার মহামায়ার পূজা করে সে ইহলোকে যাবতীয় অভিলষিত অর্থ ও পরকালে শিবসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, সে দীর্ঘায়ু হয়, অর্থলাভ করে। তিনিই মূল আর সকল দেবীই সেই মহামায়ার রূপভেদ। কামাখ্যাই মহামায়া।

সতীর যোনিমণ্ডল যে পর্বতে পড়ল মহামায়ার নিবিড় আলিঙ্গনে যোনিমণ্ডলের চাপ পর্বত সহ্য করতে না পেরে ক্রমশ পাতালের দিকে নামতে লাগল। যোনিমণ্ডল পর্বতে পড়ামাত্রই পর্বতটি নীলবর্ণ ধারণ করেছিল। তাই দেবতারা বড় শ্রদ্ধায় সেই পর্বতের নাম রাখেন নীলপর্বত। সেই পর্বত যখন নামতে থাকল বিষ্ণু ও শিব

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উভয়েই গিরিশৃঙ্গ ধারণ করলেন। কিন্তু পর্বত নামতেই থাকল। শেষে মহামায়া তাঁর নিজস্ব শক্তির আকর্ষণে নীলপর্বতকে থামিয়ে দিলেন। পূর্বে ব্রহ্মাপর্বত, পশ্চিমে বরাহ পর্বতের মাঝে যে শৃঙ্গ দেখা যায় তারই নাম নীলাচল। কামরূপ কামাখ্যার স্থান। পীঠমালায় লেখা আছে—'যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা'।

শিবদয়িতা কামাখ্যা দেবী সব মানুষের মোহের কারণে ও মহাদেবের প্রীতির জন্যে প্রতি দিন পঞ্চমূর্তি ধারণ করেন, এই পঞ্চ মূর্তি হল—কামাখ্যা, কামেশ্বরী, ত্রিপুরা, সারদা, মহোৎসহা। দেবী অষ্টযোগিনী পরিবৃতা থাকেন, এঁরা হলেন—কোটীশ্বরী, গুপ্তকাশী, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী, ধনস্থা ও প্রজটা। শিলারূপ যোনিমণ্ডলে মহাদেব লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। কামাখ্যার যোনিমণ্ডল তাই পঞ্চমহাদেব মিলে ঘিরে রেখেছেন—এঁরা হলেন, কামেশ্বর বামদেব, সিদ্ধেশ্বর ঈশান, কোটিলিঙ্গ তৎপুরুষ, হেরুক অঘোর ও আম্রাতকেশ্বর সদ্যোজাত হলেন পঞ্চ মহাদেব। সকল দেবতা তাই কামাখ্যা ক্ষেত্রে প্রস্তরত্ব পেয়ে শৈলরূপ ধারণ করে আছেন—এ ও এক গভীর রহস্য।

হাজো ও মদন কামদেব

আগরতলা থেকে আমরা ট্রেনে করে এসে ভোরবেলায় নেমেছিলাম গৌহাটি স্টেশনে। সেদিনই মন্দির খুলেছে তাই মন্দির অবধি কোনও গাড়ী যাচ্ছে না, রাতে গাড়ী চলা শুরু হলে পাহাড়ে উঠবো। সেই কারণে ঐ দিন পল্টনবাজারে একটা হোটেলে উঠলাম। দুটো ঘর ভাড়া করা হল—একটা আমি আর চিন্ময়বাবু থাকবো আর একটিতে পায়েল, ভোলানাথ ও নানু থাকবে। হোটেলে এসেই নানু বায়না করা শুরু করলো গৌহাটি শহর ঘুরে দেখবে বলে। তাই হোটেলে ফ্রেশ হয়ে টিফিন করে আমি আর ভোলানাথ ভাড়ার গাড়ী খুঁজতে বের হলাম।

গৌহাটি শহর ও নিকটবর্তী এলাকায় প্রচুর ধর্মীয় এবং দর্শনীয় স্থান আছে। প্রায় প্রতিটি স্থানই আমার ঘোরা। এর মধ্যে কয়েকটি দেখব বলে গাড়ী ভাড়া করে ফিরে এলাম হোটেলে। পায়েল ও নানু এতক্ষণে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। ওরা টিফিন করে নিতেই আমরা বের হলাম। চিন্ময় বাবু হোটেলেই থেকে গেলেন। আমাদের প্রথম গন্তব্য হাজো।

হাজো হল অসমের কামরূপ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারের প্রসিদ্ধ একটি তীর্থস্থান। এটি অসমের ;রাজধানী গুয়াহাটি থেকে প্রায় ২৪ কি.মি. দূরে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ও প্রাচীন তীর্থস্থান। এই হাজো অঞ্চলে বহু প্রাচীন মঠ-মন্দির ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে হয়গ্রীব মাধব দেবালয়টি মণিকুট পাহাড়ে অবস্থিত। ১৫৮৩ সনে রঘুদেব নারায়ণ দেবালয়টি নির্মান করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসবিদদের মতে এই দেবালয় পাল

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রাজবংশ ষষ্ঠ শতকে নির্মান করেছিলেন। এটি পাথর দিয়ে তৈরী। অনেক গুলো সিঁড়ি চড়তে হয় মন্দিরে পৌঁছতে। হয়গ্রীব কথাটির অর্থ ঘোড়ার গ্রীবা ও মাথা বিশিষ্ট বিষ্ণুর অবতার। মৎস্যপুরাণ, কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ এবং মহাভারতের 'শান্তিপর্বে' হয়গ্রীবের উল্লেখ আছে। কথিত আছে ভগবান বিষ্ণু এই রূপে দৈত্য মধু এবং কৈটভকে দমন করে তাদের হাত থেকে বেদ উদ্ধার করেন। প্রতি বছর বিহু, দোল ও জন্মাষ্টমীতে এখানে খুব বড় করে উৎসব হয়, মেলা বসে।

আমার পরিচিত কমল পাণ্ডা আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। অনেকদিন পরে দেখা। কুশল বিনিময়ের পরে ওর সাথে গিয়ে আমরা এখানে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এলাম। নানুর এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই, ও ট্যাব নিয়ে গেম খেলে চলেছে। এতক্ষণে পায়েল কমল পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করল—মাধব না হয় ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম কিন্তু হয়গ্রীব কোন দেবতা? এমন তো শুনিনি কখনও।

কমল বলল—আমি এত কিছু জানি না, তবে হয়গ্রীব হলেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার। ছোটবেলায় বাবার মুখে একটা কাহিনী শুনেছিলাম, বলতে পারি।

ভোলানাথ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে চারিদিকে চোখ বুলালেও কানটা ছিল আমাদের দিকে, উনি কমলকে বললেন—কাহিনীটা বলুন আপনি।

কমল বলতে লাগল—হিন্দু পুরাণ হল হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত অজস্র ঐতিহ্যবাহী কথামালার সংগ্রহ। এই হিন্দু ধর্মের অন্যতম জনপ্রিয় অবতার হলেন হয়গ্রীব। তিনি বিষ্ণুর অবতার। তাঁর নামে হয়গ্রীব উপনিষদও রয়েছে। ভগবান সূর্যের ছেলে রেবন্ত কোনো এক সময় উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়ায় চড়ে বৈকুণ্ঠে বেড়াতে এসেছিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা একে অশ্বরাজ, সে ও লক্ষ্মীর মতোই সমুদ্রমন্থনের সময় উদ্ভূত হয়েছিল। ঘোড়াটিকে লক্ষ্মী নিজের ভাইয়ের মতো দেখতেন। তাই উচ্চৈঃশ্রবা বৈকুণ্ঠে আসতেই তিনি স্বামীকে ছেড়ে ঘোড়ার আদরযত্ন নিয়ে পড়লেন। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা রেবন্তকে দেখে অবাক হলেন নারায়ণও। তিনি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই ছেলেটি কে? লক্ষ্মী তখন ঘোড়ার আপ্যায়নে ব্যস্ত। কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেও কথার উত্তর না পেয়ে লক্ষ্মীর উপর বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন নারায়ণ। স্ত্রীকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন—ঘোড়া নিয়ে এত আদিখ্যেতা যখন, তখন মর্ত্যে মাদীঘোড়া হয়ে জন্মাও গে! অভিশাপ শুনে লক্ষ্মীর খুব কষ্ট হয়। নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে তিনি শাপমুক্ত হয়ে আবার বৈকুণ্ঠে ফিরতে পারবেন। নারায়ণ বললেন, মর্ত্যে গিয়ে লক্ষ্মীর নারায়ণ-তুল্য এক ছেলে হবে। তারপরই লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে ফিরতে পারবেন। এরপর যথারীতি মর্ত্যে মাদী ঘোড়া হয়ে জন্মালেন লক্ষ্মী। মর্ত্যে গিয়ে তিনি শিবের তপস্যা করলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব বর দিতে এলে লক্ষ্মী বললেন, তাঁর সন্তান যেন নারায়ণের ঔরসেই জন্মায়। শিবের পরামর্শে নারায়ণ হয়গ্রীব অবতার গ্রহণ করে ঘোটকীরূপিণী লক্ষ্মীকে বিয়ে করলেন। তাদের ছেলে হলে লক্ষ্মী শাপমুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে চলে যান। এই হল মোটামুটি হয়গ্রীব অবতারের মূল কাহিনী।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভোলানাথ এবার কমলকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু আসামের মত শক্তিসাধনার দেশে বৈষ্ণব ধর্মের দেবতার পুজো হচ্ছে?

কমল বলল—দেখুন, এখানে আপনি তুলসীপাতার মালা, ফুল, মিষ্টি ভোগ দিয়ে পুজো দিলেন ঠিক কথা কিন্তু আজও বৌদ্ধাচারে তাঁর পূজা হয়। পূজারীরা হয়গ্রীবকে 'বুদ্ধমাধব' নামে সম্বোধন করেন। মূল মন্দির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে পালরাজা প্রতিষ্ঠা করেন।

ভোলানাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন—বলো কি!

কমল পাণ্ডা ধীরে ধীরে বলে চলল—আমি যতদুর জানি, বৌদ্ধ তন্ত্রে অমিতাভ ও অক্ষোভ্য কুলে তাঁর ৪টি মূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়।

ভোলানাথ আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে তুমি বললে যে কিছুই জানো না?

কমল পাণ্ডা বলল—দেখুন বাবু, ইতিহাস নিয়ে এমএ পাশ করে কোনও চাকরি-বাকরি পাইনি। দাদু-বাবার পেশায় এসে পেট চালালেও মন মানে না। তাই অবসর সময়ে একটু আধটু পড়াশুনা করি। আমার দুই মেয়ের বড়টাও ইতিহাস নিয়ে পড়ছে। আমিও ওর সাথে পড়তে বসে যাই। যাইহোক্, সাধনমালা গ্রন্থে চার 'হয়গ্রীব' মুর্তির কথা আছে। হয়গ্রীব, পরমাশ্ব, সপ্তশতিক হয়গ্রীব, লোহিত হয়গ্রীব। প্রথমের দুইজন অক্ষোভ্যকুলের ও শেষের দুইজন অমিতাভকুলের। এদের দেহের বর্ণ কখনও সাদা কখনও নীল কখনও বা লাল। চারটি রূপেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী। অক্ষোভ্যকুলে আবার বাঘের চামড়া পরিধানে আছে। তাঁর পরমাশ্বরূপ আবার ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী, মধুকর, রতি, বসন্ত, জয়কর প্রমুখকে পায়ের নীচে চেপে ও দাবিয়ে রেখে মর্দন করছে। তাঁর এই রূপ তন্ত্রের সাধনক্রম অনুযায়ী কামজয়ের ইঙ্গিতবাহী। তাই হয়গ্রীব নিঃসন্দেহে তন্ত্রে উপাস্য কামজয়ী জ্ঞানমূর্তি, তবে তাঁর মুর্তি শক্তিরহিত।

পায়েল এতক্ষণে একটু দুরে ছিল। একজন মহিলার সাথে দুরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আমাদের কাছে এসে ভোলানাথকে বলল—ওখানে আরও কয়েকটা মুর্তি রয়েছে দেখলাম।

কমল পাণ্ডা বলল—দেখুন বাবু, মন্দিরটির উপাসনাস্থলে থাকা প্রতিমূর্তিগুলি হল হয়গ্রীব বা বুঢ়া মাধব, তার বামদিকে আছে দ্বিতীয় মাধব বা বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রতীক গরুড়। আর রয়েছে চলন্তা মাধব, গোবিন্দ মাধব এবং বাসুদেব। বিষ্ণুর প্রতিমূর্তিটির সাথে উড়িষ্যার পুরীর জগন্নাথের মূর্তির সঙ্গে মিল আছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ লামারা প্রায়ই এখানে আসেন। তারা হয়গ্রীব মাধবের মূর্তিটি মহামুনি অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের বলে পূজা করেন।

ভোলানাথ বললেন—এ তো দারুন একটা কথা শুনলাম। ভারতের কোনও মন্দিরে মনে হয় না বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতার এমন সহাবস্থান আছে!

কমল নিজে থেকেই এবার ভোলানাথকে বলল—আরও একটা সংবাদ আপনাকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জানাই—ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসেছিলেন। মণিকুট পাহাড়ের নীচে বরাহকুণ্ডের পাশে একটি গহ্বর আছে। আমরা ঐ গুহার মত গহ্বরটিকে 'চৈতন্য ঘোপা' বলে থাকি। চৈতন্যদেব কিছুদিন এই গহ্বরে বাস করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময় ভাগবত পাঠ, মহোৎসব, সংকীর্তন ইত্যাদির প্রচলন করেন। তারপর তিনি হাজো থেকে পুরীতে চলে যান। সংস্কৃত গ্রন্থ 'কালিকা পুরাণ' এবং 'যোগিনী তন্ত্র' থেকে কামরূপ এবং রাজা নরনারায়ণের রাজত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। যোগিনী তন্ত্রের একটি কাহিনী চমকে দেওয়ার মতোই। সেখানে উল্লেখ করা আছে যে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুরীর সমুদ্রতীরে ভেসে আসা বিশাল বৃক্ষটি কুঠার দিয়ে সাতটি খন্ড করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি খন্ড কামরূপে নিয়ে এসে তা দিয়ে হয়গ্রীব এবং মাধবের (মৎস্য অবতার) বিগ্রহ তৈরি হয়। অর্থাৎ কোথাও যেন জগন্নাথের পুরীর সঙ্গে কামরূপের হয়গ্রীব মাধবের যোগসূত্র রয়েছে, এর ফলেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আসামে আগমন।

আমি চুপ করে এদের কথোপকথন শুনছিলাম। আমাদের দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি উপেক্ষা করে এরা দুইজন—ভোলানাথ ও পায়েল যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মন্দির ও তার ইতিহাস জেনে নিচ্ছে এতে আমি বেশ আনন্দই পেলাম। ভোলানাথ এবার আমার দিকে ফিরে বলল—চলুন কাকু, এবার দুপুরের খাওয়া কোন হোটেলে করে নিয়ে অন্য কোথাও যাই।

এরপর আমরা চলে এলাম মদন কামদেব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। শুনেছি গৌহাটি থেকে মঙ্গলদৈ যাওয়ার পথে বাইহাটা চারালি, এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে আমাদের গাড়ীটা কিছুটা এগোলে দেওয়ানগিরি পাহাড়ের দিকে, এখানেই 'মদন কামদেব' মন্দির। আগে এখানে আমি আসিনি। আমাদের গাড়ী গিয়ে থামলো মন্দিরের সামনে। গাড়ী থেকে নেমে আমরা কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরপ্রাঙ্গনে উঠে দেখি, মন্দির এখানে নেই, তবে একটি বড় টিনের চালার নীচে শিব-পার্বতীর (সামান্য ভাঙা) মুর্তি পুজিত হচ্ছেন আর চতুর্দিকে ছড়ানো-ছিটানো মন্দিরের ও পাথরের ভাঙা মুর্তি। এই মন্দিরের প্রধান দেবতা 'উমা-মহেশ্বর'। সবকিছু গোছানো থাকলেও যত্নের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু সকল মুর্তি এমন কি মূল মন্দিরটিরও ভগ্নদশা। পুরাতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণে এখন 'মদন কামদেব মন্দির' একটি আকর্ষণীয় ওপেন-এয়ার মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে।

একজন স্থানীয় গাইডকে পেলাম। উনাকে মন্দিরের এমন ভগ্নদশা বিষয়ে প্রশ্ন করাতে বললেন যে—এই মন্দিরের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে অসমীয়া পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে ভয়াল ভূমিকম্পে এই মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। মন্দির এলাকার আশেপাশে আরও অন্ততঃ ১২টিরও বেশি শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরবর্তীকালে আবিস্কার করা হয়েছে।

আসাম প্রদেশের আগে নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রাচীন গ্রন্থে আমরা প্রাগজ্যোতিষপুরের উল্লেখ পাই। আবার পরবর্তীতে যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরানে কামরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কামরূপ নামের সঙ্গে মদন বা কামদেব ও দেবী কামাখ্যার যে যোগসূত্র আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন, মদন কামদেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নবম বা দশম শতাব্দীর। সেই সময় এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন পাল রাজবংশের রাজারা। এই মন্দির, মনে হয়, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যযুগীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। মন্দিরটি প্রেমের দেবতা কামদেবকে উৎসর্গ করে তৈরী হয়েছিল বলে মন্দিরের ভাঙা মুর্তিগুলি দেখলে সহজেই বোঝা যায়। মন্দিরের আংশিকভাবে ভাঙা ভাস্কর্যগুলি কামদেব এবং তার স্ত্রী রতির প্রেমের কাহিনী, যৌন দেহ-সাধনার বিভিন্ন বিষয়, সহজযান ঘেঁষা সাধনা ও ভৈরবী সাধনার বিভিন্ন অনুষঙ্গ চিত্রিত করা আছে। মন্দিরে নাগারা স্থাপত্য ব্যবহার করা হয়েছে যাতে একশিলা পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য রয়েছে। নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ ভাস্কর্য, একটি ছয় মাথাওয়ালা ভৈরব, চার অস্ত্রধারী শিব, ভয়ঙ্কর চেহারার অসুরের ভাস্কর্য, দেবনর্তকী অপ্সরার পাথরের মূর্তি ও প্রচুর টুকরো টুকরো আংশিক ভাস্কর্য রয়েছে যা অজন্তা ও ইলোরার কাঠামোর সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। শিলা-পাথরের মূর্তিগুলি মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোর মূর্তিগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই একে আসামের খাজুরাহো মন্দিরও বলা যেতে পারে। যেহেতু মন্দিরের প্রধান দেবতা শিব তাই বিভিন্ন তিথিতে ভগবান শিবের উপাসনা করতে প্রচুর সংখ্যক পর্যটক এবং ভক্তরা এখানে ভিড় জমায়। ভাস্কর্য ছাড়াও মন্দিরের চারপাশে পাহাড় এবং পিছনের দিকে মদনকুড়ি নদী এক নয়ন জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও শান্ত পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে।

এক চৈনিক পরিব্রাজকের লেখায় এই মদন কামদেবে এক বিশেষ উৎসবের কথা বলা হয়ে থাকে, এর নাম কামোৎসব। এই সময় এরা সম্পূর্ন নগ্ন হয়ে এই মন্দিরে অবস্থান করতেন। ভক্ত নারী ও পুরুষ, একে অপরকে, তাদের নিজ হাতে আহার করাতেন। তখন তাদের জীবন্ত লিঙ্গেরও পূজা করা হত। তাদের ঘিরে কীর্তন ও মন্ত্র পাঠও করা হত। তান্ত্রিকরা দিগম্বর অবস্থাতেই সমস্ত উৎসবের সময় মন্দিরের বাইরের সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। বিভিন্ন বাসনা নিয়ে আসা কিছু নারী তাঁদের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভের আশায় এই সকল তান্ত্রিকদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হতেন। পুরুষ তান্ত্রিকদের পাশাপাশি অনেক নারী তান্ত্রিকদেরও দেখা পাওয়া যেত সেই সময়। পুরুষদের মতো তাদেরও অবাধ নগ্ন বিচরন থাকতো। পুরুষ ভক্তরা ঐ সকল দিব্যতা অর্জনকারী নারীদের যৌন সুখে তৃপ্ত করতে পারলে তাঁরা সেই সকল পুরুষ ভক্তদের তন্ত্রে মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতেন। তিন ধরণের তান্ত্রিক শক্তি প্রাপ্ত নারী-পুরুষকে কামাখ্যায় ও এতদঅঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা যথাক্রমে রতি, অঘোরী ও সতী। রতি লাল বসন ধারন করেন, অঘোরীদের বসন হয় কালো আর সতীদের বসন হয় সাদা। আর সেই রীতিরই উল্লেখ মেলে কামদেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে। এখানে এমন কিছু ভাস্কর্য্য আছে যা দেখলে বোঝা সম্ভব যে সমকামকেও গুরুত্ব দেওয়া

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হয়েছে সমানভাবে। প্রাচীন ভারতে সমকাম ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এছাড়াও কামসূত্র গ্রন্থ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে সমকামিতার বেশ কিছু কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

সনাতন হিন্দু ধর্মদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানসিক শান্তি বিসর্জন না দিয়ে এবং অত্যধিক কষ্ট ও যন্ত্রণা ছাড়া খুব সুন্দর একটি নিরুপদ্রব, অর্থপূর্ণ, মসৃণ ও আনন্দময় জীবন পরিচালনার পথ প্রশস্ত করা। এই বিষয়ে হিন্দুধর্মে জীবনযাপনের পদ্ধতিকে চারটি মূল ভিত্তির উপরে স্থাপনা করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এই চারটি উপায়কে একত্রে 'পুরুষার্থ' বলা হয়। হিন্দু ধর্মে চারটি পুরুষার্থ হলো চারটি সাধনা—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ।

হিন্দুর ধর্মজীবনে শাস্ত্র ধার্মিকতা অনুসরণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। জীবনের ক্রিয়াকলাপ যাই হোক না কেন, যদি তা সঠিক ধর্ম-অনুসারী হয় তবে এটি জীবনে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। হিন্দুধর্ম ধর্মহীন ভোগের নিরবিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের অনুমতি দেয় না; সবকিছুরই পূর্বনির্ধারিত সীমারেখা আছে, অসংযমী ভাব কখনওই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার, সমাজ, জাতির প্রতি এবং সমগ্র প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের প্রতি তার কর্তব্য এবং দায়িত্বে আবদ্ধ থাকে, এমনকি দেবতাদের ও পূর্বপুরুষের বিদেহী আত্মার প্রতিও একজন হিন্দুর দায়িত্ব এবং কর্তব্যের বাঁধনে জুড়ে থাকে। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত এবং মনুস্মৃতি ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য, সৎ জীবনের দর্শন ও আদর্শ বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে।

অর্থ, ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও ধন-সম্পদের পিছনে ছুটে চলা প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের একটি অপরিহার্য দিক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এটি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যেন না হয়ে ওঠে এবং অর্থোপার্জনের জন্য যা কিছু করা উচিত তা যেন ধর্মের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, এমনভাবেই একজন প্রকৃত হিন্দু জীবনযাপন করেন, অন্যথায় জীবন মরুভুমির মত শুষ্ক হয়ে উঠে দুর্ভোগের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে চলতে চলতে চরম কষ্টে জীবনের শেষ অংক অভিনীত হয়।

চারটি পুরুষার্থের তৃতীয় পুরুষার্থ 'কাম' দৈহিক যৌনসুখ সহ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 'আনন্দ'-এর সন্ধান করতে দিকনির্দেশনা করে। কামপ্রবৃত্তির প্রভাব ও তার প্রকাশ ও ব্যবহার সমস্ত প্রাণীর স্বভাব। তাই হিন্দুধর্ম নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কাম ভোগ করার অনুমতি দেয়। ধর্মকে উপেক্ষা করে দৈহিক আনন্দের জন্য বোহেমিয়ান ভোগকে অত্যন্ত নিরুৎসাহিত করে কারণ এই ধরনের ভোগ স্বল্পমেয়াদী আনন্দ আনতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কষ্টে শেষ হতে পারে।

জীবনের সমস্ত গ্রহণযোগ্য সাধনার মধ্যে, মোক্ষ (সংসার থেকে মুক্তি ; জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে) চাওয়াকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মানুষ, অর্থ (সম্পদ) এবং কাম (আনন্দ) অন্বেষণের জীবন অনুসরণ করার পরে এবং এমনকি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কঠোর ধর্মের (ধার্মিকতা) জীবনযাপন করার পরেও কোনও না কোনও সময়ে জীবনের অগভীরতা অনুভব করতে বাধ্য হয়। এমনকি একজনের জীবনকালের মধ্যেও, বার্ধক্যে শেষ হওয়ার প্রক্রিয়া একজনকে অর্থ ও কাম উপভোগ করা থেকে যে কোনও স্তরের যুক্তিসঙ্গত তৃপ্তি এবং মৃত্যুশয্যায়ও মনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপভোগ না করার জন্য হতাশার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করে।

এর ফলে পরবর্তী জন্ম হয় এবং চক্রটি চলতেই থাকে, কারণ সম্পদ বা ইন্দ্রিয়সুখের মৌলিক প্রকৃতি এমন যে কার্যত কেউ কখনও 'যথেষ্ট' অনুভূতি পায় না। সৃষ্টির এই দিকটি মায়া নামে পরিচিত। মায়া সর্বদা মানুষকে আরও বেশি বেশি ভোগে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রতারিত করে যা কেবলমাত্র আরও বেশি যন্ত্রণা বা অতৃপ্তির দিকে পরিচালিত করে।

জীবনের কোনো না কোনো সময়ে, কোনো না কোনো জন্মে বা অন্য কোনো সময়ে মানুষ ভাবতে শুরু করে যে তার সম্পদ ও ভোগের সন্ধানে মৌলিকভাবে কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কিনা। তিনি জন্মের প্রকৃত অর্থের জন্য আরও স্পষ্ট উত্তর খুঁজতে শুরু করেন। এই মুহূর্তে, একজন মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের খপ্পর থেকে বের হয়ে আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে ওঠে। বেদের কর্মকাণ্ড থেকে (যা পার্থিব ভোগের জন্য সমস্ত পদ্ধতি দিয়েছিল) একজন অন্বেষক নিজেকে জ্ঞানকাণ্ড - বেদান্ত/উপনিষদে উন্নীত করেন এবং তিনি এর সঠিক উত্তর এবং ব্যাখ্যা পান। ফলে তিনি অর্থ এবং কামকে পিছনে ফেলে মানসিকভাবে প্রস্তুত হন এবং জীবনের একমাত্র অর্থপূর্ণ সাধনা হিসাবে মোক্ষ লাভের জন্য সচেষ্ট হন।

কামসূত্র

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে মালঙ্গ বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' একটি কালজয়ী গ্রন্থ। নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন, কামকলা, অভিজাত শ্রেণীর সংস্কৃতি, এবং আমোদ-ফুর্তি বিষয়ে এ গ্রন্থটি বিগত প্রায় দু'হাজার বছর ধরে পাঠকদের আকৃষ্ট করে রেখেছে। সারা পৃথিবীতে বইটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করে, তবে সেটা 'কামসূত্র'র সামগ্রিক বিষয়বস্তুর কারণে নয়; মূলত বাণিজ্যের স্বার্থে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনের কারণে। পন্ডিতজনের ধারণা, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষায় যখন এ বইটি লেখা হয়েছিল তখন সমাজের অভিজাত শ্রেণীর ভিতরে ধর্ম এবং অর্থশাস্ত্রের পাশাপাশি কামশাস্ত্রের চর্চা ছিল। সংস্কৃত 'কাম' এর অর্থ বাসনা, প্রেম, আনন্দ, এবং যৌনক্রিয়া, অর্থাৎ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধ যে কোন আনন্দই কামের আওতাভুক্ত ছিল আর 'সূত্র'র অর্থ কোন নীতি বা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। বাৎস্যায়নের এই গ্রন্থের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উদ্দেশ্য 'কাম' অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ মানুষকে যথাযথ ধারনা প্রদান করা। উল্লেখ্য, 'কামসূত্র' শুধুমাত্র যৌনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের হরেক রকম বিষয়ে বিস্তারিত এবং বাস্তব-ধর্মী তথ্যাবলীর সমাবেশ ঘটেছে এখানে, যেমন: পোশাক, প্রসাধনী, বিনোদন, সমাজ, ক্রীড়া, বাড়ির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা এবং বহিরঙ্গের নান্দনিকতা। উপরন্তু, বাৎস্যায়ন কমবেশি মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, যৌন বাসনা, সমকামিতা, ভেষজ চিকিৎসা, এবং নারী যৌনকর্মীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে এখানে পরামর্শ দিয়েছেন। অতএব, এই বিষয়গুলো বিবেচনা করলে 'কামসূত্র' সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা বদলে যাবে। মূলত, 'কামসূত্র' প্রাচীন ভারতের মৌর্য এবং গুপ্ত সভ্যতার ৮০০ বছরের শিল্প সংস্কৃতির একটি লিখিত প্রমাণ। প্রকাশের পর থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত 'কামসূত্র' ভারতের সাহিত্য এবং শিল্পকলাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন কাল থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতে কামশাস্ত্রের চর্চা অব্যাহত ছিল এবং এই বিষয়ে রচিত একাধিক গ্রন্থ তার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। এই সময়ে রাজশক্তি ও তার পৃষ্ঠপোষকরা যৌনতার প্রতি ভারতীয়দের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলার জন্য আইন করে ভারতের শৃঙ্গাররস-কেন্দ্রিক সাহিত্য, শিল্পকলা, অভিনয়, এবং সঙ্গীতের প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ এনে এর নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। ফলে এই ধারার সাহিত্যকর্মের প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের দু'হাজার বছরের প্রবহমান কামশাস্ত্রের চর্চা উনিশ শতকে এসে ব্যাহত হয় আর তখন থেকেই এই সাহিত্যধারার প্রতি ভারতীয়দের, বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করে।

সম্ভবতঃ বাৎস্যায়ন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৩০০ এর মাঝে কোন এক সময়ে বাৎস্যায়ন 'কামসূত্র' রচনা করেছিলেন। কামসুত্রে অভিজাত শ্রেণির ভোগ-বিলাস এবং আভিজাত্যের ফিরিস্তি থেকে অনুমান করা যায় যে এ ধরণের গ্রন্থ রচনা তখনই সম্ভব যখন রাষ্ট্র ছিল সমৃদ্ধশালী, নগরবাসীরা ছিল ধনবান এবং বিলাস-ব্যসনে মশগুল থাকতো। সন্দেহ নেই যে, সময়টা ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং ওই জনপদ ছিল কোন রকমের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, এবং বিদেশী আগ্রাসন থেকে মুক্ত।

বাৎস্যায়ন যে নগরের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, কিংবা তাঁর রচনায় যে 'নগর' এর কথা উল্লেখ আছে—তার যথাযথ অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতজনের ভিতরে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন এ নগর ছিল পাটলিপুত্র, আবার কেউ অনুমান করেন নগরটি হলো বর্তমানের জয়পুর। তবে বেশিরভাগ পণ্ডিত অনুমান করেন যে এই অনুপম নগরটি ছিল উজ্জয়িনী। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত বলেন স্থানটির অবস্থান পশ্চিম ভারতেই ছিলো যা গুপ্ত যুগ এবং তার আগে থেকেই সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। তবে এই কথাও অনস্বীকার্য যে প্রাচীন মৌর্য এবং গুপ্ত যুগের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অভিজাত শ্রেণীর রুচি এবং সংস্কৃতির একটি লিখিত প্রমাণ এই 'কামসূত্র'। সেই সময় মগধ ছিল বিশ্বের বড় সাম্রাজ্যগুলোর একটি, যার আয়তন ছিল সত্তর লক্ষ বর্গ কিলোমিটার প্রায়। মৌর্য এবং গুপ্ত সভ্যতার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটেছিলো এই মগধে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতে মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। তাঁর পুত্র বিম্বিসারের শাসনামলে গৌতম বুদ্ধ এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু সৌধ-নগরী 'পাটলিপুত্র' নির্মাণ করেন। কামসূত্রে নাগরিকদের সামাজিক অবস্থান এবং তাদের সচ্ছলতার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে বাৎস্যায়নের এই নগরে বসবাসের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কেন না, পাটলিপুত্র ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি, সেই কারণে এই নগর পন্ডিত এবং বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করতো। অভিজাত শ্রেণীরা শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শিল্পী, নাট্যকার, কবি দার্শনিক এবং অর্থশাস্ত্রবিদরা ভাগ্যান্বেষণে এ নগরে বিচরণ করতেন, যেমন দত্তক, চাণক্য এবং বররুচি ইত্যাদিরা।

সে যাই হোক্, 'কামসূত্র' মৌর্য এবং গুপ্ত সভ্যতার জনজীবনের নানা রকম আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতির প্রামাণ্য গ্রন্থ, কেন না এ মূল্যবান সাহিত্যকর্মটি আসলে হাজার বছর আগে কামশাস্ত্র বিষয়ে রচিত একটি আকর গ্রন্থের সার-সংকলন। বাৎস্যায়নের পূর্ববর্তী লেখকরা সেই গ্রন্থটিকে সাধারণের পাঠযোগ্য করার জন্য পরিমার্জন এবং সংক্ষেপণ করেছিলেন। অনেকে আবার এই বিশাল গ্রন্থের অধ্যায়গুলোর ভিত্তিতে পৃথক-পৃথক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। মূল গ্রন্থটি লিখেছিলেন ভগবান শিবের সঙ্গী নন্দী মহারাজ। তিনি কামশাস্ত্র বিষয়ে এক হাজার অধ্যায়ের একটি বই লিখেছিলেন। নন্দীর বইয়ের বিশালতা তাঁর পরবর্তী লেখকরা সংক্ষেপ করে গেছেন। যেমন খ্রিষ্টপূর্ব আট শতকে উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু এটাকে ৫০০ অধ্যায়ে কমিয়ে আনেন। তারপর পাঞ্চলা দেশের লেখক বাভ্রু তাঁর শিষ্য ও পুত্রদের সাহায্যে এটাকে সংক্ষেপ করে ১৫০ অধ্যায়ে নিয়ে আসেন, এবং সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩ থেকে ১ শতকের ভিতরে একাধিক লেখক এই অধ্যায়গুলোর ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন দত্তক। তিনি পাটালিপুত্রের গণিকাদের পরামর্শে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভিত্তিতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিরোনাম দেন 'কামশাস্ত্র'। দত্তকের অনুকরণে সারন্য, সুবর্ণভা, ঘোটকামুখা, গোনারদিয়া, গণিকাপুত্রা এবং কুচুমারা বাকি ছয়টি অধ্যায় নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মাঝে সারন্য লিখেছিলেন সাধারণ মন্তব্যগুলো নিয়ে, ঘোটকামুখা এবং গোনারদিয়া নব-দম্পতিদের নিয়ে, গণিকাপুত্রা উপপত্নীদের নিয়ে, সুবর্ণভা লিখেছিলেন যৌন মিলনের বিভিন্ন কৌশল, এবং কুচুমারা লিখেছিলেন গুপ্ত তালিম বা শিক্ষণ নিয়ে। গোনারদিয়া-'র আরেক নাম পতঞ্জলি, যিনি 'মহাভাষ্য'র রচয়িতা। কিন্তু এ ধরণের খন্ড-বিখন্ডের ভিত্তিতে গ্রন্থ রচনার ফলে মূল পান্ডুলিপির মৌলিকত্ব নষ্ট ও খর্ব হয়ে গিয়েছিল, এমনটি দাবি করেছেন বাৎস্যায়ন এবং সেই কারণে ওই আলাদা আলাদা বিস্তারিত খন্ডকে সামনে রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্য তাকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বাৎস্যায়ন তার পূর্ববর্তী লেখকদের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, যদিও 'কামসূত্র' একটি সংকলন, কিন্তু এখানে সন্নিবেশিত সকল পরামর্শ এবং অনুশীলনগুলো তিনি নিজে পরখ করে দেখেছেন।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে কামকলার অধ্যয়ন এবং চর্চা হয়ে আসছে। 'কামসূত্র' গ্রন্থের প্রচার মধ্যযুগেই ভারতের বাইরেও পৌঁছে গিয়েছিলো। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কিংবা তার কিছু আগে রচিত 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ'-এ (৬.২.১২-১৩, ৬.৪.২-২৮)' কামশাস্ত্র চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম এবং অর্থশাস্ত্র'র পাশাপাশি প্রাচীনকালে কামশাস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন এবং অনুশীলন হতো এবং শিক্ষাটা সমাজের অভিজাত শ্রেণী, বণিক সম্প্রদায়, রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং অভিজাত গণিকাদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। সে যুগে সমাজে নারী যৌনকর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ধর্মশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, এবং অর্থশাস্ত্রে—তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতে দু'ধরণের যৌনকর্মীদের পরিচয় পাওয়া যায়; গণিকা এবং বেশ্যা। এর ভিতরে গণিকারা ছিলেন অত্যন্ত রূপসী এবং চৌষট্টি কলায় শিক্ষিতা। শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবেচনায় তারা সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাদের বাড়িতে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এবং সঙ্গীত নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা হতো। সমাজের অভিজাত শ্রেণী—এমনকি রাজাও তাদের সম্মান করতেন। এসব অভিজাত গণিকাদের সান্নিধ্য লাভের আশায় সবাই উন্মুখ থাকতো। তাই সহজকথায় বলা যায় যে, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' মূলত সমাজের অভিজাত এবং ধনপতি শ্রেণির আমোদ-প্রমোদ এবং কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা হয়েছে। এসব উচ্চবিত্তরা নগরে বাস করত এবং জীবন-যৌবন উপভোগ করার জন্য তাদের যথেষ্ট সচ্ছলতা ছিল।

বইটির মাত্র শতকরা কুড়ি ভাগ যৌন-মিলন নিয়ে আলোচনা আর বাকি অংশের লক্ষ্য—কিভাবে একজন পরিপূর্ণ মানুষের গুণাবলী অর্জন এবং পরিচ্ছন্ন জীবন উপভোগ করা যায়। মূলত, বাৎস্যায়ন মিলনের একঘেয়েমি কাটানো এবং পর্যাপ্ত দৈহিক আনন্দ লাভের জন্য বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৬৪ টি আসনের যে পরামর্শ দিয়েছেন, 'কামসূত্র' শুধুমাত্র ওইটুকুর জন্যই অতিরঞ্জিত এবং বিতর্কিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ শুধুমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'কামসূত্র' শুধুমাত্র যৌনমিলনের আসন-ভঙ্গির গ্রন্থ নয়, 'কামসূত্র'র উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক; দৈহিক আনন্দের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া এই গ্রন্থটির আরেকটি দিক তা কখনও আলোচিত হয়নি। বাৎস্যায়নের মতে, মানুষের জীবনে সময় ভেদে তিনটি লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকা উচিৎ; ধর্ম, অর্থ এবং কাম, এবং এ তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত। ধর্মশাস্ত্র পঠন-পাঠন এবং রপ্ত করার মাধ্যমে ধর্মচর্চা চালিয়ে যেতে হবে, অর্থ-ধন-দৌলত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য যেতে হবে বণিকদের কাছ আর কাম অর্থাৎ আনন্দ, কামনা-বাসনা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে 'কামসূত্র' শিক্ষায় এবং বিজ্ঞ নাগরিকদের কাছ থেকে। যৌনানন্দের চূড়ান্ত লক্ষ্য যে আধ্যাত্মিকতার কারণে, 'কামসূত্র'র শিক্ষা সেটাই। তাই,'কামসূত্র' হচ্ছে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আধ্যাত্মিকতা চর্চার একটি নির্দেশিকা।

হিন্দু ধর্মে কামকলাকে আধ্যাত্মিকতা চর্চায় অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের সহজাত তাড়নার অবদমনের ফলে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্ম দেয় বলে ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকেই যৌনতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুধর্মে মানবিক জীবনাচরণে যৌনতাকে অত্যন্ত পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক চর্চার একটি অপরিহার্য অংশ বিবেচনা করা হয়, বৃহদারণ্যক উপনিষদে নারীকে হোমাগ্নির সাথে তুলনা করে যৌনমিলনকে কৃত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বেদ-পুরাণেও মৈথুন বা কামকেলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা রয়েছে। ঋগ্বেদ-এ যম-যমীর সুক্তে বোন যমী তার ভাই যমকে যৌনমিলনের আহ্বান জানালে যম তা প্রত্যাখ্যান করে, কেন না এটা ধর্মবিরুদ্ধ। উপরন্তু, যম যমীকে পরামর্শ দেয় যে এটা সে অন্যের সাথে করুক—'তোমার প্রতি তার কামনা জাগুক আর তার প্রতি তোমার, অতঃপর তোমরা সুখী মিলনে রত হও।' যৌনতার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ছাপিয়ে এই উপমহাদেশের শিল্প এবং সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, খোদাইচিত্র, সংস্কৃত, হিন্দি, ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল এবং বাংলা সাহিত্যের পদাবলী কীর্তন, খেউর, তরজা, পাঁচালি, কবিগান, ঝুমুর এবং টপ্পায় আদিরস যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এবং এ নিয়ে ঔপনিবেশিক আমলের আগে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। ইহুদি এবং খ্রিষ্টান ধর্মে সৃষ্টির শুরু বিবেচনা করা হয় 'আলো' থেকে, হিন্দু ধর্মে সৃষ্টির শুরু 'কাম' থেকে। অতএব 'কাম' যে ধর্মে কৃত্যের পর্যায়ে সেখানে এর শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা অবান্তর। মানুষের জীবনে যৌনতার ভূমিকা অপরিসীম, সেই কারণে এ কথাটি প্রচলিত যে— 'লতাপাতা, শিকড়-বাকড়ে জ্ঞান ব্যতীত কবিরাজ, গণিতে জ্ঞান বিনা হিসাবরক্ষক এবং কামশাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতিরেকে বিবাহিত মানুষের কোনও মূল্য নেই' (ভা.গীঃ ১৮০)। সভ্যতার বিকাশে যৌনতার ভূমিকাকে খাটো করে দেখার যেমন অবকাশ নেই, তেমনি মানব জীবনের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতায় এর অবদানকে অস্বীকার করারও উপায় নেই।

বাৎস্যায়ন 'কামসূত্র'র তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশে দাবি করেছেন যে তাঁর এ বইয়ের লক্ষ্য নরনারীর যৌন-শিক্ষা যা কিনা তাদের আনন্দ এবং পূর্ণতা প্রদান করবে। তিনি আরও বলেছেন যে, মানবদেহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কামের আনন্দ প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন খাদ্যের (সূত্র ৪৬-৪৮)। অতএব নারী এবং পুরুষ দু'জনারই 'কামসূত্র' অধ্যয়ন করা উচিৎ; আর নারীদের তা করতে হবে যৌবনে পদার্পণের আগেই এবং বিয়ের পরেও, তাদের স্বামীদের অনুমতি নিয়ে এ চর্চা তারা চালিয়ে যাবে (সূত্র ১-২, ২য় অধ্যায়)। তবে এখানে তিনি অবিবাহিত নারীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত সঙ্গী বাছাইয়ের ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়েছেন। মালঙ্গ বাৎস্যায়নের পরামর্শ হল কোন সুশীল সমাজে নারীরা কোনও নির্জন জায়গায় 'কামসূত্র'-এর তত্ত্বের চর্চা, অনুশীলন এবং চৌষট্টিকলা অধ্যয়ন করবে। কামকলা ছাড়াও এই চৌষট্টিকলার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

(অঙ্গবিদ্যা) ভিতরে আছে কণ্ঠ সংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বাস্তুকলা, জ্যোতিঃশাস্ত্র, অলংকার নির্মাণ, শরবত এবং পানীয় তৈরি করা, কাব্যপাঠ, বাগান বিলাস, পুতুল নির্মাণ ইত্যাদি। নারীদের এই চৌষট্টিকলা রপ্ত করার লক্ষ্য শুধুমাত্র ভালো স্ত্রী হওয়ার জন্যই নয়; বরং দক্ষ, যোগ্য, সমঝদার, সুরুচিসম্পন্ন, সুন্দর এবং বুদ্ধিমতী নারী হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য। কোন নারী এসব অঙ্গবিদ্যায় পারদর্শী হলে যে-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে সচ্ছলতার সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। উল্লেখ্য, প্রাচীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই পান্ডুলিপি তৈরী হলেও বাৎস্যায়ন তাঁর রচনায় নারী এবং পুরুষদের একে-অন্যের পরিপূরক হওয়ার জন্য কামকলা অধ্যয়নে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙালির পল্লী সাহিত্য এবং লোকধর্মে কামকলা, দেহ এবং যৌনাচারের যথেষ্ট বিবরণ আছে এবং এটা যে 'অশ্লীল' এমন কোনো অভিযোগ ঔপনিবেশিক শাসনের আগে কেউ তোলেনি। পাঁচালি, খেঁউড়, কবিগানের পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন সমাজের অভিজাত শ্রেণীর, তাদের আর্থিক সহায়তায় এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো পরিচালিত হতো এবং তাতে গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের তল্পিবাহক দেশীয় চাটুকারেরা উপলব্ধি করছিল যে ভারতীয়দের সংস্কৃতির শিকড় তাদের জীবনবোধের অনেক গভীরে প্রোথিত এবং একে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে হলে এর মূলে আঘাত করতে হবে। তারা বুঝেছিল যে শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের থেকে ভারতীয়দের আস্থা টলাতে হলে ভারতীয়দের মনোজগতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং সেটা সম্ভব হবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে একটা নয়া শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, যার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে পাশ্চাত্যের শিল্প-সংস্কৃতি এবং ধর্ম শ্রেষ্ঠতর।

'কামসূত্র' হলো মনুষের সৃষ্ট এক অশ্লীলতা—এই ধারণাটা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে শিকড় গেড়ে বসার পরিণামে এই মূল্যবান গ্রন্থটির প্রকাশ্য চর্চা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এখনও শিক্ষিত শ্রেণি প্রকাশ্যে 'কামসূত্র' নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পায়। চৌষট্টিকলার একটি 'কামকলা' নিয়ে আলোচনায়ও বর্তমান যুব সমাজ তেমন আর গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে না, বিষয়টা সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। যেহেতু এটার প্রকাশ্য স্বীকৃতি সামাজিকভাবে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে এবং এই ধরনের গ্রন্থ পঠন-পাঠন একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে সাধারণের মাঝে এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে অসচেতন যুব-সমাজ যৌনতার দিকে থেকে সাংঘাতিক রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে। যে নিজের এবং তার সঙ্গীর দেহকে যথাযথভাবে বুঝতে অক্ষম তার পক্ষে পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করা সম্ভব নয়। দৈহিক এবং মানসিক আনন্দ লাভের জন্য সবার কামকলায় জ্ঞান থাকা উচিত, কেন না এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতার কারণে ঝগড়া-ঝাঁটি, দাম্পত্য কলহ, বিচ্ছেদ, বিশ্বাসহীনতা, পরকীয়া, ধর্ষণ এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ এর মূল কারণ। বাৎস্যায়ন এই বিষয়ে পুরুষদের সতর্ক করে দিয়েছেন; কোনো নারী যদি তার পুরুষ সঙ্গীর কাছে আনন্দ-তৃপ্তির

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অভিজ্ঞতা লাভ না করে, তাহলে সে তাকে ঘৃণা করবে এবং তাকে ছেড়ে অন্যজনের সাথে চম্পট দেবে। কামকলায় অনভিজ্ঞ পুরুষরা দৈহিক এবং মানসিক আনন্দ লাভের জন্য নারীদের সাথে পশুর মতো আচরণ করে। জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত থাকা আধুনিক মানুষের দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতার মূল কারণ যৌনতা সংশ্লিষ্ট— অতিরিক্ত মানসিক চাপ, সময়ের অভাবে পরস্পরের ইচ্ছা, চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা বুঝতে অনাগ্রহ। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ দু'হাজার বছর আগেই বাৎস্যায়ন বাতলে দিয়েছিলেন অথচ, আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সেটাকে দূরে ঠেলে রাখছি।

অতএব এটা এখন স্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক শাসনের আগে ভারতে যৌনতা বিষয়ে সাধারণের মাঝে যে ইতিবাচক মনোভাব বিরাজ করছিল, ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের পরে তাতে পরিবর্তন ঘটে। ঔপনিবেশিক প্রশাসন, মিশনারি, এবং তাদের সৃষ্ট ভারতীয় নয়া বুদ্ধিজীবীদের রক্ষণশীল মানসিকতাই ছিল কামশাস্ত্র চর্চার প্রধান অন্তরায়। এরা নানাবিধ কূটকৌশলে ভারতীয়দের মনোজগতে যৌনতা বিষয়ে সংকীর্ণ এবং অবাস্তব ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। এর পরিণামে ভারতে আদিরসের সাহিত্যধারার প্রতি সাধারণ মানুষের একটি বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। মূলত, যৌনতার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ব্যতীত বাকি ধর্মমতগুলির শিক্ষা, অজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর ব্যবধানই ভারতে কামশাস্ত্র চর্চার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ইংরেজরা কখনই ভারতে শিল্প-সাহিত্যের এই ধারাটি সম্পর্কে এতটাই আতঙ্কিত ছিল যে এটাকে আত্মস্থ করার চেষ্টাও করেনি। ঔপনিবেশিক আমলে কামশাস্ত্র রচনা ও প্রকাশনায় রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা ভারতবাসীর জন্য কোন শুভবার্তা বয়ে আনেনি। এ নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিক প্রত্যাখ্যানের পরিণামে ভারত উপমহাদেশ এখনও যৌনতার দিক থেকে অনেক কুসংস্কার এবং অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অথচ, এ ধারাটির যথাযথ চর্চা অব্যাহত থাকলে যৌনতার ব্যাপারে আমরা অনেক প্রগতিশীল চিন্তাধারা অর্জন করে এক হতাশাহীন, সুস্থ্য ও মানসিক আনন্দময় সমাজ লাভ করতে পারতাম।

সমকামিতা

যৌনতা বা কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে দেব-দেবী থেকে দানব, মুনি-ঋষি থেকে রাক্ষস, সাধারণ মানুষ থেকে পণ্ডিত ব্যক্তি, সকলকেই কামদেবতা মদন অকৃপণভাবে বাসনা নিবৃত্তির উপায় করে দিয়েছেন। কাম-ভাবনায় মদনদেবের কৃতিত্ব থাকলে যৌনক্রীড়া রতিদেবীর আশীর্বাদ। দেব-দেবী থেকে দানব, মুনি-ঋষি থেকে রাক্ষসদের রতিক্রিয়ার কথা শুনলে কান চাপা দেবেন অনেক সংস্কারি ও সনাতনী ধার্মিক মানুষ। অথচ পুরাণ হোক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কাম বা রতিক্রিয়া বা আধুনিক সময়ের সহজ ভাষায় বলা যৌনতা—সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রাকৃতিক উৎস থেকেই আসছে। এখানে কোনও

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ছুঁৎমার্গ নেই, নাক সিঁটকানো লজ্জা বা গোপনীয়তা নেই। সৃষ্টির কারণকে স্বাভাবিক জৈবিক ক্রিয়াতেই বেঁধেছিলেন মহর্ষি বাৎসায়ন। তাঁর 'কামসূত্র' কোনও মামুলি যৌনতা বিষয়ক গ্রন্থ নয়, নারী-পুরুষের কাম ও রতির সুস্থ-স্বাভাবিক জৈবিক ব্যাখ্যা। 'কামসূত্র' তাই কাব্যের থেকে অনেক বেশি বিজ্ঞান। সেখানে নারী ও পুরুষের অধিকারও সমান সমান—যৌনতাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন ঋষি বাৎসায়ণ।

কামসুত্রে যৌনতা বা বিশদে বললে রতিক্রিয়ায় বা সঙ্গমের কালে নারী ও পুরুষকে তার বিশেষ বিশেষ জায়গায় রেখেছিলেন বাৎসায়ন। রতিক্রিয়ায় পুরুষ উপরে থাকবে না নারী—তা নিয়েও পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা আছে। কিন্তু 'কামসূত্র' তা বলে না। রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন 'স্থান' নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন বাৎসায়ন যেখানে নারীকে অনেকক্ষেত্রে উর্ধ্বেই রেখেছেন তিনি। পুরাণে একে বলে বিপরীত রতিক্রিয়া, যেখানে পুরুষ নীচে ও নারী উপরে। বাৎসায়ন বলেছেন, নারী যখন উপরে তখন সে তার নিতম্বের সঞ্চালন করবে, নিতম্ব, কোমর, সারা শরীরে নারী এমন সব অলঙ্কার পরবে যা তার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বহুগুণে বাড়াবে। রতিক্রিয়ার সময় নারীর কোমরে বাঁধা অলঙ্কার থেকে কোনও রিনিরিনি শব্দ হবে না, শুধু তার কম্পন বোঝা যাবে। এর মানে হল, নারী জোর করে সঙ্গমে বাধ্য করেনি, বরং শরীরকে সেই স্পর্শ দিতে চেয়েছে যার স্বাদ পাওয়ার বাসনা রাখে কোনও পুরুষ। তাই এই বাসনার কাজে পুরুষ-নারী দুইই আছে। অথচ এখনকার সময় যৌনতার নাম নিতেই লজ্জা পান অনেক নারী। কারণ সমাজব্যবস্থায় যৌনতাকে রগরগে অশ্লীল কোনও বিষয়ের তকমা সেঁটে রাখা হয়েছে। অথচ সুপ্রাচীন কাল থেকে যৌনতা ছিল খোলামেলা আর সেখানে নারীকে স্বাধীনচেতাই বলা হয়েছে। নারী নিঃসঙ্কোচে যৌনতার কথা উচ্চারণ করতে পারতো, নিজের যৌন বাসনার কথা জানাতে পারতো। এখনও যৌনতা পরিতৃপ্তির জন্য একজন পুরুষের কাছে নিজের বাসনা ব্যক্ত করতে পারে অকপটে, কারণ সেটা স্বাভাবিক জৈবিক ক্রিয়া, এতে কোনও অপরাধ বা অশ্লীলতা নেই—তবুও অনেক নারীই সেই বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই নারী জানে না যে, উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর মা যখন স্বামীর অনুমতি না নিয়েই অন্য এক জন পুরুষের সহগামিনী হচ্ছেন তখন তিনি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। সেই সময় বিয়ে নামক কোনও বন্ধন ছিল না। বাবা উদ্দালক (জৈবিক পিতা নন) তাঁকে শান্ত করে বলেছিলেন—তুমি রাগ কোরো না পুত্র, এটাই স্ত্রীলোকের চিরাচরিত ধর্ম, সে গাভীর মতো স্বাধীন। এই দেহের অধিকার তার। কাজেই অন্যগমন অন্যায় নয়। প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব এ কথাও বলেছে, নারী স্বাধীন আর এই বিচরণ স্ত্রীলোকের প্রতি প্রকৃতির অনুগ্রহের সূচক। এখনকার সময় যা ভাবনাচিন্তারও অতীত।

আসলে যৌনতার একটি উদ্দেশ্য কখনও-সখনও সন্তান উৎপাদন হতে পারে, কিন্তু সেটা একমাত্র লক্ষ্য নয়। স্ত্রী-লোক পশুদের থেকে আলাদা, কারণ সে সন্তানধারণের উপযুক্ত সময় ছাড়াও রমণে প্রবৃত্ত হয়। পুরুষের মতো নারীও আনন্দের জন্যই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যৌনতা চায়। আর সেটা বয়সের সীমাতেও বাঁধা নয়। বৃদ্ধ বয়স মানেই যৌনতা অপরাধ—সেটাও নয়। ৬৫ পেরিয়ে যাওয়া কোনও প্রৌঢ় যদি পরম আশ্লেষে তাঁর ৬০ বছরের স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করে মিলন চায়, তাহলে তা অপরাধ নয়। 'রত' আর 'রতি', দুই শব্দের মূলেই রম্ ধাতু। রত শব্দে তো নারী-পুরুষ উভয়ের ক্রিয়াকেই বোঝায়। তাই রতিক্রিয়া উভয়ের ক্রিয়া। 'রতি' মানে আসক্তি, তন্নিষ্ঠতা, প্রীতি, রাগ, অনুরাগ। এ দিক থেকে যদি বলা হয়, মেয়েরাও তাঁদের রতিকথা বলবেন, রতির ইচ্ছে জানাবেন, এটাই চরম সত্য। কারণ যৌনতা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনের যৌনতা খুব বড় একটা ব্যাপার।

বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের যৌনতা আমারা লক্ষ্য করি। এর মাঝে কিছু যৌনতাকে আমারা বৈধ বলি আবার কিছু যৌনতাকে অবৈধ বা প্রকৃতি বিরোধী বলে থাকি। কিন্তু নিঁখুত বিশ্লেষণে কোনপ্রকার যৌন সংসর্গই অবৈধ নয়। সাধারণতঃ সমকামিতাকে অবৈধ যৌনসংসর্গ বলে সমাজে মনে করা হয়। 'সমকাম' এবং 'সমকামী' শব্দগুলোই কালের পরিক্রমায় বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত ভারতীয় সংস্কৃতিতেও সমকামিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বিষ্ণুর মোহিনী অবতাররূপে ধরাধামে এসে শিবকে আকর্ষিত করার কাহিনী এর একটি দৃষ্টান্ত। বিষ্ণু এবং শিবের মিলনের ফসল অয়াপ্পানকে হরিহরপুত্র নামেও সম্বোধন করা হয়। এ ছাড়া অষ্টাবক্র, শিখন্ডী এবং বৃহন্নলার উদাহরণগুলো সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উঠে এসেছে।

এবার আসি যৌনতার বিভিন্নতা নিয়ে। লৈঙ্গিক শ্রেণীবিন্যাসের অন্তর্গত একই প্রজাতির পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের দু'টি প্রাণী বা বিপরীত লিঙ্গের দু'টি মানুষের মধ্যে রোমান্টিক আকর্ষণ, যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন আচরণকে বিপরীতকামিতা বলে, যা সমাজের অধিকাংশ মানুষ মেনে চলেন। সাধরণতঃ এই বিষমকামিতাকে বা বিপরীতকামিতা সমাজ 'বৈধ যৌনতা' বলে মেনে নিয়েছে। বর্তমানে আইনসিদ্ধ হলেও সমকামিতা, উভয়কামিতা ও পশুকামিতাকে সমাজ অন্য দৃষ্টিতে এখনও দেখে এবং অবৈধ বলে মনে করে। সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার যৌন প্রবৃত্তিকে বলে সমকামিতা। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় সমকামী। বাৎসায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে সমকামীকে চিহ্নিত করতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ সমকামিতাকে আরেকটু 'শালীন' রূপ দিতে 'সমপ্রেম' শব্দটির প্রচলন ঘটাতে চান। জীববিজ্ঞানীরা সমকামিতাকে প্রানিজগতে সঙ্ঘটিত বহুমুখী যৌনতাসমূহের একটি অন্যতম অংশ বলে মনে করেন। এটি প্রকৃতি বিরোধী কোন রোগ নয়, অন্যান্য যৌনতার মত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রুপে সমকামিতার অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় সমকামী যৌনাচরণের চর্চা হত গুপ্ত বিনোদন হিসেবে, আবার কোন কোন জায়গায় সমকামিতা উদযাপন করা হত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে। এবার আসি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উভকামিতা নিয়ে। উভকামিতা বলতে বিশেষ একটি যৌন প্রবণতা বোঝায় যখন একজন মানুষ, নারী ও পুরুষ, উভয় লিঙ্গের প্রতিই যৌন আকর্ষণ অনুভব করে ও যৌন সম্পর্ক তৈরী করে। এরূপ মানুষ সমলিঙ্গ ও বিপরীত লিঙ্গ উভয়ের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে এবং এরূপ যৌনমিলনের মাধ্যমে যৌনানন্দ লাভে সক্ষম হলে তাকে বলা হয় উভকামী। কার্যতঃ উভকামিতা মানুষের দুটি প্রধান যৌনপ্রবৃত্তি বিপরীতকামিতা ও সমকামিতার উভয়ের সমন্বয়। মানবসভ্যতার বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় এবং প্রাণীরাজ্যের অন্যত্রও উভকামিতা দেখা যায়। এছাড়া আরও দুই রকমের যৌন সম্পর্ক মানবসমাজে দেখে থাকি। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা কে মূলত শিশুকামিতা বলা হয়ে থাকে। এখানে ছেলে মেয়ে উভয়ই হতে পারেন। আবার একজন মানুষ যখন মানুষ ব্যাতীত অন্য কোন প্রাণীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন তবে তাকে পশুকামিতা বলা হয়। শেষের দুইরকমের যৌনসম্পর্ক অবৈধ তো বটেই এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সমকামিতা নিয়ে গবেষণার ফলাফল খুব পরিষ্কার। সমকামিতা কোন মানসিক রোগ নয়, বা নয় কোন নৈতিক অধঃপতন। মোটা দাগে এটি হচ্ছে সমস্ত মানবগোষ্ঠীর সংখ্যালঘু একটি অংশের মানবিক ভালবাসা এবং যৌনতা প্রকাশের একটি স্বাভাবিক মাধ্যম। সমকামীরা আর দশটা বিষমকামীদের মতোই স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে। সমকামিতা কারো ব্যক্তি পছন্দ বা স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপারও নয়। সমকামী প্রবৃত্তিটি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হয়ে যায়, এবং সম্ভবত তৈরি হয় জন্মের আগেই, সংস্কৃতি নির্বিশেষে একই রকম থাকে, এমনকি নৈতিকতার ভিন্নতা এবং মাপকাঠিতে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। কেউ কেউ অন্যরকম বা অবৈধ ভাবলেও, নতুন নৈতিকতা আরোপ করে জনসমষ্টির সমকামী প্রবৃত্তি পরিবর্তন করা যায় না। সমকামিতাকে 'সংশোধন' এর চেষ্টা আসলে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু না। সমকাম তখনই বৈধ ও সুস্থ্য হবে যখন উভয় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর মাঝে সম্মতি থাকবে, তা প্রকৃতি বিরোধী কিছু হবে না। আর যদি না থাকে তবে তা ধর্ষণ হয়ে উঠবে।

উপরোক্ত বিভিন্ন যৌন আচরণের সম্পর্কে তথ্য ও সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পারছি, একটি য়ৌন আচরণ থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে উভকামির সাথে সমকামিতার যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি আছে বিপরীতকামিতার নিবিড় সম্পর্ক। কেউ যদি উভকামিতা বা সমকামিতাকে দায়ী করেন তবে সেই একই যুক্তিতে বিপরীতকামিতাকেও দায়ী করা সম্ভব। কারণ তিনটি যৌনতাই প্রাকৃতিক। সমকামিতা ও বিপরীতকামিতা উভয় অবৈধ ও অপরাধ হয়ে ওঠে তখনি যখন তা ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে। ধর্ষণ ছাড়া উভয় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ইচ্ছায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন অবৈধ হবার কোন কারণ নেই। কামদেবতা মদন এই সকল প্রকার মানুষকেই অকৃপণভাবে বাসনা নিবৃত্তির উপায় করে দিয়েছেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কে ঐ মেয়েটি—

মদন কামদেব মন্দির দর্শন করে আমরা পায়ে পায়ে ফিরে এলাম গাড়ীর কাছে। আসার সময় কাছাকাছি তেমন কোনও হোটেল দেখিনি। বাইহাটা চারালি বা গৌহাটি ফিরেই না হয় খেয়ে নেবো—এসব ভাবতে ভাবতে গাড়ীর কাছে পৌঁছে দেখি আমাদের গাড়ীর ড্রাইভারের সাথে এক জন যুবতী মেয়ে হাসিখুশি মনে কথা বলছে। আমি ভাবলাম মেয়েটি হয় তো ড্রাইভারের পরিচিতা কিন্তু কাছে পৌঁছাতেই ভোলানাথকে ড্রাইভার বলল—দাদা, এই মেয়েটি কামাখ্যায় যাবে, লিফট্ চাইছে। এই প্রস্তাব আমি সপাটে নাকচ করে দিলাম। কিন্তু পায়েল বলল—আমরা একটু কষ্ট করে পিছনের সিটে বসে গেলে উনি তো ড্রাইভারের পাশে বসে যেতে পারতেন। আমি ও ভোলানাথ নিমরাজি হয়ে চুপ করে গেলাম।

এতক্ষণে ঐ মেয়েটির দিকে দৃষ্টি গেল। সে এদেশীয় বলে মনে হল না, মনে হয় উত্তর বা উত্তরপশ্চিম ভারতীয় রক্তের। আসাম বা বাংলার মেয়েদের থেকে উচ্চতায় বেশী, নাকটি টিকালো, গায়ের রঙ হলদেটে ফর্সা। কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ ময়লা। লাল রঙের কাপড়টা রঙ জ্বলে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে উপরন্তু ময়লা। কাঁধে একটা ময়লা কমদামী কালো কম্বল। চুলগুলো না আঁচড়ানো, এলোমেলো ও ধুলিধুসরিত। গায়েও নিয়মিত স্নান না করার মত ময়লা। তবে চেহারাটা পুরুষালি, মেয়েদের মত কমনীয়তা কম, পুরুষের মত শক্তপোক্ত গঠন। তবে চোখদুটো বেশ উজ্বল। আমি শুনেছি যে মানুষের চোখদুটো ঠিকমতো পড়তে জানলে মানুষটাকে না কি সহজে বোঝা যায়। তাই নতুন কোনও মানুষের চোখদুটো সবার আগেই আমি দেখি, বোঝার চেষ্টা করি ঐ মানুষটির মানসিকতা। আমি এসব লক্ষ্য করতে করতে গাড়ীতে উঠে পড়েছি। আমার পরে ভোলানাথ ও পায়েল উঠল। নানু এতক্ষণ সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে আসছিলো, ওর জায়গা দখল হয়ে যাওয়াতে মন খারাপ করে আমাদের সাথে উঠে ভোলানাথের কোলে গিয়ে বসল। গাড়ী চলতে লাগলো তার নিজস্ব গতিতে।

আমিই এতক্ষণে প্রথম কথা বললাম। ড্রাইভারকে খাওয়ার হোটেলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম। ও বলল অল্প কিছুদিন আগেই বাইহাটা থেকে একটু এগিয়ে একটা ভালো হোটেল হয়েছে, খুব ভালো বন্দোবস্ত ও সুস্বাদু খাবার। আমরা ওখানেই যাব বলে ঠিক করলাম। দেখতে দেখতে বাইহাটার হোটেলের সামনে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। হোটেলটা প্রায় ফাঁকা, আমরা একে একে হোটেলে ঢুকে একটা টেবিলের চারটে সিট দখল করে বসে পড়লাম। ড্রাইভার এসে পাশের টেবিলে বসতেই পায়েল বলল—ঐ মেয়েটি এল না?

আমাদের টেবিল থেকে বসে তাকে দেখলাম। মেয়েটি গাড়ীতে সিটে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ড্রাইভার ছেলেটি বলল—না, আমি কিছু বলিনি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পায়েল ড্রাইভারকে বলল—যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো।

ড্রাইভার গিয়ে বলতেই মেয়েটি এমন ভাব করে নির্দ্বিধায় চলে এলো যে, ও যেন জানতো পায়েল ওকে ডেকে এনে খাওয়াবে। হাসিহাসি মুখ করে ড্রাইভারের টেবিলের উল্টোদিকে এসে বেশ গুছিয়ে বসলো। এতক্ষণে ওয়েটার আসেনি তাই ভোলানাথ কাউন্টারে গিয়ে খাবারের অর্ডার দিয়ে এলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিলাম। এর মধ্যেই খাবার চলে এলো—স্যালাড্, গরম ভাত, শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, খাসির মাংস, চাটনী, পাঁপড়। ম ম করে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ নাকে যেতেই খিদে যেন বেড়ে গেল! গোগ্রাসে খেতে লাগলাম। সবার আগে আমারই খাওয়া হল। আমি সাধারণতঃ পেট ঠেসে কখনওই খাই না। একটুও অতিরিক্ত ভাত যেমন নিইনি তেমন নষ্টও কিছু করিনি। খাওয়া শেষ হতেই হাত ধুয়ে, ভাজা মৌরি চিবাতে চিবাতে যেই খাওয়ার বিলের টাকা দিতে গিয়েছি অমনি পায়েল হই হই করে বলে উঠল—আপনি টাকা দেবেন না, আমি দেব।

আমি পিছিয়ে এলাম। হোটেলের বাইরে বের হয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলাম। এতক্ষণে পেটটা শান্ত হল। আমি জানি, এর পরে গাড়ীতে উঠলেই ভাতঘুম লাগবে, আর আমি ঘুমিয়ে পড়বো। একে একে সকলেই খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়ালো কিন্তু ঐ মেয়েটি আর পায়েল এখনও আসেনি। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি মেয়েটি তখনও খেয়ে চলেছে। চাটনী দিয়ে একগাদা ভাত মেখে খাচ্ছে। পায়েল ওর সামনের চেয়ারে টেবিলের বিপরীতে বসে আছে। ওর খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই পায়েল জিজ্ঞেস করল—আর ভাত নেবে তুমি?

মেয়েটি বেশ তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল—আজ অনেকদিন পরে মাংস-ভাত খেলাম। খুব ভালো লাগল। দিদিমণি, তুমি খুব ভালো মেয়ে। আমাকে যেমন গাড়ীতে করে কামাখ্যা নিয়ে যাচ্ছ তেমনই পেট ভরে খাওয়ালে। তোমার মঙ্গল হোক্।

পায়েল তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলে উঠল—এই রে, আমার যে কি ভালো হচ্ছে তা আমিই জানি! আচ্ছা চলো, আমরা গাড়ীতে গিয়ে বসি।

একথা বলে পায়েল চেয়ার থেকে উঠে বিল পেমেন্ট করতে কাউন্টারের দিকে পা বাড়ালো আর মেয়েটি হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের দিকে যেতে গিয়ে আমার সামনাসামনি পড়ে গেল। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু মুচকি হেসে সে আমার পাশ কাটিয়ে বেসিনের দিকে চলল। আমার চোখ পড়ে গেল ওর গলার দিকে। দেখি ওর গলায় একটা কালো হকীকের মালা। জপমালাই হবে! আরও একবার সামনে থেকে মেয়েটিকে দেখে খুব সাধারণ মেয়ে বলে মনে হল না। এমন আগোছালো পোষাক-পরিচ্ছদ হওয়া সত্ত্বেও কত সুন্দর কথা বলে! ও কি তবে কোন ছদ্মবেশ নিয়ে আছে!

আমি সোজা বাইরে চলে এসে গাড়ীতে চড়ে বসলাম, পায়েল বিল মিটিয়ে এলো আর মেয়েটি হাতমুখ ধুয়ে ধীর পদক্ষেপে এসে সামনের দরজা খুলে গাড়ীর সামনের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সিটে বসল। ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিল। গৌহাটি এখান থেকে মাত্র চৌত্রিশ কিলোমিটার মত। যেতে এই ঘন্টাখানিক লাগবে। আমি সিটে হেলান দিয়ে মাথাটা গাড়ীর জানালায় ঠেকিয়ে ভাতঘুমটা উপভোগ করব বলে চোখ বুজলাম। গাড়ী হেলতে দুলতে চলা শুরু করলো।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ীটা ব্রেক কষেছে। বাইহাটা থেকে ফিরে আসার পথে জালুকবাড়ী ঢোকার মুখে একটা লরি আমাদের সামনে হঠাৎ এসে গিয়েছিল। এই মোড়টা ভীষণ জটিল। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের দুর্ঘটনা হয়নি, এড়ানো গিয়েছে তবে ড্রাইভারের চোখেমুখে এখনও আতঙ্ক। আমি বিষয়টা বুঝে নিয়ে গাড়ীটাকে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াতে বললাম। আমরা নেমে চা খেতে গেলাম কিন্তু মেয়েটা বসে রইলো। আমরা চা খাচ্ছি আর ড্রাইভার ভোলানাথের সাথে কথা বলছে এমন সময় মেয়েটি, কি মনে হল জানি না, গাড়ী থেকে নেমে এসে সটান পায়েলের সামনে গিয়ে বলল—দিদিমণি, আমি চললাম। এখান থেকে আমি কামাখ্যা মন্দিরে চলে যেতে পারবো।

পায়েল বলল—তা কি করে হয়!

আমি বললাম—ড্রাইভার তোমাকে মন্দির গেটে নামিয়ে দেবে। ওটা তোমার সুবিধা হবে। তোমার সাথে তো কথাই হল না!

সে বলল—না, আমি চললাম। কামাখ্যায় এসো, দেখা হবে আর কথাও হবে।

আমি বললাম—অত ভিড়ের মধ্যে তুমি কোথায় খুঁজে পাবে আমাদের?

সে বলল—ভিড় কমে যাবে, আর তোমরা তো দু-তিনদিন থাকবে! আমি ঠিক খুঁজে নেবো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমরা দু-তিনদিন থাকবো তা তোমায় কে বলল আর তুমিই বা কোথায় থাকবে?

মেয়েটি বলল—পাহাড়ে থাকার জায়গার কি অভাব আছে? কত বড় নীলাচল পাহাড়! তবে আমি মন্দিরেই থাকবো। এসো, দেখা হবে। আর তোমার মত লোক কামাখ্যায় এসে কি হোমযজ্ঞ না করে যাবে!

একথা বলে, কারও কোন কথা না শুনে, যেমন এসেছিল তেমনই হঠাৎ করে সে সোজা হাঁটা দিল। আমরা তার চলে যাওয়া দেখতে লাগলাম।

চা খাওয়া শেষ হলে, দোকানীকে চায়ের দাম দিয়ে, আমাদের গাড়ী আবারও চলতে লাগল। এখন আমাদের গন্তব্য গৌহাটির হোটেল। সন্ধ্যা হতে আরও কিছুক্ষণ দেরী আছে। পাণ্ডার ঘরে আগের থেকে কথা বলা আছে। সন্ধ্যার পরে নীলাচল পাহাড়ে গাড়ী উঠতে দেবে। তখন আমরা পাহাড়ে যাবো। আপাততঃ হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিই।

গৌহাটিতে আমরা দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। একটায় তালা দেওয়া ছিল, পায়েল সেখানে নানুকে নিয়ে ঢুকে পড়লো আর একটায় চিন্ময়বাবু ঘুমোচ্ছিলেন, নক্ করতেই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দরজা খুলে দিলেন। দেখি একজন সাধুবাবা বসে আছেন।

সাধুবাবাকে দেখেই চিন্ময়বাবু অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন—আরে, আপনি এখানে!

ভোলানাথ চিন্ময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি চেনেন নাকি?

চিন্ময় বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, এই সেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের সাধুবাবা। কুশল বিনিময় করে তিনি বললেন—কিছুক্ষণ হল এসেছি, একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কামাখ্যা মন্দিরে যাবো, আমার সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে, আসি, পরে দেখা হবে।

চিন্ময় বাবু বললেন—কিন্তু, আপনি ঘরে ঢুকলেন কি করে?

সাধুবাবা বললেন—তুমি ঘুমাচ্ছিলে আর দরজা ভেজানো ছিলো।

ভোলানাথ অবাক হয়ে বললেন—কিন্তু চিন্ময় বাবু যে এই হোটেলে আছেন তা আপনি জানলেন কি করে?

সাধুবাবা নিঃশঙ্ক চিত্তে বললেন—বাবা, এত প্রশ্ন করছেন কেন আমাকে?

আমি বললাম—আপনি বলুন, কেন প্রশ্ন করবে না আপনাকে? আপনি একজনের ঘরে না জানিয়ে কেন ঢুকলেন?

সাধুবাবা হাসতে হাসতে বললেন—আমি আপনাদের সকলের পরিচিত। সময়ে সবকিছুই জানতে পারবেন। আপনারা আজ্ঞা দিন, এখন আমি আসি।

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করে একরকম হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন এই সাধুবাবা।

ভোলানাথ আমাকে বললেন—কাকু, লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, মেয়েটির মতই পোষাক এনার পরনে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি, আর গলায় একটা কালো হকীকের মালাও। মনে হয় একই সম্প্রদায়ের হবে। আসুন, একটু বিশ্রাম করে নিই।

আমরা বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ওরা ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না। এই প্রথমবার গেলাম মদন-কামদেব মন্দিরে—হোটেলে শুয়ে শুয়ে সেই কথাই চিন্তা করছিলাম।

সনাতনী শাস্ত্রমতে কামদেব হিন্দুদের প্রেমের দেবতা। তাঁর অন্যান্য নাম হল রাগবৃন্ত, অনঙ্গ, কন্দর্প, মন্মথ, মনসিজ, মদন, রতিকান্ত, পুষ্পবাণ, পুষ্পধন্বা, কাম ইত্যাদি। এক মতে কামদেব হিন্দু দেবী শ্রীর পুত্র অন্যদিকে তিনি কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের অবতার। তাঁর স্ত্রী হলেন দক্ষকন্যা ও আকাঙ্ক্ষার দেবী রতি। বৈষ্ণবরা তাঁর আধ্যাত্মিক সত্ত্বাটিকে কৃষ্ণের সমরূপ বলে মনে করেন। সংস্কৃত কামদেব শব্দটির অর্থ 'দিব্য প্রেম' বা 'প্রেমের দেবতা' অর্থাৎ মানুষের মনে কাম দেন যে সত্তা। দেব শব্দের অর্থ দিব্য বা স্বর্গীয়। কাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ ইচ্ছা, কামনা বা বাসনা, বিশেষত শারীরিক প্রেম বা যৌনতার ক্ষেত্রে। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে (৫।১৮।১৫) ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম কামদেব। অন্যদিকে কৃষ্ণের অপর নাম কামদেব; কখনও কখনও আবার শব্দটি কৃষ্ণের উপাধি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অগ্নিরও অপর নাম কাম। এই নামটি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঋগ্বেদেও ব্যবহৃত হয়েছে (ঋগ্বেদ ৯, ১১৩।১১)। অথর্ববেদে 'কাম' যৌনাকাঙ্ক্ষা অর্থে নয় বরং 'সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কামদেবকে সুদর্শন যুবকরূপে কল্পনা করা হয়। তাঁর নাক টিকালো, উরু, কটি ও জঙ্ঘা নিটোল; কেশ নীলচে রঙের ও কুঁচকানো। তার চওড়া বুক, পটলচেরা চোখ, মুখমণ্ডল পা ও হাতের তালু গোলাপী ও নখগুলি বাদামের মতে। সারা গায়ে বকুল ফুলের গন্ধ। মকর তাঁর বাহন। তাঁর হাতে থাকে ধনুর্বাণ, ধনুকটি আখ দিয়ে এবং সেই ধনুকের ছিলা বা গুণটি মৌমাছি দিয়ে তৈরি। পাঁচ প্রকারের সুগন্ধী ফুলে তাঁর বাণ তৈরী—অশোক, শ্বেত ও নীল পদ্ম, মল্লিকা ও আমের মুকুল।

কামদেবের জন্মকাহিনী বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। মৎস্যপুরাণ অনুসারে, বিষ্ণু-কৃষ্ণ এবং কামদেবের মধ্যে এক ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। গৌড়ীয় ঐতিহ্যে কৃষ্ণকে কামদেবরূপে পূজা করা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মনে করা হয় যে শিব মদনকে ভস্মীভূত করার পর কামদেব মদনই বাসুদেব কৃষ্ণের অংশে পরিণত হন। এই ভাবে কামদেব স্বর্গীয় আয়ুর্বেদিক উদ্ভিদেরও উপদেবতা; যিনি দৈহিক কামনা উজ্জীবনে সক্ষম। এমন ভাবেই কামদেব ভগবান কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু কৃষ্ণের পুত্র তাই তাঁর মধ্যে কৃষ্ণের গায়ের রঙ, চেহারা ও গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু কামের দেবতা তাই তাঁর সঙ্গী হল কোকিল, পায়রা, ভ্রমরের দল, বসন্ত ঋতু ও মলয় বাতাস, তাঁর উৎসব হল হোলি। কামদেবের স্ত্রী রতিও অত্যন্ত সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া, যিনি সুন্দর দেহবল্লরীযুক্তা এবং চক্র ও পদ্মধারিণী। তাঁর মধ্যেও প্রেমের দেবতার বেশ কিছু গুণ রয়েছে। ঋতুর দেবী বসন্ত সর্বদা কামদেবকে সঙ্গ দেন। তবে তিনি হতাশার দীর্ঘশ্বাস থেকে ভেসে ওঠেন; রতির মতো বাসনা থেকে নয়।

শিবপুরাণ মতে, কামদেব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র। স্কন্দপুরাণ সহ অন্যান্য সূত্রের মতে, কামদেব প্রসূতির ভাই; তাঁদের দুজনকেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন ও তাঁরা শতরূপার সন্তান। পরবর্তীকালে জানা যায় যে তিনি বিষ্ণুর সন্তান। তবে সকলে এই ব্যাপারে একমত যে তিনি প্রসূতি ও দক্ষের মেয়ে রতিকে বিয়ে করেছিলেন।

অধিকাংশ পণ্ডিত যে কাহিনীটি বিশ্বাস করেন তা হল, পৌরাণিক যুগে ভগবান ব্রহ্মার মন থেকে এক রূপবতী নারী 'সন্ধ্যা' আবির্ভূতা হলেন। সন্ধ্যাকালে এই সন্ধ্যাই নিত্য অর্চিতা হন। সন্ধ্যার যা রূপ ও গুণ ছিল এমন রূপগুণের অধিকারিণী এ বিশ্ব চরাচরে কেউ ছিল না। এমন রূপসীকে দেখে বিধাতা মনে মনে নানা বিষয় ভাবতে লাগলেন। ব্রহ্মা এমন চিন্তা করতেই তাঁর মন থেকে সোনার মত দেহবর্ণের এক মনোহর পুরুষ আবির্ভূত হলেন। পুষ্পময় পঞ্চশর শোভিত সেই অপূর্ব কমনীয় পুরুষ ব্রহ্মাকে দেখেই বললেন—'হে ব্রহ্মণ, আমার কী কাজ? আমি যখন পুরুষ তখন কাজ করাই আমার পক্ষে উচিত। অতএব আমাকে কোনও প্রশস্ত ন্যায় কর্মে নিযুক্ত করুন।'

ব্রহ্মা অবাক হলেন ও মনকে স্থির করে ভাবলেন, খুব গর্ব অনুভব করলেন এই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভেবে যে, এই অপূর্ব দর্শন পুরুষ তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছেন। ব্রহ্মা বললেন—'তুমি তোমার এই মনমোহন মূর্তি দিয়ে পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী পুরুষদের মোহিত করে চিরস্থায়ী সৃষ্টির প্রবর্তক হয়ে আমাকে সৃষ্টি কর্মে সহায়তা করো। স্বয়ং আমি, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আমরাও তোমার বশবর্তী হব। তুমি স্বয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করে সতত সুখজনক হয়ে সনাতন সৃষ্টির প্রবর্তক হও। সকল প্রাণীর মনই তোমার পুষ্পবাণের প্রধান লক্ষ্য হবে। তুমি তাদের সব সময় মত্ততায় ও আনন্দে রাখবে।'

বিধাতার চিত্ত মথিত হয়ে ওই অনিন্দ্যকান্তি পুরুষের উৎপত্তি বলে তাঁর নাম রাখা হল 'মন্মথ'। জগতের অসাধারণ কামরূপী মনোভব 'কাম' নামেও বিখ্যাত হলেন। লোককে মত্ত করেন বলে তাঁর নাম হল 'মদন'। মহাদেবের দর্পনাশে সমর্থ তাই নাম 'দর্পক' ও 'কন্দর্প'। মদন সর্বব্যাপী— স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, ব্রহ্মালোক সর্বত্রই মদনদেবের উপস্থিতি।

ব্রহ্মা মদনের নিত্যকর্ম স্থির করে দিয়েছেন। মদন ভাবলেন তার প্রভাব কতটা সত্যি তা পরীক্ষা করার জন্য—ব্রহ্মা ও অন্যান্য মুনিদের ওপর একবার পরখ করা যাক। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মদন মনে মনে ভাবেন, এই সব পুরুষ এবং সন্ধ্যাও আজ আমার শরে বশীভূত হবেন। ভাবতে ভাবতেই মদন কুসুমগুণে শরযোজনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধী বাতাস বইতে লাগল। আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের ওপর মদনদেব কুসুমবাণ নিক্ষেপ করলেন। ব্রহ্মা ও সকল মুনি কামে মোহিত হয়ে মনে বিকার লাভ করলেন। সকলেই সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রত্যেকের কাম বৃদ্ধি পেল। বিধাতা সন্ধ্যাকে দেখছেন। তাঁর শরীরে ঘাম ঝরছে। মদন তখন বুঝতে পারলেন তাঁর কাজ সফল হয়েছে। নিজের ওপর বিশ্বাসও জন্মাল। মহাদেব তখন আকাশপথে ভ্রমণ করছেন। দেখলেন, ব্রহ্মা সহ মুনিদের বিকার হয়েছে। রমণীলোলুপ হওয়ার জন্য মহাদেব মুনিদেরও তিরস্কার করলেন। মহাদেব তখন সকলকে উপহাস করতে করতে ব্রহ্মাকে ধিক্কার দিলেন, বললেন—'ব্রহ্মা! নিজের কন্যাকে দেখে তোমার কামভাব উপস্থিত হল। ছিঃ। যাঁরা বেদানুসারে চলেন এ কাজ তাঁদের যোগ্য নয়।'

মহাদেব বিধির উদ্দেশে বললেন—'পুত্রবধূ ও কন্যা মাতৃতুল্যা। আপনি সামান্য কামের প্রভাবে তা কী করে ভুলে গেলেন!'

ব্রহ্মা লজ্জিত হলেন। মহাদেবের তিরস্কারে এতই লজ্জা পেয়েছেন যে মদনের ওপর রেগে গেলেন। মহাদেবের সামনেই তিনি মদনকে উদ্দেশ্য করে রূঢ় স্বরে বললেন—'কাম যেমন আপনার সামনে আমাকে শরাঘাত করল, সে ঠিক তেমনই ফল পাবে। অহংকারে মত্ত হয়ে কন্দর্প অতি দুষ্কর কর্ম করে আপনার নয়নানলে ভস্মীভূত হবে।'

মদন বিস্মিত, এ তো ভয়ানক অভিশাপ! মদন ব্রহ্মার কাছে আবেদন রাখেন—'প্রভু! আপনি আমাকে যে কাজ করতে বলেছেন আমি তো তাই করেছি। আপনি বলেছিলেন, আপনি স্বয়ং, শ্রীবিষ্ণু ও মহেশ্বর আপনারা সকলেই আমার বশবর্তী। আমি কেবল

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আপনার কথার পরীক্ষা করছিলাম। তাহলে আমাকে কেন অভিশাপ দিলেন? আমি তো কোনও অপরাধ করিনি। আমাকে যে শাপ দিয়েছেন তা মোচন করুন প্রভু।'

ধীরে ধীরে ব্রহ্মার রাগ কমলে তিনি বললেন—'এই সন্ধ্যা আমার কন্যা। তুমি আমাকে সন্ধ্যার প্রতি কামভাবাপন্ন করে তুললে। আমি তাই তোমাকে শাপ দিয়েছি। তবে তুমি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হয়েও আবার তাঁরই অনুগ্রহে শরীর পাবে। দেবাদিদেব মহাদেব দার পরিগ্রহ করলে তিনিই তোমাকে শরীরী করে দেবেন।'

এই কথা বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন, মহাদেবও অন্তর্হিত হলেন। দক্ষ তখন মদনকে ডাকলেন ও বললেন—'এই আমার কন্যা। গুণে তোমার অনুরূপা। এই রমণী তোমার সহচারিণী, ইচ্ছানুসারে ধর্মত বশবর্তিনী হবে।' কথাগুলি বলেই দক্ষ তাঁর কন্যা রতিকে কন্দর্পের হাতে তুলে দিলেন। অনিন্দ্যসুন্দর মদনদেব ও অপূর্ব সুন্দরী রতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মদন তখন রতি নামের সেই মনোহরা রমণীকে দু'চোখ ভরে দেখে নিজ শরে বিদ্ধ হয়ে রতি অনুরাগে মুগ্ধ হলেন।

যা হয়, মদন ভুলে গেলেন ব্রহ্মার দেওয়া অভিশাপ। ইচ্ছে মহাদেবকে কামনায় জর্জরিত করা। এমনই সময়, দক্ষযজ্ঞে সতীকে হারানোর পরে, ভগবান শিব কঠোর তপস্যায় বসলেন।

এদিকে কামদেব ও রতি অতি আনন্দে দিন যাপন করছেন। ব্রহ্মা তখন কামের কাছে এসে বললেন—'হে মনোভব, এই রমণীকে সহচারিণী হিসেবে পেয়ে তোমার শোভা বেড়েছে। তুমি এবার জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলিয়ে দাও। তিনি যেন প্রীত মনে দার পরিগ্রহ করেন।'

কামদেব মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছেন ব্রহ্মার কথা। তিনি বুঝছেন তাঁর ক্ষমতা পরীক্ষিত হয়েছে। এবার মহাদেবের পালা। ব্রহ্মা বেশ সুন্দর ভাবে বলছেন—'নির্জন স্নিগ্ধ প্রদেশেই হোক, পর্বতেই হোক আর নদীতেই হোক, ঈশ্বর যেখানে যেখানে যাবেন, তুমি রতি দেবীকে নিয়ে সেই সব জায়গায় যাবে। বনিতা-পরাঙ্মুখ, সংযতচিত্ত মহাদেবকে তুমি ভোলাবে। তুমি ছাড়া মহাদেবকে ভোলাতে পারে এমন কেউ নেই। মনে রেখো, মহাদেবের হৃদয়ে রমণী অনুরাগ সঞ্চারিত হলে তোমার শাপমোচন হবে।'

কামদেব বললেন—'প্রভু, আমি আপনার কথানুযায়ী মহাদেবকে ভোলাব। কিন্তু আমার প্রধান অস্ত্র তো রমণী। আপনি নির্জনে সেই রমণীকে সৃজন করুন। ব্রহ্মা চিন্তিত হলেন, দক্ষও ভাবতে বসলেন।

উভয়েই তপস্যায় বসলেন। শুরু হল বিষ্ণুমায়ার স্তব। যোগনিদ্রার দেখা পাওয়া গেল। ব্রহ্মা বললেন—'মহাদেব একাকী বিচরণ করছেন। তিনি দার গ্রহণে ইচ্ছুক নন। রুদ্র যদি বৈরাগ্যবশে দার পরিগ্রহ না করেন তবে সৃষ্টিচক্র চলবে কেমন করে? আমি আপনার শরণাগতও। জগতের হিতার্থে আপনি তাঁকে মোহিত করুন।'

দেবী বলেন—'ব্রহ্মণ, তুমি যথার্থই বলেছ। এ জগতে আমি ছাড়া শঙ্করকে কেউ মোহিত করতে পারবে না। আমি দক্ষপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হয়ে মনোহর রূপে শঙ্করের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সঙ্গে মিলিত হব।'

এদিকে দক্ষ তপস্যায় বসলেন। তিনিও দেবীর দর্শন পেলেন। দেবী বললেন—'আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমারই কন্যারূপে জন্ম নেব। তারপর শঙ্করের সহধর্মিণী হব। কিন্তু তুমি যখন আমার প্রতি অনাদর দেখাবে তৎক্ষণাৎ আমি দেহত্যাগ করব। আর যদি আদরে শৈথিল্য না ঘটে তাহলে চিরদিন সুখে থাকব।'

এরপরে দক্ষের সহধর্মিণী বীরিণীর গর্ভে এক কন্যা জন্ম নিল। তাঁর জন্মকালে পুষ্পবৃষ্টি হল, মেঘবৃষ্টি হল, চারদিক প্রশান্ত হল, মঙ্গলবাদ্য বাজল। কন্যাটি জন্ম নেওয়ার পর নির্বাণ অগ্নি জ্বলে উঠল। দক্ষ বুঝলেন তাঁর স্ত্রী'র গর্ভে মহামায়ার জন্ম হয়েছে।

মেয়েটি বড় হয়। মহাদেবের প্রতিমূর্তি আঁকে। সর্বগুণে গুণবতী সেই দুহিতার সত্তা সাধুতা ও নীতিপরায়ণতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর নাম রাখা হল 'সতী'। দক্ষগৃহে ব্রহ্মা এসে সতীকে মন ভরে আশীর্বাদ করে গেলেন, বললেন—'যিনি তোমাকে কামনা করছেন, আর তুমি যাকে পতি করতে অভিলাষিণী সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর তোমার পতি হোক'

আবার এদিকে শিবকে বোঝানোর প্রক্রিয়া চলছে। ব্রহ্মা বলছেন—'শুধু দেবগণের নয়, জগতের হিতার্থে আপনি এক সুশোভনা রমণীর পাণি গ্রহণ করুন।'

মহাদেব বললেন—'যিনি ভাগে ভাগে আমার তেজ গ্রহণে সমর্থা হবেন, আমার স্ত্রী হবার জন্য এমন কামরূপিণী যোগিনী খুঁজে বের করো।'

ব্রহ্মা তো স্থিরই করে রেখেছেন কাকে মহাদেবের সহধর্মিণী করবেন তাই ব্রহ্মা বলেই বসলেন—'দক্ষতনয়া সতী হলেন আপনার প্রার্থনা রূপ রমণী।'

এদিকে শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য সতী তপস্যা করে চলেছেন। ব্রহ্মা মদন ও রতিকে নিয়ে শিবের কাছাকাছি গিয়ে বসন্তকাল রচনা করলেন। শিব-সতীর সাক্ষাৎ হল। মদন কামদেব 'হর্ষণ' বাণে মহাদেবের হৃদয়কে বিদ্ধ করলেন, 'মোহ' বাণ ছেড়ে মহাদেবকে সতীর প্রতি মোহিত করালেন। 'কাম' বাণে ও মায়ার প্রভাবে শিব হর্ষোৎফুল্ল হলেন। সতী তখন বর চাইলেন। বণিতা মায়ায় শিব বললেন—'তুমি আমার ভার্যা হও।'

এবার হঠাৎ ভগবান শিবের মনে পড়ে গেল যে তার তপস্যা ভঙ্গ হয়েছে। মদনদেব তাঁর পুষ্পবাণে শিবকে বিচলিত করেছেন—একথা ভগবান শিব বুঝতে পেরে তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মদনকে ভস্ম করলেন।

* * *

ওদিকে মহাদেব ও সতীর বিবাহ হল। শিব থাকেন কৈলাসে। সঙ্গী-সাথী হলেন নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত। বিভূতিভূষণ শিবের সারা গায়ে ভস্ম মাখা তাই এমন জামাই দক্ষ পছন্দ করলেন না। ঠিক করলেন শিবকে অপমান করতে হবে। আয়োজন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করলেন শিবহীন যজ্ঞের।

ভারতচন্দ্র লিখেছেন —

'আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিলা দেবভাগ।

নিমন্ত্রণ না কৈলা শঙ্করে।'

শিব ও সতী ব্যতীত যজ্ঞ শুরু হল। সতী ভাবলেন পিতার বোধহয় ভুল হয়েছে। শিবহীন যজ্ঞ তো যজ্ঞই নয়। সতীর সম্মানে আঘাত লাগল। সতী শিবের কাছে গিয়ে বাবার কাছে যাবার অনুমতি চাইলেন। শিব জানান, বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যাওয়া উচিত নয়।

এখানে ভারতচন্দ্রের বাণী —

'শঙ্কর কহেন বটে যার ঘরে যাবে।

নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে।।'

সতী ভাবেন বাপের বাড়ি যাব, তাতে আবার নিমন্ত্রণ কিসের! তবু শিব অনুমতি দেন না। সতী রেগে যান। সতী ভাবেন, শিব কি তাঁকে একজন সামান্য রমণী ভাবছেন! এবার সতীর ঈশ্বরীয় প্রকাশ দেখানো দরকার। সতী এবার মহাদেবের কাছে প্রকাশ করেন 'দশমহাবিদ্যা'-এর দশটি রূপ, একটি একটি করে সতী মহাদেবকে দেখালেন। শিব ভয় পেলেন। শিব প্রথমে আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলেন পরে দৌড়ে পালাতে যেতেই সতী বলেন—'মাভৈঃ, ভয় নেই, দক্ষ প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ করার যে অহংকার, যে দর্প, তা নাশ করার জন্যই আমি কঞ্খলে যাব।' শিব আর কী বলেন! তিনি সতীর ঐশ্বর্য, রূপ ও শক্তির প্রকাশ দেখেছেন। সতীর চরম ইচ্ছাকেই শিব মর্যাদা দিলেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই চললেন পিতার ভবনে।

দক্ষের যজ্ঞস্থলে সতী যখন এলেন তখন দক্ষ সতীকে দেখে সাথে সাথে শিবনিন্দা শুরু করলেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন —

'সভাজন শুন, জামাতার গুণ,

বয়সে বাপের বড়।

কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই।

সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।'

শিবনিন্দা শুনে সতী লজ্জায় ও দুঃখে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মহামায়া দক্ষের বাড়িতে জন্ম নেওয়ার আগেই তো বলেছিলেন, 'তুমি যখন আমার প্রতি অনাদর দেখাবে তৎক্ষণাৎ আমি দেহত্যাগ করব।' সতীর দেহত্যাগ সেই অনাদরেরই ফল। শিব খবর পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলবল নিয়ে দক্ষরাজের যজ্ঞস্থলে পৌঁছালেন। শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে যক্ষের শিরচ্ছেদ করতে নির্দেশ দিলেন। অনুচররা দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করলে দক্ষপত্নী বীরিণী শিবস্তুতি করলেন। শিবের দয়া হল তাই দক্ষরাজকে বাঁচিয়ে দিলেন আর দক্ষের মুণ্ডের স্থানে জুড়ে দিলেন একটি ছাগ মুন্ডু।

শুরু হল শিবের প্রলয় নৃত্য। নটরাজ শিব তাঁর প্রাণপ্রিয়া সতীকে কাঁধে তুলে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিয়ে ত্রিভুবন পরিক্রমা করতে লাগলেন। সারা বিশ্ব কাঁপতে লাগল। প্রলয় তাণ্ডবে দেবতারা ভয় পেয়ে শ্রীবিষ্ণুর শরণ নিলেন। সব দেবতার প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে শ্রীবিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে শিবের কাঁধে থাকা সতীর দেহকে একান্নটি খণ্ডে ছড়িয়ে দিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সীমায়। কোথাও পড়ল দেবীর আঙুল তো কোথাও ব্রহ্মরন্ধ্র, কোথাও বা সতীর যোনি, যা 'মহামুদ্রাপীঠ' নামে জগতে খ্যাত হলো। কামরূপের নীলপর্বত হলো সেই স্থান যেখানে সতীর যোনি পড়েছিল। উচ্চকোটির তান্ত্রিক সাধকেরা বলেন যে—সতীর যে দশমহাবিদ্যা রূপ তারই সামগ্রিক প্রকাশ ঘটেছে কামরূপ কামাখ্যায়। কামাখ্যাতত্ত্ব, কামাখ্যা রহস্য যতটা প্রকাশিত, তার চেয়ে অনেক বেশি গোপন, গোপনতম।

এদিকে মদনদেব ভস্ম হয়েছিলেন, স্ত্রী রতি এ দেখে যখন কাঁদছেন, বিলাপ করছেন তখন দেবতাদের এসব দেখে খারাপ লাগল। ব্রহ্মা তো কামদেবকে এমন অসম্ভব প্রায় কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন। যে কর্মের নেপথ্যে রয়েছে জগতের হিত। ব্রহ্মা কামপত্নী রতিকে কিছুটা ভস্ম রাখতে নির্দেশ দিলেন। রতি কিছুটা ভস্ম রাখলেন। দেবতারা বললেন, শিবের রাগ কমে গেলে যখন তিনি সুপ্রসন্ন হবেন, তখনই তোমার পতি কামকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে।

রতির মন ভালো নেই। তিনি শিব-বন্দনা করলেন। শিবের মনে দয়া হল, তিনি যে ভোলানাথ—সকল রাগ তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর সুধাদৃষ্টিতে ভস্মের স্তূপ থেকে মদন নবরূপে বেরিয়ে এলেন—যাকে বলে নতুন জন্ম কিন্তু এ কোন রূপ, কামদেবকে চেনাই যাচ্ছে না! শিব কামকে নতুন জীবন দিলেন বটে, হারিয়ে গেল তার নিজস্ব অপূর্ব স্বরূপ। এবার কাম ও রতি উভয়েই শিবের স্তুতি, স্তব, বন্দনা শুরু করলেন। তাঁরা মহাদেবের কাছে কামদেবের সৌম্য ও সুন্দর রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন। শিব সন্তুষ্ট হলেন। শিব এবার কামদেবকে নির্দেশ দিলেন, ভারতবর্ষের ঈশান কোণে নীলাচল পর্বতে কামদেবকে যেতে। কামদেব মন দিয়ে শুনতে থাকেন আর ভগবান শিব ধীরে ধীরে বলে চললেন—'নীলাচল পর্বতে সতীদেহ থেকে ছিন্ন হওয়া একান্নটি খণ্ডের একটি খণ্ড এখনও গোপন রয়েছে। এই সতীপীঠটি অত্যন্ত জাগ্রত পীঠ। সাধারণ মানুষের হিতার্থে সেখানে গিয়ে তুমি দেবীর মহিমা প্রচার করো, দেবীকে প্রতিষ্ঠা করো, তাহলেই তুমি তোমার নিজের পূর্ব রূপ ফিরে পাবে।'

কামদেব ও রতি এবার চললেন নীলপর্বতে। সেখানে এখনও অনাবিষ্কৃত সতীপীঠ একটি রয়েছে। সতীর একান্ন পীঠের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পীঠ। দেবতারা ও মানুষ যে সতীপীঠকে মহামুদ্রাপীঠ বলে জানেন। কাম ও রতি সেই যোনিপীঠে এলেন। তখনও পর্যন্ত সেই গুহ্য পীঠ অপ্রকাশিত, অপ্রচারিত। শিবনির্দেশে কামদেব ওই গোপন থেকে গোপনতর পীঠে এসে পূজা শুরু করলেন। ভক্তিভরে কাম ও রতিদেবী আরাধনা, পূজা, স্তব, স্তুতি করতে থাকলেন, দেবী সন্তুষ্ট হলেন। দেবী কামদেবকে তাঁর পূর্ব রূপ দান করলেন। কামদেব তাঁর অপূর্ব পূর্ব রূপ ফিরে পেয়েছিলেন বলেই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ব্রহ্মপুত্রের গায়ে গড়ে ওঠা অসমের এই ভূমিভাগ কামরূপ নামে খ্যাত যার প্রধান দেবীপীঠ হল কামাখ্যা। কামদেব পূর্বরূপ ফিরে পেলেন, মনে আনন্দ, প্রতিক্ষণে দেবীর পূজা করে চললেন। দেবতারা কামরূপে এসে দেবীর অর্চনায় রত হলেন। ধীরে ধীরে দেবীর মাহাত্ম্যকথা ছড়িয়ে পড়ল। কামদেব সিদ্ধান্ত নিলেন ওই পীঠে একটি মন্দির বানিয়ে দেবেন। আমন্ত্রণ জানানো হল দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে। তিনি কামরূপে এসে কামের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে কামাখ্যার মন্দির গড়ে দিলেন। কামদেব এই মন্দিরের নাম দিলেন আনন্দাখ্য মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে দেবীর মহামুদ্রা যোনিপীঠ। সারাক্ষণ সেই পীঠকুণ্ড থেকে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

এই কামদেব এমনই একজন দেবতা, যার পরিচিতি আজ সর্বব্যাপক হলেও, তার পূজা আজ অনেকটাই অপ্রচলিত। এই কামদেব 'প্রেম' বা আরও নিবিড়ভাবে বললে 'বাসনা'-র দেবতা। ভারতীয় পরম্পরায় উল্লিখিত 'কাম' যে পশ্চিমাদের 'সেক্সুয়ালিটি'-র সমার্থক নয়, সে কথা বার বার আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। কামদেব 'কাম' অর্থাৎ দেহজ ও দেহাতীত—এই দুই প্রকার অনুভবের জগৎকে একত্রে মুক্ত করতে পারেন। অথর্ব বেদ-এ কামদেব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পৌরাণিক যুগে কামদেব বা মদনকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবীর সন্তান কোথাও তার জন্ম কৃষ্ণ ও রুক্মিণী অবতারে মিলনের ফলে আবার কোথাও কামদেবকে ব্রহ্মার সন্তান বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। জ্যোতিষে কামদেবকে মানুষের বাসনা-নির্ধারক গ্রহগুলির অধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়। কামদেবের অধিষ্ঠানমন্ত্র হল 'ক্লীং'। এই বীজ জপে নাকি কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি আকৃষ্ট হন। প্রাচীন ভারতে কামদেব রীতিমতো পূজিত হতেন। গুপ্তযুগে নগরে নগরে তার মন্দির ছিল। প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায়, সেই মন্দিরগুলি ছিল সেকালের প্রেমিক-প্রেমিকাদের নিয়মিত বিহারের স্থান। মদনোৎসব বা হোলি ছিল কামদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উৎসব। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম'-এ গুপ্তযুগের মদনোৎসবের যে বর্ণনা রয়েছে, তার কাছে আজকের নাইট ক্লাবও তুচ্ছ। হোলি আজ 'বসন্তোৎসব'। কামদেবের নাম আর তাতে সংশ্লিষ্ট নেই। কিন্তু উৎসব রয়ে গেছে।

কামদেব উপাসনা কিন্তু আজও বহমান। তবে তার উদ্দেশ্য ও বিধেয় মোটেই প্রাচীন কামদেব-উপাসনার অনুরূপ নয়। বিভিন্ন বিচিত্র কারণে কামদেব উপাসনা কুক্ষিগত হয়েছে এক শ্রেণির 'ধর্মব্যবসায়ী'-র। বেশ ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা জানান, 'কামদেব-যজ্ঞ' এবং 'কামদেব-বশীকরণ' দ্বারা তারা যে কোনো ব্যক্তির বাসনা চরিতার্থকরণের ব্যবস্থা করবেন। ফলে একদা যে পূজা-পাঠ এদেশের সংস্কৃতির একটা বড় জায়গাকে ধরে রেখেছিল, তা আজ তুকতাকের স্তরে নেমে এসেছে।

তবে ভারতের কয়েকটি স্থানে কামদেবের মন্দির আজও রয়ে গিয়েছে। তামিলনাড়ুর আরাগালুরে কামেশ্বর মন্দিরে, বৃন্দাবনের বিখ্যাত ১২টি বনের অন্যতম কাম্যবনে, তামিলনাড়ুর থাড়িকোম্বুর সৌন্দর্য পেরুমল মন্দিরে এবং রাজস্থানের হরসত-মাতা মন্দিরে কামদেব আজও পূজিত হন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কামদেব সাধনা

এবার কামদেবের সাধনা নিয়ে দুই-একটি আলোচনা করব। বছর পাঁচেক আগে কামাখ্যা থেকে একটু দুরে, শিলং যাওয়ার রাস্তায় খেতড়ীতে এক সাধুবাবার দর্শন পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তিথি অনুযায়ী সাধনার বিষয়ে বলেছিলেন—জ্যোতিষশাস্ত্রে 'তিথি'কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। যে তিথির যে দেবতা সেই তিথি অনুযায়ী, নিয়মানুসারে ও নিষ্ঠা সহকারে পুজো-আরাধনায় দেবতা প্রসন্ন হন এবং জাগতিক ভাবে মনের অভিলাষ অনেকার্থে পূর্ণ হয় দৈব আশীর্বাদে।

১) প্রতিপদ অর্থাৎ প্রথমা বা প্রথম তিথি। এই তিথির স্বামী হলেন অগ্নিদেব। প্রথমা বা প্রতিপদ তিথিতে অগ্নিদেবের পুজার্চনা করলে গৃহে ধন, ধান্য, আয়ু, যশ, বল, মেধা ইত্যাদির বৃদ্ধি হয়।

২) দ্বিতীয়া তিথির অধীশ্বর হলেন ব্রহ্মা দেব। ব্রহ্মা দেবের পুজো ভক্তিভরে করা আবশ্যক এবং এই তিথিতে কোনও ব্রহ্মচারী সৎ ব্রাহ্মণকে খাইয়ে অন্ন-বস্ত্র দান করলে খুবই শুভদায়ক ফল পাওয়ার আশা করা যায়।

৩) তৃতীয়া তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন গৌরী মাতা। গৌরী মাতার পুজো আরাধনায় সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই তিথির আর এক স্বামী হলেন কুবের দেব। অতএব কুবের দেবের আরাধনায় গৃহে ধন বৃদ্ধি ঘটে। তাই গৌরী মাতার সাথে সাথে কুবের দেবের আরাধনা করা উচিত।

৪) চতুর্থী তিথির অধীশ্বর শ্রীগণেশ। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী সকল পুজোর পূর্বে গণেশজীর আরাধনা প্রচলিত। ওঁর শরণাগত হলে জীবনের সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়। এ ছাড়া সকল কর্মেরই সিদ্ধিদাতা হিসাবে গনেশ দেব পুজিত হন।

৫) পঞ্চমী তিথির স্বামী হলেন নাগদেব। এই তিথিতে নাগদেবতার পূজার্চনা করলে জীবন থেকে অনাবশ্যক ভয় দূর হয়। কালসর্প দোষের প্রভাবও হ্রাস পায়।

৬) ষষ্ঠী তিথির অধীশ্বর হলেন স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিক দেব। এঁর পুজোয় ব্যক্তি মেধাবী, কীর্তিমান ও যশস্বী হন। অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ও তোতলা শিশুর জন্য কার্তিকদেবের আরাধনায় অনেকার্থে শুভাশুভ ফল প্রাপ্তি হয়। মঙ্গলের দশায় যারা মামলায় জর্জরিত তারা যদি কার্তিক দেব বা স্কন্দদেবের পুজো করেন, তা হলে তা ফলদায়ক হবে।

৭) সপ্তমী তিথির স্বামী সূর্যদেব। সনাতন বা বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূর্যদেবকে আরোগ্যকারক মানা হয়। সূর্য হলেন জগতের পিতা বা রক্ষাকর্তা। সুস্থ জীবন ও রোগমুক্তির জন্য সূর্যপুজো আবশ্যক। বিশেষ করে যাদের চোখের সমস্যা তারা এই বিশেষ তিথিতে সূর্যপুজো নিয়মিত করলে শুভ ফল লাভ করতে পারেন।

৮) অষ্টমী তিথির দেবতা হলেন রুদ্রদেব। অতএব এই তিথিতে সুশোভিত ভগবান সদাশিবের পুজো করলে সকল কষ্ট ও রোগ মুক্তি হয়।

৯) নবমী তিথির অধিশ্বরী দেবী হলেন দুর্গামাতা। এঁর পুজো-অর্চনায় যশ লাভ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঘটে, বাধা ও শত্রু নাশ হয়। দুর্গামন্ত্র জপ ও পুজো করলে মা দুর্গা প্রসন্ন হন, জীবন সুরক্ষিত থাকে এবং জীবনে শুভ ফল লাভ হয়।

১০) দশমী তিথির স্বামী হলেন যমরাজ। এই তিথিতে যমদেবের আরাধনা করলে অকাল মৃত্যু ও নানা বিপদ ও দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

১১) একাদশী তিথির দেবতা বিশ্বদেব। এঁর পুজো, আরাধনা করলে ধন-ধান্য এবং ভূমি বা জমি বৃদ্ধি পায়।

১২) দ্বাদশী তিথির স্বামী হলেন বিষ্ণুদেব। শ্রীবিষ্ণুর নিয়মিত পুজো করলে সকল প্রকার সুখ বৃদ্ধি হয় এবং সকল স্থানে মানুষের শ্রদ্ধা ও আদর প্রাপ্তি ঘটে। এই বিশেষ তিথিতে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম জপ করলে শুভ ফলদায়ক হবে। এই তিথিতে তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ বলেই মানা হয়।

১৩) ত্রয়োদশী তিথির অধীশ্বর কামদেব। এঁর বন্দনা করলে ব্যক্তি রূপবান হয় এবং বৈবাহিক জীবনে সুখ বেশি করে পাওয়া যায়। কামদেবের পূজায় ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হয় ও সকল নারী-পুরুষ তার বশে তাকে।

১৪) চতুর্দশী তিথির অধীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ ভগবান শিব। তাই প্রতি মাসের চতুর্দশী তিথিতে বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ভগবান শিবের উপাসনা এবং রুদ্রাভিষেক করলে ভগবান শিব প্রসন্ন হন। এবং ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

১৫) পূর্ণিমা তিথির দেবতা চন্দ্রদেব। এঁর পুজো করলে মানুষের সমগ্র সংসার জগতে আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যাদের চন্দ্রের দশা চলছে, তাদের জন্য পূর্ণিমার ব্রত করে চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিলে মানসিক শান্তি ও সুখ বেড়ে যায়। যে সকল বাচ্চা সর্দিকাশি, ঠান্ডা জনিত রোগে প্রায়ই ভোগে তাদের মায়েদের অন্তত এক বছর পূর্ণিমার ব্রত পালন করা উচিত।

১৬) অমাবস্যা তিথিতে পিতৃপক্ষের আধিপত্য। অতএব এই তিথিতে নিজের পিতৃপক্ষের শান্তিলাভ হেতু, তাদের স্মরণ করে গরিবদের অন্ন, বস্ত্র সাধ্যমত দান করলে মানসিক শান্তি ও পিতৃপক্ষের আশীষ প্রাপ্তি হয়। ফলে নিজ কুলের মান, মর্যাদা, ধন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং সুসন্তানের অধিকারী হন।

ত্রয়োদশী তিথির অধীশ্বর কামদেবের সাধনা করে ব্যক্তির বৈবাহিক জীবনের সুখ পাওয়া যায় এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য কিছু সাধনার কথা বলপছিলেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির জন্য কামদেব সাধনা

শুক্লপক্ষের শুক্রবার এই সাধনার জন্য প্রকৃষ্ট সময়। তবে ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শুক্লপক্ষের যে কোনওদিন শুরু করা যেতে পারে। সাধনার জন্য একটি শান্ত পরিমণ্ডল প্রয়োজন। এমন একটি জায়গা খুঁজে নিয়ে পূর্ব দিকে মুখ করে একটি আসনে বসতে হবে। সামনে আম কাঠের একটি কাঠের তক্তা নিন এবং একটি পরিস্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন। আপনার গুরুদেবের ছবি তার উপরে ভক্তিভরে স্থাপনা করুন। এছাড়া এই সাধনার জন্য দরকার অনঙ্গ কামদেব যন্ত্র এবং গোলাপী স্ফটিকের জপমালা, কাপড়, সিঁদুর, ফুল, ধানের শীষ, কর্পুর, গোরোচনা, আতর, শ্বেত চন্দন, ফুল, বেলপাতা, ফল ধুপ, ধুনো, আগর, সুপারী। এই সাধনার খুবই সহজ এবং বৃদ্ধ বা যুবক, পুরুষ বা মহিলা—যে কেউই এই সাধনা করতে পারেন। স্নান সেরে পরিস্কার কাপড় পরিধান করুন ও চুল খোলা রাখবেন। এই উপাসনার জন্য প্রথমেই গুরুদেবের পুজো করুন। কাপড়, সিঁদুর, ফুল, ধানের শীষ, কর্পুর, গোরোচনা, আগর, আতর, মিছরী, শ্বেত চন্দন, ফুল, বেলপাতা, ফল এবং সাধনায় সাফল্যের জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন। তারপর একমালা গুরু মন্ত্র জপ করুন।

এরপর পরিস্কার আতপ চাল দিয়ে আটটি স্তুপ তৈরি করুন এবং প্রতিটির উপরে একটি করে সুপারী রাখুন। প্রতিটি চলের স্তুপ কামদেবের আটটি রূপের এক একটির প্রতীক। এরপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্র জপ করার পর উল্লিখিত মন্ত্রে একে একে এই রূপগুলির পূজা করুন।

ওঁম্ ক্লীং কামায় নমঃ—মন্ত্রে প্রথম স্তুপের উপর কর্পূর নিবেদন করুন।

ওঁম্ ক্লীং ভস্মশরীরায় নমঃ—মন্ত্রে দ্বিতীয় স্তুপের উপর গোরোচনা নিবেদন করুন।

ওঁম্ ক্লীং অনঙ্গায় নমঃ—মন্ত্রে তৃতীয় স্তুপের উপর আতর নিবেদন করুন।

ওঁম্ ক্লীং মন্মথায় নমঃ—মন্ত্রে চতুর্থ স্তুপের উপর আগর নিবেদন করুন।

ওঁম্ ক্লীং বসন্তসখায় নমঃ—মন্ত্রে পঞ্চম স্তুপের উপর সিঁদুর নিবেদন করুন।

ওঁম্ ক্লীং রতিকান্তায় নমঃ—ষষ্ঠ স্তুপের উপর মিছরী নিবেদন করুন।

ওঁম্ ক্লীং ইক্ষুধর্নুধরায় নমঃ—মন্ত্রে সপ্তম স্তুপে চন্দন কাঠ নিবেদন করুন।

ওঁম্ ক্লীং পুষ্পবাণায় নমঃ—মন্ত্রে অষ্টম স্তুপে ফুল নিবেদন করুন।

তারপর 'অনঙ্গ কামদেব যন্ত্র' একটি শুদ্ধ ও পরিস্কার প্লেটে কিছু জল দিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে শুকনো ও পরিস্কার কাপড়ে মুছে নিয়ে শুকিয়ে ফেলুন। এইবার যন্ত্রের পুজো করুন। এই সাধনায় প্রদীপ জ্বালানোর দরকার নেই, শুধু সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বালান। এইবার নীচে দেওয়া মন্ত্রটি ১০০০ বার জপ করুন।

মন্ত্র—ওঁম্ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমাহি তন্নো অনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।

জপ সমর্পণ করে ভগবান কামদেব এবং দেবী রতির কাছে সব ধরণের বৈধ কামনা প্রদান করতে, জীবনে পার্থিব আনন্দ, যৌন শক্তি বৃদ্ধি, আপনি যাতে দীর্ঘদিন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তরুণ, উদ্যমী, সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং তারুণ্যে ভরপুর থাকেন ইত্যাদির জন্য ভগবান কামদেবকে আপনার দেহের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য অনুরোধ করুন। পরপর দশদিন একই সময়ে, একই উপায়ে জপ করে শেষের দিন, (শুক্রবারে শুরু করলে পরের সপ্তাহের রবিবারে) ১০০০ আহুতি দিন।

বিশ্বাসের সাথে, সঠিক উপায়ে ও ভক্তি ভরে এই সাধনা করলে খুব শীঘ্রই আপনি আপনার এবং আপনার চারপাশের মানুষের আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করবেন, আপনার চৌম্বকীয় পরিমণ্ডল ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকবে। আপনি যে ক্ষেত্রেই থাকুন না কেন আপনার ব্যক্তিত্ব আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় হবে, আপনি আরও উদ্যমী, সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং তারুণ্যে ভরপুর হয়ে উঠবেন। সাধনার ইতিবাচক ফলাফল আপনার জীবনে আসবে এবং অবশ্যই আপনাকে সফল মানুষ হিসাবে পরিচিতি দেবে।

কামদেব স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্র

এই কামদেব স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্রটি যে কোনও যুবতী মেয়ে বা মহিলা বশীকরণের জন্য সর্বোচ্চ বলে বিবেচিত হয়। (কোনও অনৈতিক চিন্তায় ও অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ করলে সাধকের বিপদ হতে পারে) যদি কেউ ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে এবং বিশ্বাসের সাথে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন ও পুরো নিয়ম সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে পালন করেন, তার দ্বারা করা বশীকরণ সর্বদা সফল হয়। এই বশীকরণ মন্ত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই মন্ত্রটি একটি সিদ্ধ মন্ত্র। এটি জপ করাও বেশ সহজ। আপনি যদি সত্যিকারের মন এবং সংকল্প নিয়ে এই কাজটি করেন, তবে বিশ্বাস করুন, আপনার দ্বারা করা বশীকরণ সফল হবে।

এই মন্ত্রটি শুধুমাত্র মঙ্গলবার রাতে সূর্যাস্তের পরে সিদ্ধ করা যেতে পারে। উত্তর দিকে মুখ করে একটি নির্জন জায়গায় বসুন এবং আপনার সামনে সেই মেয়ে/মহিলার একটি ছবি রাখুন। ছবির সামনে এক মুঠো সুগন্ধী চালের ভাত রাখুন এবং সেই ভাতের উপরে অল্প পরিমাণে কুমকুম রাখুন। এবার সেই ভাতের উপরে একটি মাটির প্রদীপ রাখুন এবং তাতে অল্প পরিমাণে ঘি ভর্তি করে প্রদীপ জ্বালান। তারপরে আপনি মনে মনে ঐ মহিলার কথা চিন্তা করে নীচে দেওয়া মন্ত্রটি ৫০১ বার জপ করুন।

মন্ত্র—ওঁম্ হ্রীং সঃ কামদেবায় (সাধ্যং) বশ্যং কুরু কুরু ফট্ স্বাহা।

কামদেব স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্র জপ শেষ হওয়ার পরে, আপনার কপালে সেই ছবি তিনবার স্পর্শ করুন এবং সেই ছবিতে তিনবার ফুঁ দিন এবং মন্ত্রটি আবার ১১ বার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জপ করুন। এবার এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী একটি কালো কাপড়ে বেঁধে নিন এবং একটি নির্জন জায়গায় গর্ত খুঁড়ে সেখানে পুঁতে ফেলুন। আপনি যদি এই পদ্ধতিটি সঠিক নিয়মে করেন, তবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এর শুভ ফলাফল দেখতে শুরু করবেন।

বশীকরণের জন্য রতি মন্ত্র

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য কামদেব মন্ত্রের সাথে চুম্বকত্বের অনুভুতি হবে। আপনি কি পরিচিত ও অপরিচিত আরও মানুষের ভালবাসা পেতে চাইছেন? আপনি কি আপনার মধ্যে একটি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তৈরি করতে চাইছেন? কামদেব যে হেতু প্রেম ও আকর্ষণের দেবতা, তাই এই কামদেব মন্ত্র ভক্তির সাথে নিয়মমতো জপ করলে আপনার চারপাশে অদৃশ্য একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে। আপনার সংস্পর্শে আসা যে কেউ মুগ্ধ বোধ করতে শুরু করবে। কামদেব মন্ত্রটি সুদর্শন এবং মনোরম ব্যক্তিত্বের জন্যও নির্দিষ্ট। নিত্যদিন এই মন্ত্রের জপ আপনার একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে সাহায্য করে। এই মন্ত্র চাকরীর ইন্টারভিউ এবং চালু ব্যবসায় সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়। বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করার জন্য কামদেব এই মন্ত্রও জপ করা যেতে পারে। আপনি কি আরও বেশী মানুষের ভালবাসা পেতে চাইছেন? আপনি কি আপনার মধ্যে একটি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তৈরি করতে চাইছেন? তবে এই পদ্ধতিটি জেনে-বুঝে নেবেন।

আপনাকে এই রতি-কামদেব স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্রটি পরপর ৮ দিন জপ করতে হবে এবং তাও সূর্যোদয়ের আগে এবং আপনাকে বৃহস্পতিবার থেকে এই পদ্ধতিটি শুরু করতে হবে।

এই বশীকরণ ক্রিয়াটি করার জন্য প্রথমেই এক সপ্তাহ ধরে দিনের বেলা উপবাস ও রাত্রিবেলা স্ব-পাক নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করবেন, মাটিতে ঘুমোবেন, কথা কম বলবেন, দিবানিদ্রা যাবেন না, প্রতিদিন গোলাপী স্ফটিকের মালায় নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করবেন। যে কোনও শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার থেকে টানা আট দিন সূর্যোদয়ের আগে স্নান করুন এবং সাদা পোশাক পরিধান করুন। এবার কামদেবের পুজো করে তারপরে সাদা রঙের আসন স্থাপন করে পূর্ব দিকে মুখ করে নির্জন স্থানে বসুন। আপনার সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে টানা আট দিন তুলসীর মালা নিয়ে নীচে প্রদত্ত মন্ত্রটি ১০০৮ বার করে জপ করুন।

জপ মন্ত্র—ক্লীং কামদেবতায় নমঃ। ওঁম্ হুম্ আকর্ষণায় বশীকরণায় ফট্। ওঁম্ কামদেবায় বিদ্মহে রতিপ্রিয়ায় ধীমহি তন্নো অনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই বশীকরণ ক্রিয়া করার সময় একটি বিষয় মাথায় রাখবেন যে, এই আট দিন মাংস, মদ, ধুমপান বা নেশাদ্রব্য ব্যবহার করবেন না এবং এর আগের ও পরের সপ্তাহ ব্রহ্মচর্য অনুসরণ করবেন। আপনি যদি পূর্ণ নিয়মে টানা আট দিন এই ক্রিয়াটি করেন তবে আপনার বশীকরণ মন্ত্র জপ পুরোপুরি সফল হবে। যে মহিলার জন্য আপনি বশীকরণ ক্রিয়া করছেন তিনি নিজেই এসে আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়—যদি আপনি তন্ত্র কার্যে সফল হতে না পারেন তাহলে জানবেন - হয় তো আপনি ষটকর্মের নিয়ম সঠিকভাবে পালন করেননি। তন্ত্রশাস্ত্রে শর্ট-কাট পদ্ধতি বলে কিছু নেই। ষটকর্মকে অবজ্ঞা করা মানে অসফল হওয়া।

কামদেব শাবর মন্ত্র

'ওঁম্ নমঃ কামদেবায়
সহকাল সহদ্রাশ সহমহলী বনহে ধুনন
–জনমমদর্শনম্ উৎকণ্ঠিতম্ কুরু কুরু —
দক্ষিণ হস্তধর কুসুমবানেন হন হন স্বহা।

উপকারিতা—এই মন্ত্র জপ করলে মানসিক ও শারীরিক আকর্ষণ তীব্র হয়, যার ফলে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বজায় থাকে এবং প্রেম বৃদ্ধি পায়।

কামদেব গায়ত্রী মন্ত্র—ওঁম্ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবানায় ধীমহি তন্নো মন্মথ প্রচোদয়াৎ।

কামদেব বীজ মন্ত্র—ওঁম্ ক্লীম্ কামদেবায় নমঃ।

কামদেব শাবর মন্ত্রের উপকারিতা

কামদেব গায়ত্রী মন্ত্র জপ নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে:

১) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও সম্পর্ক বাড়ে।

২) এই মন্ত্রটি জপ করলে আপনার যৌন শক্তি এবং ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

৩) আপনার মুখ সর্বদা ঐশ্বরিকভাবে আলোকিত হয়।

৪) আপনি দেখতে খুব কমনীয় এবং আকর্ষণীয়, যার কারণে আপনার কাছাকাছি আসা লোকেরা মুগ্ধ হয়।

৫) আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হয় এবং আপনি যে কাজ করেন তা প্রশংসিত হয়।

৬) এই মন্ত্রটি জপ করলে দাম্পত্য জীবনে চাপ কমে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সন্তুষ্ট থাকে।

৭) এই মন্ত্রটি প্রেমের সম্পর্কের গতি প্রদান করে এবং জীবনে আরও সুবিধা অর্জনের উপায় হয়ে ওঠে।

৮) কামদেব গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে আপনি অগাধ ভালবাসা পান এবং আপনার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই মন্ত্রটি আপনার জীবনে প্রেম, আকর্ষণ এবং সম্পর্ক বাড়ায়।

কামদেব শাবর মন্ত্র সিদ্ধি

কামদেব শাবর মন্ত্র সিদ্ধির উপাসনার মাধ্যমে আপনার পক্ষে কাউকে আকৃষ্ট করা বা আপনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই মন্ত্রের মাধ্যমে আপনি সহজেই প্রেমের দেবতা কামদেবকে খুশি করতে পারেন। কথিত আছে কামদেব তার হাতে একটি ধনুক ও তীর ধারণ করেন এবং তার তীরগুলি মাধুর্য ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এসব তীর ব্যবহার করে তিনি দুই ব্যক্তির মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধির কাজ করেছেন।

আপনি যদি ঘৃণা দুর করতে এবং বিশেষ কাউকে ভালোবাসতে চান, তাহলে কামদেব শাবর মন্ত্র সিদ্ধি আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এই মন্ত্রটি শাবর মন্ত্রের অন্যান্য মন্ত্র থেকে আলাদা এবং এটি বশীকরণের জন্য শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। এই মন্ত্র শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। আপনি যদি সত্যিই কাউকে ভালোবাসেন এবং তা অর্জন করতে চান, তাহলে কামদেব শাবর মন্ত্র সিদ্ধি আপনার জন্য উপযোগী প্রমাণিত হতে পারে।

প্রেম ও প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্য লাভের জন্য সর্বক্ষেত্রে কামদেবের পূজা করা হয়। এটি প্রেম, বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ককে উন্নত করতেও সাহায্য করে। নীচে পুজোর বিশদ বিবরণ, মন্ত্র, সম্পূর্ণ পদ্ধতি এবং পুজোর উপকারিতার বিশদ বিবরণ রয়েছে। এই পুজো ঘরে বসেই করা যায়।

কামদেব মন্ত্র —- ক্লীম্ কামেশ্বরায় নমঃ

কামদেব পূজা কিভাবে করবেন?

উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে পূজা করতে হবে। পূজা করার আদর্শ সময় হল সকালে সূর্যোদয়ের পরে। যে ব্যক্তি পূজা করছেন তাকে স্নান করতে হবে এবং তারপর গোলাপী রঙের পোশাক পরতে হবে। মনে মনে গণেশকে প্রার্থনা করুন। আপনার শোওয়ার ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে কামদেবের মূর্তি রাখুন। মূর্তি না থাকলে জলভর্তি কলশ রাখতে পারেন। কলশের জলে কিছু চন্দন, সুগন্ধি ফুল, আমের পল্লব এবং সুগন্ধি যোগ করুন। নারকেল দিয়ে কলশ বন্ধ করুন।

* ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে হবে।
* চন্দনের ধুপ বা আগরবাতি হতে হবে।
* গোলাপি রঙের ফুল নিবেদন করুন।
* চন্দন, গুলাল ও আবীর নিবেদন করুন।
* যদি আমের ফুল পাওয়া যায় তাহলে সেগুলো নিবেদন করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

* সেদিনের ভোগ বা প্রসাদ চাল ও চিনি দিয়ে পায়েস তৈরি করতে হবে।
* আপনার প্রার্থনা এবং ইচ্ছা বলুন
* উপরের কামদেব মন্ত্রটি (ক্লীম্ কামেশ্বরায় নমঃ) ১০৮ বার জপ করতে হবে।
* ভোগ বা প্রসাদ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত এবং পুজোয় একজন বিবাহিত মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

কামদেবকে বিশেষ নিবেদন

কামদেবকে দেওয়া চন্দন রোমান্স এবং প্রেমের বিষয়ে ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রতিদিন ব্যবহার করতে হবে।

কামদেবকে সাতটি প্রদীপ নিবেদন করলে দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হয়। গরুর ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে হবে। ঘিতে আতরের মতো সুগন্ধি মেশাতে হবে। পায়েস নৈবেদ্য নিবেদন করলে স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা মিটে যাবে।

কামদেবকে ময়ূরের পেখম অর্পণ করুন এবং পরে বাড়িতে রাখলে ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করবে। প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে ভাগ্য ভালো থাকবে।

কামদেব বশীকরণ মন্ত্র সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি জনপ্রিয় মন্ত্র। ভগবান কামদেব প্রেম ও আকর্ষণের দেবতা। কামদেব ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম। কামদেব হলেন আকর্ষণ এবং চুম্বকত্বের প্রভু। সমাজে চৌম্বক ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে কোন ব্যক্তিকে জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয় এবং এমনকি সফল ব্যক্তিও সেই ধরণের কমনীয় ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করে।

কামদেব পুরুষদের মধ্যে পুরুষত্ব শক্তি বৃদ্ধি করে। কামদেব মন্ত্র সাধকের চারদিকে অদৃশ্য স্বর্গীয় আভা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যৌন শক্তি কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের শক্তি নয় বরং সমগ্র শরীরের ঐশ্বরিক শক্তি।

এই মন্ত্রটি বশীকরণ ও আকর্ষণের জন্য খুবই কার্যকরী। অনেক সাধক তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মন্ত্রটি ব্যবহার করেছেন। মন্ত্রটি গভীর একাগ্রতা এবং বিশ্বাসের সাথে জপ করা উচিত।

কামদেব বশীকরণ মন্ত্র কীভাবে জপ করবেন

মন্ত্র জপ শুক্রবার শুরু করুন। কামদেবের ছবিকে ফুল, দীপ ও ধূপ দিয়ে পুজো করুন। একটি খাঁটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। সরল কাগজে আপনি যাকে আকর্ষণ করতে চান তার নাম লিখুন। শুভ ও সফল ফলাফলের জন্য কামদেব বশীকরণ মন্ত্রের ৫ মালা উজ্জীবিত সম্মোহন মালার সাথে জপ করুন। মান্ত্রিক এই প্রক্রিয়ায় উজ্জীবিত সম্মোহন মালা ব্যবহার করতে পারেন। আরও আশাব্যঞ্জক ফলাফলের জন্য উপাসনার স্থানে বশীকরণ যন্ত্রটি রাখুন ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কামদেব বশীকরণ মন্ত্র—ওঁম্ কামদেবায় কাম বশংকরায় অমুকস্য হৃদয়ম্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় বশমানয় স্বাহা।

২১ দিন এই মন্ত্রটি জপ করুন এবং কামদেব বশীকরণ মন্ত্র জপ করে এর ফলাফল দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

কামদেব, ভস্ম ও বিভূতি

ফিরে যাই দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে। দেবী সতী দক্ষযজ্ঞে প্রানত্যাগ করার পরে ভগবান শিব যখন তান্ডব করেছিলেন তখন ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দৈব দেহ ৫১টি খন্ডে খন্ডিত করলেন ও পরে শান্ত ও বিরহ কাতর শিব এক অবিচল ধ্যানে মগ্ন হলেন। এদিকে ব্রহ্মার বর অনুযায়ী তারকাসুরকে বধ করার জন্য শিব পুত্র কার্তিকের জন্ম হওয়া আবশ্যক। অন্যদিকে সতীর পুনর্জন্ম হয়ে দেবী পার্বতীও শিবের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু স্বয়ং শিব অখন্ড ধ্যানে মগ্ন, নির্বিকার। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে তার মধ্যে কামবাসনা জাগ্রত করার জন্য ভার পড়ল কাম ও প্রেমের দেবতা কামদেবের ওপর। তিনি ও তার স্ত্রী রতি পূর্বপরিকল্পনা মত পঞ্চশরে বিদ্ধ করলেন মহাদেবকে, ধ্যান ভঙ্গ হল কিন্তু ক্রোধিত শিবের তৃতীয় নয়নের ক্রোধাগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলেন কামদেব। মদন বা কামদেব ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর সেই ভস্ম বা বিভূতি মহাদেব সর্বাঙ্গে মেখে হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। এই কাহিনীটিতে যুগ-যুগ ধরে সনাতনী বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও এর ছত্রে ছত্রে নাটকীয় মোড় থাকলেও বাস্তবে রূপক আকারে মূলতঃ এক গুহ্য সাধনতত্ত্ব বলা আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদগীতার বানীটিতে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে—

> 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
> যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ'।। (২/৬৯) গীতা।

— অর্থাৎ সর্বভূতের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ (অজ্ঞাত), সেই ব্রহ্মে, স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি-ঋষিরা জাগ্রত থাকেন (সর্বদা ব্রহ্মদর্শন বা সত্য জ্ঞান লাভ করেন)। আর যে অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে ভূতগণ জাগ্রত থাকে (সংসার দর্শন করে) স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ তিনি সংসার অনুভব করেন না।

এই শ্লোকটি চণ্ডীতে একটু সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

> 'দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
> কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ'।। (১/৪৮-৪৯) চন্ডী।

অর্থাৎ পেঁচার মত কোন কোন প্রাণী দিনে দৃষ্টিশক্তিহীন; কিন্তু অন্যান্য প্রাণী রাতে অন্ধ। সুতরাং জগৎ একই থাকে কিন্তু যার যার দেখার ক্ষমতা অনুযায়ী সে সে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ততটুকুই দেখে। এই দেখা সাধন-দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই একই শাস্ত্র, কিন্তু বোধ বা অনুধাবন করার তারতম্যের ওপরে কারও কাছে সেটি সাধারণ মুখরোচক গল্প আবার কারো কাছে গূহ্য সাধন পদ্ধতি। অর্থাৎ মদন ভস্মের এই কাহিনীর মধ্যেও রূপক আকারে সাধন-পদ্ধতি কিছু বলা হয়েছে। সেটি বুঝতে গেলে আমাদের, প্রকৃত অর্থে ভস্ম কি, মদন বা কামদেবের বাস্তব রূপ কি ও সাথে আত্মসাধন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জানতে হবে।

আমরা জানি, ভস্মকে বিভূতিও বলা হয় আর সংস্কৃত ভাষায় বিভূতি শব্দটির একাধিক অর্থ পাওয়া যায় যেমন—ভগবানের ঐশ্বর্য বা শক্তি, সমৃদ্ধি, অষ্টবিধ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য (যথা অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত), দেবাদিদেব মহাদেবের অঙ্গবিভূষিত ভস্ম 'বিভূ' শব্দের অর্থ ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্ সমন্বিত এই ব্রহ্মান্ড। সাধকের দেহও একটি ব্রহ্মাণ্ড। যে পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়ে সাধকের বা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে সেই কাম-বাসনার শরীর ভস্ম না হলে যে, সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরম পুরুষোত্তমকে জানার উপযোগী চিন্ময় দেহ লাভ করা যায় না! সাধক তার কঠোর সাধনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাম-বাসনার শরীরকে যোগাগ্নিতে দাহ করে ভস্মে পরিণত করে তার দেহকে করে তোলেন ঈশ্বরের নিত্য আনাগোনার দেবালয়।

এই 'ভস্ম' পূর্ণ মাত্রায় আত্ম-ত্যাগ এর ফলে প্রস্তুত হয়। এই পবিত্র ভস্ম নিজের পূর্ব অবয়ব, আকার, বর্ণ, গন্ধ এমনকি কর্ম এবং সর্বস্ব সত্তা হারায়। যোগীরা তাই জীবদ্দশায় যিনি নিজের আদ্যশ্রাদ্ধের সাথে সকল পরলৌকিক কাজ সম্পন্ন করে 'বিরজা হোম' করে এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। এর ফলে তিনি বাইরে থেকে জীবিতদের মত কাজকর্ম করলেও অন্তর থেকে নিজেকে মৃত (জ্যান্তে মরা) বলে মনে করেন, তার কাছে এই অন্তঃসারশূন্য জগৎ ভস্মের মতই। ফলে তিনি প্রকৃতপক্ষে হয়ে ওঠেন বিভূতিভূষণ।

আবার অনেক যোগীর কুটিরে বা আশ্রমে দেখা যায় জ্বলন্ত ধুনী। এই ধূনি জ্বলতেই থাকে। সাধু যোগী প্রতিদিন নিত্যকর্মে জপকর্ম করে জাগ্রত রাখেন অন্তরাত্মাকে, তার দেহের মৌলিক উপাদানের প্রতীকরূপে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার আরতিতে স্থূলরূপে নিবেদন করেন জল কিন্তু নাভিতে জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় সূক্ষ্ম রূপে নিবেদন করেন দেহস্থ অপতত্ত্বের প্রতীকস্বরূপ চন্দ্রগ্রন্থি বা সোমগ্রন্থির নির্যাস সোমরস। বাহ্যিক রূপে তিনি জ্বলন্ত প্রদীপ নিবেদন করেন দেহস্থ তেজতত্ত্বের প্রতীক রূপে আর অন্তরে প্রজ্বলিত দেহের সব উত্তাপকে ধুনিতে নিবেদন করে হিমশীতল শবরূপে নিজেকে কল্পনা করে আর বাহ্যিক ভাবে তিনি ক্ষিতি তত্ত্বের প্রতীক রূপে কাঠের গুঁড়ি, ঘি, ধুনো-গুগ্গল মিশ্রিত হোমাদ্। এর মধ্যে দিয়ে যোগী-সন্তরা নিজেদেরকেই আত্মাহুতি দেন, এই ভাবে নিজের অন্তরে ও বাইরে ধ্যান-ধারণা-আসন-মুদ্রার সাহায্যে পরিপক্ক করে ঈশ্বরের নিত্য আনাগোনার মন্দির নির্মাণ করেন। যোগী সাধক ধুনিতে ধুপ দানের মাধ্যমে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বাহ্যিক ভাবে বায়ুতত্ত্বকে আহুতি দেন, কিন্তু অন্তরে প্রান-অপানের যুগপৎ প্রানায়াম করে সমস্ত রিপুকে ভস্মীভূত করেন। এই ধুনির ধোঁয়া—সেটি স্বয়ং ব্যোমতত্ত্ব। যোগী তার মনে মনে ঐ ধোঁয়ার কুন্ডলীর মত কুন্ডলিনী শক্তিকে উত্তোলন করেন সহস্রারে। তাই যোগী বা সন্ন্যাসীর হোম-যজ্ঞ ও ধুনি হল চরম বৈরাগ্যের প্রতীক আর ধুনির বিভুতি বা ভস্ম হল চিরকালের পবিত্র বস্তু।

ভস্ম ও সুসলার

আগেই বলেছি, কালিকা পুরাণানুসারে ব্রহ্মা কামদেবকে সৃষ্টি করে বলেছিলেন—দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর, সর্প, দৈত্য, দানব, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণীরা সকলেই তোমার শরের শিকার হবে। অন্য প্রাণী তো বটেই, আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবও তোমার বশবর্তী হবো'। কামদেবের বাণে বশীভূত হয়ে ব্রহ্মা যেমন আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন সন্ধ্যাকে দেখে, ঠিক তেমনই কামদেবের কাজ একটাই—জীবের মনে কামভাবের উৎপত্তি ঘটানো। কিন্তু কামশক্তির অতি অল্প অংশই বংশরক্ষার জন্য যথেষ্ট। এই বিশাল উদ্বৃত্ত কামশক্তি নিয়ে মানুষ কী করবে, তা কিন্তু কামদেব নির্ধারণ করে দেন না। লক্ষ্য করে দেখুন, মানুষের চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক আছে, কাজ করার জন্য হাত আছে, আছে উদর, উপস্থ। যা দেবার ছিলো, যতোটুকু দেওয়ার ছিলো, পরমাপ্রকৃতি তা অকাতরে তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানকে ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পেশা, নাম, কাম, ধাম কোনো কিছুই নির্ধারিত করে দেননি। এবার মানুষই সিদ্ধান্ত নিক, সে কী খাবে, কোন পথে চলবে, কী করবে তার উদ্বৃত্ত নিয়ে। এটাই তার লীলাখেলা। অলক্ষ্যে বসে তিনি সাধারণের মত দেখতে থাকেন—মানুষ কি করে! মানুষ পারে তার কামশক্তিকে সংযত করে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত হতে। তা না করে মানুষ কামের প্রভাবে প্রেমের ব্যাকুলতায় খেতে ভুলে যায়, আনন্দের সময় উপস্থিত থাকতে পারে না, ক্ষোভের সময় ভয় ভুলে যায়। মনের মধ্যে সতত জেগে ওঠা এই যে হাজারো কামনা-বাসনা তার উৎসই হল কামদেব। আমাদের কামনা-বাসনার পুর্তি হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে। তাই মদনের পঞ্চশরই চোখ-কান-নাক-জিভ ও ত্বক এই এই পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চশরের পঞ্চপুস্প হল রুপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এই পঞ্চ তন্মাত্রা। তাই যিনি একবার মদনের এই পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছেন বহ্নিশিখায় পতঙ্গের মত ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, রূপ-রসে মজেছেন, সম্মোহিত হয়েছেন, ভোগের নেশায় উন্মাদ হয়েছেন, ধীরে ধীরে কামদেব তার যৌবন, তেজ, বীর্য, কান্তি, জীবনীশক্তি সবকিছু শোষণ করেছেন, অতৃপ্ত বাসনায়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আগুনের মত দগ্ধ করেছেন, তাপিত করেছেন, পরিশেষে অসংখ্য হতাশা, গ্লানি, অপূর্ণতার মাঝে রূদ্ধ করেছেন, স্তম্ভন করেছেন। সুতরাং যখন নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য মানুষ কোনো কিছু কামনা করে তখন তা কাম বা কামদেবের অধিকারে চলে আসে। কিন্তু পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে বা গুরুকৃপায় যখন কোনও 'সাধক মানুষ' এই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারে তখন 'কাম আখ্যায়িত হয় কামাখ্যা রূপে'। কাম থেকে প্রেম, তার থেকে প্রেমাস্পদ কামাখ্যার ঠিকানা জানা হয়ে যায়। তাঁকে জানার পর আর কিছু জানার থাকে না, তাকে পাওয়ার পর আর কিছু পাওয়ার থাকে না। সাধককে তাই যোগেশ্বর শিবের মতই ধ্যানের গভীরে, প্রেমের গভীরে ডুব দিয়ে নিজেকে খুঁজে পায়। আর মদন যখন সেই পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার অমোঘ পঞ্চশরে বিদ্ধ করার চেষ্টা করে সাধকের হৃদয়, তখন সাধক তার গুরু-প্রদত্ত (তৃতীয় নয়ন বা) প্রজ্ঞা উন্মোচন করে, জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে তিনি কামভাব বা মদনকে ভস্ম করেন, তিনি জীবন্ত থেকেও মৃত শব হয়ে যান অর্থাৎ 'জ্যান্তে মরা'। এই হল আমাদের বাংলার নিজস্ব সাধনা। তাই মদন ভস্মের কাহিনী শুধু মুখোরোচক গল্প নয়, এ এক 'জ্যান্তে মরা' হওয়ার আত্মসাধনা।

এই কামদেবের ভগবান শিবের কোপে ভস্ম হয়ে যাওয়া নিয়ে এবার আমরা একটু অন্য ভাবে চিন্তা করি। ভারতবর্ষের বহু সাধু-সন্ত ও সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে ভস্ম শরীরে লেপন করে আসছেন। সাধারণতঃ দুই ধরনের ভস্ম লেপন করা হয় শরীরে। ধুনি বা হবনকুণ্ডজাত ভস্ম আর শ্মশানের মৃতদেহ ভস্মীভূত ভস্ম। এমনকি অনেক শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গের ভস্ম দিয়ে অভিষেক হয়। কিন্তু সাধুরা কেন ভস্ম মাখেন আর সাধুজনের শরীরে ভস্মলেপনের প্রয়োজন কি—তা আমরা অনেকেই জানি না।

তবে এই ভস্ম লেপনের প্রচলন হিন্দু শাস্ত্রের বহু স্থানে নির্দেশিত হয়েছে। যেমন আহ্নিকতত্ত্ব অনুযায়ী শিবভক্তদের ভস্ম ললাটে ধারণ করেই শিবপুজা করতে হয়। সাধু-সন্ন্যাসী ব্যাতিরেকে, সংসারী ব্যক্তি ভস্ম, ত্রিপুণ্ডক, রুদ্রাক্ষ-ধারণ ও বিল্বপত্র ছাড়া শিব পুজা করলে তার সম্যক ফল লাভ হয় না বা তুল্য ফলের অভাব হয়। শাস্ত্র বলেছেন—

"বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোহপি মহাদেবো ন স্যাদস্য ফলপ্রদঃ।।"

আবার শাস্ত্রে নির্দেশিত আছে স্নান না করে জপ, পুজা, হোমাদি কোন কর্মই করবে না। চোখ, কান, নাক, মুখ, পায়ু, উপস্থ নিয়ে নবচ্ছিদ্র সমন্বিত এই দেহে লালা, ঘাম, মল, মূত্র সহ কোন না কোন প্রকারে মল রক্ষিত হয়, অতএব ভোরবেলা বিছানা থেকে উঠে, স্নান করেই পুজো করতে হবে। এই স্নান আবার সমর্থ ও অসমর্থ ভেদে সাতরকম বর্ননা করা হয়েছে—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণী ও মানস। মন্ত্রপাঠ করে শরীর মার্জনকে মান্ত্র স্নান বলে, সর্বাঙ্গে গঙ্গামাটি বা যে কোন পবিত্র মাটি দিয়ে তিলক করলে ভৌম স্নান হয়, হোমাগ্নি বা গোময়-ভস্ম

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বা মানব দেহভস্ম অঙ্গে লেপন করলে আগ্নেয় স্নান হবে, গোপদ-রজঃ বা গরুর খুরের আঘাতে উড়তে থাকা ধুলো, যখন প্রবহমান বায়ুতে শরীর শীতল হওয়া পর্য্যন্ত গ্রহন করা হয় তখন তাকে বায়ব্য স্নান বলে, স্বল্পবৃষ্টিতে দেহ ভিজালে দিব্য স্নান হয়, জলে অবগাহন করে স্নান করার নাম বারুণী স্নান এবং 'ওঁ অপবিত্র পবিত্রওবা সর্বাবস্থাম্ গতৌহপিবা... ' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করলে মানস স্নান হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হল ভস্ম স্নান বা আগ্নেয় স্নান। কিন্তু কথা হল সারা গায়ে ভস্ম লেপে স্নানের বিশেষ কারণ আছে। আগেই বলেছি ভস্ম লেপার জন্য দু-ধরনের ভস্ম ব্যবহৃত হয়—প্রধানতঃ কাঠ বা গোবরের ঘুঁটের সাথে বহু রকমের হোম সামগ্রী, ধুনি বা হোমকুন্ডে ভস্মীভূত করে আর দ্বিতীয়তঃ শ্মশানের শবদেহ দাহ করা ভস্ম। সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সরাসরি ধুনি বা হোমের ভস্ম ব্যবহার করা হয় না, অনেকটা ভস্ম সংগ্রহ করে তা কাপড়ে বেশ কয়েকবার ছেঁকে নিয়ে, সূক্ষ্ম পাউডারের মতো করা হয়, বিভিন্ন বস্তু মিশিয়ে, শুকিয়ে, গুঁড়িয়ে ভস্ম প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে শ্মশান ভস্ম সরাসরি লেপন করা যায়। কাঠ বা ঘুঁটে থেকে যে ভস্ম তৈরী হয় তাতে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাস জাতীয় উপাদান ও আরো বেশ কিছু অনুমাত্রায় জৈবিক ধাতু পাওয়া যায়। এই ভস্ম শরীরে মাখার বেশ কিছু উপকার রয়েছে। এই ভস্ম মাখার ফলে শরীরের লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শরীরের ভিতরের তাপ যেমন বাইরে আসতে পারে না, তেমনি বাইরের তাপের প্রভাব শরীরে তেমনভাবে অনুভূত হয় না। প্রবল ঠান্ডার সময় যেমন সামান্য পোশাকেই অথবা নির্বস্ত্র অবস্থাতেই কাটানো সম্ভব হয় সাধু সন্তদের তেমনই গরমের সময় শরীর শীতল থাকে, এটা অনেকটা প্রাকৃতিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের কাজ করে।

সাধু-সন্তরা নিরালায় পাহাড়-পর্বত, বনে-জঙ্গলে সাধনার জন্য বাস করেন। সেখানে সাপ-বিছে, বিষাক্ত পোকামাকড় ছাড়াও জোঁকের উৎপাত খুব সাধারণ ঘটনা। এই সমস্ত সরীসৃপ ও পোকামাকড় মুলত আমাদের শরীরে প্রবাহিত গরম রক্তের উপর নির্ভর করে একরকম 'থার্মাল ইমেজ' তৈরি করে। কিন্তু ভস্মের দ্বারা চামড়া ও লোমকূপ ঢাকা থাকায়, সেটা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং ভস্ম মূলতঃ ক্ষার জাতীয় বলে এরা আক্রমনও করতে পারে না। এছাড়া এই ভস্ম চামড়ায় ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। যোগী সন্ন্যাসীরা একটা দীর্ঘ সময়, অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবন ধরে, তেল, সাবান ক্রিম জাতীয় প্রসাধনী ব্যবহার করেন না এমন কি দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্নান করার সুযোগ তাদের ঘটে না। সেক্ষেত্রে সামান্য 'বস্তু' মিশ্রিত ভস্ম তাদের সব ধরনের চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

শবদেহের ভস্ম আরো উন্নত। যদিও হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সন্ন্যাসী ও যোগীরা ভস্ম ব্যবহার করে আসছেন কিন্তু জার্মানির ডাঃ উইলিয়াম হেনরিক সুসলার মানুষের দেহের ভস্ম গবেষণা করে বারোটি অজৈব লবণের সন্ধান পান, যা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মানুষের বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় এখনও সফলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ লবণের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বারোটি লবণের মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়ামের তিনটি, পটাসিয়ামের তিনটি, সোডিয়ামের তিনটি, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ও সিলিকার একটি করে। এই লবণগুলো ইলেকট্রোলাইট পর্যায়ে মানুষের শরীরে রোগের উপশম করে থাকে। যাই হোক এই অত্যাবশ্যকীয় লবনকে যোগীরা দেহভস্ম থেকে গ্রহন করেন ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখেন। তবে এই ভস্ম লেপনের ক্ষেত্রে সাধু-সন্যাসীরা কিছু মন্ত্রেরও প্রয়োগ করেন। এ'সব গুরু-শিষ্য পরম্পরায় রক্ষিত গুপ্ত মন্ত্র, উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্য ছাড়া অনুশীলন করতে নেই।

সাধকেরা এই ভস্ম মেখে শীতকালে নগ্ন দেহে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান। এ ছাড়া হঠযোগী সাধকেরা নিজসিদ্ধিবলে বিভিন্ন অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। কিন্তু তান্ত্রিক সাধকেরা সিদ্ধিলাভের জন্য সঙ্গিনীদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই বিষয়ে আমরা তখনকার জীবনযাপন পদ্ধতি, বিশেষ করে চর্যাপদের আলোচনা করলে জানতে পারি।

মাতঙ্গী সাধিকা মাতু

হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে আমরা যখন হেটেল থেকে বের হলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। একটা গাড়ী ভাড়া করে চললাম কামাখ্যা পাহাড়ের দিকে। রাস্তায় বেশ জ্যাম ছিল। পাহাড়ে উঠতে একটু দেরী হল। মন্দির-গেট থেকে অসংখ্য মানুষ পায়ে হেঁটে অম্বুবাচী মেলা ঘুরতে পাহাড়ে উঠছে বা মেলা থেকে নামছে। আমাদের গাড়ীটা ধীরগতিতে হর্ন দিতে দিতে পাহাড়ী পথ ধরে মন্দিরের দিকে চলেছে। বড়গোঁহাইয়ের বাড়ীতে আগে থেকে দুটো ঘরের কথা বলা ছিলো। বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে আমরা ভিড় কাটিয়ে আমাদের ঘরের দিকে চললাম।

পায়েলই ভোলানাথকে বললো—একটু দাঁড়াও না, চা খেয়ে নিই।

আমি বললাম—আগে ঘরে চলো, ওখানে বসেই চা খাবো।

আমরা ঘরে এসে পৌঁছলাম। পাশাপাশি দুটো ঘরের একটাতে আমি আর চিন্ময়বাবু আর একটাতে পায়েল, ভোলানাথ আর নানু। লাগেজ রেখে বসে আমি চিন্ময় বাবুকে চা নিয়ে আনতে বলে ভোলানাথের ঘরে এসে বসলাম। নানু তখন ট্যাব্ নিয়ে গেম খেলায় মনোযোগ দিয়েছে। পায়েল চিৎ হয়ে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, আমি ভোলানাথকে নিয়ে ছাদের উপরে উঠে এলাম। এই বাড়ীটা থেকে গৌহাটি শহরের আধখানা অংশ আর কামাখ্যা স্টেশনকে স্পষ্ট দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্রের জল আর তার পিছনের পাহাড়গুলো পরিস্কার নজরে আসে। এখন রাত্রিবেলায় সামান্য আলোয় তা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দেখে ভোলানাথের আনন্দ আর ধরে না। এদিকে পাহাড়ের গায়ে বাড়ীগুলোর আলো ছোট ছোট তারার মত লাগছে আর ব্রহ্মপুত্রের জলে তার প্রতিফলন পড়ছে আর আমরা তার মাঝখানে বসে দেখছি। আমি ঐ আবছা আলোয় ভোলানাথকে দর্শনীয় জায়গাগুলোর কথা বলতে লাগলাম। ছাদের উপর থেকেই নীচের ভৈরবী মন্দির আর তার সংলগ্ন কচ্ছপ পুকুর আলোয় ঝলমল করছে। এর ঠিক উপরেই ধূমাবতী মন্দিরের চূড়া দেখালাম। ভোলানাথ শুনছে বটে তবে চোখ পড়ে রয়েছে সেই দুরের পাহাড়গুলোর দিকে।

এমন সময় পায়েল ভোলানাথের মোবাইলে কল করলো, চিন্ময়বাবু চা নিয়ে ফিরেছেন তাই। আমরা দুজন নেমে এলাম উপরের থেকে। ঘরে ঢুকে তো আমরা দু'জন অবাক হয়ে গেলাম হোটেলের সেই মেয়েটিকে দেখে। আমদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে, যেন বলতে চাইছে—দেখলে তো, তোমরা আসতেই দেখা হয়ে গেল!

ভোলানাথ বলল—কি গো, কোথায় উঠেছো তুমি?

আমি মেয়েটিকে দেখে বেশ বিরক্তই হলাম। যদি এখন আবার এখানে থাকতে চায় তো এক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তাই বেশ বিরক্ত হয়ে ভোলানাথকে বললাম—কেন, আপনি কি ওর সাথে গিয়ে থাকবেন!

ভোলানাথকে বললো—তা কেন কাকু, আমি কি এখানকার কিছু চিনি! এমনিই বললাম।

মেয়েটিকে বললাম—দেখছো তো, এখানে জায়গা খুবই কম। আচ্ছা, তখন তোমার নামটা জানা হয়নি, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বললো—আমি ভৈরবী মাতু।

চিন্ময়বাবু এতক্ষণে কাগজের কাপে চা ঢালছিলেন, এখন বললেন—আমি যেখান থেকে চা নিচ্ছিলাম উনি সেখানে বসে চা খাচ্ছিলেন, আমার সাথে কথা বলতে বলতে চলে এলেন।

আমরা সকলে চা পানে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত দেখে মেয়েটিকে নিয়ে চিন্ময়বাবু পাশে ঘরে চলে গেলেন। পরপর অনেকগুলো কাজ, আগামীকাল সকালে আমরা কুমারীপূজা করব, হোমযজ্ঞ করব, দর্শন করব, কিছু কেনাকাটাও আছে, এসব নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। নানুর এতক্ষণে গেম খেলা শেষ। ও খেতে চাইলো। আমারও খিদে পাচ্ছিলো। পায়েল বললো—চলুন, আমরা খেয়ে আসি। আমি বললাম—কি খাওয়া হবে বলো।

ভোলানাথ বললেন—কাকু, রুটি আর তরকারী হলেই চলবে।

আমি বললাম—বেশ, তোমরা বসো, আমি নিয়ে আসছি।

পায়েল বললো—আমিও আপনার সাথে যাই।

আমি বললাম—বাইরে অনেক ভিড়, আমি একাই যাই, তোমরা অপেক্ষা করো।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আমি বেরিয়ে এলাম। চিন্তা করছি আর হাঁটছি, এত রাতে কি রুটি পাওয়া যাবে? এমন সময় মোবাইল বেজে উঠলো। পায়েল কল করেছে, বললো, মেয়েটির জন্যও যেন আমি খাবার নিয়ে নিই। আমার রাগ হলো। কেন এমন করে মেয়েটি আমাদের পিছনে পড়ে রয়েছে! মহা জ্বালা হলো। আমি বাসস্ট্যাণ্ডের পাশের হোটেল থেকে খাবার আনতে সোজা নীচে নাম শুরু করলাম। এমন সময় চিন্ময়বাবু আমাকে কল করলেন—বাবু, চলে আসুন, খাবার এসে গিয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমিই তো এলাম খাবার আনতে, এখন কে আবার খাবার আনলো?

চিন্ময়বাবু বললেন—মাতুর লোক নিয়ে এসেছে। আপনি চলে আসুন।

আমি ফিরে এলাম। এত রাতেও ভক্তের ভিড়ে রাস্তায় হাঁটা দায়! কাতারে কাতারে মানুষ পাহাড়ে উঠছে, মেলায় ঘুরবে, বিভিন্ন মন্দির দর্শন করে আবারও নিচে নেমে যাবে। সকলেই মা কামাখ্যার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে। এদিকে বিভিন্ন আখড়ায় গান হচ্ছে। বাউল, অসমীয়া লোকসঙ্গীত, দেহতত্ত্বের গানে সারা পাহাড় মুখরিত। দোকানীরা কত রকমের পশরা সাজিয়ে বসেছে তাই দেখতে দেখতে ফিরে এলাম আমাদের ঘরে। এসে দেখি গরম গরম রুটি আর খাসির মাংসের কারি এসেছে আর সাথে দুটো দুই লিটারের কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল।

আমি মেয়েটিকে বললাম—তোমার পরিচিত লোকই যদি খাবার এনে দেবে তো আগেই বলতে পারতে, শুধু শুধু আমাকে দৌড় করালে কেন?

চিন্ময়বাবু বললেন—বাবু, উনি বললেন যে, আপনি আর পায়েল দিদি খাসির মাংস ভালো খান কিন্তু এখানে তা পাওয়া যাবে না, তাই উনি গৌহাটি থেকে নিয়ে এলেন।

আমি বললাম—গৌহাটি থেকে তোমার লোক এতো তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এলো?

মেয়েটি আমাকে বললো—আমাদের খেতে হবে, আসুন, গরম গরম খেয়ে নিই, কি ভাবে ও খাবার নিয়ে এলো তা জানার কি খুব প্রয়োজন আছে?

ভোলানাথ এতক্ষণে কথা বললেন, মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিই তো, এত তাড়াতাড়ি কি করে আপনার লোক এলো?

মেয়েটি বললো—আপনারা সকলে খেয়ে নিন, পরে বলছি।

পায়েল বললো—ঐ তো বলেছিলাম, এ সব কাকচরিত্রের মতো কিছু কালাযাদুর ব্যাপার-স্যাপার।

মেয়েটি বললো—বললাম তো, খেয়ে নিন, পরে বলছি। কাকচরিত্র বিদ্যা খুব সাধারণ বিষয়, কিন্তু আমার এই বিদ্যা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আসুন, সকলে আনন্দ করে খেয়ে নিন, পরে এ বিষয়ে বলবো।

আমি এতক্ষণ চুপচাপ এদের কথোপকথন শুনছিলাম। পায়েল বললো—আপনি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শুরু করুন, আমরাও তা হলে শুরু করতে পারি।

খিদে তো পেয়েছিলোই, খাবারের সুগন্ধে আরও বেড়ে গেল তাই আমি খাবার নিবেদন করে খাওয়া শুরু করলাম। আমার খাওয়া শুরু হতেই সকলে খেতে শুরু করলো। নানু হঠাৎ করে বলে উঠলো—কি মজা। মাংসটা বেশ সুন্দর রান্না হয়েছে, দিদুর রান্নার মতো টেস্ট।

সকলেই চুপচাপ খেয়ে নিলাম, তারপর হাতমুখ ধুয়ে টুথপিক্ নিয়ে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে থাকা মাংসের টুকরো গুলো বের করতে কসরৎ শুরু করলাম। একটু পরেই একটা প্লাস্টিকের গ্লাসে করে কোল্ড ড্রিংকস্ দিয়ে গেল। বেসিনে গিয়ে কুলকুচি করে এসে এক চুমুকে কোল্ড ড্রিংকস্ শেষ করে দিলাম। পেটটা ভরে গিয়েছে, শরীরও ক্লান্ত, ঘুম আসছে। আমি কাৎ হতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত কটা বাজে জানি না, কে যেন আমাকে বিছানা থেকে হাত ধরে নিয়ে এলো কামাখ্যা মন্দিরের রাস্তায়। আমরা হাঁটছি, চারিদিকে ঘন অন্ধকার, পাশের মানুষটার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না! মন্দিরের বন্ধ দরজার মধ্যে দিয়ে আমার অবলীলায় দুজনে পার হয়ে এলাম। এখানে একটু আবছা আলো একটু রয়েছে। এই আলোয় আমি পাশের মানুষটিকে স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম, উনি আমার গুরুদেব। গুরুদেবকে দেখেই আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি মুখে মৃদু হাসি নিয়ে আবারও আমার হাত ধরে হাঁটা শুরু করলেন। চোখদুটোয় তাঁর কি মমতা! রোজকার মতোই তিনি কাছা দিয়ে ধুতি পরে রয়েছেন আর গায়ে উত্তরীয়। কপালে চন্দনের একটি তিলক। সারা গায়ে কি অপূর্ব ফুলের গন্ধ! আসলে আমি গুরুদেবকে দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছি। আমাকে নিয়ে সোজা বলিঘরের সামনে এসে বসিয়ে নিজে উঁচু মতো একটা জায়গায় বসলেন। তিনিই প্রথম কথা বললেন—বলো, কেমন আছো?

আমি বললাম—আপনার ও গুরুমায়ের কৃপায় ভালোই আছি। কিন্তু আপনি কবে এলেন? আমাকে জানালেন না তো!

তিনিই বললেন—পৃথ্বীশ, তুমি তো আমাকে কামাখ্যায় নিয়ে এলে না, তাই আমি একাই চলে এলাম। তা বলো, কোনও সমস্যায় পড়োনি তো বাবা?

আমি বললাম—আপনার হাত যতক্ষণ আমার মাথায় আছে ততক্ষণে আমার ভয় কি! তবে এই কয়েকদিন হল, একজন সাধিকা, একটা অল্প বসয়ী মেয়ে, আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। জানি না, ও কি সাধনা করেছে, তবে ও আর ওর গুরু সাধনায় বেশ শক্তি অর্জন করেছে। ওরা মানুষের মনের কথা বোঝে, খুব দ্রুত স্থানত্যাগ করে, কাল রাতে মুহূর্তের মধ্যে খাওয়ার জিনিস নিয়ে এলো—এই আর কি।

গুরুদেব একটু চোখ বন্ধ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর চোখ খুলে বললেন—ওরা দুইজন নয়, একজনই। কায়া পরিবর্তন করেছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—মানে? একই ব্যক্তি একবার পুরুষ আর একবার মেয়ে হচ্ছে?

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গুরুদেব বললেন—দেখো বাবা, তুমি একজন জ্যোতিষী। নিজের প্রয়োজনে প্রতিকারের বিষয়গুলি শিখেছো মাত্র। সাধনার জগৎটা বিশাল সমুদ্রের মতো। বলো তো, এক জীবনে কতটুকু আমরা শিখতে পারি? তবে, এই মেয়েটি বেশ উচ্চ স্তরের সাধিকা। অনেক সিদ্ধি ওর করায়ত্ব।

আমি বললাম—দেখুন বাবা, আমি যতটুকু আপনার কৃপায় লাভ করেছি তাই যথেষ্ট, কালীবিদ্যার অতীত কিছুই নয়।

গুরুদেব বললন—কালীবিদ্যা বলতে তুমি কি বোঝ?

আমি বললাম—শাস্ত্র বলেছেন, ব্রহ্মরূপিণী সর্বৈশ্বর্যশালিনী কালীকে ব্রহ্মরন্ধ্রেই পাওয়া যায়। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমো—এই তিন গুণ বিবর্জিতা; তিনিই সকল জীবের রূপে বিরাজমানা বা 'ক্রীং' অক্ষরস্বরূপা। বীজমন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করে কূর্চবীজ 'হুং' মন্ত্র দুই বার তারপর দুই বার ভুবনাবীজ 'হ্রীং' মন্ত্র উচ্চারণ করে 'দক্ষিণে কালিকে' বলে মা কে দর্শন করবে। ঐ 'হ্রীং' মন্ত্রের সঙ্গে সপ্তবীজ উচ্চারণ করে অগ্নিপত্নী অর্থাৎ স্বাহা মন্ত্র যোগ করবে। এই মন্ত্র জপ করলে সাধক শিবময় হন, তাঁরই সদগতি হয়, তিনি নরশ্রেষ্ঠ, দেবশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হন।

ত্রিকোণ বা নয় কোণবিশিষ্ট পদ্মের উপর ষড়ঙ্গন্যাস করে প্রকাশশীলা পরাপ্রকৃতিকে অর্চনা করবে। তাঁর দ্বারাই সর্বাঙ্গ প্রাপ্ত হবে। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা, ঘনা, বলাকা, মাত্রা, মুদ্রা, মিতা—এই পনেরোজন জ্যোতির্ময়ী দেবী পনেরোটি কোণে বিরাজ করছেন। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহী—এঁরা অষ্টদলস্থিতা দেবী। প্রণবের সঙ্গে এঁদের আমন্ত্রণ জানাতে হয় এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অঙ্গদেবতার আবাহন করে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করতে হয়। যে সাধক এই মন্ত্রগুলি নিয়মিতভাবে লক্ষ লক্ষ জপ করতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই পাপমুক্ত হবেন। তাঁর দ্বারা আর দুষ্কার্য আর হবে না, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করবেন। তিনি সকল লোক থেকে মুক্ত হয়ে আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্যের পূর্ণ অধিকারী হবেন। পঞ্চ ম-কারের সাথে ও আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝে যিনি তাঁর পূজা করবেন, তিনিই ভক্ত। তাঁর প্রচ্ছন্নতা দূর হয়ে মহত্ব প্রকাশিত হয়। তিনি নিরবিচ্ছিন্ন সুখ শান্তি লাভ করে সংসারপাশ থেকে চিরমুক্ত হন। তিনি জীবন্মুক্ত, সর্বশাস্ত্রবিদ হন। তাঁর হিংসাবৃত্তি বিনষ্ট হওয়ায় তিনি সকল জীবের বিশ্বাসভাজন হন। সিদ্ধমন্ত্র যিনি জপ করেন তাঁর কাছে রাজাও ভৃত্যস্বরূপ হয়। সেই সাধক বিশ্বাতীত পরাৎপর আনন্দময় শিবস্বরূপ হন। এই সর্বদেবাত্মক বীজমন্ত্র যিনি জপ করেন, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রভু হয়ে কালিকাকে লাভ করতে সক্ষম হন।

ভগবান শিব বলেছেন, হে দেবী, যিনি এই ঘোরা দক্ষিণাকালীকে ধ্যান করেন, তিনি কৃৎকর্তব্য, নিষ্পাপ, আমাদের উভয়ের কৃপাপাত্র ও জীবন্মুক্ত হন। যে সাধক শ্রদ্ধাসহকারে এই কালীমন্ত্র জপ করেন, তিনি জ্ঞানলাভ করে চিরমুক্ত হন। শান্তচিত্তে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সবসময় কালীপূজায় নিরত থেকে দিনের বেলা ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং রাতে কৌপিনধারী, আত্মরমণপরায়ণ ও জপ-পূজানিয়মে তৎপর হয়ে মাতৃরূপা নারীদের সশ্রদ্ধ আজ্ঞাবহ হতে হবে। তারপর শুদ্ধ জলে তর্পণ ও পূজা করবে এবং সবসময় আত্মাকে কালীরূপে চিন্তা করবে। সকল নারীদের অনুগত হবে, তাতেই যাবতীয় হত্যাপাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে। তারপর পঞ্চ ম-কার দিয়ে পুজো করলে যাবতীয় কাম্যবস্তু লাভ হবে। অতীত-ভবিষ্যৎ, দৃশ্যাদৃশ্য, স্থাবরজঙ্গম যা কিছু আছে, তা সবই কালীর কলামাত্র। এই কালীমন্ত্রজপকারী সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বসুখভাগী হয়ে থাকেন। তিনি সর্ববেত্তা, সর্বত্যাগী, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধবুদ্ধি, সর্ববেদজ্ঞ, সর্বমন্ত্রজপকারী, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বযজ্ঞকারী হয়ে দেবী কালীর অত্যন্ত প্রিয় হন।

প্রতি দিন সাধক সংশয়শূন্য হয়ে সব কাজ মনের দ্বারা সম্পাদনা করবেন এবং তারপর অপূর্ব জ্যোতির্ময় ত্রিকোণ মূলাধার চিন্তা করে সেই মূলাধারের অধঃ ও উর্ধ্বে সুষুম্নাকে স্থাপন করবে। নীলমেঘের মধ্যে স্থিতা, দীপ্তিশালিনী, বিদ্যুৎরেখার মতো, সূর্যের মতো অতুলনীয়া নীলা ও পীতা দেবীকে স্মরণ করতে হবে এবং সহস্রারে বিরাজিতা শিব-কালীকে ধ্যান করবে। তা হলে সাধক সর্বপাপমুক্ত হয়ে শিব ও ব্রহ্মস্বরূপ হবেন এবং সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয়ে কৈবল্য বা মুক্তি লাভ করবেন। ঐ মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা কালিকা, বীজ লজ্জা, শক্তি বধূ এবং কবিত্বের জন্যই প্রয়োগ হয়ে থাকে। সাধক এইভাবে ঋষি ও ছন্দ জেনে মন্ত্রের ফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করেন এবং যিনি এই সর্ববিদ্যা প্রথমে এক, দুই বা তিন নামে পুটিত করে জপ করেন, তিনিই সদ্গতি প্রাপ্ত হন।

গুরুদেব বললেন—তুমি তো সারাংশটুকু মুখস্ত বললে। এর অতিরিক্ত আরও অনেককিছু আছে। যেমন একাক্ষরী বীজ থেকে মালামন্ত্র অবধি কালীমন্ত্র হয়। এর আলাদা আলাদা ধ্যান, পুরশ্চরণ, প্রয়োগ ও ফললাভ আছে। সেগুলোও জানতে হবে। তুমি সকালবেলা তোমার ব্যাগের মধ্যে একটা হাতে লেখা খাতা পাবে। ওতে দেবী কালীর মন্ত্রসহ বিভিন্ন প্রয়োগ দেওয়া আছে। আশাকরি তোমার উপকারে আসবে।

আমি বললাম—কিন্তু ঐ মেয়েটির বিষয়ে কিছু বলুন।

গুরুদেব বললেন—ও একজন চণ্ডালিনী। ও অনেক বড়ো সাধিকা, একজন ভৈরবী। ওর বয়স এখন সাতষট্টি বছর। তবে দেখতে যুবতীর মতো লাগে। দেবী মাতঙ্গীর মন্ত্রে সিদ্ধ সে।

আমি এত কিছু শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—দেবী মাতঙ্গী তো দশমহাবিদ্যার একজন, তবু তাঁর সাধনায় এতো শক্তি লাভ হয়?

গুরুদেব বললেন—শ্রী মাতঙ্গী মহাবিদ্যা দশমহাবিদ্যার নবমতম। দেবী বরদায়িনী, সম্পদ ও সমৃদ্ধির দাতা। 'রুদ্রযামল তন্ত্র' এবং 'গুপ্ত সাধন তন্ত্র' অনুসারে তিনি আদিপরশক্তির অবতার। আমরা যখন শব্দ উচ্চারণ করি, তখন ৪টি মাত্রা অতিক্রম করার পর বাক্ বা স্বর আমাদের গলা থেকে বের হয়। এই ৪টির মধ্যে, শুধুমাত্র

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জ্ঞানী এবং অতি-চেতনাযুক্ত সাধক, যারা সাধনার তুঙ্গ অবস্থায় থাকেন তারা প্রথম তিনটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন। সাধারণ মানুষ মাত্র চতুর্থটি বা বৈখরীই উপলব্ধি করতে পারে। প্রথম তিনটি হলো—পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা। দেবী মাতঙ্গী হলেন বৈখরী শব্দের এর প্রধান দেবী, তাই তাঁকে বাগ্বিলাসিনী হিসাবে গণ্য করা হয়। দেবী মাতঙ্গী কল্পনা ও বাস্তবতার সম্মিলনের শক্তি। 'পরাবাক'-এর অর্থ হল যে ধ্বনি অতীন্দ্রিয় প্রণব, যা নির্বিকল্প সমাধিতেই একমাত্র অনুভব করা যায় ও যা ইন্দ্রিয় ও মনের অনুভবের বাইরে; এর সঙ্গে যুক্ত দেবতা ত্রিপুরভৈরবী, উৎস স্থল হলো মূলাধার চক্র। 'মন্ত্র সিদ্ধি' অর্জনের পর যে শব্দ শোনা যায়, যা শক্তিশালী ও সূক্ষ্ম, তা হলো পশ্যতিবাক্। দেবী তারা এই ধ্বনির সংশ্লিষ্ট দেবী ও এর উৎস স্থল হলো মণিপুর চক্র। মধ্যমাবাক্ জ্যোতি-ভাবে শ্রবণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দেবতা হলেন দেবী হলেন ছিন্নমস্তা, উৎসস্থল হলো অনাহত। আর বৈখরীবাক্ হলো প্রকাশিত প্রণব এবং সংশ্লিষ্ট দেবী হলেন মাতঙ্গী, উৎসস্থল হলো বিশুদ্ধচক্র। তাই দেবী মাতঙ্গী হলেন এই তিন চক্র ও দেবীর সমষ্টি মাত্র। তাঁর অবস্থান হলো আজ্ঞাচক্রে।

আবার শ্রী বিদ্যার দ্বিতীয় পর্যায়ে হল শ্রী মাতঙ্গীর সাধনা। দেবী মাতঙ্গী ললিতা ত্রিপুরসুন্দরীর প্রিয়। ললিতা সহস্রনামের বর্ণনা অনুযায়ী দেবী মাতঙ্গী সাধকদের 'বিষ্ণু গ্রন্থি' ছিন্ন করেন। মা ত্রিপুরাসুন্দরীর আধ্যাত্মিক শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। একজন সাধারণ সাধক ব্যক্তি সরাসরি ত্রিপুরাসুন্দরীর এই শক্তি আত্তীকরণ করতে পারে না, তাই তাকে দেবী মাতঙ্গীর কাছে প্রার্থনা করতে হবে যিনি সাধকের চারপাশে নিঃশর্ত ভালবাসার একটি রক্ষাকবচ্ তৈরি করেন যাতে তিনি ত্রিপুরসুন্দরীর শক্তি গ্রহণ করতে পারেন।

দেবী মাতঙ্গী সাধকের আত্মাকে ঘিরে থাকা সমস্ত অজ্ঞতা দূর করেন ও সাধকের আত্মাকে ঐশ্বরিক প্রেম ও জ্ঞানে আলোকিত করেন। তিনি সাধকের হৃদয়কে এতটাই ঐশ্বরিক ভালবাসায় পূর্ণ করেন যে তিনি সাধককে সঙ্গীত, গান, চিত্রকলা, সৃজনশীল লেখা, যোগাযোগ, আকর্ষণীয়তা এবং খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেন। তিনি সাধকের সাথে সকলের প্রেম এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের রক্ষক এবং সমস্ত নেতিবাচক শক্তি দূর করেন। আসলে শ্রী মাতঙ্গী মহাবিশ্বের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। দেবী মাতঙ্গী সাধককে এমন ঐশ্বরিক আনন্দে আশীর্বাদ করে যে সাধক সম্পূর্ণরূপে সীমাহীন সুখে নিমজ্জিত হয় এছাড়া সাধকের চারপাশে থাকা সমস্ত নেতিবাচক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন ও সবসময় রক্ষা করেন।

আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখন কি আমি দেবী মাতঙ্গীর সাধনা করতে পারি?

গুরুদেব বললেন—নিশ্চয়ই পারো, তবে এখনই তার প্রয়োজন নেই, সময় হলে বলবো। তুমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত সেখানেই তো সব আছে আর সাধনার ক্ষেত্রে 'শক্তি' বলতে যে শব্দটি বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো সেই চিরন্তন ও অসীম শক্তি, যার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কারণে সারা বিশ্ব গতিশীল, যার ফলে দিনরাত্রি ঘটে ঋতু বদলায়, জন্ম মৃত্যু ঘটে, আর সেই শক্তির কারণেই এই জড় জগতের আবির্ভাব ঘটেছে। মনে রাখবে, সেই শক্তিই প্রতিটি জীবের মধ্যে অদৃশ্য আকারে লুকিয়েও থাকে, যাকে কুন্ডলিনী বলা হয়।

দৈহিক গঠন অনুসারে মানুষের মস্তিষ্ক তিন ভাগে বিভক্ত—প্রধান মস্তিষ্ক, ছোট মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক। এই তিনটির মধ্যে 'ছোট মস্তিষ্ক' যা বৈজ্ঞানিক ভাষায় থ্যালামাস, পনস্, হাইপোথ্যালামাস, মেডুলা অবলংগেটা, থার্ড ভেন্ট্রিক্যেল নিয়ে গঠিত, এটিকে যোগের ভাষায় 'সহস্রার' বলে। সাধনার ক্ষেত্রে, জ্ঞান-চেতনা শুধু মূলাধার স্তরে থাকে তা যোগাভ্যাসের মাধ্যমে মূলাধার থেকে উত্থিত করে সহস্রারের সাথে মিলিত করা হয়। মূলাধার স্তরের এই 'জ্ঞান-চেতনা শক্তি' হল 'কুন্ডলিনী শক্তি' হল যা জীবনের মৌলিক শক্তি এবং এটি জাগ্রত হলে সাধক অনন্তের দিকে তার যাত্রা শুরু করে। মূলাধার থেকে সহস্রারের দিকে এই যাত্রায় মূলত যে শক্তি সাহায্য করে তা হল 'গুরু-শক্তি'। কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত না করে পূর্ণতা অর্জন করা অসম্ভব। সাধক যখন শক্তিরূপে গুরুর উপাসনা করে, তখন গুরু-শক্তি একই সাথে সাধকের দেহে বীজরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর ধীরে ধীরে সাধক যখন সাধনায় এগিয়ে চলতে থাকেন তখন একই শক্তিবীজ এক এক করে মানুষের দেহের সাতটি চক্রে একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সাধক অনেক কৃতিত্ব অর্জন করেন বা সিদ্ধি লাভ করেন। শাস্ত্রে এই সিদ্ধিকে অষ্ট সিদ্ধি বলে। এগুলি হলো—অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব। এই যে আটটি সিদ্ধি তা সাধকের প্রকৃতি বা চরিত্রের কিছু কিছু গুণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আর যে সাধক এই আটটি সিদ্ধি আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তিনি আরও কমপক্ষে আরও দশটি গুণের অধিকারী হতে পারেন, যেমন—কামবাসয়িতা, দূর শ্রবণ, দূরদর্শন, স্বেচ্ছা বন্ধু, পরকায়া প্রবেশ, স্বেচ্ছা মৃত্যু, দেব দর্শন, সংকল্প সিদ্ধি, আধিপত্য।

আমি 'অষ্টসিদ্ধি' বিষয়ে মোটামুটি জানতাম। এখন আনন্দিত হয়ে বললাম—আমি পারব এই অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ব করতে?

গুরুদেব বললেন—অষ্টসিদ্ধি অর্জন সহজ নয়, চাই প্রবল কৃচ্ছসাধনা সঙ্গে উত্তুঙ্গ তপোবল। প্রথমে গুরুদেবের আশ্রয়ে নিজেকে শুদ্ধ করতে হয়। বিশেষ দীক্ষাগ্রহণের পরে গুরুর দেখানো পথে সাধনযাত্রা শুরু হয়। নির্জন সাধনস্থল বেছে নিয়ে অভীষ্ট পূরনের জন্য কঠোর সাধনার সোপান বেয়ে সাধক যতই উঁচুতে উঠতে থাকেন, ততই একের পর এক সিদ্ধি সাধকের হস্তগত হয়। কিন্তু কখনও নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য সাধকেরা এই সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগ করেন। ভক্তের আকুল ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কখনও প্রকাশ হয়ে পড়েছে সিদ্ধাই, যেমন মেয়েটি আজ তোমাদের খাবার আনতে গিয়ে করলো।

আমি বললাম—গুরুদেব, যদি অষ্টসিদ্ধি বিষয়ে বিস্তৃত করে বুঝিয়ে বলেন তো

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভালো হয়।

গুরুদেব তখন একটু থেমে চোখ বন্ধ করে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—প্রথমেই বলি অনিমা বিষয়ে। 'অনিমা' হল অষ্টসিদ্ধির মধ্যে প্রথম। এই সিদ্ধি প্রাপ্ত হলে একজন সাধক তাঁর নিজের দেহকে ইচ্ছামত সংকুচিত করার ক্ষমতা লাভ করেন। তবে অনিমা শুধুমাত্র দেহকে সংকুচিত করার ক্ষমতা দেয়। 'মহিমা' এমন একটি সিদ্ধি যা একজন সাধকের দৈহিক আকৃতিকে বড়ো করতে সাহায্য করে। এই সিদ্ধির প্রাপ্তি না করলে অনিমা সিদ্ধির প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয় না কারণ মহিমার প্রয়োগ করে সংকুচিত দেহ আবারও বিরাট করা সম্ভব হয়। 'গরিমা' সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক শরীরের ওজন পরিবর্তন করতে পারে। অনিমা যেমন একজন সাধককে নিজের দেহকে ছোট্ট করতে সাহায্য করে, সেইরকম গরিমার প্রয়োগ করে একজন সাধক নিজের দেহের ওজন বড়ো করতে সক্ষম হন। এই সিদ্ধি লাভের ফলে সাধক দেহের ওজনকে স্বল্প থেকে অনেক ভারি করতে পারেন। দেহ এই সময় এতটাই ভারী হয়ে যায় যে শরীরকে অথবা শরীরের কোন অঙ্গকে আর নাড়ানো বা সরানো সম্ভব হয় না। 'লঘিমা' হল গরিমার ঠিক বিপরীত সিদ্ধি। গরিমা ও লঘিমার সম্পর্ক অনেকটা অনিমা ও মহিমার সম্পর্কের মতোই বিপরীতমুখী। লঘিমা সাধকের ওজন কমাতে সাহায্য করে। এই সিদ্ধির প্রয়োগ করে সাধক তার শরীরের ওজন এতটাই হাল্কা করে নিতে পারেন যে তিনি আকাশে উড়তে পারেন। 'প্রাপ্তি' প্রয়োগ করে সাধক তাঁর ইচ্ছামত যে কোন বস্তু তৎক্ষণাৎ লাভ করতে পারেন। এই সিদ্ধির প্রয়োগের ফলে সাধক শূন্য থেকেই তাঁর চাহিদামতো বস্তু লাভ করতে পারেন। 'প্রকম্য' এমন একপ্রকার সিদ্ধি যা সাধককে জীবনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এই সিদ্ধির লাভের ফলে সাধক মুহূর্তের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে নিজের ইচ্ছামত অন্য কোন স্থানে যেতে পারেন এমন কি জলের নিচে বেঁচে থাকতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে প্রকম্য সিদ্ধির প্রয়োগ সাধককে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে তোলে। 'ঈশিত্ব' সিদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে সাধক প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যখন কোন সাধক এই সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছামত প্রকৃতিক ঘটনাকে ঘটাতে পারেন। অষ্টসিদ্ধির অন্তিম সিদ্ধি হল 'বশিত্ব' যার প্রয়োগ করে সাধক অন্যের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এমনকি মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জীবের মনকেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমি গুরুদেবকে আগ্রহ জানিয়ে বললাম—আপনি আগেই বলেছেন যে, দেবী মাতঙ্গীর অবস্থান হলো আজ্ঞাচক্রে। তো এই চক্রটি নিয়ে বিশেষ কিছু বলুন।

গুরুদেব বললেন—এই আজ্ঞা চক্র নিয়ে লালন ফকিরের গানে আমরা শুনেছি—

দমের সাথে কর সম্মিলন
অজান খবর জানবিরে মন
বিনয় করে বলছে লালন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঠিকের ঘর ভুলো না।

যারা আধ্যাত্ম মার্গে আছেন তারা অবশ্যই কুণ্ডলিনী-শক্তি বা ষটচক্র শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত। ঈশ্বর দর্শন বা আত্মদর্শন লাভের জন্যেই সাধকেরা সাধনা করে থাকেন। সাধনার আছে বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন কঠিন পন্থা। তবে সকলের উদ্দেশ্যে কিন্তু ঈশ্বর দর্শন এবং মুক্তি লাভ। মানে পথ আলাদা আলাদা হলেও গন্তব্যস্থান এক—আত্মজ্ঞান লাভ। সঠিক গুরু এবং সৎ গুরুর কৃপা ছাড়া এই অত্যন্ত শক্তিশালী চক্রগুলোকে, জাগানো সম্ভব নয়, ঈশ্বর লাভ মুক্তি তো দূরের কথা। আজ্ঞা চক্র ঠিক এই কাজটিই করে।

আমি বললাম—এই চক্রটিকেই তো গুরুচক্র বলে?

গুরুদেব বললেন—হ্যাঁ, আজ্ঞা চক্রকেই গুরুচক্র বলে। আজ্ঞা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল নির্দেশ, অর্থাৎ যে চক্র আদেশ বা আজ্ঞা দিয়ে থাকে তাকেই আজ্ঞা চক্র বলা হয়। এই চক্র কাকে আজ্ঞা দেয়? আমাদের দেহের অন্যান্য পাঁচটি চক্রকে আজ্ঞা বা নির্দেশ দেয় বা নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের কপাল এবং দুই ভ্রুর মাঝখানে এই চক্রের অবস্থান। এই চক্রের পাঁপড়ি দুটি বা এটি দ্বিদল পদ্ম। এর অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন পরম শিব ও শক্তি হাকিনী। এই চক্র সম্পর্কে বিভিন্ন ঘরানা তথা নানা মুনির নানা মত, বিস্তর তর্ক রয়েছে। আমাদের দেহের চক্রগুলো আমাদের চোখ,নাক, কান, জিভ ও চামড়া—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে আর সেই চক্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, নেতৃত্ব দেয় বা আজ্ঞা দেয় আজ্ঞাচক্র। ষটচক্রের এটাই শেষ চক্র। তবে এর উপরেই একটি চক্র আছে, আমাদের ব্রহ্মতালুতে, সেই মহা চক্রের নাম হলো ‘‘সহস্রার চক্র”। তবে এই চক্র উন্মুক্ত থাকে বা খোলা থাকে তাই একে চক্র হিসেবে ধরা হয় না। এখানে স্বয়ং পরমব্রহ্ম পরম শিবের অবস্থান। শক্তি বা ইষ্টদেবী এই কুণ্ডলিনী চক্রে ঘুমিয়ে থাকেন, সাধন ক্রিয়ার ফলে সাধক যখন একটি একটি করে চক্র ভেদ করে সহস্রারে পরম শিবের সাথে সেই শক্তির মিলন ঘটাতে পারে, তখন সাধকের মোক্ষলাভ ঘটে। আজ্ঞা চক্র ঠিক এই কাজটিরই নিয়ন্ত্রণ করে। এই চক্রকে যুক্ত-ত্রিবেনীও বলে কারণ এই জায়গায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী রূপে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী একত্রে মিলিত হয়ে সহস্রার পর্যন্ত গিয়েছে। আজ্ঞাচক্রের ঠিক উপরে ষোড়শদল বিশিষ্ট সোমচক্র নামে একটি গুপ্ত চক্র আছে। ঐ ষোড়শদলকে চন্দ্রের ষোড়শ কলা বলে। ষোড়শ কলার ষোলটি বিভিন্ন গুণ থাকে যেমন—কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য ও একাগ্রতা। এর উপরে আরও একটা গুপ্ত ষড়দল পদ্ম আছে যাকে জ্ঞান চক্র বলে। এর এক এক দল ক্রমে—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও স্বপ্ন জ্ঞান জন্মে। আজ্ঞা চক্রের নীচে তালুমূলে দ্বাদশ দলের একটা গুপ্ত চক্র আছে এই চক্রটাকে মনস চক্র বলে। এই পদ্মে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূল ভূতের উদ্ভাবন হয়ে থাকে। এর এক এক দল ক্রমে ক্রমে—শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অ-রতি, সম্ভ্রম ও উদ্বিগ্ন এই দ্বাদশটা বৃত্তি উদ্ভাবিত হয়। এই সব চক্রকে একা নিয়ন্ত্রণ করে এই আজ্ঞা চক্র। এই চক্রকে তাই গুরু চক্রও বলে।

আমি কৌতুহলী হয়ে গুরুদেবকে তাই জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা বাবা, এই জন্যেই কি গুরুদেবকে ইষ্টদেবতারও উপরে বলা হয়েছে?

গুরুদেব বললেন—ঠিক তাই। শাস্ত্র বলেছেন, সাধনার মূল হলেন শ্রী গুরুদেব। কোনও শিষ্যের জীবনে যদি আপন কেউ থেকে থাকেন তবে তা কেবল গুরুদেব। সাধনা শুরুর সময় একটা সময় পর্যন্ত শিষ্যের চোখে দেব-দেবীদের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না, তার মাথা যদি কোথাও নত হয়, তবে তা তার পিতামাতা ও গুরুদেবের চরণ ছাড়া অন্য কোথাও নত হয় না। এ ছাড়া, শিষ্যের জন্য ইষ্ট এবং গুরুর মধ্যে পার্থক্যও শেষ হয়ে যায় কারণ এটি তার মনে স্পষ্ট হয় যে সমস্ত দেবদেবী একত্রে যদি কোথাও উপস্থিতি থাকে তবে তা গুরুদেবের মধ্যেই রয়েছেন। তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে লাভ কি! ঠিক একই ভাবে সাধনার এক পর্যায়ে সাধক বুঝতে পারেন যে আজ্ঞা চক্রই সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আমি বললাম—বাহ্, খুব সুন্দর করে আপনি বুঝালেন।

গুরুদেব বললেন—আমাদের শরীরে এই চক্রগুলি ছাড়া আরও ৭২হাজার নাড়ী রয়েছে। প্রত্যেকটা নাড়ীতে একজন করে যোগিনীর অবস্থান। সঠিক সাধনা ছাড়া এ উপলব্ধি হয় না। আমি যতটা সংক্ষেপে বলে গেলাম আদতে বিষয়টি তার থেকে অনেক অনেক অনেক গুন কঠিন এই চক্র সাধনা। চূড়ান্ত ধৈর্য্য, চূড়ান্ত শৃঙ্খলা এবং অভ্যাসে পটু না হলে, এই ষটচক্র সাধনা বা কুণ্ডলিনী সাধনার চিন্তা মাথাতেও আনতে নেই আর অবশ্যই সঠিক ও সৎ যোগগুরুর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করা দরকার। আজ এটুকুই থাক, আবার অন্য কোন দিন কুণ্ডলিনী ও আজ্ঞা চক্র নিয়ে আরও তথ্য তোমায় বলবো।

আমি বললাম—না বাবা, মোটামুটি অনেকটা বুঝতে পারলাম তবে খুব ভালো করে অনুশীলন ও অভ্যাস না করলে তো আজ্ঞা চক্র বিষয়ে বোঝা যাবে না!

গুরুদেব বললেন—এই আজ্ঞা চক্রের দেবী এই মাতঙ্গীর সাধনা আমাদের বাংলায় প্রাচীনকালে শুরু হয়। চর্যাপদে তাই দেখি ডোম্বীপাদ দেবীকে নিয়ে পদ লিখেছেন —

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করই।।১
বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরুপাঅপসাএ জাইব পুণু জিনউরা।।২
পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি।।৩
চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দা।।৪

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছরে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জানই কুলেঁ কুল বুড়ই।।৫

এর বঙ্গার্থ হলো, গঙ্গারূপিণী ললনা ও যমুনারূপী রসনার মাঝে অবধূতী নাড়ী বেয়ে নৌকো চলে। মাতঙ্গী ডোম্বী অবলীলাক্রমে তাঁর পুত্রদের পার করিয়ে দেন। ডোম্বি! নৌকো বেয়ে চল! ও ডোম্বি! বেলা অনেক হল। সদ্গুরুপাদপ্রসাদে আমি জিনপুরে যাব। পঞ্চ ম-কারের পাঁচ বৈঠা ক্রমাগত কামনার জলে পড়ছে। পীঠে মণিমূলে কাছি বেঁধে রাখা হয়েছে। তুমি মহাশূন্যের সেচনী দিয়ে জল সেঁচতে থাকো, যেন তা শরীরে না প্রবেশ করতে পায়। করুণার সূর্য আর প্রজ্ঞার চাঁদ দুই হাতে নিয়ে নপুংসক পুলিন্দ সৃষ্টি-সংহারের মায়াখেলায় মেতেছেন। অথচ তুমি বামেও সরো না, ডানেও সরো না; পারানির কড়িও ধরো না। তুমি স্বচ্ছন্দে মধ্যপথে বিহার করো। যে মূঢ়মতি সাধন-নৌকো চড়েও তা বাইতে জানে না, তার কুলকুণ্ডলিনী কুলেই নিমজ্জিত থেকে বুড়িয়ে যায়।

আমি বললাম—এ তো কুণ্ডলিনী সাধনার কথা! দেহ সাধনার বিষয়ে তখন থেকেই বাঙালীরা চর্চা করত?

গুরুদেব বললেন—নিশ্চয়ই, নয় তো এমন পদ কি করে তাঁরা রচনা করলেন! ডোম্বী-পা চর্যার অষ্টম পদটি রচনা করেছেন। ডোম্বী-পা ছিলেন ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা। ডোম্বী রাজার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, ডোম্বী-পা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষালাভ করায় তার প্রজারা তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। এতে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী শুরু হয়। যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন তা দূর হয়। এতে তান্ত্রিকরা রাজাকে ধর্মবান মনে করেন এবং দেশের প্রজারাও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভে অনুপ্রাণিত হয়। এছাড়া রাঢ়দেশের হিন্দু রাজা বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি সাধন করায় ডোম্বী সেখানে উপস্থিত হন এবং অলৌকিক বলে রাজা-প্রজা সকলকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি কর্ণাটকের সমুচ্চয় নামক রাজার তৈরি ৮০০ টি স্তূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বলে মাটিতে মিশিয়ে দেন। বিরূ-পা ছিলেন তার গুরুদেব। একটি অলৌকিক ঘটনা হল—প্রজাদের অনুরোধে যখন রাজা বন হতে দেশে ফিরে আসেন ও সঙ্গিনী ডোমনিসহ নিজেকে সাত দিন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রেখে নতুন দেহ নিয়ে বের হয়ে আসেন। তখন তার নাম হয় আচার্য ডোম্বী।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ডোম্বী-পা মাতঙ্গী দেবীর উপাসনা করতেন?

গুরুদেব বললেন—শুধু ডোম্বী-পা কেন, অনেকেই দেবী মাতঙ্গীর উপাসনা করতেন। আর করবেন না কেন! এই দেবীর আরাধনা করলে যে প্রচুর সিদ্ধাই লাভ হয়। পরবর্তী কালের দশমহাবিদ্যার নবম দেবী হলেন মাতঙ্গী। তন্ত্র শাস্ত্র অনুযায়ী এই দেবীকে সরস্বতীর আর এক রূপ বলে মনে করা হলেও দেবী সরস্বতীর স্নিগ্ধতা তাঁর মধ্যে নেই। ইনি শ্রীকূল ও কালীকূল—দুই কুলেই পূজিতা। ইনিই উচ্ছিষ্টচণ্ডালিনী দেবী ও নির্মাল্যধারীনি দেবী। এঁর ভৈরব মতঙ্গ শিব।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

'শাক্তপ্রমোদ' তন্ত্রশাস্ত্রে দেবীর ধ্যান—

'শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।

ধ্যায়েহং বেদৈর্বাহুদণ্ডৈঃ অসি-খেটক-পাশাঙ্কুশ-ধরাম্।।'

— দেবী শ্যামবর্ণা অর্ধচন্দ্রধারিণী ও ত্রিনেত্রা। চার হাতে তরবারি, চষক, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করে রত্নসিংহাসনে বসে আছেন। ইনি তমঃ প্রধানা। এঁর বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ধ্যান, পূজা, মন্ত্র ও উপায় আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি এই সাধনা করতে পারি?

গুরুদেব বললেন—নিশ্চয়ই পারো, তবে ঘরে থেকে এই সাধনা করা উচিত নয়। ইনি তমঃ প্রধানা দেবী, সাধককে ভয়ংকর রূপে দেখা দেন। এ ছাড়া মাতঙ্গী সাধনায় ভয়ংকরী ডামরী শক্তির উদ্ভব হয়। সবসময় সে শক্তি সামলানো মুশকিল। তা ছাড়া তোমার বয়স হয়েছে, এখন এমন সাধনা না করাই ভালো। বারাণসীর লোককথা অনুযায়ী, মাতঙ্গী দেবীর উপাসনা করত চণ্ডাল সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই ভাবে তাঁর চণ্ডালিনী রূপটি গড়ে ওঠে। তাঁকে শ্মাশানবাসী, ভস্ম মাখা শিবের যোগ্য শক্তি বলে মনে করা হয়। এই কারণেই তিনি উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারিণী ও অপরিচ্ছন্না। মাতঙ্গীর উপাসনা মানুষকে ক্লিন্নতা থেকে মুক্ত করে। এই দেবীর পূজা পদ্ধতি গোপন এবং ভয়াবহ।

সাধকের কাছে দেবী মাতঙ্গী কর্তৃত্ব-শক্তির দেবী। কালীকুল সম্প্রদায়ে ইনি জাতিহীন ও শ্রীকুল সম্প্রদায়ে দেবী ললিতার প্রধানমন্ত্রী। মাতঙ্গীর মুর্তি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে ইনি পূর্ণ বাগ্‌দেবীরই মূর্তি। দেবী তার দৈবী আকর্ষণে সাধকের সকল 'কর্ম' আকর্ষণ করে শোষণ করে নেন, তাই তিনি শ্যামবর্ণা। মাতঙ্গীর এই শ্যামলা দেহবর্ণ হল পরাবাক্ বিন্দু, তাঁর ত্রিনয়ন হল সূর্য, চন্দ্র আর অগ্নি, তাঁর চার বাহু চারটি বেদ, দেবীর হাতে মায়াবন্ধনরূপ পাশ-ও রয়েছে, আবার পাশ ছিন্নকারী অসিও রয়েছে। দেবীর তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ চিত্তবৃত্তির প্রত্যাহার এবং খেটক্ বা চর্ম আঘাত নিবারণী সহনশক্তির প্রতীক। তাই পাশ হল অবিদ্যা, অঙ্কুশ হল বিদ্যা, কর্মরাশি হল দণ্ড, শব্দস্পর্শাদি গুণ হল কৃপাণ অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির প্রতীক। দেবীর কদম্ববন হল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। যোগরাজোপনিষদ'-এ ব্রহ্মলোককে কদম্বের মত গোলাকৃতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—'কদম্বগোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে।' দেবীর মাথার অর্ধচন্দ্র অতিরহস্যময়। এই চন্দ্র থেকে স্নিগ্ধ কিরণ ও সুধা বর্ষিত হয়ে সাধকের মনের সকল রাজসিক অহঙ্কার দুর হয়ে যায়। সাধক প্রণবদেহ লাভ করে অন্তিম মোক্ষসাধনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ভগবতী মাতঙ্গীর রত্নসিংহাসন দিব্যশক্তিসমন্বিত সিংহবাহনের প্রতীক আর সূক্ষ্মরূপে এই সিংহাসন শিবাত্মক মহামঞ্চ। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই তিন রকম অহঙ্কারের মধ্যে রাজসিক অহঙ্কার থেকে মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয় আর দেবী মাতঙ্গীর অধিষ্ঠান সেই মনস্তত্ত্বলোকের আজ্ঞাচক্রে। তাঁর সাধনায় সিদ্ধ সাধক কমপক্ষে আঠারো রকমের সিদ্ধাই অর্জন করেন। রক্তজবা ফুল দেবীর প্রিয় সেই সাথে রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম ও

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নীলকণ্ঠ ফুল দিয়েও দেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। গুঞ্জাঃফুল বা কুঁচ ফুল দেবীর বিশেষ প্রিয়। তবে অন্যান্য যে কোনও ফুলে দেবীর পূজা করা যায়। তাঁর সাত্ত্বিক পূজায় পায়েস, রাজসিক পূজার ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে মৎস্য, মাংস ও তামসিক পূজায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে মাতঙ্গী জয়ন্তী পালিত হয়।

আমি বললাম—ঠিক আছে, তাই হবে।

গুরুদেব বললেন—আমি তবে আসি।

গুরুদেব হঠাৎ আমার সামনে থেকে নিমেষে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন তা আমি দেখতে পেলাম না। আমি চিৎকার করে গুরুদেবকে ডাকলাম—বাবা, কোথায় গেলেন আপনি? আমি উঠে দাঁড়াতে গেলাম।

**

আসলে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমি ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছি। আমার পাশেই চিন্ময় বাবু শুয়ে। আর খাটের উপরে ঐ মেয়েটি বসে মিটিমিটি হাসছে। আমাকে এভাবে দেখে হাসতে হাসতে বললো—কি গো বাবা, স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?

আমি থতোমতো খেয়ে বললাম—হম্।

মেয়েটি বললো—তো কি স্বপ্ন দেখলে?

আমি বললাম—সে অনেক কথা। এখন অনেক রাত, ঘুমিয়ে পড়ো, কাল সকালে কথা হবে।

মাতু বলল—এখন গভীর রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ, চলো আমরা দু'জনে এই বাড়ীর ছাদে গিয়ে বসি। কয়েকটা বিষয়ে একটু কথা বলে নিই।

আমি বললাম—নাহ্, একটু ঘুমিয়ে নিই। তুমিও শুয়ে পড়ো।

মাতু বলল—ঘুম মানে তো একপ্রকারের মৃত্যু আর জেগে থাকা হলো জীবন। চলো কিছুক্ষণ জেগে থেকে কয়েকটা জরুরী কথা বলে নিই।

আমি নিমরাজি হয়ে বললাম—চলো।

আমাদের ঘরের উপরেই ছাদ। আমরা দুইজন সিঁড়ি বেয়ে চললাম ছাদে। পরিস্কার জায়গা। বসে বসে রাতের গুয়াহাটি শহরে চোখ পড়ল। ছোটছোট আলোকবিন্দু জনবসতি যেমন বুঝিয়ে দিচ্ছে তেমন রাস্তাঘাটও বোঝা যাচ্ছে। নীচে ব্রহ্মপুত্রের জলে আলোর প্রতিচ্ছবি দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা আকাশে ভেসে আছি। নীরবতা ভেঙে মাতু বললো—এখন মেলা চলছে। জানো তো, কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের সবচেয়ে বড় উৎসব এই অম্বুবাচী। এই সময় দেবীর মন্দির তিনদিন বন্ধ থাকে। বিভিন্ন অলৌকিকতায় মোড়া এই পুণ্যতীর্থ। যে সব দৈবী অলৌকিকতার কথা প্রচার করা হয়, তা এখন অনেকে বিশ্বাস করতে চান না, তবুও তারই মাঝে অন্য এক অপার্থিব বিশ্বাসে ভর করে এই মহোৎসবের সময় দেবীর মন্দির ও মন্দিরের আশপাশের সারা পাহাড়ে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভারতের অজস্র তান্ত্রিক, সন্ত এবং লক্ষ লক্ষ সাধারণ গৃহস্থের ভিড়ে এক রহস্যময় যোগ সৃষ্টি হয়, যার আকর্ষণ কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। আর এরই আকর্ষণে তুমিও এসেছো আর আমিও।

আমি বললাম—ঠিক বলেছো।

সত্যিই তাই। আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক অম্বুবাচীতে একজন সাধুর সাথে প্রথম আসি এই কামাখ্যাধামে। তখন এক ভয় মিশানো কৌতুহল ছিল। এরপর অনেকবার এসেছি এখানে। অনেকের মুখে এই তীর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী শুনেছি। 'কামাখ্যা' এই কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে ভিড় করে অজস্র অলৌকিক অপার রহস্যমাখা গল্পগাথা; যা পূর্বপুরুষ-পরম্পরায় সকলেরই শোনা। আমাদের কারও কাছে এই তীর্থ পিশাচসিদ্ধের দেশ, কারও কাছে এই দেশ ভিনদেশি পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখা কুহকিনী নারীদের দেশ; কারও কাছে এই স্থান গূঢ় তন্ত্রসাধনার আদর্শ ভূমি; আবার কারও কাছে এই স্থান পরম পবিত্র পুণ্য শাক্ততীর্থ 'কামাখ্যাধাম'।

এই যে, এই সব কিংবদন্তি আর গল্পগাথা ছড়িয়ে কামাখ্যাকে পরম রহস্যময় অলৌকিক এক দুর্লভ ভূমি করে রাখার সচেতন প্রচেষ্টা; তার ঐতিহ্য কিন্তু অনেক প্রাচীন। শুনেছি, সুপ্রাচীনকালে এই অরণ্য-পর্বতময় অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ছিল, ভক্তদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র দুর্গমতা জয় করে এখানে তীর্থ করার সৌভাগ্য অর্জন করতেন, বাকিরা তাঁদের মুখেই শুনতেন তীর্থের মাহাত্ম্যগাথা; ফলে শোনা কথার পরতে পরতে রহস্য বাড়ত এবং তা নির্বিচার বিশ্বাসে ভর করে বংশপরম্পরায় চারিয়ে যেত আমাদের মধ্যে। যা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যাই হোক, এই যে কামাখ্যার রহস্যময়তা; তার অন্তর্মূলে একজনই আছেন, তিনি দেবী আদ্যাশক্তি। দেবীর পীঠ ভক্তজনের কাছে 'যোনিপীঠ' বলে পরিচিত। এই পীঠ শুধু একান্ন সতীপীঠের অন্যতম পীঠ নয়; যে চারটি পীঠ 'আদি সতীপীঠ' হিসেবে স্বীকৃত, এটি তার মধ্যে একটি। প্রাচীন পুরাণগ্রন্থে এই পীঠের মাহাত্ম্য লেখা আছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে কচ্ছপের পীঠের মতো এক বিস্তৃত উঁচু জমি ছিল এই 'কুব্জিকা' পীঠ। সিদ্ধ-শক্তিপীঠ গড়ে ওঠার জন্য তন্ত্রমতে এমন ভূমিই আদর্শ। কিন্তু এই জায়গায় যখন দেবী সতীর যোনি পতিত হল, তখন তার বিপুল ভার ধরিত্রী সহ্য করতে পারলেন না। কাতরভাবে সাহায্যের জন্য তিনি প্রার্থনা জানালেন ত্রি-দেবতার কাছে। তাঁর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যথাক্রমে শ্বেত, বরাহ ও নীল নামে পাশাপাশি তিনটি পর্বতের রূপ ধারণ করে পীঠভার মাথায় তুলে নিলেন। কিন্তু আদ্যাশক্তির সেই তেজ ও ভার তাঁরা ধারণ করতে পারলেন না। তিনটি পর্বতই ক্রমশ মাটির অতলে ডুবে যেতে শুরু করলো। তখন মেদিনীর প্রার্থনায় স্বয়ং দেবী জাগ্রত হয়ে আপন ভার আপনিই গ্রহণ করলেন, তিন পর্বতকে রক্ষা করলেন এবং আপন নিবাস নির্দিষ্ট করলেন নীল পর্বতে। এই পর্বত যেহেতু স্বয়ং শিব, তাই এখানে শিব-শক্তি সর্বদা একত্রে অবস্থান করেন বলেই ভক্তজনের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিশ্বাস।

নীল পর্বতে কামাখ্যাধামে মন্দির অব্দি পৌঁছনোর জন্য আসলে পাহাড়ের চারিদিকে চারটি পথ রয়েছে। পৌরাণিক কিংবদন্তি অনুসারে এই চারটি পথ কিন্তু 'নরক' নামের এক অসুরের তৈরি। এখনকার আসাম বা তখনকার কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুর গড়ে উঠেছিল এই নরকাসুরের হাতেই। তিনিই ছিলেন এখানকার রাজা। তিনি একদিন শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তিনি হাজির হলেন অরণ্যে ঢাকা নীল পর্বতের চূড়ায়, দেবীস্থানে। তখন লীলাময়ী দেবী আগন্তুক এই নরকাসুরকে সুন্দরী যুবতী এক কুমারী কন্যারূপে দর্শন দিলেন। কন্যার রূপে মুগ্ধ হলেন নরকাসুর। দিলেন বিবাহের প্রস্তাব। তখন কন্যারূপী দেবী জানালেন যে, এ-প্রস্তাবে তাঁর একটি শর্ত আছে। এক রাতের মধ্যে নরকাসুর যদি পাহাড়ের চারিদিক থেকে চারটি পথ তৈরি করে মধ্যিখানে একটি বিশ্রামস্থান তৈরি করে দিতে পারেন; তাহলে বিবাহে তাঁর আপত্তি নেই।

দেবীর শর্তে রাজি-হয়ে সন্ধ্যা নামতেই নরকাসুর লেগে-পড়লেন কাজে। তিনি তাঁর তপস্যালব্ধ অমিতশক্তিতে রাত্রি শেষ হবার আগে চারটি পথ তো তৈরি করলেনই; সেইসঙ্গে একটি বিশ্রামঘর নির্মাণও অনেকদূর এগিয়ে ফেললেন। তাই দেখে দেবী প্রমাদ গুণলেন। তিনি ভেবেছিলেন নরকাসুর তাঁর শর্তপূরণ করতে পারবেন না এবং এভাবেই তাঁর প্রস্তাব উপেক্ষা করা যাবে! কিন্তু কাজে উল্টোটা হতে দেখে দেবী এবার ছলনার আশ্রয় নিলেন, বিশ্রামগৃহ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ভগবান বিষ্ণু মোরগ রূপ ধারণ করে অসময়ে ভোরের ডাক ডেকে উঠলেন। এতে নরকাসুর, কাজ শেষ হবার আগেই ভোর হয়ে গেছে ভেবে হতাশ ও চরম ক্ষুব্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে দিলেন। মায়ার প্রভাবে সত্যমিথ্যা বিচারের ক্ষমতাই তার রইল না। যেভাবেই হোক শর্তভঙ্গের ফলে তাঁর আর দেবীকে পাওয়া হল না।

দেবীকে নরকাসুর না-পেলেও দেবীর লীলায় ভক্তজন দেবীর থানে যাওয়ার জন্য চারটি পথ পেল, পেল একটি অসম্পূর্ণ বিশ্রামস্থল। এই পথ বেয়েই আশপাশের জনপদ থেকে ভক্তজন দেবীর লীলার টানে আসতে লাগল তাঁর পীঠে উপাসনার জন্য। ধীরে ধীরে দেবী ভক্তের সমস্ত কামনা পূরণের মধ্য দিয়ে 'সর্বকামনা পূর্ণকারিণী দেবী' অর্থাৎ 'কামাখ্যা' নামে আরাধিত হতে লাগলেন। দেবীর নামে তাঁর পীঠস্থানও ক্রমে ক্রমে 'কুব্জিকা' থেকে কালের কোন এক বাঁকে এসে 'কামাখ্যা' হয়ে উঠল। আর দেবী যেহেতু নরকাসুরকে কুমারীরূপে দর্শন দিয়েছিলেন, তাই ভক্তজন তাঁকে শুরু থেকেই 'কুমারী' রূপে আরাধনা করতে শুরু করলেন। পৌরাণিক কিংবদন্তি অনুসারে, দেবীর পীঠস্থানে প্রথম মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন স্বয়ং কামদেব, মুক্তি পেয়েছিলেন শিবের রোষ থেকে আর ভক্তজন এভাবেই পেয়েছিল দেবীর প্রথম মন্দির।

কিন্তু এই মন্দির তৈরির পরই মারাত্মক এক সমস্যা দেখা দিল। দেবীর মাহাত্ম্যে সকল ভক্তজন অশেষ পুণ্যে অক্ষয় স্বর্গে বাস করতে শুরু করলো। তখন যমরাজ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কর্মহীন হতে শুরু করলেন। যমলোক ছারখারে যেতে লাগল। এই অবস্থায় শিবের চরণে এসে পড়লেন যম। তিনি এই বিপদ থেকে উদ্ধারের নিদান চাইলেন ভগবান শিবের কাছে। বিপদের গভীরতা বুঝে মহাদেব তখন দেবী উগ্রতারাকে পাঠালেন দেবীর পীঠস্থান থেকে সকল ভক্তদের সরিয়ে দিতে। তাঁর আদেশে উগ্রতারা সকলকে সরিয়ে যখন ঋষি বশিষ্ঠকে সরাতে গেলেন তখন তা বশিষ্ঠের সম্মানে লাগল, ঋষি বশিষ্ঠ তখন মহা ক্ষুব্ধ হয়ে দেবীর পীঠ লুপ্ত হওয়ার অভিশাপ দিলেন! এরপর এক দুর্বিপাকে মন্দির ও দেবীর পীঠস্থান মানুষের চোখের অন্তরালে চলে গেলো, সাধারণের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে গেল দেবীর জাগ্রত পীঠ।

এবার আসি ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর কথায়। কামদেবের মন্দির ধ্বংস হওয়ার কয়েক সহস্র বছর পরের কথা। কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ একবার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আশ্রয় নিলেন নীল পাহাড়ের চূড়ার গহন অরণ্যে। রাজার অসহায় অবস্থা দেখে দেবীর দয়া হল। তিনি বৃদ্ধাবেশে রাজার কাছে এসে ঢিবির মতো আপন পীঠস্থান দেখিয়ে যথাবিধি পূজার উপদেশ দিয়ে বললেন যে, এখানে দেবী আদ্যাশক্তি কামাখ্যার গুপ্ত পীঠ রয়েছে, তিনি সকল ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। রাজার যদি কোন মনের বাসনা থাকে, তা জানিয়ে তিনি যেন অবশ্যই পূজা করেন।

বৃদ্ধা চলে গেলে রাজা পুষ্প, অর্ঘ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে দেবীর পূজা করলেন। মানত করলেন এই বলে যে, তিনি যদি শত্রুদের পরাজিত করে অধীন করতে পারেন, তাহলে দেবীর পীঠস্থানে সুদৃশ্য মন্দির তৈরি করিয়ে দেবেন। রাজার নিষ্ঠাভরা পূজা গ্রহণ করে দেবী তাঁর ঐকান্তিক মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন। এর ফলে, অচিরেই রাজা তাঁর মানত পূর্ণ করতে অসম্ভব সুন্দর এক মন্দির গড়ে দিয়েছিলেন।

তারপর মধ্যযুগের ইসলামিক শাসনের মধ্যকালে কালাপাহাড়-এর আক্রমণে মন্দিরের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বসিংহের ভাই শুক্লধ্বজ সেই ভগ্ন মন্দির মেরামত করে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এই হল মন্দির তৈরির ইতিহাস।

বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মন্দিরের এখন তিনটি মণ্ডপ রয়েছে। তাদের নাম যথাক্রমে—'চলন্তা', 'পঞ্চরত্ন' ও 'নাটমন্দির'। তিনটি মণ্ডপ পেরোলেই গর্ভগৃহ। মূল গর্ভগৃহে দেবীর কোন মূর্তি নেই। পাথরটি যোনি আকৃতির। সেখান থেকে অবিরাম জলস্রোত বেরিয়ে আসছে, যা নালার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। কুণ্ডের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা জলে এক এক-সময় যোনিপীঠ কিছুটা ডুবে থাকে। ভক্তজন পূজার অর্ঘ্য নিয়ে এখানে প্রবেশ করলে পাণ্ডা ও পুরোহিতেরা সেই অর্ঘ্য যোনিপীঠে ঠেকিয়ে দেন। ভক্তজনের হাত পুরোহিতরা ধরে যোনিপীঠ স্পর্শ করিয়ে দেন। তখন কয়েক সেকেণ্ড যোনিপীঠ স্পর্শ করে থাকা যায়, হাত দিয়ে তার আকৃতি অনুভব করা যায়, এই সময় যোনির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা জলের স্রোত স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে দেবীর তথাকথিত মূর্তি না থাকলেও তিনি পঞ্চধ্যানমূর্তিতে পূজিতা হন—'কামাখ্যা', 'ত্রিপুরা', 'কামেশ্বরী', 'সারদা' ও 'মহোৎসহা' নামে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দেবীর মন্দিরে নিত্য ছাগবলি হয়। দেবীর মন্দির থেকে প্রসাদের সঙ্গে একখণ্ড রক্তবস্ত্রও পাওয়া যায়। অনেকে সৌভাগ্য লাভের বস্তু হিসেবে এই রক্তবস্ত্র ধারণ করেন বা গৃহে রক্ষা করেন। দেবীর ভৈরব হলেন 'উমানন্দ'। তিনি দেবীমন্দির থেকে কিছুদূরে ব্রহ্মপুত্রের বুকে জলস্রোতের ঠিক মধ্যিখানে ছোট্ট একটি পাহাড়ে লিঙ্গরূপে অবস্থান করছেন।

মাতু বললো—কি চিন্তা করছো গো?

আমি বললাম—এই কামাখ্যাধামের কথা।

মাতু বললো—আচ্ছা বলো তো, এত বছর ধরে তুমি এই ধামে এসে কি পেলে?

আমি বললাম—কি পেলাম সেটা বড়ো কথা নয়, কি পাইনি সেটাই বড়ো বিষয়। আমি এত বছর ধরে কামাখ্যাধামে এসে আমার যোগ্যতার থেকে বেশী এমন অনেককিছুই পেয়েছি। কামাখ্যা দেবীর সাধনা কি তুমি করেছো?

সে বললো—দেবী কামাখ্যা সর্বোচ্চ তান্ত্রিক ঐতিহ্যে সম্মানিতা। এই নীলাচল পাহাড় তান্ত্রিকদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আর কামাখ্যা সাধনা বলতে বোঝায় আধ্যাত্মিক অনুশীলন বা কামাখ্যা দেবীর সাথে সম্পর্কিত উপাসনা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যেকোন ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত সুবিধাগুলি পৃথক বিশ্বাস এবং ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। এখানে কিছু সাধারণ দিক রয়েছে যা লোকেরা কামাখ্যা সাধনার সম্ভাব্য সুবিধা হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, যেমন—

আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্বোধন—আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন ক্রিয়ার মতো, কামাখ্যা সাধনা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধিতে অবদান রাখে বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি সাধক ও দেবীশক্তির সাথে গভীর সংযোগ গড়ে তোলে এবং তার আধ্যাত্মিক সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে।

আশীর্বাদ এবং সাধকের সুরক্ষা— সাধক তার উপরে ক্রিয়াশীল নেতিবাচক শক্তি, বাধা এবং ক্ষতি থেকে সুরক্ষার জন্য কামাখ্যা দেবীর আশীর্বাদ চাইতে পারেন।

ইচ্ছা পূরণ—কামাখ্যা দেবীকে 'কামনা পুরণ'-এর দেবী হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে তাঁর সাধকের ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা রয়েছে। কামাখ্যা সাধকেরা তাদের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা অর্জনে তাঁর সহায়তা চাইতে পারে।

নিরাময়—কিছু সাধক বিশ্বাস করেন যে কামাখ্যা সাধনায় শারীরিক ও মানসিক নিরাময়তা লক্ষ্য করা যায়। এটি অসুস্থতা থেকে ত্রাণ পেতে এবং সামগ্রিক সুস্থতা ও নিরাময় থাকার একটি উপায় হিসাবে দেখা যেতে পারে।

তান্ত্রিক অনুশীলন—কামাখ্যা সাধনা প্রায়শই তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং অনুশীলনের সাথে যুক্ত। যারা তান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেন তারা খুব সহজেই জীবনের রহস্যময় দিকগুলির গভীর উপলব্ধি হতে পারেন।

রূপান্তর এবং শুদ্ধিকরণ— দেবী কামাখ্যা সাধনা কখনও কখনও জীবনের পরিবর্তনশীল দিকগুলির সাথে যুক্ত। অনুশীলনকারীরা বিশ্বাস করতে পারেন যে কামাখ্যা সাধনায়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিযুক্ত থাকা সাধক আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি এবং নিজের ইতিবাচক রূপান্তর ঘটাতে পারেন।

এবার খুব সংক্ষেপে শ্রী মাতঙ্গী মহাবিদ্যা বীজাক্ষর মন্ত্র জপ করার নিয়ম বলছি, শুনে নাও। দশমহাবিদ্যার সাধনায় অতি অবশ্য সাধককে নিজেরই একজন সিদ্ধগুরুর খোঁজ করা উচিত। তোমার গুরুদেব যদি সিদ্ধ হয়ে থাকেন তো ভালো নচেৎ উপযুক্ত গুরুদেব খুঁজে ও তার সাথে যোগাযোগ করে তোমার গুরুদেবের কাছে 'মাতঙ্গী দেবীর সাধনা' শিক্ষার অনুমতি নিয়ে নিও। এই দেবীর সাধনা নিজের বাসস্থানে না করা উচিত। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে পূজা মন্দিরে তিনটি ধূপ ও প্রদীপ জ্বালাবে।

ধ্যান ও পূজা করে নিয়ে মৃদুভাবে বীজাক্ষর মন্ত্র জপ করে জপ সমর্পণ করে নিও। মূল জপ মন্ত্র হলো—ওঁম হ্রীম্ ক্লীম্ হুম্ মাতঙ্গৈ ফট্ স্বাহা। এই ভাবে ক্রমাগত একচল্লিশ দিন জপ করে বিয়াল্লিশ দিনে আহুতি দিতে হবে। প্রতিদিন পাঁচ হাজার মন্ত্র জপ করতে হয়। এতে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। তারপরে প্রয়োজন মতো তিনি যদি খাদ্য, অর্থ বা কোনও বস্তুগত জিনিস চান তবে তাকে সেই জিনিসটি কল্পনা করতে হবে এবং মাত্র পাঁচ বার মন্ত্রটি জপ করলে চাহিদা মতো বস্তু সাধকের হস্তগত হবে।

আমি বললাম—এই কালীর কথা বলতে বলতে কামাখ্যার কথা বলেই মাতঙ্গী সাধনার আলোচনা করলে। তুমি খুব চঞ্চল।

ভৈরবী বলল—চঞ্চলতাই তো ভালো। অনেক আঘাত সহ্য করতে সক্ষম। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মন আর আত্মা বিষয়ে বলেছেন, মন চঞ্চল, আত্মা কিন্তু চঞ্চল নয়, তিনি ধীর স্থির। তিনি মন আর আত্মা কে ভিন্ন রুপে দেখিয়েছেন।

আমি বললাম—মন ও আত্মা পৃথক হলেও প্রাণ স্থির না হলে মন স্থির হয় না, জীবাত্মাও বিক্ষিপ্তভাবে কর্ম করে।

মাতু ভৈরবী বললো—প্রান স্থির হওয়া মানে তো মৃত্যু।

আমি বললাম—না। এটা মনে হয় তুমি জানো না।

সে বললো—সব জানি না তবে একটু একটু জানি। প্রান কি? প্রান হলো মানব দেহের জীবনী শক্তি। প্রান পাঁচ প্রকার—প্রান, অপান, সমান, উদান, ব্যান, যাদের একত্রে পঞ্চবায়ু বলা হয়। অষ্টাঙ্গযোগের একটি হলো প্রানায়াম, যা প্রানকে দীর্ঘ করতে সক্ষম। এর অনেক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য আমি যদি একটি নির্দিষ্ট স্তরে নিয়ে গিয়ে প্রানটাকে রুখে দিই তাহলে আমার মৃত্যু অবধারিত। প্রাণকে রোখা যায় না।

আমি বললাম—প্রাণ তো সর্বক্ষেত্রে প্রবাহিত। বায়ু পঞ্চাশটি, প্রধান দশটি, তার মধ্যে প্রধান পাঁচটি, তার মধ্যে প্রধান 'প্রাণ' বায়ু। দেহের মৃত্যু হলেও দশবায়ুর মধ্যের একটি, 'ধনঞ্জয়' বায়ু মস্তিষ্কে অবস্থান করে। বায়ু-জ্ঞানী মানুষ 'ধনঞ্জয়' বায়ুর উপর নির্ভর করে মৃত মানুষেও প্রাণ সঞ্জীবন করে শবদেহকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন। মৃতদেহ শ্মশানে কাঠে পোড়ানোর সময় যখন মাথাটা ফাটে তখন ফট্ করে যে আওয়াজ হয়, তখন ঐ বায়ু বেরিয়ে যায়। এই 'প্রাণ' নিয়েই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মাতু ভৈরবী বলল—কিন্তু এখন ভাবার বিষয় হলো এতো সব জানার পরেও, মানুষ কেমন আজব এক প্রানী যে আধ্যাত্মিকভাবে কিছুই করে না। যারা করে তার প্রায় সব ভুল।

আমি বললাম—কি গূঢ় আলোচনা, বাপ্ রে বাপ্!

মাতু ভৈরবী বলল—দূর দূর ফালতু হলো সব, আমাদের জীবনটাই বৃথা। তার কারণ মানুষ এখনও পঁচিশে ডিসেম্বর কেক খায়, পার্টি করতে যায়, অথচ নিজেকে জানে না, 'সাধনা' করে না, গীতা শোনে অথচ পড়ে না।

আমি বললাম—আবার পরের জন্মে আসবো। তখন দেখা হবে।

মাতু ভৈরবী বলল—সময় নষ্ট করলে 'সাধন' হবে না, গীতা বেশি পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যাবে না, গীতা-চণ্ডী দুটোই পড়ুন, সকাল হোলো বিছানা ছাড়ুন, পুজোর আয়োজন করুন।

আমি বললাম—কলিতে আমি শুধু সব স্মরনে রাখবো। শুধু পরমেশ্বরকে অনুসরণ করে চলবো। বেশি সাধনা করলে অসাধু হয়ে যাবো কারন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলে গেছেন কলির সাধক কেমন হবে। তাই ভয়ে সাধু হইনি।

মাতু ভৈরবী বলল—আমি তো রোজ ভোর সাড়ে তিনটায় উঠি, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পুজোয় বসি। আজও উঠে আমার পূজা হয়ে গেছে। তারপর একটু তাঁকে স্মরন করে যা বলার বলে নিয়েছি, ঐ পাঁচটা পর্যন্ত। তারপর সারাদিন ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াই। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে যা দেখি ঐ গুলো সব তাঁর কাছে রিপোর্ট করি ।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—ও, তুমি ভগবানের রিপোর্টার?

মাতুও হাসতে হাসতে বলল— উল্টোপাল্টা দেখলেই রিপোর্ট চলে যাবে।

আমি বললাম—আর ভালো কাজ করলে?

মাতু ভৈরবী বলল—খারাপ তো কিছুই নয়, আর ভালোও কিছু নয়। সব হল কর্ম।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—ঐ রিপোর্টারের কথা বললাম।

মাতু বলল—না না আমি দুষ্টুমি করছিলাম একটু, ঐ সময়ে আমি একটু ধ্যান জপ করি। আপন মনে জপ করি কারন ঐ সময় জপটা খুব সুন্দর হয়। অনেক সুন্দর লাগে সব কিছু। শরীর মন সব কিছু হালকা লাগে। একটা সুন্দর অনুভূতি আসে। শরীরে কোন রোগ ব্যাধি থাকে না, শরীর খুব সুস্থ থাকে। মাথাটা একদম পরিস্কার থাকে সারাদিন। এটা আমি দেখেছি।

আমি বললাম—মন তো উতলা থাকে।

ভৈরবী বলল—না, ঐ সময় আমি খুব স্থির, শরীরটা ভীষণ হাল্কা হয়ে যায়। মনে হয় উপরে বেলুনের মতো ভাসছি। অদ্ভুত একটা অনুভুতি যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ঐ সময় আমি একেবারে স্থির। আমাকে ডাকলেও সাড়া পাবেন না। আমার এক সেবক আমার সাথে থাকে, সে না কি অনেক বার ডেকেছে, কিন্তু আমার না কি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কোন সাড়া শব্দ পায় নি। ঐ সময় নাকি আমার সেবক খুব ভয় পায় আমার কাছে আসতে। ও বলে—মা তোমাকে ঐ সময় আমার খুব ভয় করে, আর কোনও সময় ভয় করে না। মাঝে মাঝে কোনো সময় নাকি ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। আসলে ও খুব ছোট তো, আমাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে ভয় পায় হয় তো।

আমি আগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করলাম—ঐ সময় মানসপটে কি কোনও দৃশ্যের অবতারণা হয়?

মাতু আগ্রহভরে বলল—সে অনেক কথা, অনেক দৃশ্য দেখি, হিজিবিজির মতো। সব কিছু মনে থাকে না। কিন্তু আজকে একটা অন্য রকম দৃশ্য দেখলাম জানি না কেন, বাবা ভোলানাথ নটরাজ ভঙ্গিতে কিন্তু দুই হাতে মা দুর্গার মতো অস্ত্র। কিন্তু এমনটা যে হতে পারে তা আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি। কেমন যেন একটা! কখনও কখনও গভীর চিন্তায় ডুবে যাই। যখন একটু হুঁশ আসে লক্ষ করি, শরীর এতটাই হাল্কা লাগে মনে হয় যেন শরীরটাই নেই। অথচ মাথাটা এতটাই ভারী লাগে যেন মাথায় কেউ ভারী পাথর রেখে দিয়েছে। দুই ভ্রুর মাঝে বা নাকের ডগায় বিভিন্ন রঙ দেখা যায়, পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয় আর শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুলকানি অনুভব হয়।

আমি বললাম—বাহ্, বেশ সুন্দর ব্যাপার তো!

মাতু বলল—অবশ্যই সুন্দর। আপনিও ধ্যান-জপ করুন, আপনারও এমন বিচিত্র অনুভুতি হবে। মনে করো, স্থির ভাবে বসে সাধনা করছো, হঠাৎ দেখবে ভিতর থেকে দুলতে থাকবে। শরীরটা বরফের মতো ঠান্ডা মনে হবে আবার কখনও বা শরীরটা অত্যাধিক গরম মনে হবে। ধ্যানের গভীরে গেলে দেখবে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করছো তুমি কিম্বা নিজেকে আকাশে উড়তে দেখবে। এইভাবে বিভিন্ন লোকলোকান্তরে ও বিভিন্ন ব্রহ্মান্ডে, বিভিন্ন গ্রহে যাত্রা করছে—সে এক আলাদা অনুভূতি। কোন এক শক্তি তোমার মাথার ওপর থেকে শরীরে প্রবেশ করে তোমাকে অনাবিল আনন্দ ও শান্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় হয়তো বা তীর্থক্ষেত্র ও মন্দির ভ্রমণ করতে পারো, সেখানকার সাধুসন্ত বা মন্দিরের দেবদেবীর সাথে কথাও বলতে পারো। অনেকে আবার মৃত পূর্বজদের সাথে কথা বলেন বা নিজের পূর্বজন্ম দেখেন। আজ্ঞাচক্রে এমন হয়, এই চক্রে ভয়ংকর বিভিন্ন জন্তু, ভয়ানক মুখ, ভুতপ্রেতেরও দর্শন হতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই মাথায় চাপ অনুভব হতে পারে। মনে হতে পারে, মেরুদন্ড বেয়ে পিঁপড়ে ওঠা-নামা করছে মনে হবে আর কোন এক শক্তি তোমার মাথাটাকে ধরে তোমার আকাশের দিকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। অবশেষে শরীরটা বড় হতে হতে আকাশ মাথা ঠেকেছে মনে হবে। এসব অনুভূতি গুলো সাধনকালে অনুভূত হয়, তবে আধার ভিন্নে সবার অনুভূতি ভিন্ন হয়। মোটামুটি এই সকল অনুভূতিগুলির মধ্যে এক বা একাধিক অনুভূতি যদি তোমার সাধনকালে অনুভব হয়, তবে তুমি ধন্য।

আমি কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার এমন অনুভুতি কবে থেকে হয়?

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মাতু বলল—সে এক আলাদা কাহিনী, আর একদিন বলব। তবে ঐ সকল অনুভুতির পরে চিন্তায় আসে, কেন এমন দেখলাম! সেটা উদঘাটন করার চেষ্টা করি, আর কিছু বুঝতে না পারলে, তখন মনের আকুলতাটা বাড়তে থাকে সারাদিন। আকুলি বিকুলি করে মনটা। এই সব কথা আমি কাউকেই বলতে পারি না। কে কি ভাববে তাই, আমার ভীষণ লজ্জা করে

আমি বললাম—লজ্জার কি আছে?

সে বলল—আমি অবাস্তব অনেক জিনিস দেখি, কিন্তু কাউকে বলতে পারি না। নিজের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করি। আমি এই সব বুঝতে পারি না, আর কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারি না। কাকে আর জিজ্ঞেস করব!

আমি বললাম—তোমার গুরুদেবকে জানিও।

মাতু জানালো—জানিয়েছি তো! তিনি এই বিষয়ে আমাকে ভীষণ সাহায্য করেন। তাঁর কৃপা না পেলে কি এসব অনুভুতি হয়! তবে তোমাকে দেখে মনে হলো তুমি খুব স্বচ্ছ ধার্মিক মানুষ, তোমার মনটাও পরিষ্কার স্বচ্ছ হয় তো, যাকে যা বলো মুখের উপর বলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। অন্যায়টা অন্যায়, আর ন্যায়টা ন্যায়—এটা তুমি মনেও করে আর বলেও দেন। তুমি বেশ পড়াশোনা করা মানুষ, তোমার ভালো জ্ঞানও আছে, তুমি যতটুকু সাধনা করেন মনোযোগ সহকারে করে, মনে কোন কু-ভাব বা কু-চিন্তা তোমার আসে না আর তুমি আনও না। বই লিখো—যেটা আমার খুব পছন্দের। তাই তোমাকে এত কথা বললাম। কিছু ভুল বললে ক্ষমা করবে।

আমি বললাম—আমাকে ধার্মিক বললে ঠিক আছে, কিন্তু ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝ?

মাতু পাগলী বলল—ধর্ম বলতে আমি 'প্রকৃতির ধর্ম' বলব। এই প্রকৃতি বা এই পৃথিবীতে নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ বাস করার কথা বলব। এই ভাবে জীবন প্রতিপালন করতে গেলে আমাদের কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। সেই নিয়ম মেনে চলতে শাস্ত্রে পরামর্শ ও আদেশ দেওয়া থাকে। পুজো-পাঠ করতে বলা হয়, সাধারণ মানুষ তাকেই ধর্ম বলে।

আমি বললাম—'প্রকৃতির ধর্ম' বলতে তুমি কি বুঝাতে চাইলে?

মাতু বলল—দেখো বাবা, 'শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্'— মানবদেহ রোগের পীঠস্থান; আবার এটাও বলতে পারো যে, সুস্থ মন সুস্থ শরীরেই অধিষ্ঠান করে। দুটি কথাই সত্য। তবে পরবর্তী বাক্যটিকে অন্য ভাবেও বলা যায়—সুস্থ, সবল ও যুক্তিবাদী মন মানব দেহকে সুঠাম-সুন্দর-জ্যোর্তিময় করে রাখে, বহু শারীরিক রোগকে প্রতিরোধ ও নিরাময় করে, এমন কি বিপজ্জনক সংক্রামক রোগকেও জয় করতে সাহায্য করে; এই বলিষ্ঠ মানসিকতা আসে দেহ-মনের ব্যায়ামের মাধ্যমে। দৈহিক ব্যায়াম বলতে আমরা বুঝি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়মিত সঞ্চালন ও শ্রম এবং মানসিক ব্যায়াম বলতে বুঝি নিয়মিত কঠোর যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম ও গভীর ধ্যানানুশীলন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আমরা তাই করি। ভারতীয় সাধকদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখবে বহু অলৌকিক ঘটনার প্রাণবন্ত বর্ণনা আছে। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধকেরা প্রথমে আমাদের মধ্যে সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছেন। পরবর্তী কালে কঠোর তপশ্চর্যা, যোগাভ্যাস ও গভীর ধ্যানের মাধ্যমে বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে সাধার মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানুষের মনের গঠন, মানুষের মনের ক্ষমতা অসীম। মানুষ তার স্থির মনের শক্তি দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে। মনস্থির করাই সাধনার মূল কথা। স্থির মন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এই ঐশ্বরিক ও অলৌকিক ক্ষমতা বলে ভারতের সাধক- সাধিকারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং বিভূতি লাভ করেছেন; শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্ব চরাচরে এই সত্য সর্ব যুগে ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। হিমালয়ের গহন কন্দরে অথবা তপোভূমি নর্মদার শ্বাপদ সংকুল গভীর অরণ্যে আজও দেখা যায় ধ্যানমগ্ন মানবাত্মা, যাঁদের বয়স সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। তাঁদের আচার-আচরণ বড় অদ্ভুত, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। এই সব আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের খাদ্যের প্রয়োজন নেই; বাসস্থানের ঠিকানা লোকালয় বর্জিত গভীর অরণ্য বা পাবর্ত্য ভূমি; পোশাকের প্রশ্নই নেই; অসুখ-বিসুখ হয় না, ফলে ওষুধেরও কোন প্রয়োজন নেই। মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধীন। কি ভাবে এসব সম্ভব? হিংস্র বন্য প্রানীদের এঁরা কি ভাবে একান্ত অনুগত গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত করেন? কিংবা বন্য হিংস্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এনাদের বন্ধু হয় কি ভাবে? উত্তর সম্ভবতঃ একটাই—তা হচ্ছে কঠোর যোগাভ্যাস ও ধ্যানের ফলে প্রাপ্ত মানসিক পরিকাঠামোর উপর নির্ভরশীল আধ্যাত্মিক শক্তি। এর দ্বারা কোন বিষয়বস্তুকে গভীর ভাবে দেখা ও উপলব্ধি করা আর এই গভীর উপলব্ধিই ঈশ্বর সান্নিধ্য এবং চরম ও পরম প্রাপ্তি।

আমি বললাম—তুমি হয় তো ঠিক কথা বলছ।

মাতু বলল—ঠিক কথা বলছি মানে! জেনে রাখো, এটাই মূল কথা। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা বলছি—আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে গঙ্গাসাগর মেলার সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুরা আসেন। বাবুঘাটের কাছে তারা দু'একদিন থাকেন। আমি যেতাম সাধু দেখতে, একটু আলাপ করতে, কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গলাভ করতে। আমার কলেজ জীবনের কথা বলছি, সেই বছর শীতের প্রকোপ ছিল খুব বেশী। বিভিন্ন তাঁবুতে সাধুরা রয়েছেন। আমি ঘুরে ঘুরে তাঁদের দেখছি। চোখ আটকে গেল একটি তাঁবুতে, সেখানে আবছা আলোয় বসে আছেন ১৫-২০ জনের এক দল সাধু। শুধু কৌপিন পরা, সারা গায়ে ভস্ম মাখা, তাদের মাঝখানে দিব্যকান্তি অতি অল্পবয়স্ক এক জ্যোর্তিময় জটাজুটধারী দেবোপম পুরুষ। অর্দ্ধ নিমিলিত চক্ষু, ধ্যানস্থ। ওদের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসলাম। ওদের মধ্যে যাকে দেখে মনে হয়েছিল বয়সে সবার চেয়ে বড়, তার সঙ্গেই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী-বাংলা এবং বাংলা-হিন্দীতে কথা বললাম কিছুক্ষন। জানলাম এই বয়স্ক ব্যক্তিটি প্রকৃত পক্ষে সবার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ছোট, বয়স সামান্য একটু বেশী, নব্বই বছর প্রায়, বাকীরা সবাই একশো বছরের বেশী। মাঝখানে ধ্যানস্থ যুবা পুরুষটির বয়স সবার চেয়ে বেশী—দুশোর বেশী।" এই সব সাধুদের গুরুদেব। ওদের বাসস্থান কুমায়নের গভীর অরণ্যের কোন এক গুহায়। এই গুরুদেব প্রসাদ? এক অজানা গাছের সবুজ ছোট একটা পাতা, বছরে একটি পাতা একবার খান এই গুরু মহারাজ। সারা বছর আর কোন খাদ্য খান না। মনে পড়ে গেল কামাখ্যা মন্দির সংলগ্ন দশনামী আখড়ায় এক সাধুর কাছে ঐ পাতা দেখেছিলাম। ঐ সাধুজী প্রতি গুরুপূর্ণিমায় একবার একটা পাতা খেয়ে আবার ধ্যানে বসে থাকেন ও নিত্য তন্ত্রক্রিয়া করেন। বিস্ময়ে বাক্-শূন্য আমি। মনে-মনে বার-বার প্রণাম জানালাম। ফিরে আসার সময় একশো টাকার একটা নোট দিয়ে প্রণাম করলাম। ওদের কয়েকজন করজোড় করে ফিরিয়ে দিল সেই অর্থ। আরও গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ঈশ্বরকে বার-বার ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম—তাঁর কীর্তির চেয়ে তিনি আরও মহান। সেদিন বুঝতে পারিনি ঐসব মানসিক ও দৈহিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান- কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই কেন? সব কৃচ্ছ সাধনের উদ্দেশ্য সেই জগৎ পিতার সান্নিধ্য ও দর্শন। কিন্তু ঐ কৃচ্ছ সাধনের পিছনে যে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, তা সেদিন বুঝিনি, আজ বুঝতে পারছি।

আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলাম—একটা পাতা খেয়ে একবছর না খেয়ে সাধনা করেন!

মাতু বলল—আলবাৎ করেন। এ পৃথিবীর কতটুকু তুমি জানো আর কতটুকুই বা আমি জানি! তবে শোনো, আর একটা ঘটনা বলি। একবার গুরুজীর সাথে শিলং গিয়েছিলাম। এক ভক্তের বাড়ীতে উঠেছি। ভক্ত মানুষটি ঐ জায়গার খুব ধনী ব্যক্তি। আনন্দে দিনগুলো কাটছিলো। ঐ ব্যক্তির সাথে গুরুদেবের কাজকর্ম শেষ হলেও আমরা কয়েকদিন ওখানেই ছিলাম। হঠাৎ একদিন রাতে গুরুদেব বললেন—মাতু, কাল খুব সকালে এখান থেকে বের হবো। ঝোলা গুছিয়ে রাখিস।

আমি সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলাম। ভোর বেলা, অন্ধকার তখনও আছে। গুরুদেব আমার ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। আমি ঝোলা কাঁধে বের হয়ে এলাম। গৃহকর্তা দরজা খুলে দিতেই আমরা দুইজনে হাঁটা ধরলাম। আধাশহর শিলং থেকে বেরিয়ে জি.এস. রোড থেকে আমরা গৌহাটি যাওয়ার একটা বাস পেয়ে গেলাম। ভোরবেলার খালি বাসে বসে সিটে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। আমাদের গন্তব্য উমিয়াম হ্রদ-এর বা লেক-এর পাশে এক প্রাচীন কালী মন্দির। এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে, লোকালয় থেকে দুরে, এই মন্দিরে থাকেন গুরুদেবের এক ধর্মভাই। কয়েকদিন তাঁর আশ্রয়ে থেকে আমরা ফিরবো গৌহাটী। বাস থেকে উমিয়াম ভিউ পয়েন্টে নেমে পড়লাম। এটা বাস স্টপেজ নয়, তাই কন্ডাকটর একটু চেঁচামেচি করল বটে কিন্তু পরে চুপ করে গেলো, আর আমরা নেমে যেতেই সে ও নেমে এসে গুরুদেবকে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। আমি এটা দেখে খুব একটা অবাক হয়নি কারণ এমন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঘটনা আগেও দু-একবার হয়েছে। যা হোক, রাস্তা পার হয়ে আমরা জঙ্গলের পথ ধরলাম। চুপচাপ দুইজনে একমনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, গুরুদেবই প্রথম কথা বললেন—মাতু, এখানে আমরা যে কতদিন থাকবো, ততদিন চুপচাপ থাকবি। তবে সবসময় সজাগ থাকবি। খুব অসুবিধা না থাকলে আমাকে ডাকবি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন গুরুদেব? তিনি বললেন—মেঘালয়ের এই পবিত্র অঞ্চলটা অলৌকিক ক্ষমতাশালী এক ডাকিনীর সৃষ্টি, আশেপাশের সকলে তাই বিশ্বাস করে। এই অঞ্চলের নাম মাওলিংখুঙ, এখানে অলৌকিকতার শিকড় অনেক গভীরে, অনুভব করবি। সেই ডাকিনী এখন আর দেহে নেই কিন্তু, তবে এখনও সে এখানে ঘুরে বেড়ায় তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। অনেকবার আমি তাদের অদৃশ্য শরীরী উপস্থিতি নিজে অনুভব করেছি। আশাকরি তুইও অনুভব করবি। তবে ভয়লেশহীন থাকবি। ওরা কারও ক্ষতি কোনওদিন করে না পারলে তোর সাধনায় সাহায্য করবে।

আমি হাঁটছি আর শুনছি গুরুদেবের কথা। বিভিন্ন নাম জানা-নাম অজানা গাছের এক ঘন জঙ্গল। প্রচুর পাখীর ডাক শুনতে শুনতে পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে চলেছি। ভাবছি, ডাকিনীর জাদুমন্ত্রে কি এমন একটা জঙ্গল সৃষ্টি হতে পারে! একজন ডাকিনী কি পার্থিব জাদুর সাহায্যে সমস্ত পার্থিব শক্তিকে সেই জায়গায় জড়ো করতে পারে?

ধীরে ধীরে আমরা জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়ছি, আর রাস্তাও সরু হতে হতে শেষ হয়ে গিয়েছে। এই জঙ্গল সত্যিই গহন কিন্তু ছবির মতো সুন্দরও বটে। এই জঙ্গল হাজার হাজার বছরের প্রাচীন গাছও চোখে পড়ল। হঠাৎ গুরুদেব একটা পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চারিদিকে আরও কিছু শ্যাওলা ধরা পাথর পড়ে রয়েছে। তবে এই পাথরটা চৌ-কোনা, মাঝের জায়গটায় একটা ফুটবলের মত গর্ত। সবুজ শ্যাওলা সারা গায়ে জড়ানো। এক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—গুরুদেব, আমরা এখানে দাঁড়ালাম কেন?

গুরুদেব বললেন—এটা বলির জায়গা। পশু, পাখী এমন কি আগে নরবলিও হয়েছে এখানে। আমরা মন্দিরের কাছে এসে পড়েছি। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—পাথর তো আরও রয়েছে, ওগুলোতেও কি বলি হয়েছে? গুরুদেব খুব ভক্তির সাথে নরম স্বরে বললেন—না, ওগুলো এক এক জনের বসার জায়গা।

এই জঙ্গলে পুরোনো আমলের বলি দেওয়ার পাথর দেখতে পেলাম। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কত দিনের পুরোনো তা কে জানে! পুরো জায়গাটা মাঝারি আকারের পাথর দিয়ে সীমানা করা। এছাড়া গর্ত করা গাছের গুড়ি তো আছেই। জঙ্গলের ভিতর থেকে দুরে দৃষ্টি ফেললে এখানে ওখানে রুক্ষ পাহাড় উঁকি মেরে চলেছে এবং জঙ্গলের এক দিয়ে একটি জলপ্রপাত বয়ে চলেছে যার জল বরফের মতো ঠাণ্ডা। জঙ্গলের এই গভীরে আকাশের আকার ছোট, মনে হয় দিনের আলো থেকে রাতের অন্ধকার বেশি চোখে চোখে পড়ে। ডাকিনীদের অশরীরী উপস্থিতি নিয়ে এই এলাকাটায় একটা গা ছমছমে পরিবেশ—মনে করতেই কেমন একটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গুরুদেব আমার ভাবগতিক দেখেই হয় তো বললেন—ভয় নেই, এগিয়ে চল।

গুরুদেব বললেন যে ডাকিনীরা নাকি প্রকৃতির শক্তিগুলোর সঙ্গে কথা বলতে পারে এমন কি আংশিক নিয়ন্ত্রণ করে। তারা মাটিতে কান পেতে মাটির তলার জীবনের শব্দ শুনতে পায়, তারা না কি বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, অন্ধকারে আলোর স্ফুরণ ঘটায় এবং গহন জঙ্গলের নিরীহ বা হিংস্র সকল জীব তাঁদের কথা শুনে চলে। গুরুদেবের কথা শুনতে শুনতে আমরা মন্দিরে পৌঁছলাম।

সহাস্য বদনে গুরুদেবের ধর্মভাই আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু মন্দির বলতে আমরা যা বুঝি তা এটা নয়। তিনটি বিশাল আকৃতির পাথরের উপরে একটা চ্যাপ্টা পাথর নিয়ে একটা ঘরের মত, এই আর কি। পাশে একটা জঙ্গলের কাঠকুটো আর পাতা দিয়ে একটা ছাউনি মতো ঘর। এটাতেই থাকেন ঐ সাধু। আমার হঠাৎ মনে হল—তা হলে আমরা থাকবো কোথায়!

এতটা পথ হেঁটে এসে আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। আমি তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। গুরুদেব এসে জাগিয়ে হাতে গরম এক পানীয়ের পাত্র দিলেন। পাত্রটা একটা মানুষের খুলির। গুরুদেব বললেন—এটা খেয়ে ঐ ঝর্ণায় স্নান করে এসো। ঝর্ণায় স্নান করা মনে হতে ভয় পেয়ে বসলো, ডাকিনীর ভয়, অশরীরীর ভয়।

ঐ সাধু, মানে গুরুদেবের ধর্মভাই বললেন—এই পবিত্র জঙ্গলটির নাম মাওলিংখুঙ্। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে সত্তর কি পঁচাত্তর কিলোমিটার মতো দুরত্বের এই এলাকা পূর্ব খাসিয়া পর্বতমালার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। মেঘালয়কে ঘিরে যত অলৌকিক রহস্য রয়েছে তার সিংহভাগ এই অরণ্যকেই কেন্দ্র করে। খাসিয়ারা মনে করে যে এই জঙ্গলই তাদের দেবদেবীদের পবিত্র মন্দির। আর, তাই এই অরণ্যে যারা প্রবেশ করবে তারা যেন দেবদেবীদের বিরক্ত বা উত্যক্ত না করে এবং এই অরণ্য থেকে কোনও কিছুই যেন বাইরে না নিয়ে যায়।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম—আপনাকে তারা কেউ কিছু বলেনি?

তিনি বললেন—না।

এই মাওলিংখুঙ্ অরণ্য আদতে বোগা উপজাতির মানুষের বসবাস ছিল যারা জয়ন্তীয়া পর্বতের নাড় অঞ্চল থেকে এখানে এসেছিল। এই উপজাতির সম্প্রদায় এখানে বিস্তার করলেও অচিরেই এখানে একটি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। খাসিয়াদের অনেক গোষ্ঠী আছে। সেই সময় তারা একজন যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজতে শুরু করে যে তাদের সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে উপজাতির মঙ্গল করতে পারবে। একদিন তারা এই মাওলিংখুঙ্-এ এক জনসভা করে। দুরদুরান্ত থেকে সকল গোষ্ঠীর খাসিয়া মানুষ সেই সভাতে যোগ দেয়। সকলেই নিজের নিজের মত করে এই সভায় ক্ষমতা দেখাতে শুরু করে।

এর পরেই তারা খামাহ নংসাই বলে একজন মহিলাকে তারা নেত্রী হিসাবে মনোনীত করে। এই খামাহ নামের মহিলাটি ছিল সাহসী, বুদ্ধিমতী এবং একজন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অসাধারণ কূটনীতিক। সে তার মায়ের কাছ থেকে অলৌকিক কিছু জাদুবিদ্যার শিক্ষা পেয়েছিলো। কোনও কিছু ঘটার আগেই সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আঁচ করতে পারত। সে তার স্বামী লিহির নংসাই-এর সাথে এই সভায় এসেছিলো। মাওফ্ল্যাঙের কাছে তারা লাইতোমা বন বস্তিতে থাকত, যদিও তার আদিবাড়ি অসমের নওগাঁতে। এমনিতেই এই উপজাতিরা জাদুবিদ্যা ও ডাকিনী বিদ্যায় বিশ্বাসী। আর, এই মহিলা সেই ডাকিনীর আশীর্বাদ পেয়েছিলো। তাঁর জাদুবিদ্যার ক্ষমতা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, পরবর্তীকালে শিলংয়ের সিয়েমরাও তাঁকে ভয় পেত। এই খামাহ তাদের নেত্রী হিসাবে শপথ নিলো।

খাসিয়া আদিবাসীরা যখন তাকে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব দিতে বলে তখন সে তা অস্বীকার করে বলে—যদি ঈশ্বর অনুমতি দেন তাহলে সে তাদের নেতৃত্ব দেবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছে প্রমান করতে সে তখনই তীর ছুঁড়ে একটা পাখী মেরে গাছ থেকে নামিয়ে আনে। সকলকে বলে—ডাকিনীর স্তব করো, স্তব শেষ হওয়ার আগে যদি পাখীটা বেঁচে ওঠে তবে আমি নেতৃত্ব দেব। এই উপবন ও উপবনের দেবী আমাকে এই ভাবে বার্তা দেবেন।

সকলে ডাকিনীর স্তব শুরু করলো, আর কি আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই পাখীটার ক্ষত সেরে গিয়ে জীবন্ত হয়ে উড়ে চলে গেলো।

খামাহ এখন উপজাতিদের নেত্রী, সকলে তাকে 'ইউ লিংদোহ' উপাধিতে ভূষিত করলো। যে পাথরগুলো তোমরা দেখে এলে তার উপর সকল গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়রা বসলো আর একটা পাথরের উপর প্রচুর পশু বলি হলো। খসিয়া উপজাতিদের বিশ্বাস সেই পাথরগুলোর পুরোনো শক্তিগুন এখনও একই রকম রয়েছে। শোনা যায়, সেই খামাহ্ এই পাথরগুলোকে মন্ত্রপূত করে দিয়েছিলো। অনেকে আবার বলে যে নেত্রী হওয়ার পরে সে পায়ে হেঁটে গোটা জঙ্গল ঘুরে মন্ত্র পাঠ করে বড়োবড়ো পাথর ও প্রাচীন গাছগুলোকে অভিমন্ত্রিত করে দিয়েছিলো। কিছু গাছকে এমন ভাবে মন্ত্রপুত করেছিলো যাতে গাছের উপর অংশ অদৃশ্য জানালা হিসেবে কাজ করে, যেই জানালা দিয়ে খাসিয়াদের এই পবিত্র ভূমির অভিভাবকরা তাঁর সন্তানদের উপর নজর রাখতে পারবেন। এই গুপ্ত দরজাগুলোর সম্পর্কে একমাত্র খামাহ্ অবগত ছিল কারণ প্রয়োজনে তাকে সেই অদৃশ্য জানালাগুলো খুলে অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে হত।

এখনও না কি জঙ্গলের কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে অলৌকিক গতিবিধি মালুম করা যায়। পাথর ও গাছগুলোর নিস্তব্ধতার মাঝে অদৃশ্য কিছু ছায়ার চলাফেরা লক্ষ করা যায়। গাছের পাতা, শেওলা কিংবা রাস্তার ধারে এই ছায়াগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়। এই জঙ্গলে অলৌকিক জীবনের শিকড় অনেক গভীরে।

আমি মাতুকে বললাম—এ আবার অলৌকিক কি!

মাতু বললো—অলৌকিক নয়! একজন মহিলা অতশত মানুষের মধ্যে থেকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নেত্রী নির্বাচিত হয়ে সমগ্র খাসিয়া উপজাতিদের মঙ্গল কামনাকারী ধর্মগুরু হল এটা কি সাধারণ কোনও ঘটনা?

আমি মাতুকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কতদুর পড়াশুনা করেছো?

পাগলী বলল—সে সব জেনে তোমার লাভ কি? তুমি তো এসেছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আর কিছু মন্ত্রতন্ত্র শিখতে। সেটুকু নিয়েই খুশী থাকো আর আমার মত মানুষের কাছে তার পূর্বজীবন সম্পর্কে কোন খোঁজ করবে না, কেউ বলেন না।

আমি মাতুর কাছে দুই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলাম—আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।

মাতু বলল—দেখো বাবা, তোমার এই জিজ্ঞাসা করাটাও মনের অনিয়ন্ত্রিত চলন। নিয়ন্ত্রিত মন কখনও এমন প্রশ্ন করে না। দুজন অপরিচিত সাধু প্রথম পরিচয়ে একে অপরকে এমন প্রশ্ন করে না। কারণ সাধক মাত্রই শক্তির অধিকারী। এই সব অত্যাশ্চর্য অলৌকিক শক্তি এক দিনে আসে না, কঠোর ও দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে লাভ করা যায়। আগে বুঝতাম না এই শক্তি লাভের পিছনে কোন্ বৈজ্ঞানিক সত্য এবং তথ্য লুকিয়ে আছে। বিভিন্ন ধরণের ধ্যানের পদ্ধতি, দেহের উপর মন্ত্রের প্রভাব, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে কুলকুণ্ডলিনীর গুরুত্ব, ধ্যানের প্রভাবকে কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং শেষে সাধনালব্ধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদ ভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন ও ব্যাখ্যা সঠিক উপায়ে ও গুরুসান্নিধ্যে থেকে লাভ করতে হয়। এর সাথে সাথে সাধকের অলক্ষ্যে শক্তির উদ্বোধন হয়। তুমি চাইলে তোমাকে একটা সাধনা শিখিয়ে দিতে পারি। তোমার খুব ভালো হবে। বয়স তো হল, দিনদিন শরীর দুর্বল হচ্ছে। এই সাধনাটা করো। প্রতি মাসে সাতদিন করে করবে আর পুরো কার্তিক মাসটা করবে। মন্ত্র ও সাধনাটা খুবই সোজা।

আমি বললাম—এই বয়সে আবার নতুন করে কিছু করতে মন চায় না।

মাতু হাসতে হাসতে বললো—মনের কি দোষ! আসলে দোষ হল তোমার। কয়েকটা বই লিখে তুমি ভাবছো মহা পণ্ডিত হয়ে গিয়েছো। তা নয়। আমি বলছি, তুমি করো। তোমার মণিপুর খুবই খারাপ অবস্থায় আছে, ছোটবেলাতেই ছিল, এখন আরও বেড়ে গিয়েছে। তুমি সূর্যসাধনা শুরু করো, ভালো হবে।

আমি বললাম—সে কেমন সাধনা?

মাতু বলল—এই সাধনাটা খুবই সহজ। অন্তর্দৃষ্টি এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য সূর্য সাধনা করলে মানুষের অনেক উপকার হয়। গুরুদেবের ঐ ধর্মভাই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। শোনো, সনাতন জ্যোতিষশাস্ত্র বলে যে—রাশিচক্রের মেষ রাশির অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে সূর্য যাত্রা শুরু করে মীনের রেবতী নক্ষত্রে শেষ হয়। সূর্যের পুরো রাশিচক্র ঘুরতে সময় লাগে বারো মাস। এই গ্রহটি মেষ রাশিতে সবচেয়ে শক্তিশালী আর তুলা রাশিতে সবচেয়ে দুর্বল। প্রতি বছর চৌদ্দ এপ্রিল সূর্য মেষরাশিতে আর তেইশ সেপ্টেম্বর সূর্য তুলা রাশিতে প্রবেশ করে। এই সময়টাই, সূর্য যখন সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে থাকেন ও সবল অবস্থানে থাকেন, মণিপুর চক্রের ভারসাম্য রক্ষা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করতে আর তোমার চারপাশের সমস্ত কিছুর মধ্যে থাকা সৌর শক্তির সাথে তোমার মনঃশক্তিকে একীভূত করার এটিই উপযুক্ত সময়। লক্ষ্য করে দেখো, এই সময়ের আগে-পরেই হিন্দুরা চৈত্র ও আশ্বিন নবরাত্রি ব্রত করে। বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে এপ্রিল এবং অক্টোবরেই ঋতুগুলিও এক বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তাই সৌরশক্তির একটি সম-করণ এই সময়ে তোমার মধ্যে গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে। তাই এই মুহূর্ত দুটি শুরু হওয়ার ত্রিশ দিনের সময়কালে সৌর শক্তিসঞ্চয় ও আত্তীকরণের জন্য অত্যন্ত শুভ। কেন? কারণ, সাধনার জগতে কোনো গ্রহ দুর্বল হয়ে পড়লে তার শক্তি তৈরি করা সহজ হয়। মন্ত্র যোগে, সাধক মন্ত্রের দেবতার সাথে ধীরে ধীরে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলে। শক্তি যখন সবথেকে কম ও বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কাজ করে তখন তাকে ব্যবহার করা খুব সহজ। এই সময়ে তোমার মণিপুর চক্র বা সোলার প্লেক্সাসে ত্রিশ দিনের জন্য ধ্যান করার ফলে শারীরিক স্তরে ও মানসিক স্তরে তোমার তিন ধাতু—বায়ু, পিত্ত ও কফ্, তোমার সমান বায়ু, তোমার শারীরিক তাপ শক্তি ও শরীরের স্থির বিদ্যুতের ভারসাম্য নিশ্চিত করে। তুমি যদি মন্ত্র-দীক্ষিত হও তবে এই শক্তি আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য এই সময়টি উপযুক্ত হবে।

এই বার আমি তোমাকে মাসব্যাপী কার্তিক সূর্য সাধনা বিষয়টি বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। এই সাধনার দুটি অংশ রয়েছে—সকালে ও রাতে। প্রথম দিনেই, তোমাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু সূর্যদেবের কাছে সংকল্প করতে হবে। তুমি বলবে যে, 'পরবর্তী ত্রিশ দিন ধরে আমি প্রতিদিন সকালে এই মন্ত্রের এক মালা করে জপ করব এবং প্রতি রাতে ধ্যান করব। আমি আমার আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির জন্য এটি করছি, তাই মহাবিশ্বের সকল শুভ শক্তি এবং পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ, গুরুদেবের আশীর্বাদ আমার সাথে থাকুক।'

সকালবেলায় সূর্যোদয়ের আগে উঠে পড়ো, এমন কি সূর্যোদয়ের তিরিশ মিনিট আগেই উঠতে হবে। এবার স্নান করে এবং পরিস্কার ও শুদ্ধ কাপড় পরে তোমার আসনে বসো এবং জলশুদ্ধি করে আচমন করে নাও। তোমার সামনে একটি আলাদা ছোট জলের পাত্র রাখো। এতে এক চিমটি গুঁড়ো হলুদ দিয়ে নিজের নিত্যকর্ম শেষ করো। এবার রুদ্রাক্ষ মালায় মানসিকভাবে—'ওঁম্ হ্রীং অশ্ব-তেজস্য অধোবানি স্বাহা।' মন্ত্রটি একশো আট বার জপ করে নাও। এটি সূর্য সাধন মন্ত্র। এবার তুমি হলুদ দেওয়া জলটুকু পান করে নাও। দ্বিতীয় একটি পাত্রে এক চিমটি গুঁড়ো হলুদ দিয়ে তাতে গঙ্গা জল নিয়ে শিবলিঙ্গমে অভিষেক করো বা কোন গাছের গোড়ায় ঢেলে দাও। তোমার কাজ শেষ। এখন তুমি প্রাতরাশ করতে পারো। রাত্রিবেলা, বিছানায় বসে, ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগে, তোমার মণিপুর চক্রে পাঁচ মিনিটের জন্য ধ্যান করো এবং—'ওঁম্ হ্রীং অশ্ব-তেজস্য অধোবানি স্বাহা' মন্ত্রটি একশো আট বার জপ করতে করতে তোমার মণিপুর চক্রে মন্ত্রের শক্তির প্রকাশ কল্পনা করো। এই ভাবে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কার্তিকমাসের প্রতিটি দিন এই বিশেষ সূর্য সাধনা করে ৩০তম দিনে সকালে শেষ হবে; যখন তুমি শিবলিঙ্গমে জল নিবেদন করবে। এর ফলে তোমার মণিপুর চক্র জাগ্রত হবে, তোমার কোষ্ঠীতে সূর্যের বল বৃদ্ধি হবে। বারো বছরের বেশি বয়সী যে কেউ এটি করতে পারে তবে সারা মাস নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতে হবেন। আমি চাই—ঐশ্বরিক করুণা তোমার সাথে থাকুক এবং তুমি নিজের সুস্থজীবনের জন্য এই সুন্দর সাধনা প্রতি বছর করতে থাকো।

আমি বললাম—বেশ, তুমি যখন বলছো তখন তাই করবো। কিন্তু গুরুদেবের সাথে যে মাওলিংখুঙ্-এ গেলে, ওখানে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন কালীমন্দির দেখলে তো।

মাতু বললো—হ্যাঁ, অনেক পুরানো কালীমন্দির। তবে ওখানে কোনও মূর্তি নেই। একখণ্ড ডিম্বাকৃতি পাথরে সিঁদুর লেপা আর তাতে চোখ-নাক-মুখ মতো আঁকা—কালীর মাথার মতো। ঐ হলো কালী। মন্দিরও বড়োবড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরী। ছাদ একটা বিশাল বড়ো পাথরের টুকরো। ভাবতেই অবাক লাগে যে অতবড়ো পাথরটাকে তুললো কি ভাবে!

আমি বললাম—এমন একটা মন্দির আমিও দেখেছি, মন্দিরটি মাত্র চারটি বিশাল আকৃতির পাথর দিয়ে তৈরী। বশিষ্ঠ মন্দির থেকে মাত্র কিছুদুরে—বিশ্বামিত্র গুহা।

মাতু ভৈরবী বললো—হয় তো এমন আরও অনেক আছে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, হতেই পারে। তবে, 'কালী' বলতে তুমি কি বোঝ?

মাতু বললো—একালে দেবী কালী বলতে যা বুঝি, তার ভিত্তি কামরূপ, কামাখ্যা ও কালিকাপুরাণ। কালিকাপুরাণ মানেই কামরূপ মন্দিরের দেবী কামাখ্যাকে কেন্দ্রে রেখে দীর্ঘ তন্ত্রচর্চা। এই চর্চার ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান কালে কালীর দেবী ভাবনার মূল রূপরেখা তৈরী হয়েছে। গুরুজনদের মুখে শুনেছি, কালিকাপুরাণ প্রথম সংকলিত হয়েছিলো দশম শতকে। গ্রন্থটিতে আটানব্বইটি অধ্যায় এবং প্রায় ন'হাজারটি শ্লোক রয়েছে। পুরাণটি সর্বতোভাবে দেবী কালীকেন্দ্রিক। কালীর নানা রূপ নিয়ে এখানে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। এতে বর্ণিত নদী ও পর্বতের নামগুলি কামরূপ রাজ্যের সঙ্গে জড়িত। এই সংকলনে দেবী কামাখ্যার পূজাপ্রকরণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। আসলে কালিকাপুরাণ একটি উপপুরাণ। এই পুরাণটি সৃষ্টি হয়েছে আঠেরোটি মহাপুরাণের বিষয়বস্তুর সম্মিলনে। বল্লালসেন থেকে রঘুনন্দনের সময় পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আদি কালিকাপুরাণ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত কালিকাপুরাণে-একান্নতম অধ্যায় থেকে দেবতা মহেশ্বর মানসপুত্র ভৈরব ও বেতালকে উপদেশের মাধ্যমে তন্ত্রশাস্ত্রের বিস্তৃত ও জটিল বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। কালিকাপুরাণের এই অংশটি দেবী কালীর পূজার্চনা ও তন্ত্রসাধনার মূল উৎস। প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিচার করলে মনে হয় বর্তমানে প্রচলিত কালীধারণা ষোলো শতকের পরেই বিকশিত হয়েছিলো, অর্থাৎ সুলতানি আমলে। কালের বিচারে বর্তমান কালী মূর্তিটি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিঃসন্দেহে অর্বাচীন।

আমি অবাক হয়ে শুনতে শুনতে বললাম—তাই না কি!

মাতু ভৈরবী তন্ময় হয়ে বলল—হ্যাঁ। কালীসাধকদের জন্যে কালিকাপুরাণ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। অন্যদিকে এর নরবলির বর্ণনা ও অন্যান্য বহু তান্ত্রিক আচার সাধারণ মানুষের জন্য ভীষণ ভয়ের কারণ। প্রচলিত মূলস্রোতের পূজাবিধি ও গোপন তান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে সমীকরণ করা হয়েছে কালিকাপুরাণে। এই পুরাণে পঞ্চ ম'-কারকে সাধকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে। আবার এই পুরাণে প্রথম ভক্তদের 'হিন্দু' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমন কি কামাখ্যাদেবীর পূজার্চনার অধিকার নিয়ে আর্য ও অনার্য সমাজের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার বিষয় হিসাবেও কালিকাপুরাণ এক অন্যতম প্রামানিক ধর্মগ্রন্থ।

আমি বললাম—আমি তো জানতাম চৈতন্যচরিতামৃতে প্রথম 'হিন্দু' শব্দটির প্রচলন হয়েছে।

মাতু বললো—ওসব ছাড়ো, অনার্যদের থেকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কিভাবে শক্তিসাধনের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে সেই কৌশল এইবার তুমি দেখো, নরকাসুরের কাহিনী থেকে তা স্পষ্ট বোঝো। অনার্য কিরাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শক্তিদেবী ও শিবের পরম্পরা পরস্পর নির্ভরশীল ছিলো। পুরাণ অনুযায়ী পুরাকালে প্রাগজ্যোতিষে কামরূপ রাজ্যের কেন্দ্রে কামাখ্যা অঞ্চল ছিলো 'নায়িকা দ্বারা আকীর্ণ'। এই নারীরা নানারকম তান্ত্রিক ও যৌগিকশক্তির আধার ছিলেন। মন্ত্র-তন্ত্র, জাদুবিদ্যায় তারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বহিরাগতদের তাঁরা জাদুবলে পশুতে পরিবর্তিত করে দিতে পারতেন। এই রাজ্যে এককালে দেবতা মহাদেব স্বয়ং 'রহস্য' নামে এক কঠোর তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যে শিবের মাহাত্ম্য ম্লান করে একদিন বিষ্ণুর পরাক্রম জারি হয়। বিষ্ণু রাজ্যটি দান করেন তাঁর ও ধরিত্রী দেবীর পুত্র নরককে। কিরাতরা ছিলেন কামাখ্যা নগরের মূল বাসিন্দা। সেখানে তাঁদের প্রবল প্রতাপ ছিলো। কামাখ্যা নগরীতে প্রতি বাড়ীর দরজায় দরজায় সোনার ঘট সাজানো থাকতো। চারিদিক ছিলো নানা রঙের পতাকায় সজ্জিত। কিরাতরা ছিলেন মদ্য-মাংসপ্রেমী। তাঁদের রাজা ছিল ঘট্টিক, বিষ্ণু এবং তাঁর পুত্র নরকের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের দেখলে তিনি কুপিত হতেন।

আর্য সভ্যতার প্রতিভূ দেবতা বিষ্ণু, শিবের অধিকারে থাকা প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য দখল করতে চাইলেন। কিন্তু রাজা ঘট্টিক আর্যদের দখলদারি মানলেন না এবং 'দেবতা'-দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হলেন। কিরাতরাজ ঘট্টিক তখন বিষ্ণু এবং তাঁর পুত্র নরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। যুদ্ধের সময় বীর কিরাত সেনাদের শরবর্ষণে অস্থির বিষ্ণু পুত্র নরককে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বললেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী সেই যুদ্ধে বীরত্ব সহকারে লড়াই করে নরক কিরাতরাজ ঘট্টিককে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে কিছু কিরাত বীর নরকের শরণাপন্ন হলেন বটে, কিন্তু বিষ্ণু

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নরককে জানালেন, অধিকাংশ কিরাত সম্প্রদায় দেবী দিগবাসিনীর (দিগম্বরী কালিকা) শরণ নিয়েছেন। দেবী তাঁদের রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নরক পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করে বিদ্রোহী কিরাতদের পরাজিত করায় বিষ্ণু তাঁকে বর দেন যে, নরক প্রাগজ্যোতিষে কামাখ্যা রাজ্যের অধিপতি হবেন। কিরাতরা পূর্বদিকে সাগরপারে বিতাড়িত হবেন। নরক রাজা হবার পর কামাখ্যায় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণরা এসে বসবাস শুরু করেন। কিরাতদের আরাধ্যা আদ্যাশক্তি যোগমায়া কামাখ্যাদেবী আর্যরাজাদেরও পূজ্যা হয়ে উঠলেন।

আমি বললাম—এখানে তো তবে শিবের অধিকার খর্ব হল।

ভৈরবী বললো—কিন্তু কাহিনী এখানেই শেষ হয় না। রাজা নরক দীর্ঘদিন শাসন করার পর তাঁর সঙ্গে অসুরদের রাজা বলির পুত্র বাণের সৌহার্দ্য হলো। বাণ ছিলেন প্রবল শৈব। তাঁর প্রভাবে পড়ে নরক বেদ-ব্রাহ্মণের অধিকার, অর্থাৎ আর্যসংস্কৃতির প্রতিপত্তিকে অবহেলা করতে শুরু করেন। নিজেও বিষ্ণু দেবতাকে ত্যাগ করলেন। শৈবপ্রভাবে নরক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যমী হয়ে উঠলেন। এই সময় বশিষ্ঠ গেলেন 'তারা মন্ত্র' সিদ্ধ করতে। নরকাসুর তাকেও তাড়িয়ে দিলো। এই 'বিদ্রোহ'-এর ফলে বশিষ্ঠমুনির অভিশাপে তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হয়ে গেলো। বিষ্ণু অত্যন্ত রেগে শৈবপন্থী নরকের রাজত্বকে উচ্ছন্নে পাঠালেন।

আমি বললাম—এতে তো স্পষ্ট যে প্রাগজ্যোতিষের অধিকার নিয়ে শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে।

মাতু ভৈরবী বললো—ঠিক তাই। যেহেতু কামাখ্যাদেবীর অধিকার পেলেই একসঙ্গে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের অধিকারও অর্জন করা যায়, তাই উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই কখনও থামেনি। কালিকাপুরাণের এই কাহিনীর মধ্যে আবহমান কাল ধরে চলে আসা বাংলা ও অসমে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে ক্ষমতাদখলের ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বারো-তেরো শতকে কালিকাপুরাণের কেন্দ্রে ছিলেন শৈবমতের সঙ্গে সংলিপ্ত দেবী যোগমায়া। এই দেবী শিবের অন্যতম শক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। বর্তমান কালিকাপুরাণে যে প্রবল তান্ত্রিক আনুগত্য চোখে পড়ে, তখনও তা দানা বাঁধেনি। এই পুরাণের পরবর্তী সংস্করণে আরও একটি অসঙ্গতি দেখা যায়। এর মধ্যে বৈষ্ণব আগমের প্রভাবও স্পষ্ট। প্রবণতাটি সম্পূর্ণ শাক্ত পরম্পরায় রচিত একটি পুরাণে বেমানান। মনে করা হয় কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর উপস্থিতির মূলে রয়েছে 'পঞ্চরাত্র' আন্দোলনের প্রভাব। এককথায় বর্তমানে প্রকাশিত কালিকাপুরাণ একটি শাক্ত ও বৈষ্ণব আগমশাস্ত্রের মিশ্রিত ধারণা। ষোলো শতকে নির্মিত বর্তমান কামাখ্যা মন্দিরের সর্বত্র বিষ্ণুমূর্তির প্রাধান্য ও মন্দিরের পাশে একটি বিষ্ণুমন্দিরও এই ধারণার সাক্ষ্য দেয়।

আমি বললাম—এর পরে তো বিষ্ণু ও পৃথ্বীদেবীর সন্তান নরকাসুর বন্ধু বাণাসুরের প্রভাবে শৈবমত গ্রহণ করেন।

মাতু বললো—হ্যাঁ। এই সময়ে ভগবান বিষ্ণু বিচলিত হয়ে পড়েন। ভীষণ রেগে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গিয়ে নিজেই তাকে বিনাশ করার জন্য বিষ্ণু এগিয়ে আসেন। রাজা নরকের সঙ্গে যুদ্ধে বিষ্ণুর সঙ্গী ছিলেন স্বয়ং কামাখ্যা দেবী। বিষ্ণুর শক্তি হিসেবে কালিকা ও কামাখ্যা দেবীকে দেখা যায় কালিকাপুরাণের এই পর্বে। শিবের শক্তি হয়ে ওঠার অনেক আগে কালী ছিলেন বিষ্ণুর শক্তিরূপ বিষ্ণুমায়া। বিষ্ণুকে দিয়ে শুরু হলেও সামগ্রিকভাবে কালিকাপুরাণের মতে শক্তিদেবী কালীর পুরুষসঙ্গী ছিলেন শিব। কালীর নামান্তর ছিলো রুদ্রাণী, শংকরী বা শিবদূতী। দেবী জন্ম-জন্মান্তর ধরে নানারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন শিবের শক্তি হয়ে। শিবের মনোযোগ আকর্ষণ, তাঁকে জয় করাই ছিলো শক্তিদেবীর প্রধান উদ্দেশ্য।

আমি বললাম—ঠিকই তো, শুরু থেকেই কালিকাপুরাণ বৈষ্ণব ও শাক্তমতের পরস্পর বিপরীত মেরুর মধ্যে একটা সংঘাত রয়ে গিয়েছে!

মাতু বললো—প্রথম পর্বে বিষ্ণুর সঙ্গে দেবীর যোগ বিষয়ে আলোচনা আছে। পুরাণটির সূচনায় হরির প্রতি প্রণাম জানিয়ে তবেই দেবীর প্রতি আনুগত্য জানানো হয়েছে। দেবী এখানে 'বিষ্ণুমায়া'। বিষ্ণু তাঁকে সৃষ্টি করেছেন ভক্তজনের আশ্রয়, জ্ঞান ও মুক্তিদায়িনীরূপে। 'মায়া তোমাদের রক্ষা করুন। তিনি বিষ্ণুমায়া। সূর্যালোকে যেমন অন্ধকার দুরীভূত হয়, তাঁর দয়ায় মানুষের অজ্ঞান দুর হবে। তিনিই মুক্তির হেতু এবং পাপচিন্তা দূর করে মানুষকে শুদ্ধসত্ত্ব করবেন।'

আমি বললাম—কেন, শৈব বা শাক্ত মতে তাদের কি শুদ্ধ বিচার ছিলো না?

মাতু বললো—নিশ্চয়ই ছিলো। আগে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমানাটা জানো। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা সমেত পুর্বের ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমদিক আর উত্তরে অরুণাচল ভুটান সমেত পশ্চিমে বিহারের কোশী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই রাজ্য। এই ভূখন্ডের কিছু অংশ অন্তত মহাকাব্যিক যুগে জলের নিচে ছিল আর অধিকাংশ অংশ জল-জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্গম, ব্রহ্মপুত্র এখনকার মতো গারো পাহাড়কে বেড় দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে লৌহিত সাগরে পড়ত। আদিবাসীরা ছিল বর্মা, মঙ্গোলিয়া ও আদি অস্ট্রাল জাতির সংমিশ্রণ। এদের ভাষাকেই আর্যরা 'পাখীর ভাষা' বলতো। এই কামরূপ রাজ্য 'আর্য ভারত'-এর ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ভৌগলিক ভাবে বহুদূরে ছিল। পর্বত ও ঘন জঙ্গলে ঢাকা জনপদে পাহাড় ছাড়াও ছিলো দুর্বার ব্রহ্মপুত্র নদ। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল হয়ে স্থলপথের সংযোগটিই ছিলো যোগাযোগের প্রধান উপায়। এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান স্রোতটির মধ্যে বজ্র ও লামাতন্ত্রযানের প্রভাব ছিলো প্রবল। এই জনগোষ্ঠীর আনুগত্য অর্জন করতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি তন্ত্রমন্ত্রের প্রথা-প্রণালী আত্মস্থ করতে পারছিলো না। তাই শৈব মূলনিবাসী ও বিষ্ণুবাদী বহিরাগত শক্তির মধ্যে টানাপোড়েন সমানে চলতে থাকে। আজকের দিনেও দেশের উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দেখতে পাই। একসময় কামরূপ এই ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিলো। স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজ্যের মেয়েরা ছিলেন পুরুষদের থেকে উজ্জ্বলতর মানবগোষ্ঠী। বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা এটা মেনে নিতে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পারতো না। নারীদের এতো প্রভাব-প্রতিপত্তি সরাসরি বিরোধিতাও করতে পারতো না তারা। শেষ পর্যন্ত কামরূপের নারীদের বিরুদ্ধে ডাকবিদ্যা চর্চার অভিযোগ তুলে বহিরাগত আর্য পুরুষদের জন্য সাবধানবাণী প্রচার করা হতো, যাতে কামরূপের স্বাধীনা, রূপসী, বরনারীদের আকর্ষণে যেন আর্য বীরেরা মোহগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। এক কথায় ঐ নারীরা ডাকিনী-যোগিনী-জাদুকরী ও তারা মোহগ্রস্ত পুরুষদের রক্ত পান করে থাকে, তাদের প্রতি মোহ জয় করতে না পারলে দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বীর ক্ষত্রিয়রা 'মেষজন্ম' লাভ করবে—এই সব প্রচারে যে বিশেষ লাভ হয়েছিলো, তা নয়। বহিরাগত আর্য পুরুষরা স্থানীয় নারীদের সঙ্গিনী করে তন্ত্র-মন্ত্র চর্চায় সুখে দিনাতিপাত করতেন, তা আর্যাবর্তের পুরোহিতরা যতো রাগই করুন না কেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর্যেতরদের কিছু কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলো আবার অনেক কিছুই করেনি।

আমি বললাম—এই ভাবে শৈব আর বৈষ্ণবদের আধিপত্য বিস্তারের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠে একসময় বহিরাগত আর্য সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে অনার্যরা। তবে কামরূপ জনপদটি ভারতীয় নারীশক্তির আদি কেন্দ্র। সারাদেশে যখন পুরুষতান্ত্রিকতার আতিশয্যকে কেউ কখনও চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি, একমাত্র কামরূপ সভ্যতাই চিরকাল নারীশক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে শিরোপা দিয়ে এসেছে। জনজীবনে ও ব্যক্তিযাপনে এখানকার কৌমসংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেবী কালীর প্রবল প্রভাব। তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নিজেদের অধ্যাত্মচর্চার অঙ্গ করে ফেলেছিলেন। কামরূপের কামিনীরা ইতিহাসের একটা সময়ে পুরুষতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে স্বাধীন হওয়ার ক্ষমতা অর্জনের উৎস ছিলেন। তাদের আপনজন ছিলো দেবী কালী, তাদের ছিলো মহাদেবীর যোনিপীঠভিত্তিক 'মনোভব গুহা'-মন্দিরের আত্মবিশ্বাসী ঐতিহ্য। তবে বেশ সুন্দর করে একটা নতুন বিষয়বস্তু বোঝালে।

মাতু বললো—এটাই তো মূল বিষয়।

আমি মাতুর জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সাধারণ একজন মেয়েকে দেখে বোঝাই যায় না যে সে কি অপার জ্ঞানের ভাণ্ডার! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কালী কি অনার্য্য দেবী বলে কালো না অন্য কোনো তাৎপর্য্য আছে?

মাতু বললো—অনার্য বলেই তো মনে হয় আমার। আর কালিকাপুরানের কাল হলো উত্তরবৌদ্ধ যুগ। তা ছাড়া কালী মহাভারতেরও আগের তাই কালী হলো অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ীয় দেবী। অনেকেই বলেন, কালী দুর্গা সব একই। মোটেও না। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে দেবীমাহাত্ম্যে এক মহাকালীর ধ্যান আছে, যাঁর দশ পা, দশ মুখ, তিনিই মহামায়া, তিনিই বিষ্ণু-ব্রহ্মা-শিবের শক্তি। তিনিই আবার পরবর্তীকালে ধ্যানে তিনি মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী হিসেবে চিহ্নিতা। এরপরে সপ্তসতী চণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভর সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবী পার্বতীর শরীর থেকে কালী বেরিয়ে আসেন। পরে তিনিই চন্ড-মুন্ড কে হত্যা করেন ও রক্তিবীজের রক্ত পান করে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আবার মূলদেবী পার্বতীর শরীরে মিশে যান। তাই দেবীমাহাত্ম্যে কালী একজন উপদেবী মাত্র—দশম

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শতাব্দীতে কালীকে নিয়ে মূল আলোচনা করা হয়েছে কালিকাপুরাণে। এর মধ্যবর্তী সময়ে নগ্নিকা শক্তিদেবী হিসেবে দেবী তারা এসে গিয়েছেন, বজ্রযানীরা তন্ত্রকে বাড়াতে শুরু করেছে। কালিকাপুরাণের দেবী কামাখ্যা বলো, কালী বা তারা বলো, ছিন্নমস্তা বা মাতঙ্গী বলো, বজ্রযানীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও পূর্ব ভারতে। তবে লক্ষ্য করলে দেখবে, খেটেখাওয়া মানুষ-ই প্রকৃতি আর তাদের আরাধনাই শক্তির আরাধনা এবং কালীপুজো হলো সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের আরাধনা।

আমি মাতুকে জিজ্ঞাসা করলাম—তবে দেবীমাহাত্ম্যের উপদেবী কালী অনার্যদের পূজিত অন্য কোনও দেবী থেকে কি এসেছিলেন?

মাতু বললো—তা বলতে পারো। বৈদিক যুগের আগে, সভ্যতার উষালগ্নে, সারা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে পালন হত তন্ত্রধর্ম। তাতে শিব ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন দেবী ছিলেন আর তাদের পরিচিতিও আলাদা আলাদা ছিলো। আজকের কালী তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের তৈরী করা পুরাণে ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণদের হাতে পড়ে উবে যেতে বসা বাংলার প্রাচীন তন্ত্রধর্ম আশ্রয় নেয় তখন বৌদ্ধ ধর্মে। বৌদ্ধরা এতে বিচলিত হয়ে মহাযান, হীনযান ইত্যাদি ভাগে নিজেদের ভাগ করে নেন। ফলে এমন একটা ধারণা তৈরী হলো যে তন্ত্র আসলে বৌদ্ধদের একাংশের ব্যাপার স্যাপার। আদৌ তেমন কিছু নয়, হাতবদল হয়েছে মাত্র। বৌদ্ধধর্ম বলতে প্রথমে মহাযান, পরে বজ্রযান। কালিকাপুরাণ আর বজ্রযান প্রায় সমসাময়িক। আসলে বহিরাগতরা আমাদের পূর্বভারতে এসে এখানকার খাদ্য, বাসস্থান, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতির মোহে পড়ে গিয়েছিলো। ছিল পশুপালক হয়ে গেলো চাষা। কিন্তু মহাজনগিরি ছাড়তে পারলো না। রুদ্রকে শিবের সাথে মিলিয়ে নিলো, কালীকে বিয়ে দিয়ে দিলো শিবের সাথে, বিষ্ণুর দশাবতারের সৃষ্টি হলো—মাছ, কচ্ছপ, শুওর, বুদ্ধ নিয়ে, জাঙ্গুলী হলো মনসা, হারীতি হলো ষষ্ঠী, বসুধারা হলো লক্ষ্মী। এর বাইরেও অনেক দেবদেবী আছেন যারা আর্যদের হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়ে ব্রাহ্মণের পুজো পেতে লাগলো। বাঙ্গালী তখন থেকে হিন্দু হতে শুরু করলো।

আমি বললাম—মানে, বাঙ্গালী কি হিন্দু নয়?

মাতু বললো—বৌদ্ধও নয়। বাঙ্গালী হল বাঙ্গালীই। কালী বাঙ্গালীর, হিন্দুত্ব চাপিয়ে কালীকে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

আমি বললাম—ব্যাপারটা কিরকম?

মাতু বললো—বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশের একাদশ অধ্যায়ের কাহিনী বলে যে, যযাতিপুত্র পুরুর বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র, তাদের শাসনাধীন ছিল ভারতের পূর্বভাগ। এই অঞ্চলে প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ট্রাল জাতির মানুষদের বাস ছিলো, এবং তারাই পূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসী। মহাভারতের আদিপর্বেও অসুররাজ বলির এই পাঁচ পুত্রের উল্লেখ আছে। বলিরাজের এই পাঁচ সন্তান পূর্বভারতের যে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পাঁচটি রাজ্য শাসন করতেন, তাঁদের নাম থেকেই সেই পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। বলিরাজার এই পাঁচটি পুত্র 'বালেয় ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হয়েছেন। মৎস্য ও বায়ু পুরাণেও বলিরাজার এই পাঁচ ছেলের উল্লেখ আছে। তাই এদের হিন্দু বলা যাবে না। তবে উচ্চশ্রেণির বাঙালী ছিল আলপাইন আর্য সম্প্রদায়ের ও এরা নর্ডিক আর্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত সংস্কৃতির।

আমি বললাম—তাহলে এদের ভাষাও আলাদা আলাদা ছিল?

মাতু বললো—অঞ্চলভেদে ভাষা আলাদা হলেও মূল ভাষা ছিল বাংলা ভাষার উপর ভিত্তি করেই। প্রাচীন যুগের 'বঙ্গ' বলতে যা বোঝাতো, বর্তমানের বিহারের দ্বারভাঙা থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও আসাম, ত্রিপুরা এবং মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের কিছু অংশ, উত্তরের নেপাল-ভুটান থেকে দক্ষিণের সুন্দরবন ও সাগর অবধি—এই সমস্ত এলাকাটাই শুধু বাঙালীপ্রধান অনার্য জাতিগোষ্ঠীর ছিলো। এখনও এই অঞ্চলের বর্ণ, ভাষা, স্বর, সংস্কৃতি প্রায় কাছাকাছি। আবার সেই অর্থে এখানে কোনো একছত্র রাজা ছিলো না, ছোটছোট গোষ্ঠীর সামন্ত শাসক ছিলেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগে এই পুরো এলাকায় কোনো বৌদ্ধ বা মুসলিম জনবসতিও ছিলো না।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং প্রচারের ফলে শুধু বঙ্গেই নয় সমগ্র ভারত অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, আফগানিস্তান, নেপাল ও ভুটান- এই সমগ্র এলাকার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জন গোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করে ফেলে। বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের ফলে গ্রাম, শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঢুকতে শুরু করলো, তখন ঐ আদিম ধর্ম পালন করা পাহাড়-জঙ্গলের মানুষেরা তাদের ধর্ম নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মে শামিল হলেন। সেই থেকে কালী, তারা ইত্যাদিরা বৌদ্ধ ধর্মের একাংশের দেবী বলে প্রতিষ্ঠা পেলেন। তাই বলছিলাম কালী হিন্দু নন, বৌদ্ধও নন, তার চেয়েও পুরোনো। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এই সমস্ত অঞ্চলে অরাজকতার সময়ে গোপাল-এর নেতৃত্বে পালবংশের পত্তন হয় ও 'বঙ্গদেশ'-এর এই অ-বৌদ্ধ রাজা ও তার বংশধরেরা পরবর্তী চারশ' বছর ভারতবর্ষ শাসন করেন। তবে সাথে সাথে পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্বভারতে বিভিন্ন বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাও হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাথে বৌদ্ধধর্মের চর্চা অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আনুমানিক ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে শংকরাচার্য, কুমারিল ভট্ট এবং এরকম আরো কয়েকজনের প্রচেষ্টায়—বর্তমানের ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নেপাল ভূখণ্ডে হিন্দু ধর্ম আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই পদ্ধতিটা ছিলো, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে সনাতন ধর্মের ধর্মগুরুদের তর্কসভায় ধর্ম নিয়ে রক্তপাতহীন যুক্তি-নির্ভর আলোচন হতো, যদি হিন্দুরা পরাজিত হয়, তাহলে ঐ এলাকার অবশিষ্ট সকল হিন্দু বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করবে, আর যদি বৌদ্ধরা পরাজিত হয়, তাহলে তাদেরকে আবার সনাতন ধর্মে ফিরে আসতে হবে; বলা বাহুল্য সনাতন ধর্মের ধর্মগুরুদের সাথে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বৌদ্ধরা কোনোদিনই জিততে পারেনি, এভাবেই এই পুরো এলাকার বৌদ্ধরা অধিকাংশই আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে।

শংকরাচার্য ছিলেন দক্ষিণভারতের মানুষ, তার জীবনকালও ছিলো অল্প, মাত্র ৩২ বছরের এই জীবনে সারা ভারতবর্ষ তাঁর অধিকারে এলেও আমাদের এই বঙ্গে এসে নাথ যোগী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে যুক্তি-তর্কে তিনি পরাজিত হন। ফলে বঙ্গের বৌদ্ধরা আর হিন্দু ধর্মে ফিরে আসেনি, বঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতিরই পীঠস্থান ছিলো। এই পরিস্থিতি চলে প্রায় ১২০০ সাল পর্যন্ত। তবে এর মাঝে আবার বঙ্গের শাসনভার পাল বংশের থেকে আসে হিন্দু সেন বংশের কাছে। শেষে ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি যখন বিহার ও বঙ্গ আক্রমন ক'রে দখল করে, তখন সমগ্র বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দুরা এক সাথে বখতিয়ার খিলজির ইসলামিক শক্তির সম্মুখীন হয় এবং বৌদ্ধরা পরাজিত হয়ে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, যার প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার, কুমিল্লার ময়নামতি বিহার, মেদিনীপুরের মোগলমারী বিহার এবং ভারতের পাটনার নালন্দা বিহার ও বৃহত্তর বঙ্গদেশ ছেড়ে, তাদের কিছু বই পুস্তক নিয়ে জীবিত ভিক্ষুরা পালিয়ে চলে যায় তিব্বত, নেপাল, ভুটানে। এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাপদ', যা ছিলো বৌদ্ধভিক্ষুদের সাধন-সঙ্গীত, তা আবিষ্কৃত হয়েছিলো নেপাল থেকে। ইতিহাস বলে, বৌদ্ধ বাঙালীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইসলামের পীড়নে ধর্মান্তরিত হয়। কিন্তু অনার্য বাঙালীকে এতবার ধর্মমত পরিবর্তন করিয়েও তার মন থেকে 'কালী' দেবীকে মুছে ফেলা যায়নি। আমরা তাই অনেক মুসলমান কবিকে কালীসঙ্গীত লিখতে ও গাইতে দেখি। তো সে যাই হোক্, ধীরে ধীরে আদিম অনার্য ধর্ম ও তার প্রয়োগ ও কালী সাধনা মুছে যাওয়ার মতো হয়েও টিমটিম করে টিকে থাকলো পাহাড়-জঙ্গলে আদিবাসীদের কাছে আর কালী ব্রাহ্মণের দেবী হয়ে লালপাড় শাড়ী পরলেন ও অনার্য আধা-ন্যাংটা দেবতা শিব বাঘের চামড়া ছেড়ে ধুতি-উত্তরীয় পরে দেবসভায় সিংহাসনে বসে হিন্দু ধর্মের দেবতায় পরিণত হলেন।

আমি বললাম—হম্। আর তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতি ধারণা সাংখ্য দর্শন থেকে এসেছে।

মাতু বললো—দেখো, যখন তুমি অনার্য দেবীদের সাথে একজন করে পুরুষ দেবতা গুঁজে দিলে, মানে বৈদিক আর তন্ত্রের মিলনের সময় থেকে বলতে পারো, পুরুষ-প্রকৃতি ধারণা সাংখ্য দর্শন থেকে তন্ত্রে এসেছে। আর তন্ত্রের দেবতাদের অনার্য্য দেবতা ধরে নিলে সাংখ্যও অনার্য্য দর্শনের থেকে আসছে ভেবে নেওয়া যায়। সাংখ্যের অনেক আগেই ভারতের আদিবাসীরা এই চর্চায় ছিলো। আসলে বেদের আগেও যে ভারতে বুদ্ধির চর্চা ছিলো, এটা আমরা মানতে চাই না বা মানতে চাওয়ানো হয় না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার বিস্তারের হাতিয়ার করেছিলো গিলে খাওয়াকে, আত্তীকরণ করাকে। তাই আদিবাসীদের আচার-ধর্মের বেশ কিছু বিষয়কে তারা গিলে খেয়েছিলো এবং সুচারুভাবে হজমও করেছিলো। তার প্রভাব সাংখ্যতে থাকতেই পারে। জাগতিক তৃপ্তির জন্যে ঈশ্বর-এর উপাসনা, বর্ণাশ্রম, যজ্ঞ ইত্যাদি মিলিয়ে যে বৈদিক ধর্ম, তার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উল্টোদিকেও একটা সাধন-জগৎ থাকছে যারা জাগতিক ভোগকে দুঃখ-কষ্টের হেতু ধরছে এবং কিছু অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে মুক্তি পেতে চাইছে, এই ধারাটি সাংখ্যে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

আমি মাতুকে প্রশ্ন করলাম—তাহলে তুমি বলছো যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম হাত ধরাধরি করে চলছিল?

মাতু বললো—বৌদ্ধধর্মের যে অংশটি তন্ত্রকে তাদের ধর্মের অংশ করে নিলো, তারা তো বুদ্ধের ধর্ম থেকেই বিচ্যুত, কারণ বুদ্ধ ছিলেন নিরীশ্বরবাদী, পুরোপুরি নাস্তিক। ওঁর ধর্ম পালনে ঈশ্বর নেই তো দেবদেবী আসে কোথা থেকে? ওটা পুরোটাই আদিবাসীদের আদিম ধর্ম সমেত বৌদ্ধধর্মের খোলসে আশ্রয় নেওয়া, যাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গিলে খাওয়াকে আটকানো যায়। পরে যখন আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, হিন্দু ধর্ম হয়ে শংকরাচার্যের হাত ধরে ফিরে এলো, যখন বুদ্ধ অবতার হয়ে গেলেন, আর উপায় না দেখে ওরা সেই হিন্দু ধর্মের ভিতরেই তন্ত্রকে নিয়ে এলেন। নিম্নবর্গের চর্চা হিসাবেই তান্ত্রিক আচার থেকে গেলো পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের ভিতরে, এটাই মূল বিষয়। লক্ষ্য করো, বৌদ্ধ বা তান্ত্রিকরা কেউই বেদ-এর ঈশ্বর-এর উপাসনা করেননি—জীবনের দুঃখক্লেশ মোচনের জন্য কিছু নীতি মেনে তার মাধ্যমে নির্বাণ বা মুক্তির কথা ভেবেছেন, সেই হিসেবে বৌদ্ধ দর্শন থেকে তন্ত্রের মিলনের একটা সহজ রাস্তা আছে, যেটা বৈদিক ধর্মের সঙ্গে নেই।

আমি মাতুর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে অবাক হলাম, কতো খবর সে রাখে! তাই আবারও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তবে একসময় আমি বুঝতে চেয়েছিলাম, কালীকে অনার্য্য দেবতা হিসেবে হিন্দু ধর্মে আনা হয়েছে না কি বৌদ্ধ দেবী হিসেবে মুখ্য হয়েছেন তাই হিন্দুধর্ম পাত্তা দিতে বাধ্য হয়েছে?

মাতু বললো—কালীকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তৈরী করেছে ভারতের আদিবাসী দেবীদের আদলে। আবার বৌদ্ধ ধর্মে আদিবাসিন্দাদের দেবদেবীরা এসেছেন আদিবাসীদের হাত ধরেই, যাকে পন্ডিতেরা পরে যার নাম দিয়েছেন 'তন্ত্র'। আবার তারও পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের সময়, তারাই ঢুকে পড়েছেন হিন্দু তান্ত্রিক রূপ ধরে। তাই, কালীকে অনার্য দেবী হিসাবে হিন্দু ধর্মে আনা হয়েছে এটাও যেমন সত্যি, আবার, কালী অনার্যদের থেকেই বৌদ্ধ ধর্মে এসেছেন এটাও সত্যি, আবার, কালী বৌদ্ধ ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে এসেছেন সেটাও সত্যি। তবে সব সত্যিগুলোরই সময় কাল ভিন্ন ভিন্ন। গৌতম বুদ্ধ বেদ বা অন্য কোন দেবতাতেই বিশ্বাস রাখতেন না এবং তান্ত্রিকেরাও বেদের ঈশ্বর বা দেবতায় বিশ্বাস করতো না, কিন্তু তাদের নিজেদের দেবতায় বিশ্বাস রাখতেন। তাই বৌদ্ধ ধর্মে দেবদেবীর প্রশ্নই ওঠে না। বুদ্ধের অবতারত্ব হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের পরেই হচ্ছে, যার হাত ধরেই হোক। যেমন ধরো ঋগ্বেদ-এর নিঋতি দেবী। তিনি কৃষ্ণবর্ণা ও ঘোরা। পরে আর এনাকে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় নি। ঐতেরেয় ব্রাহ্মনে একবার 'পাশহস্তা'-র উল্লেখ আছে মাত্র। ঐ নিঋতি দেবী, বা ঐ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শক্তিদেবীর অনার্য্যতা, এটা তো স্বীকৃত তথ্য। পুরাণে উপনিষদে আছে। ঐ নিঋতি দেবী কিন্তু কালীর পুর্বাতনা এবং কালো। এমনিতেই ঋগ্বেদে শুধু পুরুষ দেবতার কথা। সেখানে নারী দেবীর উল্লেখও বেশ, যাকে বলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বললাম—কিন্তু আর্যরা কি মূর্তি পুজো করত?

মাতু বললো—কালী অনার্য দেবী এটা ঠিক। তাঁর পুজো অনেকদিন আগে থেকেই হত, কিন্তু সে ছিল নিরাকার। সেটির মধ্যে অনার্য্য প্রভাব তো আছেই, সে তো গায়ের রং দেখেই বোঝা যায়। ওদিকে হরিবংশে এক দেবী ছিলেন কিরাতিনি, চোরেদের পুজ্যা, বনে-জঙ্গলে শবর পুলিন্দরা এঁর ভক্ত। ইনি পত্রবসনা, তাই একে পর্ণশবরী বলা হতো। সে ও কালো রঙের। কিন্তু কালী অর্থে নগ্না, কালো, হাড়মালা, এইসব হতে সময় লাগবে। এই যে কালী আমরা দেখি সেটি মুলতঃ শ'পাঁচেক বছর আগে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কল্পনা। কথিত যে উনার ধ্যান মুর্ত্তি অনুযায়ী মাটির মুর্ত্তি গড়ানো হয় এবং সেই থেকেই কালী পুজোর শুরু। তো, এর আগে শস্ত্রধারিনী, কালো, শ্মশানচারী কিছু দেবীমুর্ত্তি নানান পুরাণে এসেছেন, তাদের চেহারা ও আকৃতি বর্ত্তমানের কালী মুর্ত্তির সাথে কিছুটা মিল হলেও সম্পুর্ন একরকম নয়। আমার যেটা অদ্ভুত লাগে সেটা হলো এঁই মাতৃমুর্ত্তির চেহারায় আছে এক বিভৎস রূপ কল্পনা এবং হিন্দুর দেবদেবী কল্পনার মধ্যে সবথেকে খোলাখুলি একটা প্রচন্ড যৌনতার জোরদার প্রকাশ। তাঁর মন্ত্রে কালী ও তার নানান সঙ্গীরা প্রায় এমনই বিপরীতরতাতুরা অথবা রতিস্থিতা ও যুগলে আবদ্ধ। বৈদিক দেব-দেবীরা তেমন নয়। দেবী কালী সমস্ত তন্ত্র সাধনারই মূল আরাধ্যা,. কিন্তু বামাচারী তন্ত্রের বিভিন্ন কার্যকলাপ, যা মূলত বজ্রযান থেকে এসেছে, তার থেকে একটু আলাদা। তন্ত্র ও কালী সমান্তরাল দুটো বিষয় ও দুটোরই ব্যপ্তি বিশাল।

আর্য্যদের মুর্ত্তি পুজো ছিলো না। তাই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের সময়ে বাংলায় খুব যজ্ঞ হতো আর তার খরচা রাজারাজড়াই দিতে পারতেন। ফলে পুরোহিতদের আর সংসার চলতো না। তাই তারা তখন অনার্য্য দেবদেবী ও মুর্ত্তি পুজোকে আত্তীকরণ করলেন। এরপর তারা বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থ লেখা শুরু করলেন। এক কালীকে বিভিন্ন কোন থেকে দর্শন করে আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন ধ্যান ও মন্ত্রের রচনা করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা মাতু, তুমি তন্ত্র বিষয়টিকে নিজের জীবনের সাথে মিশিয়ে নিয়েছো।

সে বললো—সবই কালীর কৃপা আর আমার গুরুদেবের যত্ন। গুরুদেব আমার সাধনায় যা সাহায্য করেছেন, যে ভাবে আমাকে চোখে চোখে রেখেছেন, মনে হয় আর কেউ এমন ভাবে তার গুরুদেবকে পায়নি। আমি সত্যিই তাঁর কৃপাধন্য। কতরকমের যে কালীর রূপকল্পনা ও মন্ত্র আছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!

আমি বললাম—আমাকে কি কিছু সাধনা ও মন্ত্র শিখাবে?

নিশ্চয়ই শিখাবো। প্রথমে বলি একাক্ষরী কালী মন্ত্রের কথা। কালী কালী বলো।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালীমন্ত্র জপ করলে যে যা চায় সে তা পায়। কালীমন্ত্র জপে রোগ শোক সব কিছু দূর হয়, নিশ্চয়ই হয়। ভগবান শঙ্কর বলেছেন—কালীমন্ত্রের তুল্যা বিদ্যা আর কোথাও নেই, কালীমন্ত্র জপে শান্তি পুষ্টি আদি কর্ম অচিরে সিদ্ধ হয়।

মহাপদি মহাত্রাসে মহাদারিদ্র্য-সঙ্কটে।
বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ মহাঘোরে ভয়ঙ্করে।।
রাজাদিভয়মাপন্নে রাজচক্রে বিশেষতঃ।
উক্তমন্ত্রমিমং দেবি লক্ষমাত্রং সমভ্যসেৎ। —পিচ্ছিলাতন্ত্র।

—মহা-আপদে, মহাভয়ে, মহাদারিদ্র্য-সঙ্কটে, মহাদারুণ ব্যাধিবদ্ধিতে, ভয়ঙ্কর রাজভয়ে বিশেষত রাজচক্রান্তে, হে দেবি! উক্ত মন্ত্র লক্ষ জপ করবে। দেবতার ক্রোধে, ভীষণ গ্রহদোষ ভয়ে, ভয়ের সাগর প্রান্তরে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'লে, সর্বত্র শান্তিকার্য্যে, ধননাশ উপস্থিত হ'লে ও স্বজনগণের বিদ্বেষে 'অযুতং প্রজপেন্মনুম্'— অযুত কালীমন্ত্র জপ করবে। কালী মন্ত্রজপকারীকে সযত্নে পালন করে থাকেন। সেজন্য পরম যত্নে কালিকাকে ভজন কর। জপ না করলে সিদ্ধবিদ্যাও হানি করেন; হোম ব্যতীত ঐশ্বর্য লাভ হয় না। 'ন সির্দ্ধিজ্জপনং বিনা'—জপ বিনা সিদ্ধি হয় না। সর্ব্বত্র পূজা বিনা জপ হয় না।

একাক্ষরী কালীমন্ত্রের প্রভাব খুব, একাক্ষরী মন্ত্র 'ক্রীং' হলো কল্পবৃক্ষ স্বরূপ।

একাক্ষরী মন্ত্রের ধ্যান হলো —

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকা-করাম্।।
মুক্তকেশীং ললজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

বঙ্গার্থ—যিনি শবারূঢ়া, মহাভয়ঙ্করাকৃতি, ভীষণদশনা, বরদায়িনী, সহস্যবদনা, ত্রিনয়না; যাঁর হস্তে কপালকর্ত্তৃকা বিরাজমান, যাঁর কেশ আলুলায়িত ও জিহ্বা লোলা; যিনি বারংবার রুধির পান করছেন, চারটি বাহুর মধ্যে দুই হাতে বর ও অভয় ও আর দুই হাতে খড়্গ ও মুণ্ড ধারণ করছেন, সেই দেবীকে স্মরণ করি।

এবার আমার কালীমন্ত্রের মহিমা শোন্। এ মহামন্ত্র জানা মাত্রই মানুষ জীবন্মুক্ত হতে পারে, এ সকল মন্ত্রের মন্ত্রশুদ্ধির চিন্তা নেই—অরি-মিত্রাদি দোষ বিচার করতে হয় না। এ মন্ত্রের আরাধনাতে সময় অসময় বিবেচনা নেই, এবং অধিক অর্থব্যয় কিংবা অধিক কায়ক্লেশ করতে হয় না। যে সাধক সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী কালিকাকে চিন্তা করে তার হস্তে সর্ব্বদা সর্বসিদ্ধি বিদ্যমান থাকে এবং সভাতে সে ব্যক্তির মুখ হতে গদ্যপদ্যময় বাক্য নিঃসৃত হয়, তাকে দেখা মাত্র প্রতিপক্ষগণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। রাজারাও তার দাস হয়ে থাকেন, অন্য সাধারণ মানব সম্বন্ধে আর কি বলব। সে সাধক দিবারাত্র ব্যত্যয় অর্থাৎ দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন করতে পারে, ত্রিভুবনকে বশ করতে সমর্থ হয়, দেহান্তে দুর্ল্লভ দেবীর গণত্ব লাভ করে। ভৈরবতন্ত্রে বলা হয়েছে —

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দিবারাত্রব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্ত্তুংক্ষমো ভবেৎ।
অন্তে চ লভতে দেব্যা গণত্বং দুর্লভং নরঃ।।

যারা কালীসাধনা করে তাদের পিতৃগণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কুব্জিকাতন্ত্রে বলা হয়েছে

কে মে গোত্রে সমুৎপন্নাঃ কালীং সাধিতুমুদ্যতাঃ।
তৎ শ্রুত্বা পিতরঃ সর্ব্বে নৃত্যন্তি হৃষ্টমানসাঃ।।

—আমার বংশে উৎপন্ন কারা কালীসাধনা করতে উদ্যত হয়েছে—তা শুনে তাদের পিতৃগণ আনন্দিত মনে নত্য করতে থাকেন।

কালিমূর্ত্তি খুব ভয়ঙ্করী কেন না, যারা পাপী তারা কালীকে ভীষণা দেখে ভয় পায়। ভক্তেরা ভীষণা দেখে না—ভয় পায় না, বাঘিনীকে দেখলে অন্য সকলে ভীত হয়, বাঘিনীর ছেলে মা'র প্রসন্ন মুখ দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অসুর সংহার করার জন্য কালীকে ঐরকম মূর্ত্তি ধারণ করতে হয়, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য রূপ শত্রুগুলোকে, অজ্ঞান রূপ মহাশত্রুকে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে সংহার করে আর স্নেহময়ী প্রেমময়ী মা হয়ে সাধককে কোলে করে স্তন্যপান করায়। ভক্ত কেবল মা মা করে ডাকে, তাই সে কালীকে আর ভয়ঙ্করী দেখে না, অতিসুন্দর নয়ন-মন-বিমোহন কালীর রূপ দেখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এক কালীকে আশ্রয় করলে মানুষ একেবারে নির্ভয় হয়ে যায়। কালী মন্ত্র জপে মানুষ সমস্ত লোক কর্ত্তৃক পূজিত হয়। মহাবিদ্যা কালীর একাক্ষর মন্ত্র সারাৎসার, শ্রেষ্ঠ হতেও অতি শ্রেষ্ঠতর। যদি জাপক হেলা করেও কালীর একাক্ষর মন্ত্র জপ করে তাহলেও চতুর্বর্গ লাভে সমর্থ হয়।

কালী মন্ত্রের যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ কালীকে নিন্দা করে। কালীপুজোর প্রসাদ গ্রহণ করে না। যারা কালীর নিন্দা করে তাদের আয়ু ক্ষয় হয়, পুত্র কলত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং শেষে নরকে গমন করে। কালীর সাধকের কোন চিন্তা নেই।

ব্রহ্মযামলের প্রসিদ্ধ 'আদ্যাস্তোত্রে' ভারতবর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন স্থানের স্থানিক দেবীদের একচ্ছত্রছায়ায় আনার একটি চেষ্টা দেখা যায়। সেখানে সেতুবন্ধের 'রামেশ্বরী', থেকে পুরুষোত্তমের 'বিমলা', ওড়িশার 'বিরজা' থেকে নীলপর্বতের 'কামাখ্যার' পাশে বঙ্গের 'কালিকা'র নাম দেখা যায়। এই ব্রহ্ম নারদ সংবাদ থেকে এই স্তোত্র পাঠে এটা বুঝা যায় যে, বৃহত্তর বাংলায় দেবী কালিকার নামে বিখ্যাত। বঙ্গের ধর্মীয় জীবন বৈষ্ণব ও শৈব প্রভাবিত হলেও তার কেন্দ্রভূমি তন্ত্রশাসিত। আর তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার আদি বিদ্যা কালী। 'কুব্জিকাতন্ত্রে' স্বয়ং সদাশিব বলেছেন কালীর উপাসনাই কলির মোক্ষদানকারী—'কালিকা মোক্ষদা দেবী কলৌ শীঘ্র ফলপ্রদা।' আবার 'পিচ্ছিলাতন্ত্র' আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, কালী ভিন্ন কলির দ্বিতীয় কোনও উপাস্য নেই—

কলৌ কালী কলৌ কালী
নান্যদেবো কলৌ যুগে।

'পীঠনির্ণয়' তন্ত্রের ঊনবিংশ সতীপীঠ হল 'কালীপীঠ'। 'পীঠাধীশ' ও 'পীঠনায়িকার'

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিবরণ এইরকম—

নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপদাঙ্গুলি চ মে।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা।।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পীঠবর্ণনায় হুবহু এর বঙ্গীয় অনুবাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত—

কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলি ডানিপা'র।
নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তার।।

তন্ত্রশাস্ত্রের 'কালীপীঠ' বাঙালি কবির লেখায় এখানে 'কালীঘাট' হলো। কেন হল, তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ নেই। কলকাতার প্রসিদ্ধ বর্তমান কালীঘাট মন্দিরের দেবী কালিকা এবং পীঠভৈরব নকুলেশ পূজিত হন। অর্বাচীন 'নিগমকল্প'-এর পীঠমালায় বর্তমান কালীঘাটের পরিচিতি দানে মহাদেবের মুখে উক্ত হয়েছে —

দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুকাকার ক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্যকং।।

—অর্থাৎ 'ভাগীরথীর পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলাপুরী পর্যন্ত ধনুকাকার দুই যোজন ক্রোশব্যাপী এলাকা কালীক্ষেত্র।' এর এক ক্রোশ মতো ত্রিকোণ ক্ষেত্রে দেবী বিরাজমানা। এই ত্রিকোণের এক কোণে ব্রহ্মা, আর এক কোণে বিষ্ণু এবং অবশিষ্ট কোণে মহাদেব অবস্থিত থাকায় এই ক্ষেত্র মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। এখানে ভৈরবী, বগলা ইত্যাদি অষ্টশক্তি বিরাজমানা। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে শুধু মানুষ নয়, কীটপতঙ্গাদিও দেহত্যাগ করলে মুক্তিলাভ করবে। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দু'টিতে কালীঘাটের কথা পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে রচিত হয়েছিল কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। সেখানে কালীঘাটা স্থাননাম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে—

ত্বরায় চলিল তরী তিলক না রয়।
চিৎপুর শালিখা এড়াইয়া যায়।।
কলিকাতা এড়াইল বেলা অবসানে।
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
কালীঘাটা এড়াইল বেনের নন্দন।।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গি দিল দরশন।।

বেতাই চণ্ডীর উদ্দেশ্য পূজা দিলেও কালীঘাটে তারা পূজা দিলেন না বটে, তবে ঘাটের নাম যেহেতু কালীঘাট তাই কালীর অবস্থান অস্বীকার করবার উপায় নেই। আবার সপ্তদশ শতকের 'ভবিষ্য পুরাণ'-এর ব্রাহ্মখণ্ডের ২২তম অধ্যায়ের শ্লোকটিতে—'গোবিন্দপুর প্রান্তেচ কালী সুরধুনী তটে' বলে কালীঘাটের উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে রচিত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় এর 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী'তে কালীঘাট তীর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চলিল দক্ষিণ দেশে বালি ছাড়া অবশেষে।
উপনীত যথা কালীঘাট।
দেখেন অপূর্বস্থান পূজা হল বলিদান
দ্বিজগণ করে চণ্ডীপাঠ।।'

এই বিবরণ আবার কালীঘাটের প্রতিষ্ঠা বিষয়ক জনশ্রুতির বিপরীত। পরবর্তীতে লালমোহন বিদ্যানিধির 'ঘটককারিকা'র সম্বন্ধ নির্ণয় অংশে দেখতে পাই—

'কালীঘাটে কালী হল সাবর্ণ সম্পত্তি।
হালদার পূজক এইত তার বৃত্তি।।'

যা হোক্, বর্তমানে বঙ্গদেশে যে, দেবী কালিকার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা এখানকার কালী মন্দিরের সংখ্যাধিক্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তাই 'বঙ্গদেশে চ কালিকা'—এই বাক্য কতটা প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও বঙ্গের কালী প্রাধান্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এতো কিছু মনে রাখো কি করে?

মাতু বললো—মনে রাখাটাও সাধনার অঙ্গ। তাই সব কিছু মনে থাকে আর মন্ত্রগুলো লিখে রাখি। তোমার ইচ্ছা হলে লিখে নিও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—দাও তবে তোমার খাতাটা।

মাতু ভৈরবী সরল মনে তার মন্ত্রের খাতাটা আমাকে খুলে দিলো। পরিস্কার ঝরঝরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা মন্ত্র, ধ্যান ইত্যাদি। আমি বললাম—উরিব্বাস্, এ তো অনেক লেখা, এতোসব এখন লিখবো কিভাবে!

মাতু বললো—তাহলে তুমি সময় করে পরে লিখে নিও।

আমি পরে একে একে সবগুলো লিখে নিয়েছিলাম। এই মন্ত্রগুলির আলাদা আলাদা ধ্যান আর সাধনাও আলাদা আলাদা। এখানে মন্ত্রগুলি শুধু দিলাম। পরবর্তীকালে এই মন্ত্র থেকে বেছে বেছে কিছু সাধনা পদ্ধতি লিখে দেবো।

২) দ্বি-অক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং, খ) ক্রীং হুং। গুহ্য কালী তন্ত্রে বলা হয়েছে এই মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, বীজ ক্রীং, শক্তি স্বাহা, কীলক হুং।

৩) ত্র্যক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং, খ) হ্রীং শ্রীং ক্রীং, গ) হ্রীং শ্রীং ক্লীং, ঘ) ক্রীং হুং হ্রীং, ঙ) ক্রীং স্বাহা, চ) ঐং ক্লীং হ্রীং, ছ) ক্লীং হুং হ্রীং, জ) ওঁ হ্রীং হ্রীং, ঝ) হুং ক্রীং হুং, ঞ) হ্রীং ক্রীং হ্রীং, ট) হুং হ্রীং হুং, ঠ) হ্রীং হুং হ্রীং, ড) হ্রীং স্বাহা, ঢ) হুং স্বাহা, ণ) হ্রীং হ্রীং হ্রীং, ত) ক্লীং ক্লীং ক্লীং।

৪) পঞ্চাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা, গ) ক্রীং হ্রীং হুং ফট্।

৫) ষড়ক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা, খ) ক্রীং কালিকে স্বাহা।

৬) সপ্তাক্ষর কালী মন্ত্র—পরমেশ্বরী স্বাহা।

৭) অষ্টাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং হুং হ্রীং

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা, গ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা, ঘ) দক্ষিণে কালিকে স্বাহা, ঙ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

৮) নবাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

৯) দশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্, খ) ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্, গ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, ঘ) হ্রীং ক্রী শ্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা।

১০) একাদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ঐং নমঃ ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা, খ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা, গ) নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা।

১১) দ্বাদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা।

১২) চতুর্দশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা।

১৩) পঞ্চদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) নমঃ নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালিকে হুং, খ) হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

১৪) ষোড়শাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা, খ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা, গ) হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা।

১৫) সপ্তদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) স্ত্রীং হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা। খ) ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা।

১৬) বিংশত্যক্ষর কালী মন্ত্র—ক) হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং। খ) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

১৭) দ্বাবিংশত্যক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। খ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। গ) হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা।

১৮) ভদ্রকালী মন্ত্র—হৌং কালী মহাকালী কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।

১৯) গুহ্য কালী মন্ত্র—ক্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং স্বাহা।

২০) মহা কালী মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং।

২১) শ্মশান কালী মন্ত্র—ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং।

২২) কামকলা কালী মন্ত্র—ক্লীং ক্রীং হুং ক্রোং স্ফোং কামকলা কালী স্ফোং ক্রোং হুং ক্রীং ক্লীং স্বাহা।

২৩) সিদ্ধি কালী মন্ত্র—ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

২৩) কঙ্কালী কালী মন্ত্র—ওঁ হ্রীং কালী কঙ্কালী কিল কিল স্বাহা।

২৪) রক্ষা কালী মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং।

২৫) কামাখ্যা কালী মন্ত্র—ত্রীং ত্রীং ত্রীং।

পরবর্তীকালে 'কালী সাধনা' বইটির বর্ধিত অংশে সাধনার আরও বিবরণ প্রকাশিত হবে।

আমি পরে একে একে সবগুলো লিখে নিয়েছিলাম। এই মন্ত্রগুলির আলাদা আলাদা ধ্যান আর সাধনাও আলাদা আলাদা। এখানে মন্ত্রগুলি শুধু দিলাম। পরবর্তীকালে এই মন্ত্র থেকে বেছে বেছে কিছু সাধনা পদ্ধতি লিখে দেবো।

২) দ্বি-অক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং, খ) ক্রীং হুং। গুহ্য কালী তন্ত্রে বলা হয়েছে এই মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, বীজ ক্রীং, শক্তি স্বাহা, কীলক হুং।

৩) ত্র্যক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং, খ) হ্রীং শ্রীং ক্রীং, গ) হ্রীং শ্রীং ক্লীং, ঘ) ক্রীং হুং হ্রীং, ঙ) ক্রীং স্বাহা, চ) ঐং ক্লীং হ্রীং, ছ) ক্লীং হুং হ্রীং, জ) ওঁ হ্রীং হ্রীং, ঝ) হুং ক্রীং হুং, ঞ) হ্রীং ক্রীং হ্রীং, ট) হুং হ্রীং হুং, ঠ) হ্রীং হুং হ্রীং, ড) হ্রীং স্বাহা, ঢ) হুং স্বাহা, ণ) হ্রীং হ্রীং হ্রীং, ত) ক্লীং ক্লীং ক্লীং।

৪) পঞ্চাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা, গ) ক্রীং হ্রীং হুং ফট্।

৫) ষড়ক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা, খ) ক্রীং কালিকে স্বাহা।

৬) সপ্তাক্ষর কালী মন্ত্র—পরমেশ্বরী স্বাহা।

৭) অষ্টাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং হুং হ্রীং ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা, গ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা, ঘ) দক্ষিণে কালিকে স্বাহা, ঙ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

৮) নবাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

৯) দশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্, খ) ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্, গ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, ঘ) হ্রীং ক্রী শ্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা।

১০) একাদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ঐং নমঃ ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা, খ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা, গ) নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা।

১১) দ্বাদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা।

১২) চতুর্দশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, খ) ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা।

১৩) পঞ্চদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) নমঃ নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালিকে হুং, খ) হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

১৪) ষোড়শাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা, খ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা, গ) হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা।

১৫) সপ্তদশাক্ষর কালী মন্ত্র—ক) স্ত্রীং হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা। খ) ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা।

১৬) বিংশত্যক্ষর কালী মন্ত্র—ক) হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং। খ) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

১৭) দ্বাবিংশত্যক্ষর কালী মন্ত্র—ক) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। খ) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। গ) হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা।

১৮) ভদ্রকালী মন্ত্র—হৌং কালী মহাকালী কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।

১৯) গুহ্য কালী মন্ত্র—ক্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং স্বাহা।

২০) মহা কালী মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং।

২১) শ্মশান কালী মন্ত্র—ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং।

২২) কামকলা কালী মন্ত্র—ক্লীং ক্রীং হুং ক্রোং স্ফ্রোং কামকলা কালী স্ফ্রোং ক্রোং হুং ক্রীং ক্লীং স্বাহা।

২৩) সিদ্ধি কালী মন্ত্র—ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

২৩) কঙ্কালী কালী মন্ত্র—ওঁ হ্রীং কালী কঙ্কালী কিল কিল স্বাহা।

২৪) রক্ষা কালী মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং।

২৫) কামাখ্যা কালী মন্ত্র—ত্রীং ত্রীং ত্রীং।

পরবর্তীকালে 'কালী সাধনা' বইটির বর্ধিত দ্বিতীয় ভাগে সাধনার আরও বিবরণ প্রকাশিত হবে।

—সম্পূর্ণ—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

Preservation Foundation, Chandigarh

তন্ত্রের সাথে দেবী কালীর সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আর কালীর সাধনা ও শাক্ত-প্রভাব 'বঙ্গদেশ'- যে প্রবল এটা বোধকরি অস্বীকার করা যায় না। বৃহত্তর বঙ্গদেশ-এ কালীর সাধনা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসছে। উড্ডিয়ান (ধারণা করা হয় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম), (অসমের) কামাখ্যা, সিরিহট্ট (বর্তমানের শ্রীহট্ট) ও পূর্ণগিরি তন্ত্রের মুখ্য পীঠস্থান বলেও যে চারটি জায়গার উল্লেখ আছে তা ও এই বঙ্গদেশ-এ। এই বঙ্গদেশ, দেবী কালী ও কয়েকটি সাধনা নিয়ে লেখক এই বইয়ে বিবৃত করেছেন।

লেখকের জন্ম ও প্রাথমিক পড়াশুনা উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয়। কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ফিজিয়োলজি অনার্স। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে কর্মজীবন শুরু। পরে কম্পিউটার এডুকেশন, প্রেস ও ডিটিপি নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ এক সাধু মানুষের সংস্পর্শে এসে হয় কামাখ্যা দর্শন। সেই বছরই অম্বুবাচী মেলায় গৌহাটিতে এসে হয় তাঁর মানসিক পরিবর্তন। বর্ধমানে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ ও পুনরায় কামাখ্যায় বসবাস। বিভিন্ন সাধুগুরুগণের সংস্পর্শে এসে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটা বেড়েছে। সেই সাধনজীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই বইটি আশাকরি সকলের উপযোগী হবে।

সনাতনী প্রকাশন